উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা-৩

৬৮-তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা — মাঘ, ১৩৭২

উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৭২

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১	শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর মহাসমাধি		...	৫৭
২।	দিব্য বাণী		...	৬০
৩।	কথাপ্রসঙ্গে			৬১
	শ্রীরামকৃষ্ণ			
৪।	যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে	স্বামী সারদানন্দ	...	৬২

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
৫।	স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র			...	৬৩
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ	(গান)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৬৪
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনাদর্শ		স্বামী আদিনাথানন্দ	...	৬৫
৮।	শক্তির উৎস		ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ	...	৬৯
৯।	পাঙ্গী পাহাড়	(কবিতা)	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	...	৭৩
১০।	মৌলনা রুমীর অধ্যাত্মকাব্য		ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল	...	৭৪
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা		স্বামী নির্বেদানন্দ	...	৭৯
১২।	প্রার্থনা	(কবিতা)	শ্রীস্মরজিৎ মুখোপাধ্যায়	...	৮৪
১৩।	চিকাগো বক্তৃতার গুরুত্ব		শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন	...	৮৫

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১৪। শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি	স্বামী যতীশ্বরানন্দ	...	৮৯
১৫। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পরিস্থিতি	শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার		৯৭
১৬। সমালোচনা		...	১০৩
১৭। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ		...	১০৭
১৮। বিবিধ সংবাদ		...	১১১

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে ভাল হয়। **বার্ষিক মূল্য** (ডাক মাশুল সহ) **টাকা ৫·৫০ ও ষাণ্মাসিক টাকা ৩৲।** প্রতি সংখ্যা ০·৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা** যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। 'উদ্বোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।**

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৭২

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১।	শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ			...	১১৩
২।	দিব্য বাণী			...	১১৫
৩।	কথাপ্রসঙ্গে			...	১১৬
	ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য				
	ছাত্রজীবনে সংযম ও জাতির ভবিষ্যৎ				
৪।	ভারতের সীমারেখা	(কবিতা)	শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর	...	১২০

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
৫।	পঞ্চকোশ বিচার		স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ	...	১২১
৬।	ফাল্গুনে	(কবিতা)	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	১২৬
৭।	স্পিতম জরথুষ্ট্র		জে. কে. ওয়াডিয়া	...	১২৭
৮।	ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পরিস্থিতি		শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার		১৩২
৯।	ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা	(কবিতা)	শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত	...	১৩৫
১০।	রামায়ণী		শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল	...	১৩৬
১১।	বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি		শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	১৪০
১২।	প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ		স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ	...	১৪৭
১৩।	প্রার্থনা	(কবিতা)	শ্রীমতী শিবানী মৈত্র	...	১৫২

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১৪।	স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র			১৫৩
১৫।	নৈষা তর্কেণ	(কবিতা)	শ্রীশিবশম্ভু সরকার	১৫৫
১৬।	শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা		স্বামী নির্বেদানন্দ	১৫৬
১৭।	সমালোচনা			১৬১
১৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ			১৬৩
১৯।	বিবিধ সংবাদ			১৬৭

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে ভাল হয়। **বার্ষিক মূল্য** (ডাক মাশুল সহ) **টাকা ৫'৫০ ও ষাণ্মাসিক টাকা ৩৲।** প্রতি সংখ্যা ০'৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। 'উদ্বোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।**

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৭৩

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১।	দিব্য বাণী			...	১৬৯
২।	কথাপ্রসঙ্গে			...	১৭০
	সনাতন ধর্ম, ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর				
৩।	স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র			...	১৭৫
৪।	ধম্মপদ	(কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	...	১৭৬

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
৫।	ভগবৎপ্রসঙ্গ		স্বামী মাধবানন্দ	...	১৭৭
৬।	স্বরূপ	(কবিতা)	শ্রীমদন চৌধুরী	...	১৮০
৭।	চারি আর্যসত্য		ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ	...	১৮১
৮।	বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি		শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	১৮৬
৯।	বিশ্বগীতি	(কবিতা)	শ্রীঅনন্তনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১৯৩
১০।	মহাপরিনির্বাণের বাণী		ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্য	...	১৯৪
১১।	শক্তির বিভিন্ন রূপ		ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ	...	১৯৮
১২।	জীবন শিল্প ও স্বামী বিবেকানন্দ		স্বামী তথাগতানন্দ	...	২০৩
১৩।	নাভি-তীর্থ (মণিপুর)		শ্রীমতী শিবানী দত্ত	...	২০৮

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১৪।	পথের সন্ধানে		ব্রহ্মচারী প্রসূন	..	২১৩
১৫।	প্রার্থনা	(কবিতা)	শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২১৬
১৬।	সমালোচনা			...	২১৭
১৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ			...	২১৯
১৮।	বিবিধ সংবাদ			...	২২৩

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে ভাল হয়। **বার্ষিক মূল্য** (ডাক মাশুল সহ) **টাকা ৫·৫০ ও ষাণ্মাসিক টাকা ৩৲**। প্রতি সংখ্যা ·৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন**। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। 'উদ্বোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক**।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১।	দিব্য বাণী		...	২২৫
২।	কথাপ্রসঙ্গে		...	২২৬
	দেশসেবকের আদর্শ			
	ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা			
৩।	বুদ্ধদেব স্মরণে	স্বামী আদিনাথানন্দ	...	২৩০

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
৪।	'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু'		স্বামী ধীরেশানন্দ	...	২৩৩
৫।	"বাণীর অমৃত ঢালো"	(কবিতা)	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	২৩৮
৬।	বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি		শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	২৩৯
৭।	আলমবাজার মঠ		শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	২৪৬
৮।	প্রেম-রূপ	(কবিতা)	শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	...	২৫৫
৯।	প্রাণের পরিচয়		শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে বেদান্তবিনোদ		২৫৬
১০।	সোঽহম্	(কবিতা)	শ্রীগুরুদাস দাশ	...	২৬১
১১।	শিক্ষাপ্রসঙ্গ		স্বামী ভূধরানন্দ	...	২৬২
১২।	পরলোকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু			...	২৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১৩।	শিল্পচর্যায় শিল্পাচার্য নন্দলাল	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী	২৬৮
১৪।	শ্যামা-সঙ্গীত (গান)	শ্রীসুধীরকুমার দাস ...	২৭০
১৫।	সমালোচনা	...	২৭১
১৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ	...	২৭৫
১৭।	বিবিধ সংবাদ	...	২৭৭

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে ভাল হয়। **বার্ষিক মূল্য** (ডাক মাশুল সহ) **টাকা ৫·৫০ ও যাণ্মাসিক টাকা ৩৲।** প্রতি সংখ্যা ০·৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—*গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে,* **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। 'উদ্বোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।**

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩৭৩

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১।	দিব্য বাণী		...	২৮১
২।	কথাপ্রসঙ্গে অন্তর্মুখিতা বা আধ্যাত্মিকতা— মানবতাকে বাঁচাইবার উপায়		...	২৮২
৩।	স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র		...	২৮৮

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৪।	ভগবৎপ্রসঙ্গ	স্বামী মাধবানন্দ ...	২৮৯
৫।	'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার'	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ...	২৯৩
৬।	শক্তির বিভিন্ন রূপ	ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ ...	৩০১
৭।	রাজস্থানের মেলা উৎসব ও ব্রত পার্বণ	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী ...	৩০৪
৮।	অশেষ করুণা (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাশ ...	৩১০
৯।	বন্যানিয়ন্ত্রণ	শ্রীচিরঞ্জীব সরকার ...	৩১১
১০।	শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅজিত সেন ...	৩১৯
১১।	জাগো! (কবিতা)	শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৩২৩
১২।	ঈশ্বর	শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়	৩২৪

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১৩।	ষোড়শীপূজা	(কবিতা)	শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী	...	৩২৭
১৪।	সমালোচনা			...	৩২৮
১৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ			...	৩৩০
১৬।	বিবিধ সংবাদ			...	৩৩৪

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে ভাল হয়। **বার্ষিক মূল্য** (ডাক মাশুল সহ) **টাকা ৫·৫০ ও ষাণ্মাসিক টাকা ৩৲**। প্রতি সংখ্যা ·৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের পর সংবাদ দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন**। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। 'উদ্বোধনে'র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক**।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

দিব্য বাণী

চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।

প্রবর্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ॥ —বিষ্ণুপুরাণ ৩।২।৪৪

চারিটি যুগের অন্তে সদাই বেদ-বিপ্লব আসে

(লোপ পেতে বসে ধর্মাচরণ, যথাযথ বেদ-জ্ঞান)—

সপ্তর্ষিরা নামিয়া তখন এই ধরণীর বুকে

করেন আবার সনাতন সেই বেদের প্রবর্তন।

নরঋষির অবতরণ*

স্বামী সারদানন্দ

ঐ স্তিমিতচিৎসিন্ধু ভেদি উঠিছে কি জ্যোতি ঘন।

মায়া- খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন॥

কোটী সূর্য গলাইয়া ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন॥

দেখ উজ্জ্বল বালক বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে,

প্রেমঘন বাহুপাশে কাহারে (নরেশে) করে ধারণ॥

বলে, চাহ বীর আঁখি মেলি, রাখ ধ্যান চল চলি,

ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন॥

সুধীর ধীর পরশে, যোগী চাহে সহরষে,

কণ্টকিত তনু মন, নীরবে ভাসে নয়ন॥

তারা জ্বলি ছায়াপথে পশে ধরা আচম্বিতে,

পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ॥

---

*'স্বামী বিবেকানন্দ'-শীর্ষক গান—উদ্বোধন, সপ্তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩১১

পরলোকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

গভীর দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী গত ১১ই জানুআরি রাত্রি ১-৩২ মিনিটের সময় (তাসখণ্ড সময়) আকস্মিকভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহার মাত্র সাত মিনিট পূর্বে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

আয়ুব খাঁর সহিত আলোচনা করিয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের পথসন্ধানে তিনি কোসিগিনের আমন্ত্রণে রাশিয়ার তাসখণ্ডে গিয়াছিলেন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার কয়েকঘণ্টা পরেই তাঁহার দেহাবসান হয়। ১১ তারিখ বেলা ২॥টার সময় তাঁহার দেহ তাসখণ্ড হইতে দিল্লীতে লইয়া আসা হয়। শেষকৃত্য আরম্ভ হয় পরদিন বেলা ১২-৩২ মিনিটে।

বিশুদ্ধ ভারতীয় ছাঁচে গঠিত জীবন, ভারতের কল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শাস্ত্রীজী তাঁহার বজ্রের চেয়েও কঠোর অথচ কুসুমের চেয়েও কোমল বিমল চরিত্রের জন্য, তাঁহার সরল ব্যবহারের জন্য ভারতবাসী সকলেরই অন্তরে অকপট শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

অতি অল্প সময়, মাত্র উনিশ মাস তিনি প্রধানমন্ত্রীরূপে জাতির কর্ণধার ছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে দেশের ভিতর ও বাহির হইতে বহু বিপর্যয়ের ঝড় প্রবলবেগে উঠিয়া আভ্যন্তরীণ একবদ্ধতাকে ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার দৃঢ়প্রত্যয়-বিশিষ্ট নিপুণ ধীরস্থির পরিচালনায় সেই সব সঙ্কট-মুহূর্তে জাতি সুসংহত হইয়াছে, দেশ বিপন্মুক্ত হইয়াছে, আবার শান্তির পথের সন্ধানও পাইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর চলার পথনির্ধারণে যে দ্বিধার ভাব শান্তিকামী ভারতে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছিল, শাস্ত্রীজী সে দ্বিধা নিশ্চিহ্ন করিয়া নির্ভুল পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাই বিশ্বকল্যাণের পথ এবং জাতির মহত্বের নিদর্শন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সহিত আত্মরক্ষা বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শক্তিমান হওয়া এবং প্রয়োজন হইলে শক্তির প্রয়োগ করাও একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রীজী কার্যতঃ উভয়ভাবের সমন্বয় সাধন করিয়া জাতিকে অগ্রগমনের পথে নিঃসংশয় করিয়াছেন, জাতির ঈষদাচ্ছন্ন আত্মবিশ্বাসকে পূর্ণভাবে নিরাবরণ করিয়াছেন। আবার ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই—বিশ্বেরও—কল্যাণকামনায় আন্তরিকভাবে শান্তির পথ-সন্ধান-প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সংযম এবং ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। যে আদর্শ ধরিয়া ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি নূতন আদর্শের দিকে যান নাই, তাহারই পরিপূরণ করিয়াছেন। ভারতের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দুর্বলতা বলিয়া বহির্জগতে বিবেচিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তিনি সেই আশঙ্কাকে লুপ্ত করিয়া ভারতের এই আদর্শকেই শক্তিদৃপ্ত দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন, ইহাকে অধিকতর মহিমোজ্জ্বলই করিয়াছেন।

* * *

বারাণসী জেলার মোগলসরাই-এ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর লালবাহাদুর শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সারদাপ্রসাদ শিক্ষকতা করিতেন। দেড় বৎসর বয়সে লালবাহাদুর

পিতৃহীন হন। মাতামহের তত্ত্বাবধানে বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মহাত্মাজীর আবেদনে সাড়া দিয়া তিনি ১৭ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। মুক্তিলাভের পর কাশী বিদ্যাপীঠে আবার তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এখান হইতে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করিবার পর এলাহাবাদে আসেন; এখানেই তাঁহার দেশ-সেবা পুনরায় সুরু হয় এবং একটানা চলিতে থাকে।

এলাহাবাদ পৌরসংসদের সদস্যরূপে, এলাহাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিরূপে এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে তিনি দীর্ঘকাল দেশ-সেবায় ব্রতী ছিলেন। পরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আইনসভায় যুক্তপ্রদেশ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দেও তিনি পুনরায় এই পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হইয়াছে। সর্বমোট নয় বৎসর তিনি কারাবাস করিয়াছেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি নূতন সংসদের রাজ্যসভায় সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্র ও পরিবহনমন্ত্রীও হন এই বৎসর। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে হন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় রেল ও পরিবহন মন্ত্রী হইয়া ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী হন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে। কামরাজ-পরিকল্পনায় সংগঠনের জন্য ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে দপ্তরহীন মন্ত্রীরূপে আবার তাঁহাকে আনা হয়। জওহরলালজীর মৃত্যুর পর এই বৎসরই জুন মাসে তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত হন।

প্রধান মন্ত্রী হইবার পরই তাঁহাকে বহুবিধ আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের সহিত সামরিক সংঘর্ষ সুরু হয়। কচ্ছের ব্যাপার পুরাপুরি মিটিতে না মিটিতেই কাশ্মীর লইয়া আগুন জলিয়া ওঠে। ধীর স্থির অথচ দৃঢ় হইয়া যেভাবে তিনি এই সমস্যার মধ্য দিয়া ভারতকে গৌরবের পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং পরে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধনের সূচনা করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসের পাতায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

*   *   *

শাস্ত্রীজী নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সর্বাবস্থায় অবিচল নিষ্ঠা দেখাইয়া এদিকে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। বিদেশের সংস্কৃতি, বিদেশের আচরণ, বিদেশের মতামতের প্রতি মোহ ভারতের নিজস্বতায় ও ভারতের কল্যাণে নিবদ্ধ তাঁহার একাগ্র দৃষ্টিকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে নাই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল—"তাঁর বাণী এক অর্থে সর্বব্যাপক। সেই কম্বু-কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানেই সারা দেশ জেগে উঠেছিল।·· আমার আজও মনে আছে, ছাত্র জীবনে তাঁর বাণী ও রচনা আমার অন্তরে কি গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর বাণী আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমি চাই, দেশের প্রত্যেক যুবক-যুবতী স্বামীজীর বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করুক।"[১] তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

---

১ "স্বামীজীর জীবনদর্শন" (শাস্ত্রীজী কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধের অনুবাদ)—উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৭১

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' ৬৮তম বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের সহৃদয় সহযোগিতা ইহার অগ্রগমন অব্যাহত রাখিযাছে, 'উদ্বোধনে'র সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের সকলেরই শুভেচ্ছা আমাদের চিরকাম্য।

অতীতের স্মৃতিগুলির মধ্যে যেগুলি ভবিষ্য জীবনের পক্ষেও শুভকর, সেগুলিকে মনে সজাগ রাখিতে হয় চেষ্টা করিয়া। নতুবা, 'অভ্যাসের-সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণ সঙ্কোচে ঔদাস্যের ধূলা ওড়ে··মন জড়তায় ঠেকে'—গতানুগতিকতায় সেই মহত্তর চেতনাগুলি ক্রমশঃ মনের গভীরে তলাইয়া যায়।

বিগত বৎসর, বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও, একটি অতি কল্যাণকর জিনিস আমাদের দিয়াছে—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতবাসী-রূপে সকলকে লইয়া একটি শুভ চেতনায়, আত্মবিশ্বাসে, আত্মমর্যাদায় এবং জাতির কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগে প্রেরণা। শ্রীভগবানের কৃপায় এই কল্যাণকর ভাবগুলিকে আমরা যেন জাতীয় জীবনে সদাজাগ্রত রাখিবার মত ব্যবস্থা করিতে পারি।

আমাদের প্রয়োজন

অতীত ইতিহাসের ঘটনা-বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের উপর কিছুটা আলোক বিকিরণ করে। অনেকের অন্তরালোক আবার স্পষ্ট করিয়া তোলে ভবিষ্যৎকে; পরবর্তীকালে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী-গুলির বাস্তবরূপায়ণতাই ইহার অভ্রান্ততার নিদর্শক।

৬৭ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ('উদ্বোধনের' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা') আমাদের বর্তমান প্রয়োজন সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কিছুটা আমরা আয়ত্ত করিলেও এখনো অনেক বাকী--"যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা, চাই সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিযা অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

কিন্তু ইহার একটি বিপজ্জনক দিকও আছে —"যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্য-তরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়, ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়, ভয় হয়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই।"

ভারতের বর্তমান জাগরণের কালটুকুর সীমায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এই বিপদের আভাস ইতিপূর্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাশ্চাত্যভাবানুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের অনেকেই 'ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা' হইয়া যাইতেছে, অত্যধিক ভোগ-লিপ্সা তাহাদের ন্যায়অন্যায়-বোধকে এবং স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার মোহ মনুষ্যত্বকেই বিলুপ্ত করিতেছে, অনেকেরই জীবনকে 'ইতোনষ্ট-

স্বতোভ্রষ্টঃ' করিয়া আপাতমধুরতার অন্তে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ও অশান্তির সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে।

ইহারই প্রতিকারকল্পে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বামীজী আমাদের ঘরের রত্নরাজিকে—প্রাচীন ভারতের অমূল্য ভাব ও চিন্তাগুলিকে, বহু শতাব্দীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত জীবনাদর্শকে সর্বদা চোখের সামনে রাখিয়া অপরের ভাবগুলির দিকে তাকাইতে বলিয়াছেন। ভারতের উচ্চভাবগুলি চরমসত্যের মহিমাস্নাত, কোন যুগের কোন ভাবের, কোন যুক্তি-বিচারের সম্মুখীন হইতে সেগুলির ভয় নাই। জাতির কূপমণ্ডূকতারূপ অচলায়তনের দু-একটি কক্ষের বাতায়ন কোন কোন মনীষী দ্বারা স্বামীজীর পূর্বেই উন্মুক্ত হইয়াছিল সত্য কিন্তু অগণিত কক্ষসমন্বিত এই সুবিশাল অট্টালিকার সব বাতায়ন, সব দ্বার পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়াছেন স্বামীজীই, এবং উন্মুক্তই রাখিতে বলিয়াছেন (অবশ্য তাহার পূর্বে আমাদের ঘরে যে নিজস্ব ভাবগুলি রহিয়াছে সেগুলিকে তিনি দেশবাসীর চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন)—"যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা দেখিতে ও জানিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক পাশ্চাত্য কিরণ।"

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ক্রমবর্ধমান হইয়া আজিও "কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধু-হৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া নবরঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।…বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব—রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে।"

কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের 'ঘরের সম্পত্তি' 'আসাধারণের' সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার কোন ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই, নমনীয়চিত্ত বালক-বালিকাগণ প্রথম হইতেই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে বিদেশাগত সর্ববিধ ভাবধারার সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ পাইতেছে, কিন্তু ঘরের রত্নরাজি প্রায় কিছুই তাহারা দেখিতে পাইতেছে না। বালকগণকে, যুবকগণকে দেশপ্রেমিক করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগী করিতে হইবে, উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে দূরে রাখিতে হইবে, জাতির অতীত জীবনের গৌরব স্মরন করাইয়া তাহাদিগকে জাতির প্রতি সশ্রদ্ধ করিতে হইবে, ইহা দেশের বহু মনীষী আজ উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার জন্য কার্যকরী পন্থাবিষ্কার করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু যাহা দ্বারা ইহা সহজে ঘটানো সম্ভব, তাহার দিকে এখনো কাহারো পূর্ণ দৃষ্টি পড়িতেছে না। যে দৃষ্টিশক্তি অমৃত ও গরলের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে পারে, যাহা প্রলোভনের অপরূপ আবরণটি সরাইয়া 'অগ্রেহ-মৃতোপমম্, পরিণামে বিষমিব' জীবনাদর্শের আত্মঘাতী স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে পারে, তাহা সহজেই লাভ করানো যায় আমাদের উচ্চচিন্তা-গুলি সর্বসাধারণের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলে।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইহা সহজে করা যায়; অবিলম্বে ইহা করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই প্রতিটি ধাপের উপযোগী বা উপযোগী করা অন্ততঃ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও বেদান্ত অবশ্যপাঠ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতির ও ধর্মের উচ্চভাব-গুলিও থাকিবে। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এগুলির যথার্থ মর্ম সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের

চিন্তাধারারও সর্বত্র বিস্তার। বিদেশী সাহিত্যের পরিচয় আমরা অনেকেই রাখি, রাখিতে পারিলে গর্ব অনুভব করি; কিন্তু আমাদের রামায়ণ-মহাভারত গীতা বেদান্ত-উপনিষদে কি আছে, উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তাহার সঠিক সংবাদ হয়ত সকলে রাখি না, মানবজাতির আধুনিক সমস্যাগুলির উপর স্বামী বিবেকানন্দ কি আলোকসম্পাত করিয়াছেন, তাহাও হয়ত জানি না। আমাদের ঘরেই কত উচ্চ, কত ব্যাপক, কত গভীর চিন্তারাজি আছে, পাশ্চাত্যের চিন্তাগুলির দিকে তাকাইবার সময় সেগুলিও দেখা প্রয়োজন। গল্পের মাধ্যমে, ঐতিহাসিক উচ্চ জীবনের মাধ্যমে—পুরাণের মাধ্যমে—এই চিন্তাগুলিকে সর্বজনবোধ্য করা হইয়াছিল বলিয়াই বিপরীত চিন্তার সহিত পরিচয় সত্ত্বেও ভারতের উচ্চজীবনাদর্শ বিলুপ্ত হয় নাই। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপলব্ধ বা অধিগম্য অতি উচ্চ চিন্তাগুলিকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত না করিলে যে সমাজ বা সভ্যতা দীর্ঘজীবী হয় না, উন্নতির পথে তাহার অগ্রগমন রুদ্ধ হয়, তাহা আমাদের প্রাচীনকালের সভ্যতার নিয়ামকগণ জানিতেন। মহাভারতে তাই স্পষ্ট নির্দেশ আছে, 'বেদকে ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বর্ধিত করিবে (গল্পাদির মাধ্যমে সহজবোধ্য করিবে); নতুবা অল্পবুদ্ধি লোক উহাকে প্রহার করিবে (বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা ও ত্যাগ করিবে)।' প্রাণবন্ত ভারতে সর্ববিধ চিন্তার দ্বার অবারিত ছিল। কোন শক্তিশালী বা বিরোধী চিন্তার "চ্যালেঞ্জ"-এর সম্মুখীন হইতে সে ভয় পাইত না। আধুনিক যুগের জড়বাদভিত্তিক চিন্তার সমপর্যায়ের চার্বাকদর্শনের চিন্তার সহিতও জনগণ পরিচিত ছিল। উহাকে স্বীকার করা হইয়াছিল, বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছিল, এবং অন্যান্য বস্তুরাজির তুলনায় উহা মূল্যহীন বিবেচিত হইয়া অগ্রাহ্যও হইয়াছিল। চার্বাক দর্শন ভারতীয় জাতির চিরন্তন অবলম্বনভূমি হইতে তাহাকে সরাইতে চাহিয়াছিল, এক শ্রেণীর বর্তমান জড়বাদী জীবনদর্শন যাহা বলিতে চায়, সেই সব কথাই বলিয়াছিল: ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই ঋষিরা 'ধূর্ত, ভণ্ড, প্রতারক।' পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, মানুষের দেহাতীত কোন সত্তাই নাই—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" কাজেই এই জীবন যতদিন আছে, যৎটুকু পার, যে উপায়ে পার সুখ ভোগ করিয়া লও— —"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" বলা বাহুল্য এই ঋণ শোধ দিবার জন্য নৈতিক কোন দায়িত্বের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ নৈতিকজীবনের প্রতি আসক্তিও 'কুসংস্কার' মাত্র, 'সংস্কারমুক্ত' হইয়া সদসদ্ যে কোন উপায়েই হউক সুখলাভই হইল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—শাস্ত্রের কথা ও প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া "যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।" এককথায় একটি পশু বুদ্ধিমান হইলে যাহা করা সম্ভব, তাহা সবই কর। এই সব চিন্তাগুলি, যাহা মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া লইতে চায়, কোনদিনই এখানে সমগ্র জাতির জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবার মত শক্তিসঞ্চয় করিতে পারে নাই, কোনদিন পারিবেও না। জীবনের হাটে ইহার বিনিময়ে শান্তি এবং আনন্দ পাওয়া কখন সম্ভব নয়। যদি হইত, তাহা হইলে ভোগ্যবস্তুর অনায়াসলভ্যতা বা প্রাচুর্য যেখানে, সেই পাশ্চাত্যে অসংখ্য নরনারীর অন্তর অশান্তিতে পুড়িয়া ছারখার হইত না, স্বামীজীর ভাষায়: মুখে তার অট্টহাসি, কিন্তু অন্তর তার কান্নায় ভরা। খাওয়া-পরা প্রভৃতি প্রয়োজনগুলি মানুষের পক্ষে অবশ্যস্বীকার্য সন্দেহ

নাই, বাহুল্যেরও স্থান আছে, কিন্তু কেবল ঐগুলির প্রাচুর্যই সভ্য, সংস্কৃতিবান মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে উচ্চতর আনন্দ চায়।

বর্তমান সময়ে আমাদের বাধামুক্ত অঙ্গনে বহির্দেশ হইতে যে সব ভাবরাশি আসিতেছে, তন্মধ্যে জীবনপ্রদ ভাবগুলির সঙ্গে, অতি অল্পসংখ্যক হইলেও, অনেকেই যে এই গরলও পান করিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের নিজস্ব ভাবগুলিকে তাঁহাদের চোখের সামনে ধরা হয় নাই, সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার সুযোগ তাঁহারা পান নাই। তাহারই ফলে জীবননিয়ন্ত্রণের উপরও তাহার প্রভাব পড়িয়াছে, প্রায় সর্বস্তরে প্রবলবেগে দুর্নীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। সব চেয়ে আশঙ্কার কথা, লজ্জার কথা, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে এই গরল আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে অসঙ্কোচে বিতরিত হইতে সুরু করিয়াছে।

বহু জাতির জীবনস্পর্শী অতীতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া মনীষীরা মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন। সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতার অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলির উন্নতি-অবনতির ক্ষণ ও কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন টয়েন্‌বী, সোরোকিন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বহু মনীষী; অতীতের গমন পথ দেখিয়া উহাদের পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইতেছে। এভাবে একটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতাই জগতে টিকিয়া থাকিবে, বাকী সবগুলিই—ভারতীয় সভ্যতাও—হয় বিনষ্ট হইবে, না হয় পাশ্চাত্যেরই অনুরূপ হইয়া যাইবে।

অতীতের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া যাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাঁহারা ছাড়া আরো এক ধরনের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আছেন। তাঁহাদের যুক্তি-অনুমানের সহায়তায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় না; তাঁহারা ভবিষ্যৎ দেখিতে পান।

স্বামীজী স্বয়ং এই স্তরের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। মানবজাতির ইতিহাসও তিনি বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এই উভয়বিধ দৃষ্টিসঞ্জাত, সেই দৃষ্টিতে দেখিয়াই তিনি ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহার উন্নতির জন্য নির্ভুল পথের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

তিনি স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, ভারতীয় সভ্যতার বিনাশ তো নাই-ই—অদূর ভবিষ্যতে উহা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভাস্বর হইয়া উঠিবে। এই ভাস্বরতা আসিবে আমাদের ঘরের মণিরত্নগুলি বাহির করিয়া সেগুলিকে পাশ্চাত্যের শিল্প-বিজ্ঞানাদির ও অন্যান্য শুভকর ভাবরাজির উপর খচিত করিয়া; রত্নগুলির কথা ভুলিয়া গিয়া বা সেগুলিকে নিভৃত কক্ষে বদ্ধ রাখিয়া নহে—উহা বিনাশের পথ। কিন্তু তাহা আর হইবার নহে—ভারতীয় সভ্যতার সুমহান প্রকাশ ঘটিবেই।

আমরা ইচ্ছা করিলেও ইহার অন্যথা করিতে পারিব না, জগতের কোন শক্তি, কোন চিন্তাই তাহা পারিবে না। পারিবে না সত্য, কিন্তু সোজা পথে না চলিলে বহু দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। বাঁকাপথে বহু ঘুরিয়া অনেক সহিয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া, শেষে আমাদের ডঙ্কামারা রাজপথে উঠিতেই হইবে।

প্রাচীন ভারতের মৃত্যুঞ্জয় ভাবগুলি যত শীঘ্র সর্বধারণের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিব, দুর্নীতি, দুর্বলতা প্রভৃতি সঞ্জাত দুর্ভোগের অবসান তত নিকটবর্তী হইবে, সর্বাধিক কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে তত বেশী।

সৃষ্টিতত্ত্ব*

স্বামী সারদানন্দ

প্রাণ ও আকাশ ঃ মহাভারতাদিতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করিয়া সাধারণতঃ আমরা অনেক ভুল বুঝিয়া থাকি। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হইল; এখন প্রাণ মানে আমরা নানারূপ বুঝিয়া থাকি। কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝিয়া লন, কেহ জীবাত্মা বুঝেন, ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। সেইরূপ আকাশ অর্থে আমরা অবকাশ বুঝি; এই আকাশের তিন রূপ অর্থ আছে। ১ম মহাকাশ—বাহ্য জগতের সকল বস্তু এই মহাকাশে বর্তমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বৃক্ষাদি সমস্তই এই অবকাশে রহিয়াছে। ২য়— চিত্তাকাশ, আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্য মনকে আকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩য়— চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ, আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সামান্য জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ। আমাদের জ্ঞানে অজ্ঞান জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নাই—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, এই আকাশে বাহ্যিক মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্তাকাশ উভয়ই রহিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় আকাশ আর এক অর্থে প্রযোগ করা হইয়াছে। ইহা পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরাজীতে যাহাকে matter বলে, ইহা জড়ের সূক্ষ্ম অংশ, এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, যেমন গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্নপরিপাক-শক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি—সমস্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার, সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসশক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং নিঃশ্বাসশক্তি বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলিয়া ইহাকে প্রাণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণ বলিতে এক মূল শক্তিকে বুঝিতে হইবে, আর সকল শক্তিই ইহার বিকার। সেইরূপ আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, মূল জড় বস্তু—আর সমস্ত জড় বস্তুই যাহার বিকারমাত্র।

শাস্ত্র ও বিজ্ঞান ঃ আমরা শাস্ত্রের এই মত না বুঝিয়াই ইহা ভ্রান্ত মত বলিয়া অগ্রাহ্য করি, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান এই সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য হইতে আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন। আকাশের পরমাণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বায়ু—বা ধাতু—কম্পন অর্থ। আকাশ হইতে এই বায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হইতে তেজঃ জন্মায়, বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করিতেছে। কোন বস্তুর গতিরোধ করিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বহিলে উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া বাসোপযোগী হইয়াছে। এখনো সূর্যলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাষ্পরূপে বর্তমান রহিয়াছে। এই তেজঃ শীতল হইয়া অপ্ বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হইয়া পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদিরূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চ-মহাভূত প্রথমে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থূল জগৎ নির্মিত হয়।

---

* 'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় 'সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতা' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

কলিতজয়বিবেকানন্দস্তোত্রম্

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী*

বিগলিতশতসূর্যজ্যোতিষা লিপ্তকান্তিং
স্ফুরদগণিতবিদ্যুদ্দীপ্তবিস্ফারনেত্রং
শিশুশশধরভালং ভৈরবং ভস্মগাত্রং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ১

অরুণকিরণজালোস্তিন্নপাদারবিন্দং
নখরতরলজ্যোৎস্নাধিকৃকৃতেন্দুপ্রকাশং
স্তিমিতমদনগর্বং শর্বমানন্দরূপং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ২

নয়নকমলবাসং লোললাস্যং রমায়া-
গুর্ণবিভজিতবাণী কণ্ঠে যস্যাতিলগ্না।
নিখিলবিভবসিদ্ধির্যস্য সেবানুরক্তা
তমহমজবিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৩

প্রহবণধৃতবেদং জ্ঞানবিজ্ঞাননেত্রং
মৃগপতিবলদৃপ্তং মূর্তবেদান্তসূর্যং
অভীবভীবিতি ঘোষৈর্নাদিতক্ষৌণীপৃষ্ঠং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৪

কলিমলমপনেতুং স্বাগতং হ্যক্ষচক্রাৎ
জডমতিজনসঙ্ঘান্ দীপয়ন্তং রজোভিঃ
জনহিত-মতি-কেন্দ্রস্থাপকং দিগ্‌দেশান্তং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৫

কলিযুগমলহাবী শোভনঃ জ্ঞপ্তিখড়্গৈঃ
সকলতমমপাস্য শ্রৌতধর্মং রটন্তং
নিহিতনিখিলকামং মাত্রকৌপীনবিত্তং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৬

জননমরণমুগ্ধধ্বান্তবিধ্বংসকার্যং
অমিতবলবিলাসং ব্যোমকেশং বিশালং
ভজনবসসমুদ্রং ভাববাত্যাতিলোলং
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৭

চরণকমলগন্ধভ্রামিতং ভৃঙ্গমিন্দুং
গময়তু গুরুদৃষ্টিস্তূর্ণমীশানলোকং
শময়তু বমণাচ্ছ্রদ্ধেয়াশেষদোষান্
জয়তু ভুবি বিবেকানন্দনামাতিধন্যম্ ॥ ৮

---

* স্বামীজীর শিষ্য

বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

পাশ্চাত্য দেশে এই জ্ঞানবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠার দিনে অনেক বিখ্যাত মনীষী নৈতিক এবং ধর্মগত অবনতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কর্মযোগী আলবার্ট স্থইজারের Decay and the Restoration of Civilisation বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে জ্ঞানের উচ্চতম গগনস্পর্শী পিরামিড, আর পাশেই অতলস্পর্শ গিরিগহ্বর স্বতই চিন্তাশীল সুধীজনের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য ও ভীতি উৎপাদন করে। যে কোন সময় একটা landslideএ পাহাড় ধ্বসিয়া পরা অসম্ভব নহে। এই যদি নৈসর্গিক জ্ঞানালোকে ভাস্বর পাশ্চাত্যের অবস্থা হয় তবে আমাদের স্বাধীন ভারতের অবস্থা কি অন্য রূপ? এই প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। আদিমকালে, এমন কি নিকট অতীতেও ইংরেজের প্রভাব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ হিমালয়- ও সমুদ্র-বেষ্টিত হইয়া নিজের বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কার লইয়া পরিখাবেষ্টিত দুর্গের ন্যায় আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু আজ যে সব দ্বার খুলিয়া গিয়া ঘর বাহিরের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। আজও কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? যত কিছু ভাববন্যা আজ ইউরোপ-আমেরিকাকে প্লাবিত করিতেছে তাহার ঢেউ এ মহাভারতের তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে শুধু সহরাভিমুখে নয়, গ্রামাঞ্চলেও। যে কোন রন্ধ্র দিয়া তাহা প্রবলবেগে প্রবেশ করিতেছে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে। এক শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ভবিষ্যদ্দর্শী লোক 'ত্রাহি মধুসূদন' রব তুলিয়াছেন ইতিমধ্যেই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মধুসূদন কাহাকেও হাতে ধরিয়া ত্রাণ করেন না। করিলে পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণীর কোনই প্রয়োজন হইত না, সপ্ত-ঋষির একজনকে নামিয়া আসিতে হইত না এই ধরাধামে। 'যমেবৈষ বৃণুতে' ঠিক, কিন্তু চুম্বকের ন্যায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে হয় শ্রদ্ধাভক্তি এবং কর্মের দ্বারা।

বর্তমান যুগের মানবজাতির প্রয়োজন মহামানবের। মহামানব ভারতের মাপকাঠিতে কি? এ মাপকাঠি কি নূতন করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে? নিশ্চয়ই নয়। আমরা অসভ্য বর্বর জাতি নহি। দশহাজার কি অন্ততঃ ৫।৬ হাজার বছর পূর্বে এই মাপকাঠি এ দেশেই তৈয়ার হইয়াছিল আমাদের রমণীয় তপোবনে, যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ঋগ্বেদ হইতে সুরু করিয়া উপনিষদের প্রতি চিন্তা প্রতি কল্পনা পর্যন্ত অনুরঞ্জিত, তাহা হইল— মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কি? প্রেয় না শ্রেয়? প্রেয় ইহলোক-সীমিত, আর শ্রেয় ইহলোক পরলোক উভয় লোক ব্যাপী। ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ। আমাদের ষড়্দর্শন তো ইহা লইয়াই। হাজার হাজার বছর পূর্বেই আমরা জীবনের লক্ষ্য নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করিয়াছি। তবে আর নূতন করিয়া লক্ষ্য আবিষ্কার করিব কি? মাপকাঠি তৈয়ার করিব কি? পাশ্চাত্য এখনো খুঁজিতেছে; সেখানে যত যত ism নামে মানুষের সুখসাধনের মাপকাঠি তৈয়ার হইতেছে, সব চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলায় আসন গ্রহণ

করিতেছে ক্রমে ক্রমে। এ ভয়ঙ্কর যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি নৈতিক ও উচ্চতম ধর্মমূলক উন্নতি সমান্তরাল রেখায় প্রসারিত না হয় তবে মানবজাতির ৫০ লক্ষ বৎসরের ইতিহাসের এই শেষ পৃষ্ঠা খোলা হইয়াছে বলা যায়। স্বামীজীর আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ কেন? তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে এই আত্মঘাতী প্রবল উদ্যম কেন? ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যশোলিপ্সা তাঁহার ছিল না। সমাধিস্থ হইয়া তিনি হিমাচল বা ভারতের যে কোন নির্জন স্থানে শুকদেবের মত আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন। গুরুবলও তো তাঁহার ছিল অসীম। আমেরিকা কেন? আমি নিজে কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ-শিলা সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া নিজকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। উত্তর পাইলাম, মনশ্চক্ষে দেখিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ শিলাটির উপর বসিয়া আছেন ভারতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, ভারতের তৎকালীন তমসার আবরণ উন্মোচনের জন্য "অপাবৃণু" মন্ত্রের ধ্যানে যেন মগ্ন তিনি। শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, চিন্তামাত্রেই কি একটা অনুপ্রেরণা লাভ করিলাম—স্বামীজীর সেই মূর্তিটি হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিল, যেমন দেখিয়াছিলাম ঢাকায় তাঁহার অভ্যর্থনা-সভায় ও লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রস্নানের জন্য সমবেত অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে। লক্ষ স্নানার্থী লোকের সমাবেশ মধ্যে মনে হইয়াছিল মধ্যাহ্ন-সূর্য যেন মূর্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন তীর্থের মহিমা বাড়াইবার জন্য। সেদিনের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতাই আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনে নিযুক্ত করিয়াছে। স্বামীজী তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে আদানপ্রদান ভিন্ন বর্তমান ভারতের কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' ইহা সুপরিস্ফুট। আজ প্রায় ৭০ বৎসর পরেও আমরা কয়জন সেকথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি? যাহা সত্য তাহা কখনও লোপ পায় না, সাময়িকভাবে ঢাকা থাকিতে পারে। এত বড় ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা এ ভারতেও পূর্বে কয়জন জন্মিয়াছিলেন জানি না। স্বামীজী বলিয়াছেন, India was great in the past, India will be greater in the future ভারত অতীতে মহান ছিল, ভবিষ্যতে মহত্তর হইবে। আরও মহৎ বৃহৎ হইবে কাহাকে অবলম্বন করিয়া?—শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া, যিনি একাধারে 'রাম' এবং 'কৃষ্ণ', আর বিবেকানন্দকে অবলম্বন করিয়া—যাঁহার ত্যাগের মহিমা অভ্রংলিহ। একজন বড় পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখিতেছেন, what is true is valid whether I as an individual know it or not, even beauty is blessed in itself whether I notice it or not.

সর্বজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে স্বামীজীকে বোঝা এক কথা, আর স্বামীজীকে তাঁহার স্বমহিমায় বোঝা আর এক কথা। পাশ্চাত্য মনীষী রোমা রোঁলা উভয় ভাবেই স্বামীজীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

একটা কথা আমাদের স্মরণ করিতে বাধা নাই যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জন্ম পরিগ্রহের পশ্চাতে রহিয়াছে ভারতের একটা প্রকাণ্ড ঐতিহ্য। এখানে ঐতিহ্য অর্থে আমি একটা পটভূমিকা বুঝি। স্বামী গম্ভীরানন্দ ১৩৭১ সালের চৈত্র সংখ্যা উদ্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামীজীর আবির্ভাবের সুন্দর একটি পটভূমিকা লিখিয়াছেন। আমি একজন ইতিহাসের

ছাত্র হিসাবে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। আর একটি কথা শুধু বলিতে চাই। একবার একটা আবহাওয়া কোন স্থানে স্বষ্ট হইয়া গেলে যে অনুকূল অবস্থাব স্বষ্টি হয়, তাহার ফলেই আরও স্বষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে যদি না আবার মানসিক ও শারীরিক প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হয়। ভারতেও মাঝে মাঝে এই প্রতিকূল অবস্থার স্বষ্টি হইযাছে ও তাহাতে সাময়িক প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে সত্য কিন্তু অধ্যাত্ম-চিন্তার ও জ্ঞানগঙ্গার মূল ধারা এই আর্যভূমিতে বহিয়াই চলিয়াছে। তাই যুগে যুগে এদেশে ভগবানের অবতরণ সম্ভব হইয়াছে।

অতীতে ধ্যানমগ্ন ভারতের ধ্যান ভঙ্গ করিল কে? ইতিহাস বলিবে গ্রীক জাতিরা আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বেই ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহার ফলে কি জ্যোতিষে কি গণিতে ও অন্যান্য শাস্ত্রে ভারতের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইউরোপকেও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিল। ইহাই বর্তমান গবেষকগণের মত। (Vide Basham — The Wonder that was India)

অষ্টাদশ শতক জার্মান দেশের এক অতি উজ্জ্বল দার্শনিক যুগ। Hegel, Herder, Voltaire প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকগণ বলেন, India is the craddle of human kind. ভারতই মানবজাতির শিশুদোলা। আরও বলেন মানবীয় কৃষ্টির সূত্রপাত ঐ গঙ্গাব ধারে: Inception of human culture near The Ganges where the first flicker of human wisdom was nourished অর্থাৎ সংক্ষেপে গঙ্গাতীরেই মানবের প্রথম জ্ঞানের বিকাশ। ভারতেব এই প্রতিমূর্তি লইয়া জার্মানি ও ফ্রান্সে বহু বিখ্যাত উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে। গ্রীসের mythology বা পুরাণতত্ত্ব হইতে ভারতীয় mythology বা পুরাণতত্ত্ব মর্যাদা পাইয়াছে সেখানে বেশী। তারপর যখন আধুনিক যুগে ম্যাক্সমূলার, ডুযেশন প্রভৃতি দার্শনিকের মত আলোচনা করি তখন আরও বিস্মিত হইয়া পড়ি। ম্যাক্সমূলার তাঁহার মূল্যবান জীবনের ৪০ বৎসর মগ্ন ছিলেন আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রসমুদ্রে, যাহার ফলে ঋগ্বেদাদি ভারতীয় অমূল্য গ্রন্থরাজি নবোদিত সূর্যের ন্যায় পৃথিবী আলোকিত করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন আমাদের বেদান্ত-বিজ্ঞানকে আধুনিক মনের বোধগম্য ব্যাখ্যায় জগৎময় ছড়াইয়া দিতে।

ম্যাক্সমূলার সংখ্যবেদান্ত ইত্যাদি দর্শন আলোচনান্তে একটা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "I admit, as a popular philosophy the Vedanta would have its dangers, that it would fail to call out and strengthen the manly qualities required for the practical side of life and that it might raise the human mind to a height from which the *most* essential virtues of social and political life might dwindle away into mere phantoms."

এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কিন্তু তাহা হইলে যে স্বামীজীর ভারতভূমে আবির্ভাব ব্যর্থ হইয়া যায়। স্বামীজী ভারতে বস্তুবাদ (Materialism) এবং অধ্যাত্মবাদ উভয়ের সমন্বযে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছেন ভারতের আদর্শকে। কোনও মানুষ বা জাতির জীবনে ইহা হইতে উচ্চতর আদর্শ থাকিতে পারে কি? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, স্বর্গকে নিজ স্বার্থকতার জন্যই ধরাতে নামিয়া আসিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতেও সেই কথা। তাই স্বামীজী কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর

পাতন। বেদান্তের ভূমি ভারতবর্ষকে কর্মের তূর্যনিনাদে পূর্ণ করিয়া, প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। সে কি নির্ঘোষ! সে পাঞ্চজন্য-রবে সমস্ত ভারতভূমিতে যেন কুরুক্ষেত্রের পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল। সে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্র কাহার না প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল সেকালে! তাহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হউক যুগে যুগে ভারতের প্রতি গুহাগহ্বরে, প্রতি কক্ষে, প্রতি প্রাসাদে। জাগ্রত রাখুক ভারতকে, জাগাইয়া তুলুক সমগ্র বিশ্বকে। সে বাণী ধ্বনিত হইয়াই চলিতেছে—আমরা কর্ণকুহর আবৃত করিয়া রাখিয়াছি তাই শুনিতেছি না। এই আবরণ-টুকু যদি সরাইতে না পারি, তবে নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিব কোন মুখে? স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের বহু দিক আছে। সে চরিত্রের এক একটি দিক লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। মানুষের উন্নতির যেমন কোন সীমারেখা টানা যায় না, তেমনি সে দেবমানব-চরিত্র আলোচনারও কোন শেষ থাকিতে পারে না। কারণ আমাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত কত নূতন নূতন জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে যাহার সুষ্ঠু সমাধান জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু কে তাহা করিবে? যাঁহারা আত্মাভিমানে মগ্ন হইয়া স্বার্থসাধনে, নিজ যশোগানে তন্ময়, তাঁহারা? সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী, যাঁহার চিত্ত পূর্ণ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, সেই বুদ্ধপ্রতিম লোক ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা আর সমগ্র ভাবে দেখার মধ্যে তফাৎ অনেক। সকলেই বিবেকানন্দকে সমগ্রভাবে দেখুক। তিনি কোথাও আত্মগোপন করিয়া নাই, সমগ্র রচনাবলী, সমগ্র পত্রাবলীর মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কোথাও দীনতা নাই, কোথাও সসঙ্কোচ বা সভয় ভাব বা যশের লিপ্সা অণুমাত্র নাই। আছে প্রেম, আর নিঃসংশয়, বলিষ্ঠ, অভ্রান্ত পথনির্দেশ; আছে প্রাণবন্ত প্রেরণা। একদিকে বর্তমান যুগের "স্বদেশমন্ত্র"—দরিদ্র, অজ্ঞ, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতিকে প্লাবিত করিয়া প্রেমের প্লাবন, অপর দিকে মৃত্যুরূপা প্রলয়রূপিণী কালীর আহ্বানে অভয়মন্ত্রের প্রচার—আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন সাহিত্যে কেহ দেখিয়াছে কি? তৎকালের ভারত-মহাশ্মশানে এই মন্ত্রেরই প্রয়োজন ছিল না কি? স্বাধীনতা লাভ করিলেও আজও আমরা এই এটম-বোমার যুগে চারিদিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যুরূপা কালীকে ভুলিতে পারিতেছি কি? আমাদের যে আজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন প্রেমের দীক্ষার ও অভয় বাণী শ্রবণের।

আজ আমরা Socialistic pattern of Society স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি সত্য, কিন্তু দেশে নিরন্ন, ক্ষুধার্ত অভাবগ্রস্ত লোক এখনো সংখ্যাতীত। স্বার্থপরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাগতিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্রনারায়ণের একমাত্র ভরসা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও তাঁহার কর্মপ্রেরণা নয় কি? স্বামীজীর ইতিহাসজ্ঞান অতি আশ্চর্য। তিনি রোম গ্রীস হইতে সমস্ত মধ্যপ্রাচীর, সমগ্র জগতের ইতিহাসে সভ্যতার ভাঙন-গড়ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি অঞ্চলের ইতিহাস তাহার নখদর্পণে। সভ্যতার অগ্রগতির ধারা তাই তাঁহার লেখনীমুখে অপূর্ব ভাষায় প্রকাশিত। জাতির সংহতি-রক্ষায় এবং ভবিষ্যৎগঠনে তাই তাঁহার দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি। পরবর্তী কালে Toynbee প্রমুখ ঐতিহাসিক ঐ দৃষ্টিতেই ইতিহাস রচনা

করিতেছেন। স্বামীজী আমাদের অতীত ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি ও সাফল্য পর্যালোচনায় দক্ষহস্ত। কাজেই এদিক হইতেও তাঁহার ইঙ্গিত আমাদের শিরোধার্য হওয়া উচিত। আজ দেশে নেতার অভাব নাই। সকলেই নেতা। ফলে অভ্রান্ত, নির্দিষ্ট পথের অভাব। আমাদের কিছু সঞ্চয় চাই। দেশের জন্য, বাঁচিবার জন্য স্বামীজী অপরের দ্বারে কেবল হাত পাতিতে বলেন নাই, তাঁহার নীতি ছিল 'দিব আর নিব'। স্বামীজী কি জ্ঞানযোগী না কর্মযোগী? এ প্রশ্নের উত্তর, তিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে প্রেমের সূত্র ঢুকাইয়া হইয়াছেন বর্তমান যুগের মহাযোগী। বিবেকানন্দের সমস্ত প্রেরণার মূলে ছিল ধর্ম, যে ধর্ম আজ জগতের প্রায় সর্বত্র জীবন হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ ধর্ম শাশ্বত সনাতন ধর্ম—যাহা অর্থ কাম এবং মোক্ষের ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের এই ধর্মকে জীবন্ত করিয়া অপরকে দিতে হইবে। সেই প্রেমে অনুস্যূত বেদান্ত-ধর্মের প্রচার দ্বারা তিনি জগৎটাকে একবারে ওলট-পালট করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন যুগের বৌদ্ধসঙ্ঘ একদিন জাপান হইতে চীন, তাতার, সিংহল প্রভৃতি ছাইয়া 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল। স্বামীজী তাই উদার সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া গেলেন ভারতের ও জগতের জাগতিক, আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ মুক্তির জন্য—কোন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি না করিয়া। তিনি জগৎকে আর ভাগাভাগি করেন নাই, সারা বিশ্বের জন্যই কথা বলিয়াছেন। আজ এই সঙ্ঘের দেশবিদেশ-ব্যাপী কর্মশক্তি পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কোথা হইতে এই দূরদৃষ্টি আর কোথা হইতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের এই কর্মপ্রেরণা? জ্ঞানযোগী ম্যাক্সমূলার আজ বাঁচিয়া থাকিলে দেখিয়া আনন্দিত হইতেন যে, বেদান্ত শুধু নিষ্ক্রিয় নীরস জ্ঞানচর্চা নয়, যোগীর হাতে তাহা অগ্নিগর্ভ প্রেমসাধনা। "মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্", শঙ্কর বলিলেন, কিছু গ্রহণ না করিয়া, "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", ত্যাগীর জীবনযাপন কর। আমাদের এই যুগের শঙ্কর, একাধারে বুদ্ধ ও শঙ্কর স্বামীজী বলিলেন, ত্যাগী হইয়াও নিষ্কাম কর্ম কর, ধনীদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া দেশের দরিদ্রদের দাও, তাহাদের সর্ববিধ উন্নতি সাধন কর, তাহাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা কর। তিনি নিজে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে পরিবারের, সমাজের, দেশের সেবার জন্য ধন উপার্জন করা কর্তব্য—স্বামীজী বলিয়াছেন—অর্জন না করিলে ত্যাগ করিবে কি? স্বামীজী যেন যিশুর ভাষায় হিন্দু সমাজকে বলিলেন, I come not to destroy but to fulfil—আমি সমাজ ধ্বংসের জন্য নয়, গড়ার জন্য আসিয়াছি। আমরা স্বামীজীর পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, না পিছাইয়া পড়িতেছি—ভাবিবার বিষয়। হিন্দু বলিয়া সগর্বে দাঁড়াইতে আজও আমাদের সাহস নাই। বিশ্বপ্রেমিক হিন্দু, উদার নির্ভীক হিন্দু, কাহারো ভয়ে নিজস্বতাকে কিছুতেই ম্লান করিবে না—এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক হিন্দুকে গ্রহণ করিতে হইবে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধন করিতে হয়।

জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমগ্র জগতের এ যুগের পথপ্রদর্শক স্বামীজী বলিয়াছেন, হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান য়াহুদী সবই তাঁহার আপন জন। আর বলিয়াছেন: জীবনে মাত্র একটি জিনিস আছে, যাহা যে কোন মূল্য দিয়া লাভ করার যোগ্য। তাহার নাম প্রেম, ভালবাসা—

আকাশের মত যাহার বিস্তার, সমুদ্রের মত যাহার গভীরতা।" চরম বেদান্তজ্ঞানের সহিত এই মানবপ্রেম যুক্ত হইলে জগতের আর কিছু পাইবার বাকী থাকে কি? এ আদর্শ জগতে আর কেহ প্রচার ও স্থাপন করিয়াছেন কি আজ পর্যন্ত?

আজকাল একটা ধুয়া বা বুলি উঠিয়াছে—মানবতা। কিন্তু মানবতা বা human fellow-feeling তো কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছে না। দ্বন্দ্ব-কোলাহল বাড়িয়াই চলিয়াছে জগতে। কারণ এ মানবতা abstract একটা ভাব মাত্র—ইহা ভিত্তিহীন। সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপর মানবতাকে স্থাপিত না করিলে সব ব্যর্থ হইবে। তাই স্বামীজী বিশ্বগগনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের পতাকা উড্ডীন করিয়া কত বৈদেশিককে শিষ্য ও ভক্ত করিয়া গেলেন। আমাদের দাসত্বের যুগে ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারিত কি? এক ব্রহ্মের সন্তান যদি সবাই হয়, যদি মূলে থাকে নিঃস্বার্থতা, তবে মানবতাও আপনিই আসিবে। ছায়া তো কায়ারই অনুসরণ করে।

স্বামীজী অনেক ভাবিয়া গিয়াছেন আমাদের জন্য। আবার অনেক ভাববার কথা রাখিয়াও গিয়াছেন আমাদের জন্য। সেগুলির সমাধান আমাদিগকে করিতে হইবে তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণে। জাতীয় বা ব্যক্তিগত জীবনের এমন কোন বিভাগ নাই যাহার উপর তাঁহার দৃষ্টিপাত হয় নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ মন্তব্য কিছু নাই কিন্তু তিনি মূল ধরিয়া কথা বলিয়াছেন সর্ববিধ মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া।

বর্তমানে জগতের বড় সমস্যাই হইল নীতিজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া, মানুষকে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া কি করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায়। বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াই চলিয়াছে ও চলিবে এক সীমাহীন উন্নতির পথে। কিন্তু এই বিজ্ঞানকে আত্মঘাতী না হইতে হইলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের সঙ্গে চাই তাহার মিলন। একার্যে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "বেদান্তই আমাদের প্রাণ, বেদান্তই আমাদের জীবন। ইহারই উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লাভ হইযাছে তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। বর্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে।"

তিনি অনেক কিছুরই পূর্বাভাষ দিয়াছেন, যাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে, এবং সকল পরিবর্তনকেই জ্ঞান ও সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্তও দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্বজ্ঞ শ্রীশ্রীঠাকুর সকল ভবিষ্যৎ যেন দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া যোগ্য আধার বুঝিয়া তাঁহার সর্বশক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন স্বামীজীর উপর। কাজেই আমাদের পথ সুগম—শুধু নয়ন উন্মীলিত রাখিযা চলিতে হইবে। অন্তে নিজের মুক্তি হইবে কি না, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই—স্বামীজীর কথামত কেবল কাজ করিয়া যাওয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সকল উন্নতির মূলে। স্বামীজী মানুষের প্রতি, নিজের প্রতি শ্রদ্ধার চূড়ান্তই দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং আমাদিগকে সশ্রদ্ধ হইতে, সকলের সহিত সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। কী উচ্চ স্তর হইতে, কী এক অতি মানবের আসনে বসিয়া কথা বলিতেন স্বামীজী।

স্বামীজী যে একটা ঈশ্বর-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। সেজন্যই তাঁহার আরব্ধ

সমাজ- ও দেশগঠন-উপযোগী কাজগুলি তাড়াতাড়ি গুছাইয়া ফেলিবার জন্ম শেষের দিকে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাপ্রয়াণের তিন বৎসর পূর্বেই তিনি ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত আলাপে নিজ জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন তাঁহার কাজের তুলনায় এবং আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার প্রভাব অনন্তকাল স্থায়ী হইবে এদেশে এবং বিদেশে; তাঁহার চিন্তা এবং প্রেরণার স্পন্দন অনন্তকাল ধরিয়া স্পন্দিত হইয়া চলিবে।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বর্তমান যুগে ইহা অপেক্ষা সারগর্ভ বাণী আর কেহ উচ্চারণ করিয়াছে কি? তুমি রাজনীতিবিদ্ হও, ধার্মিক হও, লোকসেবক হও, মাথা পাতিয়া লও এই অমর বাণী। একমাত্র ইহা দ্বারাই জগতে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। ইহাই যুগবাণী।

প্রার্থনা

স্বামী জীবানন্দ

ধ্যানমগ্ন ঋষি অখণ্ডের ঘর থেকে
এলে নেমে মর্ত্যধামে বিশ্বহিত লাগি
রামকৃষ্ণ-মহাভাব-প্রচারক হয়ে,
তব পায়ে নতশির কৃপাকণা মাগি।
বাণী তব স্তব্ধ নয় আজও ধ্বনিত
আকাশে বাতাসে তার রয়েছে মূর্ছনা
সারা বিশ্বে কণ্ঠে কণ্ঠে হতেছে রণিত
কান পেতে শোনা যায় অপূর্ব ব্যঞ্জনা!

প্রাণের ভারত তব এখনো মলিন
ক্ষুধার্ত আতুর কণ্ঠ হয়নি নীরব
হাহাকার আর্তনাদ দিকে দিকে ওঠে
দুর্বলতা এখনো যে হয়নি বিলীন!
দাও শক্তি, ভক্তি দাও সেবিতে হে বীর
আজ যেন আদর্শের সার্থকতা ঘটে।

কায়া ও ছায়া

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জননী সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো পূজার প্রসঙ্গে ভক্তদের বলিতেন, কায়া ও ছায়া এক, অর্থাৎ জীবন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও ছবি-শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ নাই যদি ভক্ত যথাযথ শ্রদ্ধা-ভক্তি হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দেখিতে পারেন। হিন্দুধর্মের সমালোচকগণ ইহা বুঝিতে পারেন না, কোন কালেই পারিবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের এক অপরিবর্তনীয় বুলি—প্রতিমা-পূজা পৌত্তলিকতা। হিন্দুধর্মের সনাতন ঐতিহ্যে উপাস্যদেবতা মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী। দেবতা বাস্তবিক বাহিরে নন, চৈতন্য যেখানে সর্বদা জ্বল জ্বল করিতেছে সেই মানুষের হৃদয়ে। অতএব হিন্দু উপাসকের নিকট প্রতিমার প্রকৃত উপাদান কাঠ খড় মাটি পাথর নয়, চৈতন্য। মন্ত্র পড়ি যাঁহার উদ্দেশ্যে, স্তব গাই যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি হৃদয়াসীন চৈতন্যময় সত্তা, নির্জীব, জড়বস্তু নন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কায়া ও ছায়ার পারস্পরিক সম্বন্ধ ও মূল্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। কখনও কায়া অপেক্ষা ছায়াই বেশী প্রয়োজনীয়—যেমন নিদাঘ রৌদ্রে তপ্ত পথচারীর নিকট গাছের ছায়া। গাছটি সুন্দর কি অসুন্দর, মূল্যবান কি সাধারণ তখন আমরা সে বিচার করি না, আমরা তাকাই তাহার ছায়ার দিকে যাহা আমাদের শরীরকে শীতল করিবে। সরোবরের জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব আকাশের চন্দ্রের ন্যায় নয়নাকর্ষী না হইলেও উহা দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই। তাজমহল দেখিয়া যাঁহারা মুগ্ধ হন তাঁহারা যমুনার জলে উহার ছায়ার স্মৃতিটিও সযত্নে হৃদয়ে সঞ্চিত রাখেন এবং তাজমহলের গল্প করিবার সময় ছায়া-তাজমহলেরও বর্ণনা করিতে ভুলেন না। মানুষ মরিয়া যায় কিন্তু সে পরবর্তীদের নিকট বাঁচিয়া থাকে তাহার ছায়া—আলোকচিত্রের মধ্যে। কোনও পতিব্রতা নারীকে যখন কেহ বলে, তিনি যেন তাঁহার স্বামীর ছায়া—তখন এই ছায়াত্ব ঐ নারীর গৌরবই ঘোষণা করে। সঙ্গীতেও আমরা ছায়ার সমাদর করি। মূল রাগিণীর ন্যায় উহার ছায়া-রাগিণীসমূহও শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়রঞ্জন করে। নট—ছায়ানট, খাম্বাজ—কৌমুদী খাম্বাজ, ভৈরবী—আনন্দ ভৈরবী ইত্যাদি। ছায়া কায়া নয় কিন্তু কায়ার অনেক আলোক, শক্তি, আনন্দ উহাতে বহু সময়ে সংক্রামিত হয়।

কখনও কখনও ছায়াকে বর্জন করিতে হয়। গভীর রাত্রিতে ঘরের মধ্যে মন্দান্ধকারে যদি অকস্মাৎ একটি সচল ছায়া চোখে পড়ে আমরা ভয়ে আঁতকাইয়া উঠি। যাহার ভালবাসার আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের আদৌ আস্থা নাই সে যদি মিষ্ট কথা কহিয়া মিতালি করিতে আসে তাহা হইলে আমরা সতর্ক হই, কেননা ছায়া-বন্ধু বড় ভয়ঙ্কর। ছায়া-অবতার—কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী সাধন করেন। যীশুখ্রীষ্ট সেইজন্য সাবধান করিয়াছিলেন, Beware of false prophets, ভুয়ো অবতার হইতে হুঁশিয়ার।

কখনও কখনও ছায়াকে গ্রহণ করিতে হয় উহার যথার্থ মূল্য জানিয়া—যেমন গিলটি করা গহনা। যদি জানি উহা আসল সোনার নয়—ছায়া-সোনার—তাহা হইলে উহা কিনিতে

পারি, ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু ঠকিবার আশঙ্কা নাই। সোনার মূল্য দিয়া উহা কিনি না। আমরা যখন অভিনয় দেখি তখন নাট্যের বিভিন্ন অঙ্কে অভিনেতাদের সঙ্গে হাসি কাঁদি, লম্ফ-ঝম্ফ করি, আনন্দ পাই, কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানি এই সকল ঘটনা সত্য নয়, ছায়া।

আধ্যাত্মিক জীবনেও কায়া ও ছায়ার প্রসঙ্গ ও চিন্তা অনবরত আমাদিগকে করিতে হয়। ত্রিবিধ তাপে তপ্ত হইয়া আমরা যখন শ্রীভগবানকে প্রাণের আর্তি নিবেদন করি তখন তাঁহার করুণা একটি শীতল ছায়ারূপে আমাদের নিকট নামিয়া আসে। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার নাম-গান, তাঁহাতে নির্ভরতা দ্বারা আমাদের মনঃপ্রাণ শীতল হয়। ভগবানের কায়া কি প্রকার তাহা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য—পণ্ডিতরা উহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা করুন—আমাদের পক্ষে তাঁহার ছায়াই পর্যাপ্ত। বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা দ্বারা হৃদয়ে তাঁহার অতীন্দ্রিয় প্রেমের যে অনুভূতি আমরা পাই উহাই তাঁহার ছায়া। উহাই আমাদের সন্তাপ হরণ করে, আমাদিগকে শক্তি দেয়, শান্তি দেয়।

কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন, আমাদের দেহের মধ্যে দুইটি সত্তা বাস করিতেছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। কায়া ও ছায়ার ন্যায় উভয়ে পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ (কঠোপনিষৎ ১।৩।১), উভয়ের প্রকৃতিতে প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান—যেমন চৈতন্যময়তা, আনন্দময়তা, স্বাধীন ইচ্ছা, কর্মশক্তি ইত্যাদি। কিন্তু জীবাত্মার ক্ষেত্রে এই ধর্মগুলি সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে পরমাত্মায় উহাদের পরিমাণ অনন্ত। পরমাত্মা অসীম চৈতন্যস্বরূপ ; তাঁহার আনন্দের, স্বাধীনতার, সৃজনশক্তির কোনও গণ্ডী নাই। উপনিষদ্ বলেন, মানুষের জীবভাব তাহার চিরকালের পরিচয় নয়। এমন দিন আসিতে পারে যখন ছায়া কায়ার মধ্যে অন্তর্হিত হয়, মানুষ জানে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি ব্রহ্মস্বরূপ। লৌকিক জীবনে একজন বন্ধুর পক্ষে তাহার প্রিয় সুহৃদের ছায়া হইয়া থাকা অথবা পতিব্রতা নারীর স্বামীর ছায়া হইয়া চলা গৌরবের বিষয়। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে মানুষ যদি পরমাত্মার ছায়া হইয়া জীবত্ব-স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে উহা তাহার মূর্খতার পরিচায়ক। মানুষের প্রধান কর্তব্য আত্মজ্ঞান লাভ করা, ছায়াত্ব ঘুচাইয়া কায়াত্ব উপলব্ধি করা।

ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টি আলাদা, বুলিও আলাদা। ভক্ত ভাবেন, তিনি যে ভগবানের ছায়া, বৃহৎ অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ এইটি যদি সর্বদা মনে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলেই তো জীবন-সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। দুর্বুদ্ধিবশতঃ এই সত্য আমরা খেয়াল করি না বলিয়াই তো অহঙ্কার-মত্ত হইয়া 'আমি' 'আমি' করি। সেইজন্যই তো দুঃখ পাই, কত যন্ত্রণা ভোগ করি। যদি সর্বক্ষণ বলিতে পারি 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু', যদি গীতার শিক্ষা মনে রাখিতে পারি –

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥

(ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহার দৈবী মায়ায় সকলকে কলের পুতুলের ন্যায় চালাইতেছেন,) তাহা হইলে সকল দুঃখের অবসান হয়। অতএব ভক্ত বলেন, হে প্রভু, সর্বদা আমাকে তোমার ছায়া করিয়া রাখো। আমি যে তোমার—ইহা যেন আমি ভুলিয়া না যাই। তোমার ভুবনমোহিনী অবিদ্যা মায়ায় পড়িয়া আমি যেন তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ বিস্মৃত না হই। হে প্রভু, আমি পার্থিব সুখ চাই না, স্বর্গসুখও চাই না, জন্মে-জন্মে তোমার কিঙ্কর হইয়া তোমার সেবাধিকার চাই।

আমরা যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি ততক্ষণ প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনা সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারি উহারা মনের সৃষ্টি, মিথ্যা। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু বা ঘটনাগুলি যদি ভাবিতে চেষ্টা করি তখন সেগুলি আর বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় উহারা কায়াহীন ছায়ামাত্র। লৌকিক জীবনের এই অভিজ্ঞতা আধ্যাত্মিক জীবনেও অনুভূত হয়। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মবস্তুর দিকে যত আমরা আগাইয়া যাই নাম-রূপময় জগৎসংসার ততই আমাদের নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে বাধ্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একটি গানে এই অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।

জগৎ-সংসারকে অনিত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা না হইলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি সুদূরপরাহত। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ উভয় পথেই ইহা সত্য। উপনিষদ্ বলিতেছেন, ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে। বিবেকী ব্যক্তি অনিত্যবস্তুসমূহকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইতে যান না। (কঠ ২।১।২) গীতায় শ্রীভগবান ভক্ত অর্জুনকে বলিতেছেন, অনিত্যম-সুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। এই অনিত্য দুঃখময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি যথার্থ শ্রেয়ঃ চাও তো আমার ভজনা কর। জ্ঞান-সাধকের মন্ত্র—'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা।' ভক্তি-সাধকের মন্ত্র—'ভগবানই সত্য, জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল।' উভয় পথের সাধকই কায়া ও ছায়ার মূল্য জানেন, গিলটি করা গহনাকে সোনা বলিয়া ভ্রম করেন না।

জ্ঞান ও ভক্তির উভয়েরই আবার একটা উচ্চতর দৃষ্টি আছে। উপনিষদ্ বলিতেছেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম। আত্মৈবেদং সর্বম্—আত্মাই এই সব কিছু হইয়াছেন। জগৎ-সংসারকে মায়া বলিয়া দৃঢ় প্রযত্নে প্রত্যাখ্যান করিয়া করিয়া আত্মবস্তুর সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মাকে উপলব্ধি করিবার পর সাধক দেখেন নামরূপও আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আত্মারই সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ জগৎ-সংসারে প্রকাশ পাইতেছে। তখন সাধকের নিকট কায়া ও ছায়ার পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। ছায়া বলিয়া তিনি কিছু দেখেন না, সবই কায়া—ছায়াহীন কায়া। সাধক কবি সুরদাস তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গানের শেষে লিখিয়াছেন—

ইক মাযা ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগেরো
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

সুরদাস বলিতেছেন—মায়া এক বস্তু আর ব্রহ্ম আর এক বস্তু এই লইয়া ঝগড়া দেখিতে পাই। এই ভেদ অজ্ঞান হইতেই হয়। হে জ্ঞানী, তুমি যদি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকো তো ব্রহ্ম ও মায়ার মধ্যে প্রভেদ দেখিতেছ কেন?

সুরদাস উপনিষদের সিদ্ধান্তই ধ্বনিত করিয়াছেন, ভক্তির পরাকাষ্ঠাতেও এই দৃষ্টি আসিয়া থাকে। ভগবানকে দর্শন করিলে সংসারকে অনিত্য বলিবার আর প্রয়োজন থাকে না। সংসারকে তখন ভগবানের লীলা বলিয়া মনে হয়। সব রূপের মধ্যে তখন তাঁহার স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠে, সকল শব্দের ভিতর বাঁশীর সুর শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সুফী সাধক জাফরের এই গানটি শুনিতে ভাল বাসিতেন—'জো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।' যাহা কিছু আছে সবই তুমি।

আধ্যাত্মিক জীবনে কায়া অর্থাৎ সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান তাঁহার ছায়া দ্বারা আমাদের ত্রিতাপ দূর করেন। তাঁহার মূর্তি—ছায়ার ভিতর তাঁহাকে ভাবনা করিবার চেষ্টা দ্বারা আমরা তাঁহার সান্নিধ্য ও স্পর্শ লাভ করি। আমরা

যতক্ষণ জীব ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব —ছায়া। যতদিন না আমরা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিতেছি ততদিন সংসার মায়া—ছায়া। এই ছায়া সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। সত্যের অনুভূতি হইলে মায়া হইতে আর ভয় নাই—ছায়া তখন কায়ার সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

দানবের পরাজয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

দানবেরা মাঝে মাঝে মাথা তোলে উন্মত্ত উল্লাসে,
ভাবে, বুঝি দেবতারা সবাই নিদ্রিত, সে-সুযোগে
নিমেষে প্রয়োগ করে সর্বশক্তি, আপন বিক্রমে
অধিকার করে নেবে স্বর্গরাজ্য, হবে অধিপতি
একচ্ছত্র, কেউ আর প্রতিদ্বন্দ্বী রবে না কোথাও,
একা সব ভুঞ্জিবে সে, অসপত্ন রাজ্যসুখভোগ।

মাথা তোলে ঠিকই সে, হুহুঙ্কার ছাড়ে গর্বভরে,
যতটুকু শক্তি আছে, সেই নিয়ে নিজেকে অজেয়
মনে করে, আর সেই শক্তির প্রচণ্ড দম্ভভরে
এদিকে ওদিকে করে হানাহানি, ন্যায়নীতি সব
চির-বিসর্জন দিয়ে, জানে না-যে, তারা যে দানব,
দানব শক্তির বশ, অধর্মের আশ্রিত-যে তারা।

স্বপ্ন তার ভেঙে যায়, দম্ভ তার লুটায় মাটিতে,
প্রচণ্ড আঘাত আসে, যে-আঘাতে উদ্ধত মস্তক
নত হয় ভূমিতলে, প্রাণভয়ে আশ্রয় সন্ধান
করে সে সবার কাছে, অসত্য অধর্মাচারী সেই
দানবের 'পরে হানে বিদ্রূপ ঘৃণার তীক্ষ্ণ বাণে
সবাই, সঙ্কোচে আর দেখায় না মুখ সে আলোকে।

বারে বারে দানবের পরাভব এমনি করেই
হয়, তবু কোনদিন শিক্ষা তার হয়নি, হবে না।
সে জাগবে বার বার, ঘটাবে অনর্থ চারিধারে,
তারপর জর্জরিত হয়ে শেষে লুটাবে ধুলায়।
নিশ্চিহ্ন কি কোনদিন হবে নাকো এই দানবেরা?
শুধু পরাজয় নয়, চাই তার সম্পূর্ণ বিনাশ।

"তাল ভঙ্গ ন পায়"*

স্বামী তেজসানন্দ

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর্য ঋষিকণ্ঠে যে শাশ্বত বাণী ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই ভারত-কৃষ্টির মূল ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অদৃশ্য শিশিরসম্পাতে যেমন পুষ্পকলিকাসমূহ অলক্ষিতে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি যুগে যুগে অধ্যাত্ম-মনীষিবর্গের অবিশ্রান্ত নীরব কঠোর সাধনার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক তথা সাংস্কৃতিক জীবন বিচিত্র শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের বেদ ও বেদান্ত, রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদির মর্মবাণী সেই সাংস্কৃতিক আদর্শকে শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যেও এক অপার্থিব জ্ঞানালোকে চিরভাস্বর রাখিয়া সকলকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়া আসিতেছে।

এই সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টি-সাধনকল্পে বিবিধ ভাষাভাষী ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রদ রম্য কথা-সাহিত্য, প্রচলিত গল্প ও গাথা সহজ ও সরল ভাষায় ও ছন্দে জনমানসে যে অমর রেখাপাত করিয়া দেশবাসীকে তাহাদের সমুন্নত আদর্শের প্রতি সর্বদা সচেতন রাখিয়াছে, তাহার যথার্থ মূল্যায়ন করা সহজসাধ্য নহে। মনীষিবর্গের এই অতুল অবদানের ফলেই ভারতের কৃষ্টিধারা আজও সতেজ ও সজীব রহিয়াছে এবং উহা দিকে দিকে প্রসারিত হইয়া বিশ্ববাসীকে শান্তির অমৃতরসের সন্ধান দিতেছে। তাই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "এই সেই ভারত যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতে আবার তদ্রূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে।"

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত একটি সারগর্ভ কাহিনীর অবতারণা করা হইতেছে যাহার মাধ্যমে আমরা গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত আদর্শেরও কতকটা পরিচয় পাইতে সমর্থ হইব।

বহুবৎসর পূর্বে কোন এক সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের একটি অখ্যাত পল্লীতে সঙ্গীত- ও নটন-নিপুণ নট-নটীদ্বয় বাস করিত। নাচিয়া গাহিয়া জীবিকার্জন করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ইহা অনস্বীকার্য যে, যখন দেশে কোনপ্রকার অর্থাভাব থাকে না ও শস্যসামগ্রীরও অনটন ঘটে না, তখনই সঙ্গীত- ও নর্তনপ্রিয় জনগণ এইরূপ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হয় এবং নাচগানই যাহাদের উপজীবিকা তাহাদিগকেও অর্থোপার্জনের জন্য কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। দৈব-বিড়ম্বনায় একবার প্রখর সূর্যতাপে ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনাবৃষ্টিতে সেই দেশের অধিকাংশ শস্যই বিনষ্ট হয় এবং দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় অনেকে আত্ম-রক্ষার্থে দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কাহারও পক্ষে যে নাচ-গানের জন্য অর্থব্যয় করা সম্ভব নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের এই

---

* একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার নাচ-গানের আসরও অনতিবিলম্বে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া তাহারাও পার্শ্ববর্তী অপর এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজার রাজ্যে প্রস্থান করিল।

সে-দেশের খাদ্যের বা অর্থের বিশেষ কোন অভাব ছিল না। রাজা অশীতিপর বৃদ্ধ ও অতিশয় কৃপণ। তিনি তাঁহার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ এক মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কঠোরহস্তে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে এই পলিতকেশ বৃদ্ধ নৃপতি ও মন্ত্রীর বহুপূর্বেই বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু সেই নির্দিষ্টকাল অতীত হইলেও কার্পণ্যদোষ-দুষ্ট ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থপর নৃপতি এবং তদ্ভাবে ভাবিত মন্ত্রী তাঁহাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অকুতোভয়ে প্রজাশাসন করিতেন। প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জরণ শ্রুত হইলেও রাজদণ্ডের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে কেহ কোন বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইত না। যাহা হউক, দেশান্তর হইতে আগত সেই প্রসিদ্ধ নট-নটীদ্বয় বায়কুণ্ঠ নৃপতির রাজধানীতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে হাটে-মাঠে,—নানা স্থানে তাহাদের অভিনয়-চাতুর্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে অচিরেই তাহাদের নৃত্য-গীতনৈপুণ্যের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং কিছু কিছু অর্থাগমও হইতে লাগিল। নট-নটীদ্বয় রাজদরবারে তাহাদের নৃত্য-গীত-পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য নিরতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাদের দৃঢ় ধারণা রাজদরবারে নৃত্য-কলা প্রদর্শন করিতে পারিলে একদিনেই তাহারা প্রভূত পরিমাণে অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইবে। তাহাদের এই সঙ্গীত- ও নর্তন-বিদ্যার সংবাদও নৃপতির কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। সভাসদ্‌বর্গের অনুরোধে রাজা আদেশ করিলেন যে, যদি বিনা অর্থব্যয়ে তাহারা রাজসভায় নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করিতে সম্মত হয়, তবে তাঁহার দিক হইতে কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না। নট-নটীদ্বয় রাজাদেশ শিরোধার্য করিয়া আকুল আগ্রহে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাজা তাঁহার মন্ত্রী ও সভাসদ্‌বর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। সভাগৃহ অচিরে আলোকমালায় সুসজ্জিত হইল। নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থল পরিষদ্‌বৃন্দ, রাজ্যের গণ্যমান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রজাবর্গ দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। প্রবলপ্রতাপ নৃপতি ও যুবরাজ এবং মন্ত্রী ও মন্ত্রীকন্যাও স্ব স্ব সম্মানিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিপুল জনসমাগমে সভামণ্ডপে তিলধারণেরও স্থান রহিল না। চারুদর্শন নট-নটীদ্বয় যথোচিত মনোহর বেশ ধারণপূর্বক রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে তাহাদিগকে স্বাগত জানাইল।

নৃত্য-গীতাভিনয় আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সকলে নির্বাক্ বিস্ময়ে দেখিতে পাইল—জটাজূটধারী, বিভূতিভূষিতাঙ্গ, কৌপীনমাত্র-সম্বল, আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘকায় এক তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসী একখানি ছিন্নকন্থা স্কন্ধে বহন করিয়া সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ও মুখমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁহার ধীর মন্থরগতি, ধ্যানগম্ভীর ভাব ও উত্তান নয়নের স্থির দৃষ্টির মাধ্যমে এক দিব্যানুভূতি প্রকট হইতেছিল। এই নৃত্য-গীতের আসরে এবম্বিধ একজন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর আগমনে সকলেই উচ্চকিত

হইয়া উঠিল। তাঁহার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যও কেহ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইল না। সভাস্থ সকলের ন্যায় তিনিও একটি আসন গ্রহণ করিয়া নিশ্চল অবস্থায় উপবিষ্ট রহিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে নটী (নর্তকী) সাবলীল মনোহর ভঙ্গীতে তাহার নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার সহযোগী বাদ্যবিশারদ নট বামদেব সঙ্গীত ও নৃত্যের তালে তাল রাখিয়া নিপুণহস্তে বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল। নর্তকীর তাল-লয়-সমন্বিত-সঙ্গীতের মূর্ছনা, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, লীলায়িত নর্তন-ভঙ্গী দর্শন-শ্রবণে দর্শকবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। সময় যে কিভাবে অলক্ষিতে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে সকলে এই অভিনয় দর্শন করিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া তৃতীয় যামে পৌঁছিয়াছে। অথচ এখনও কেহই নর্তকীকে শুধু প্রশংসাধ্বনি ব্যতীত কোন বস্তু উপহার বা পুরস্কার প্রদান করিতেছে না। তদ্দর্শনে শ্রান্ত নর্তকী ব্যথিত অন্তরে তাহার সহযোগী বাদ্যবাদক বামদেবকে উদ্দেশ করিয়া গানের সুরে বলিয়া উঠিল—

"রাত দো ঘড়ী বজ গঈ, থক গঈ পঞ্জর মেরী
নটী কহে, সুনো বামদেব ইনাম ন মিলা কোঈ"।—

—রাত্রি দুই ঘটিকা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নাচ-গান করিতে করিতে আমার বক্ষের পাঁজর ক্লান্ত ও ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ তুমি স্বচ্ছন্দে কেবল তালই বাজাইয়া চলিয়াছ। এ পর্যন্ত কাহার নিকট হইতে কোন কিছু ইনামও (বকশিস) মিলিল না। নর্তকীর এই হতাশা ও দুঃখব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া নট গানের সঙ্গে তাল রাখিয়া বলিয়া উঠিল—

"বহুত গঈ থোড়ী রহী থোড়ী অভী হ্যায়।
নট কহে, সুনো নটী, তাল ভঙ্গ ন পায়॥"

—রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তো চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি শেষ হইতে আর অল্পক্ষণমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাও দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া যাইবে। হে নর্তকী, তুমি যে ভাবে, যে তালে নৃত্য-গীত পরিবেশন করিতেছ, তুমি সেই ভাবেই উহা করিয়া যাও। দেখিও, যেন তাল ভঙ্গ না হয়।

নটের উক্তিটি শ্রবণমাত্র সভাস্থলে উপবিষ্ট সেই সন্ন্যাসীপ্রবর তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিন্নকন্থাটি হর্ষপুলকিত চিত্তে নট-নটীদ্বয়কে প্রদান করিলেন। উভয়ে সন্ন্যাসীর এই দান সাদরে গ্রহণ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে মস্তক দ্বারা উহা স্পর্শ করিল। দেখিতে দেখিতে নৃপতির পার্শ্বে উপবিষ্ট রাজকুমার তাঁহার মহার্ঘ অঙ্গুরীয়টি এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীর পার্শ্বে সমাসীনা তাঁহার পরমাসুন্দরী দুহিতা স্ব-কণ্ঠ হইতে মূল্যবান স্বর্ণহারটি উন্মোচন করিয়া অভিনয়-মঞ্চে নট-নটীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে পুরস্কারস্বরূপ নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে কৃপণ নৃপতি ও তৎস্বভাবসম্পন্ন মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। রাত্রি শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই এবং অভিনয়কারীদ্বয়ও বিরামহীন নৃত্য-গীতাদি পরিবেশনের ফলে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া নৃপতি কালবিলম্ব না করিয়া সভা-ভঙ্গের আদেশ প্রদান করিলেন। একে একে সকলে সভাগৃহ হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা সর্বপ্রথম সেই সন্ন্যাসীপ্রবরকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই রাজসভায় আগমন করিয়াছেন এবং নট-নটীর সঙ্গীতের মধ্যে তিনি এমন কি তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন যাহাতে এতটা প্রসন্ন হইয়া তিনি তাঁহার একমাত্র

গাত্রাচ্ছাদন ছিন্নকন্থাটি অভিনয়কারীদ্বয়কে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নৃপতি কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—মহারাজ, আপনার প্রশ্নদুইটির যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি। আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন—

"ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বস্ত্রং সুজীর্ণশতখণ্ডময়ী চ কন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ ন জহাতি চেতঃ॥"

—আমি সনাতনপন্থী একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। গুরুগৃহে দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্যপালন, গুরুসেবা ও যথারীতি শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করিবার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক স্বাদু বা নীরস যথাপ্রাপ্ত মাধুকরী ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলাম। বৃক্ষতলে ভূমি-শয্যায় শয়ন; সঙ্গী একমাত্র নিজের দেহখানি। আর দেহাচ্ছাদন ঐ সুজীর্ণ শতখণ্ডময়ী কন্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতকাল কৃচ্ছ্রসাধন করা সত্ত্বেও এই চিত্তকে বিষয়বাসনামুক্ত করিতে সমর্থ হই নাই। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম জীবন-সন্ধ্যায় আপনার নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইলে একটি কুটীর বাঁধিয়া ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়া দিব। মহারাজ! সুদীর্ঘকাল যে সন্ন্যাসী কাহারও কৃপাপ্রার্থী হয় নাই, স্বদেহের সুখ-দুঃখের প্রতিও যে কোন দিন বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করে নাই, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট যে সন্ন্যাসী দেশে দেশে, পাহাড়ে পর্বতে, নির্জন অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া পরিব্রাজক জীবন যাপন করিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতধারী সন্ন্যাসী আজ ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর রক্ষার্থে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া রাজদরবারে সমাগত। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? মহারাজ! এখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক বিরাট সভা,—লোকে লোকারণ্য। বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের সমাবেশে সভাগৃহ জমজম করিতেছে। সভান্তে আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সভাস্থলে আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং নট-নটীর গানও শুনিতেছিলাম। নটের বাক্যের শেষ পঙ্‌ক্তিটি শ্রবণমাত্র আমার চিত্তে যে সাময়িক ভ্রান্তি ও মানসিক দুর্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সহসা কাটিয়া গেল। নট নটীকে লক্ষ্য করিয়া গানের ছন্দে সত্য কথাই বলিয়াছে,—রাত্রির অধিকাংশই তো অতীত হইয়াছে। সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। সুতরাং তুমি যে তালে নাচ-গান করিতেছ, তাল ভঙ্গ না করিয়া সেইভাবেই উহা করিয়া যাও। কি অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ এই বাণী! আমি এতকাল যে তালে ত্যাগের পথ, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরতার পথ বাহিয়া চলিয়াছি, আজ ক্ষণিক দুর্বলতাবশতঃ সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র সম্বল জগতের ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনার দ্বারদেশে কৃপাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলাম। ধিক, শত ধিক এই বিষয়লুব্ধ মনকে। বস্তুতঃ একবার পদস্খলন হইলে চিত্তকে আবার উচ্চগ্রামে উন্নীত করা সহজে সম্ভব হয় না, অলক্ষিতে মন দিনের পর দিন নিম্নগামী হইতে থাকে। সন্ন্যাসীশিরোমণি আচার্য শঙ্করও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে মুক্তিপথযাত্রী-মাত্রকেই উদ্দেশ করিয়া সাবধানবাণী শুনাইয়াছেন—

"লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্ যদি চিত্তমীষদ্বহির্মুখং
সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্‌ক্তৌ
পতিতো যথা তথা"॥৩২৫॥

—খেলার গোলক অসাবধানতাবশতঃ যদি সোপানশ্রেণীর সর্বোচ্চ সোপানেও পতিত হয়, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে নামিতে থাকে। এইভাবে চিত্তও যদি ব্রহ্মচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও বহির্মুখ হয়—বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন হয়—তাহা হইলে উহা ক্রমান্বয়ে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইয়া উহাতেই আসক্ত হয়।

জীবনের এই মৌন সন্ধিক্ষণে ইহারা আমার চক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। ইহারাও আজ আমার শিক্ষাগুরু। আমি ইহাদের নিকট হইতে যে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিয়াছি ও সাবধানবাণী শ্রবণ করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রকৃত পাথেয় হইয়া থাকিবে। "রথ্যায়াং বহুবস্ত্রানি ভিক্ষা সর্বত্র লভ্যতে। ভূমিঃ শয্যাস্তি বিস্তীর্ণা যতয়ঃ কেন দুঃখিতাঃ।"—রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র ছিন্ন বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাধুকরী ভিক্ষাও এই বিরাট সংসারে সহজলভ্য। এই বিশাল শ্যামলা ধরণী তাহার স্নেহাঞ্চল বিছাইয়া আমার সুখশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। জীবন-নির্বাহের এই বিপুল সমারোহ থাকিতে প্রকৃত সন্ন্যাসীর তো দুঃখিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তাই আমি এই নট-নটীর অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমার ছিন্ন কন্থাটি তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়াছি। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"—ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ সত্যই বলিয়াছেন,—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায় এই ত্যাগের পথ দুর্গম ও বিপজ্জনক; কিঞ্চিন্মাত্র অসতর্ক ও অসাবধান হইলে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। জয় হউক মহারাজ, শ্রীভগবান আপনার অশেষ কল্যাণ করুন।—এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্তে রাজসভা পশ্চাতে রাখিয়া চিরতরে অদৃশ্য হইলেন। সন্ন্যাসী-কেশরী স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে এই সমুন্নত আদর্শেরই প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "The Song of the Sannyasin" (সন্ন্যাসীর গীতি) কাব্যে লিখিয়াছেন—

"সুখতরে গৃহ ক'রো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও,
হউক কুৎসিত কিংবা সুরন্ধিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য পেয় অপবিত্র করে?
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মত,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥" ১১॥

অতঃপর নৃপতি রাজকুমার ও মন্ত্রীকন্যাকে তাহাদের মূল্যবান রত্নালঙ্কার নট-নটীদ্বয়কে পুরস্কার দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার বলিতে লাগিলেন—পিতঃ, হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে,—"ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা।" "...যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধানানুসারে মন্দাধিকারী সাধারণ জনগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে এবং প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যবান উচ্চাধিকারী

ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রবিধান অন্যপ্রকার। যখনই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখনই সে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ—যে কোন অবস্থা হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। মহারাজ! আপনার বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণের সময় অনেক পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। আমিও যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছি। অথচ আপনি কার্পণ্যবশতঃ ও ক্ষমতালিপ্সায় আত্মহারা হইয়া এখন পর্যন্ত আমার উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ না করিয়া রাজকার্যেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, আপনার নিকট মন্ত্রী-দুহিতার সঙ্গে আমার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায় নানাভাবে ব্যক্ত করা সত্ত্বেও আপনার নিকট হইতে এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সম্মতিসূচক কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই নাই। ইহা যে কিরূপ মর্ম-পীড়াদায়ক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মন্ত্রীমহাশয়ও আপনার মত একজন কৃপণ নৃপতির পুত্রের হস্তে তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি এবং মন্ত্রী-কন্যা উভয়ে আপনাদের দুজনকেই আজ গভীর নিশিতে গোপনে হত্যা করিয়া রাজ্যের শাসন-দণ্ড ধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান দুর্লঙ্ঘনীয়। নট-নটীর গানের শেষ পঙ্‌ক্তিটি "তাল ভঙ্গ ন পায়"—আজ গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া আমাদের কর্ণে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, আপনারা উভয়েই কালের স্বাভাবিক গতিতেই অল্পদিনের মধ্যেই এই সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন। এই মহাসত্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহারা আমাদের উভয়কেই এক মহাপাতক হইতে রক্ষা করিয়াছে। আপনাদিগকে হত্যা করিয়া রাজা-রানী হইবার দুরভিসন্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ইহারা আমাদের যে উপকার সাধন করিয়াছে, তাহার তুলনায় এই পার্থিব স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও রত্নহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ। গভীর কৃতজ্ঞতাবশতই পুরস্কারস্বরূপ উহা তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছি।

বৃদ্ধ নৃপতি ও বৃদ্ধ মন্ত্রী নিবিষ্টমনে রাজ-কুমারের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্পণ্য, হঠকারিতা, স্বার্থপরতা, ভোগলিপ্সা ও ক্ষমতা-প্রিয়তার যে কি বিষময় পরিণাম হইতে পারে তাহা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন। ইহাও এতদিনে বুঝিতে পারিলেন যে, ভোগের দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয় না। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে —"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥" —বিষয়-ভোগের দ্বারা ভোগের আকাঙ্ক্ষা কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা দিন দিনই বর্ধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভোগের মধ্যে শান্তির সন্ধান কোনদিনেই মিলিবে না—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—একমাত্র ত্যাগেই অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব। ভর্তৃহরিও তাঁহার বৈরাগ্যশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং
বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং
রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং
কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং
বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥ ৩১॥

—ভোগে রোগভয়, সৎকুলের গৌরবে কুল-ভঙ্গের ভয়, সম্পত্তিতে রাজ্যলোলুপ নৃপতি হইতে ভয়, মানে অপমানের ভয়, বলে শত্রুর ভয়, রূপে বৃদ্ধত্বের ভয়, শাস্ত্রে পরাজয়ের ভয়, সদ্‌গুণে খলব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভয়, শরীরধারণে

মৃত্যুভয় বিদ্যমান। সংসারে বস্তুমাত্রেই ভয়ের কারণ নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র বিষয়ভোগ-বৈরাগ্য দ্বারাই নির্ভয় হওয়া সম্ভব।

বৃদ্ধ নৃপতি ও বৃদ্ধ মন্ত্রী আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজকুমারের সঙ্গে মন্ত্রীকন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাহাদের উভয়কে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিবার মানসে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক বনে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই আখ্যায়িকাটি বিভিন্ন লেখকের লেখনীমুখে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইলেও ইহার মাধ্যমে ভারতের সনাতন আদর্শের যে সমুজ্জ্বল আলেখ্য সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোথাও কোন মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয় না। এই সপিল বন্ধুর ও পিচ্ছিল সংসারপথে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীকে কি তালে, কি ছন্দে পদক্ষেপ করিতে হইবে তাহা এই বহুপ্রচলিত "তাল ভঙ্গ ন পায়" কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা অনস্বীকার্য যে, আবহমানকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের যে সাংস্কৃতিক ধারা নির্বাধ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এবম্বিধ প্রচলিত বিভিন্ন কথিকা উহারই পরিপুষ্টি সাধনপূর্বক মনুষ্যসমাজে সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। পরমকারুণিক শ্রীভগবান আমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করুন এবং প্রকৃত আলোকের সন্ধান দিয়া আমাদের জীবন ধন্য করুন,--ইহাই তাঁহার রাতুল চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি॥"
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—হে প্রভো, অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, অজ্ঞান অন্ধকার হইতে জ্ঞানের জ্যোতিতে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান কর। ওহে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের হৃদয়ে জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হও। শান্তিময় হউক আমাদের জীবন।

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন্ দূর জন্মলগ্নে, হে চির-সুন্দর,
জ্বেলে দিলে তুমি মোর মর্মের ভিতর
সৌন্দর্য-পিপাসা। বহ্নিশিখা অমরার।
নগরীর পাষাণের মরু-সাহারার
বক্ষে তাই চিত্ত মম কেঁদেছে কেবলই।
তাই পল্লী-জননীর অঙ্কে এনু চলি
যেখানে আকাশ নীল, প্রান্তর শ্যামল,
যেখানে শিশির ভেজা ঘাসে ঝলমল
করে কোটী কোহিনূর অরুণ-কিরণে।
যেখানে ফসলে সোনা, মধু সমীরণে।
পাখীদের কাকলিতে অরণ্য মুখর।
কানে আসে সারাবেলা তরুর মর্মর।
হে সুন্দর, দৈন্য দিলে ঐশ্বর্যে ভরিয়া।
বিত্তে কভু তৃপ্ত নয় মানবের হিয়া!

শ্রীসোমনাথ

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সোমনাথ একটি বিরাট বিস্ময়। পশ্চিম সমুদ্রকূলে অবস্থিত প্রভাসপত্তনের এই শিবস্থান যে কত প্রাচীন, তা নির্ণয় করা একরকম অসাধ্য। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত পবিত্রিলা এই দেশ"—এই 'পুরাতন পুরুষের' মতই এই প্রভাসক্ষেত্র সুপ্রাচীন, আর এই মহাতীর্থ সোমনাথও তত প্রাচীন।

পুরাণাদি প্রাচীন সাহিত্য পাঠে জানা যায়, দক্ষ-শাপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত ভগবান চন্দ্র এখানেই শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে শাপমুক্ত হয়ে নিজ প্রভা ফিরে পেয়েছিলেন, এই জন্যই ক্ষেত্রের নাম 'প্রভাস'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার অবসান এইখানেই, যদুকুলও আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে এখানেই শেষ হয়ে যায়। অদ্যাপি সেইসব পুরাতন স্থান ও স্মৃতি বিদ্যমান।

সরস্বতী, হিরণ্য ও কপিলা—এই তিনটি পুণ্যনদী এখানেই সাগরে মিশেছেন, এইজন্যও এই ক্ষেত্র মহাপবিত্র। মহাভারতে এই প্রভাস তীর্থের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতের এই পশ্চিম উপকূল, প্রাচীন Venice-এর মত এক সময় ভারত ও ভারতেতর দেশের মধ্যে জলপথে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, বর্তমান বোম্বে বা কলকাতা বন্দর অপেক্ষা এর ঐশ্বর্য কোনও অংশেই কম ছিল না।

ভারতবাসীর মর্মকথা: 'সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল', তাই চিরকালই এদেশের নরনারী শ্রীভগবানের তৃপ্তির জন্য ধনসম্পদ ত বটেই, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

ভারতবর্ষের আরাধ্য দেবতা 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। তাই ভারতবর্ষময় অসংখ্য শিবমন্দির, আর নিয়ত কোটি কণ্ঠে "হর, হর, বম্, বম্।" বৈদিক যুগেরও আগে থেকে এই শিবের পুজো ও আরাধনা যে চলে আসছে, মহেন্‌জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক অবিষ্কারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেব সোমনাথের উপাসনা যে কবে থেকে সুরু হয়েছিল, বলা প্রায় অসম্ভব। এখানকার মন্দিরের ঐশ্বর্যের ও সম্পদের কথা লোকের মুখে মুখে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে রেডিও বা সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারবিভাগ ছিল না। সুতরাং এ প্রচারে যে কত যুগ লেগেছিল তা কে জানে?

'রাক্ষসীর প্রাণপাখী' 'মরিয়া না মরে'। ধনলুব্ধ বিদেশীদের বর্বরতায় অনেকবার এই মন্দির ধ্বংস হলেও অচিরকালের মধ্যেই আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'শ্মশানেষ্বাক্রীড়া' শিব শ্মশান ভালবাসেন বলেই, তাঁর অচিন্ত্য ও অব্যক্ত লীলার যজ্ঞে এই ধ্বংস, আবার 'ললাটস্থচন্দ্রাদ্‌গলিত-সুধয়া' নূতন সৃষ্টি। জয় মহাদেব শম্ভো। 'ভাঙ্গাগড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর।'

এই প্রভাসে কবে যে প্রথম শ্রীসোমনাথের মন্দির নির্মিত হয় তা বলা শক্ত। তবে নানান সাহিত্যিক প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নাসিক ও কার্লে শিলালেখে সিথিয়ান্ নাহাপন কর্তৃক প্রভাসে শিবের আরাধনার উল্লেখ আছে।

অবশ্য এ বিষয়ে গুপ্তযুগের কোন শিলালেখ পাওয়া যায়নি।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে (৪৭০ খৃঃ) সৌরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও বল্লভীতে হয় তার রাজধানী। বল্লভী রাজারা প্রায় সকলেই শিবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁদের রাজ্যকালে এ-স্থানের প্রভূত উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বদাই যে বিদেশীর আক্রমণেই মন্দির ধ্বংস হয়েছে, একথাও জোর করে বলা না। সমুদ্রের নোনা আবহাওয়া ও প্রাচীনত্ব এর জন্য দায়ী, একথাও অবশ্য অনুমান করা অসঙ্গত নয়। খুব সম্ভব এই কারণেই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির জীর্ণ হওয়ার ফলে খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতকে তৃতীয় মন্দির নির্মিত হয়। তখন থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সোমনাথ মহাদেব খুবই প্রকট। কিংবদন্তী যদি বিশ্বাস করতে হয়, প্রত্যহ গঙ্গোত্রীর জলে মহাদেবের অভিষেক হত এবং ভক্তিমান মানুষেরাই সে জল কাঁধে করে বয়ে আনতেন।

ইতিমধ্যে আরবদেশে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব (৫৭০) খৃঃ। তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্ম দুর্ধর্ষ আরবগণকে এক করে নববলে বলীয়ান করে তোলে। মহম্মদের দেহান্তের (৬৩২ খৃঃ) একশ বছরের মধ্যেই মক্কা থেকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আরব শক্তির পদানত হয়।

ভারতবর্ষের ধনসম্পত্তিও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে (৭১১ খৃঃ) আরবীয়দের প্রথম ভারত অভিযান হলেও এদেশে রাজ্যস্থাপন করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল (১১৯২ খৃঃ)।

গজনীর সুলতান মামুদ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন। মুসলমান লেখকদের মতে হিন্দুরা খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং বহুকালের দেবমন্দির ধ্বংস ও লুন্ঠিত হয়। হিন্দুরা এই অবমাননার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেন এবং মামুদকে অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এমন কি লুন্ঠিত ধনসম্পত্তিও বিশেষ কিছু গজনী অবধি পৌঁছায়নি।

এইভাবে মন্দির ধ্বংস হলেও অনহিলওয়ারার চালুক্য রাজারা এই মন্দির আবার নির্মাণ করেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার ঐতিহাসিক জয়নুল আকবর লিখেছেন: 'হিন্দুস্থানের সমুদ্রতীরে একটি বিরাট শহর আছে। তাহার নাম সোমনাথ। মুসলমানের মক্কার মতই এই স্থান হিন্দুদের পরম পুণ্যক্ষেত্র।'

দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১১৪ খৃঃ) ভব বৃহস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ শৈব সাধুর বিশেষ আগ্রহে সম্রাট কুমার পাল এই মন্দির সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢেলে তৈরী করান। এটি দেখতে যেন কৈলাস-শিখরের মতন। তাই এর নূতন নাম হয় 'মেরু প্রাসাদ'। বলতে গেলে শুধু মন্দির নয়, সম্পূর্ণ শহরটি সম্রাটের চেষ্টায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৯৬) আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লীর সম্রাট হবার পরেই গুজরাটের দিকে অভিযান করেন। তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মন্দির ধ্বংস ত হয়ই, তার ভগ্নাংশগুলিরও অনেক দিল্লী চলে যায়। এর কিছু পরেই জুনাগড়ের রাজা মহীপাল চুড়সম মন্দির মেরামত করেন এবং তাঁর ছেলে নগর আবার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্য কাল ১৩২৫-৫১ খৃঃ।

১৪৬৯ খৃঃ মাহ্‌মুদ বেগ মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ সরিয়ে এটিকে একটি মসজিদে পরিণত করলেও এ প্রচেষ্টা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি মন্দির আবার নূতন করে মাথা তোলে।

সম্রাট আকবরের সময়ে জুনাগড় দুর্গ মোগল অধিকারে আসে (১৫৭৭ খৃঃ)। কিন্তু এ সময়ে সোমনাথ মন্দিরে কোন উপদ্রব হয়নি। অবশ্য এই সময় থেকে সুরাট বন্দরের ক্রমোন্নতি, ফলে প্রভাসের গরিমা ক্রমশঃ কমতে থাকে। ঔরঙ্গজেবের আমলে (১৬৬৯ খৃঃ) গুজরাটের মোগল সুবেদারকে এই মন্দির ধ্বংস করার হুকুম দেওয়া হলেও এটি কাজে পরিণত হয়নি। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং অভিযান চালান এবং সোমনাথ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের রানী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈ, পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিবপ্রতিষ্ঠার অসুবিধা দেখে, এখান থেকে খানিক দূরে একটি নূতন মন্দির গড়িয়ে সেখানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত সেবা-পূজোর ব্যবস্থা করেন। বাইরের ধাক্কা প্রভৃতি থেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের তলায় একটি গুহায় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা হয়। অদ্যাপি সেখানে নিয়মিত সেবাপূজো চলে আসছে। এই মন্দিরের অভ্যন্তরের জমাট আধ্যাত্মিক ভাব যাত্রী মাত্রেরই মনে গভীর রেখাপাত করে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বরোদার গাইকোয়াড়ের তত্ত্বাবধানে সমগ্র সৌরাষ্ট্রদেশ চলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে 'ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে' দিল্লী-রাজশালা স্তব্ধ ও মোগল-মহিমার শ্মশানশয্যা হয়ে গেছে এবং 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' রূপায়িত হয়ে ভারতের সর্বত্রই অধিকার বিস্তার করতে থাকে। মারাঠা ও রাজপুত রাজারাও আস্তে আস্তে বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করে কালে পূর্ব গৌরবের কঙ্কালে পরিণত হল।

মহাকালের খেলা চলতে থাকে। তারই অপ্রতিহত প্রভাবে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে দোর্দণ্ড প্রতাপী বৃটিশরাজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হয়। (আগষ্ট ১৫, ১৯৪৭)

ভারতের লৌহ-মানব সর্দার প্যাটেল কথা বলেন কম, কিন্তু কাজ করেন তার শতগুণ। তাঁরই অদম্য উৎসাহে সেই পুরাতন ভগ্নস্তূপের মধ্যে আবার সোমনাথের মন্দির সম্পূর্ণ নূতন করে নির্মিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে নওয়ানগরের জামসাহেব এর ভিত্তি স্থাপন করেন। সম্বৎসরের মধ্যে আরব্ধ কাজ সমাধা হয় এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নূতন মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

সোমনাথ বা প্রভাসপত্তনের কথা অতি সংক্ষেপেই বলা হল। এই সামান্য প্রবন্ধের মধ্যে এর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। ভারতের উপাস্য দেবতা 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। কার সাধ্য ভারত-ভারতীর এই প্রাণের দেবতাকে তার অন্তর থেকে তাড়াবে? তিনি যে 'সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে'। ধর্মপ্রাণ ভারত-বাসীর ইষ্টনিষ্ঠার এটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। যতকাল ভারতবর্ষ থাকবে, ততকাল এখানে শিবের ডমরু, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ও মা কালীর পাঠা চলবেই। এই আপ্তবাণী ত বাজে কথা নয়।

মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিবের রাতুল চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম। তাঁর ললাটস্থ চন্দ্রের প্রভায় সকলের হৃদয়-মন্দির আলোকিত হোক। সকলের শুভ হোক, সকলে মানুষ হোক, এই প্রার্থনা :

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥
সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতি রম্যে
জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে॥

—খেলার গোলক অসাবধানতাবশতঃ যদি সোপানশ্রেণীর সর্বোচ্চ সোপানেও পতিত হয়, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে নামিতে থাকে। এইভাবে চিত্তও যদি ব্রহ্মচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও বহির্মুখ হয়—বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন হয়—তাহা হইলে উহা ক্রমান্বয়ে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইয়া উহাতেই আসক্ত হয়।

জীবনের এই মৌন সন্ধিক্ষণে ইহারা আমার চক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। ইহারাও আজ আমার শিক্ষাগুরু। আমি ইহাদের নিকট হইতে যে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিয়াছি ও সাবধানবাণী শ্রবণ করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রকৃত পাথেয় হইয়া থাকিবে। "রথ্যায়াং বহুবস্ত্রানি ভিক্ষা সর্বত্র লভ্যতে। ভূমিঃ শয্যাস্তি বিস্তীর্ণা যতয়ঃ কেন দুঃখিতাঃ।"—রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র ছিন্ন বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাধুকরী ভিক্ষাও এই বিরাট সংসারে সহজলভ্য। এই বিশাল শ্যামলা ধরণী তাহার স্নেহাঞ্চল বিছাইয়া আমার সুখশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। জীবন-নির্বাহের এই বিপুল সমারোহ থাকিতে প্রকৃত সন্ন্যাসীর তো দুঃখিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তাই আমি এই নট-নটীর অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমার ছিন্ন কন্থাটি তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়াছি। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"—ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ সত্যই বলিয়াছেন,—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায় এই ত্যাগের পথ দুর্গম ও বিপজ্জনক; কিঞ্চিন্মাত্র অসতর্ক ও অসাবধান হইলে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। জয় হউক মহারাজ, শ্রীভগবান আপনার অশেষ কল্যাণ করুন।—এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্তে রাজসভা পশ্চাতে রাখিয়া চিরতরে অদৃশ্য হইলেন। সন্ন্যাসী-কেশরী স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে এই সমুন্নত আদর্শেরই প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "The Song of the Sannyasin" (সন্ন্যাসীর গীতি) কাব্যে লিখিয়াছেন—

> "সুখতরে গৃহ ক'রো না নির্মাণ,
> কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান?
> গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
> শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস;
> দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
> সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও;
> হউক কুৎসিত কিংবা সুবন্ধিত,
> ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
> শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
> কোন্ খাদ্য পেয় অপবিত্র করে?
> হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মত,
> স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
> উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
> গাও গাও গাও সদা এই গান—
> ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥" ১১॥

অতঃপর নৃপতি রাজকুমার ও মন্ত্রীকন্যাকে তাহাদের মূল্যবান রত্নালঙ্কার নট-নটীদ্বয়কে পুরস্কার দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার বলিতে লাগিলেন—পিতঃ, হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে,—"ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা।" "...যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধানানুসারে মন্দাধিকারী সাধারণ জনগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে এবং প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যবান উচ্চাধিকারী

ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রবিধান অন্যপ্রকার। যখনই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখনই সে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ—যে কোন অবস্থা হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। মহারাজ! আপনার বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণের সময় অনেক পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। আমিও যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছি। অথচ আপনি কার্পণ্যবশতঃ ও ক্ষমতালিপ্সায় আত্মহারা হইয়া এখন পর্যন্ত আমার উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ না করিয়া রাজকার্যেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, আপনার নিকট মন্ত্রী-দুহিতার সঙ্গে আমার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায় নানাভাবে ব্যক্ত করা সত্ত্বেও আপনার নিকট হইতে এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সম্মতিসূচক কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই নাই। ইহা যে কিরূপ মর্ম-পীড়াদায়ক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মন্ত্রীমহাশয়ও আপনার মত একজন কৃপণ নৃপতির পুত্রের হস্তে তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি এবং মন্ত্রী-কন্যা উভয়ে আপনাদের দুজনকেই আজ গভীর নিশিতে গোপনে হত্যা করিয়া রাজ্যের শাসন-দণ্ড ধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান দুর্লঙ্ঘনীয়। নট-নটীর গানের শেষ পঙ্‌ক্তিটি "তাল ভঙ্গ ন পায়"—আজ গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া আমাদের কর্ণে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, আপনারা উভয়েই কালের স্বাভাবিক গতিতেই অল্পদিনের মধ্যেই এই সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন। এই মহাসত্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহারা আমাদের উভয়কেই এক মহাপাতক হইতে রক্ষা করিয়াছে। আপনাদিগকে হত্যা করিয়া রাজা-রানী হইবার দুরভিসন্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ইহারা আমাদের যে উপকার সাধন করিয়াছে, তাহার তুলনায় এই পার্থিব স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও রত্নহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ। গভীর কৃতজ্ঞতাবশতই পুরস্কারস্বরূপ উহা তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছি।

বৃদ্ধ নৃপতি ও বৃদ্ধ মন্ত্রী নিবিষ্টমনে রাজ-কুমারের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্পণ্য, হঠকারিতা, স্বার্থপরতা, ভোগলিপ্সা ও ক্ষমতা-প্রিয়তার যে কি বিষময় পরিণাম হইতে পারে তাহা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন। ইহাও এতদিনে বুঝিতে পারিলেন যে, ভোগের দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয় না! শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে —"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥" —বিষয়-ভোগের দ্বারা ভোগের আকাঙ্ক্ষা কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা দিন দিনই বর্ধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভোগের মধ্যে শান্তির সন্ধান কোনদিনেই মিলিবে না—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—একমাত্র ত্যাগেই অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব। ভর্তৃহরিও তাহার বৈরাগ্যশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং
বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং
রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং
কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং
বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥ ৩১॥

—ভোগে রোগভয়, সৎকুলের গৌরবে কুল-ভঙ্গের ভয়, সম্পত্তিতে রাজ্যলোলুপ নৃপতি হইতে ভয়, মানে অপমানের ভয়, বলে শত্রুর ভয়, রূপে বৃদ্ধত্বের ভয়, শাস্ত্রে পরাজয়ের ভয়, সদ্গুণে খলব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভয়, শরীরধারণে

মৃত্যুভয় বিদ্যমান। সংসারে বস্তুমাত্রেই ভয়ের কারণ নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র বিষয়ভোগ-বৈরাগ্য দ্বারাই নির্ভয় হওয়া সম্ভব।

বৃদ্ধ নৃপতি ও বৃদ্ধ মন্ত্রী আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজকুমারের সঙ্গে মন্ত্রীকন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাহাদের উভয়কে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিবার মানসে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক বনে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই আখ্যায়িকাটি বিভিন্ন লেখকের লেখনীমুখে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইলেও ইহার মাধ্যমে ভারতের সনাতন আদর্শের যে সমুজ্জ্বল আলেখ্য সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোথাও কোন মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয় না। এই সর্পিল বন্ধুর ও পিচ্ছিল সংসারপথে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীকে কি তালে, কি ছন্দে পদক্ষেপ করিতে হইবে তাহা এই বহুপ্রচলিত "তাল ভঙ্গ ন পায়" কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা অনস্বীকার্য যে, আবহমানকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের যে সাংস্কৃতিক ধারা নির্বাধ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এবম্বিধ প্রচলিত বিভিন্ন কথিকা উহারই পরিপুষ্টি সাধনপূর্বক মনুষ্যসমাজে সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। পরমকারুণিক শ্রীভগবান আমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করুন এবং প্রকৃত আলোকের সন্ধান দিয়া আমাদের জীবন ধন্য করুন,—ইহাই তাঁহার রাতুল চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি॥"
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—হে প্রভো, অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, অজ্ঞান অন্ধকার হইতে জ্ঞানের জ্যোতিতে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান কর। ওহে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের হৃদয়ে জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হও। শান্তিময় হউক আমাদের জীবন।

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন্ দূর জন্মলগ্নে, হে চির-সুন্দর,
জ্বেলে দিলে তুমি মোর মর্মের ভিতর
সৌন্দর্য-পিপাসা! বহ্নিশিখা অমরার।
নগরীর পাষাণের মরু-সাহারার
বক্ষে তাই চিত্ত মম কেঁদেছে কেবলই।
তাই পল্লী-জননীর অঙ্কে এনু চলি
যেখানে আকাশ নীল, প্রান্তর শ্যামল,
যেখানে শিশির ভেজা ঘাসে ঝলমল
করে কোটী কোহিনূর অরুণ-কিরণে!
যেখানে ফসলে সোনা, মধু সমীরণে।
পাখীদের কাকলিতে অরণ্য মুখর।
কানে আসে সারাবেলা তরুর মর্মর।
হে সুন্দর, দৈন্য দিলে ঐশ্বর্যে ভরিয়া।
বিত্তে কভু তৃপ্ত নয় মানবের হিয়া!

শ্রীসোমনাথ

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সোমনাথ একটি বিরাট বিস্ময়। পশ্চিম সমুদ্রকূলে অবস্থিত প্রভাসপত্তনের এই শিবস্থান যে কত প্রাচীন, তা নির্ণয় করা একরকম অসাধ্য। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত পবিত্রিলা এই দেশ"—এই 'পুরাতন পুরুষের' মতই এই প্রভাসক্ষেত্র সুপ্রাচীন, আর এই মহাতীর্থ সোমনাথও তত প্রাচীন।

পুরাণাদি প্রাচীন সাহিত্য পাঠে জানা যায়, দক্ষ-শাপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত ভগবান চন্দ্র এখানেই শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে শাপমুক্ত হয়ে নিজ প্রভা ফিরে পেয়েছিলেন, এই জন্যই ক্ষেত্রের নাম 'প্রভাস'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার অবসান এইখানেই, যদুকুলও আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে এখানেই শেষ হয়ে যায়। অদ্যাপি সেইসব পুরাতন স্থান ও স্মৃতি বিদ্যমান।

সরস্বতী, হিরণ্য ও কপিলা—এই তিনটি পুণ্যনদী এখানেই সাগরে মিশেছেন, এইজন্যও এই ক্ষেত্র মহাপবিত্র। মহাভারতে এই প্রভাস তীর্থের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতের এই পশ্চিম উপকূল, প্রাচীন Venice-এর মত এক সময় ভারত ও ভারতেতর দেশের মধ্যে জলপথে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, বর্তমান বোম্বে বা কলকাতা বন্দর অপেক্ষা এর ঐশ্বর্য কোনও অংশেই কম ছিল না।

ভারতবাসীর মর্মকথা: 'সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল', তাই চিরকালই এদেশের নরনারী শ্রীভগবানের তৃপ্তির জন্য ধনসম্পদ ত বটেই, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

ভারতবর্ষের আরাধ্য দেবতা 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। তাই ভারতবর্ষময় অসংখ্য শিবমন্দির, আর নিয়ত কোটি কণ্ঠে "হর, হর, বম্, বম্।" বৈদিক যুগেরও আগে থেকে এই শিবের পুজো ও আরাধনা যে চলে আসছে, মহেন্‌জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেব সোমনাথের উপাসনা যে কবে থেকে সুরু হয়েছিল, বলা প্রায় অসম্ভব। এখানকার মন্দিরের ঐশ্বর্যের ও সম্পদের কথা লোকের মুখে মুখে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে রেডিও বা সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারবিভাগ ছিল না। সুতরাং এ প্রচারে যে কত যুগ লেগেছিল তা কে জানে?

'রাক্ষসীর প্রাণপাখী' 'মরিয়া না মরে'। ধনলুব্ধ বিদেশীদের বর্বরতায় অনেকবার এই মন্দির ধ্বংস হলেও অচিরকালের মধ্যেই আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'শ্মশানেষ্বাক্রীড়া' শিব শ্মশান ভালবাসেন বলেই, তাঁর অচিন্ত্য ও অব্যক্ত লীলার যজ্ঞে এই ধ্বংস, আবার 'ললাটস্থচন্দ্রাদ্গলিত-সুধয়া' নূতন সৃষ্টি! জয় মহাদেব শম্ভো! 'ভাঙ্গাগড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর!'

এই প্রভাসে কবে যে প্রথম শ্রীসোমনাথের মন্দির নির্মিত হয় তা বলা শক্ত। তবে নানান সাহিত্যিক প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নাসিক ও কার্লে শিলালেখে সিথিযান্ নাহাপন কর্তৃক প্রভাসে শিবের আরাধনার উল্লেখ আছে।

অবশ্য এ বিষয়ে গুপ্তযুগের কোন শিলালেখ পাওয়া যায়নি।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে (৪৭০ খৃঃ) সৌরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও বল্লভীতে হয় তার রাজধানী। বল্লভী রাজারা প্রায় সকলেই শিবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁদের রাজ্যকালে এ-স্থানের প্রভূত উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বদাই যে বিদেশীর আক্রমণেই মন্দির ধ্বংস হয়েছে, একথাও জোর করে বলা না। সমুদ্রের নোনা আবহাওয়া ও প্রাচীনত্ব এর জন্য দায়ী, একথাও অবশ্য অনুমান করা অসঙ্গত নয়। খুব সম্ভব এই কারণেই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির জীর্ণ হওয়ার ফলে খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতকে তৃতীয় মন্দির নির্মিত হয়। তখন থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সোমনাথ মহাদেব খুবই প্রকট। কিংবদন্তী যদি বিশ্বাস করতে হয়, প্রত্যহ গঙ্গোত্রীর জলে মহাদেবের অভিষেক হত এবং ভক্তিমান মানুষেরাই সে জল কাঁধে করে বয়ে আনতেন।

ইতিমধ্যে আরবদেশে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব (৫৭০) খৃঃ। তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্ম দুর্ধর্ষ আরবগণকে এক করে নববলে বলীয়ান করে তোলে। মহম্মদের দেহান্তের (৬৩২ খৃঃ) একশ বছরের মধ্যেই মক্কা থেকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আরব শক্তির পদানত হয়।

ভারতবর্ষের ধনসম্পত্তিও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে (৭১১ খৃঃ) আরবীয়দের প্রথম ভারত অভিযান হলেও এদেশে রাজ্যস্থাপন করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল (১১৯২ খৃঃ)।

গজনীর সুলতান মামুদ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন। মুসলমান লেখকদের মতে হিন্দুরা খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং বহুকালের দেবমন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। হিন্দুরা এই অবমাননার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেন এবং মামুদকে অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এমন কি লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তিও বিশেষ কিছু গজনী অবধি পৌছায়নি।

এইভাবে মন্দির ধ্বংস হলেও অনহিলওয়ারার চালুক্য রাজারা এই মন্দির আবার নির্মাণ করেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার ঐতিহাসিক জয়নুল আকবর লিখেছেন: 'হিন্দুস্থানের সমুদ্রতীরে একটি বিরাট শহর আছে। তাহার নাম সোমনাথ। মুসলমানের মক্কার মতই এই স্থান হিন্দুদের পরম পুণ্যক্ষেত্র।'

দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১১৪ খৃঃ) ভব বৃহস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ শৈব সাধুর বিশেষ আগ্রহে সম্রাট কুমার পাল এই মন্দির সম্পূর্ণ নূতন ছাচে ঢেলে তৈরী করান। এটি দেখতে যেন কৈলাস-শিখরের মতন। তাই এর নূতন নাম হয় 'মেরু পাসাদ'। বলতে গেলে শুধু মন্দির নয়, সম্পূর্ণ শহরটি সম্রাটের চেষ্টায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৯৬) আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লীর সম্রাট হবার পরেই গুজরাটের দিকে অভিযান করেন। তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মন্দির ধ্বংস ত হয়ই, তার ভগ্নাংশগুলিরও অনেক দিল্লী চলে যায়। এর কিছু পরেই জুনাগড়ের রাজা মহীপাল চূড়সম মন্দির মেরামত করেন এবং তাঁর ছেলে নগর আবার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্য কাল ১৩২৫-৫১ খৃঃ।

১৪৬৯ খৃঃ মাহ্‌মুদ বেগ মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ সরিয়ে এটিকে একটি মসজিদে পরিণত করলেও এ প্রচেষ্টা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি মন্দির আবার নূতন করে মাথা তোলে।

সম্রাট আকবরের সময়ে জুনাগড় দুর্গ মোগল অধিকারে আসে (১৫৭৭ খৃঃ)। কিন্তু এ সময়ে সোমনাথ মন্দিরে কোন উপদ্রব হয়নি। অবশ্য এই সময় থেকে সুরাট বন্দরের ক্রমোন্নতি, ফলে প্রভাসের গরিমা ক্রমশঃ কমতে থাকে। ঔরঙ্গজেবের আমলে (১৬৬৯ খৃ°) গুজরাটের মোগল সুবেদারকে এই মন্দির ধ্বংস করার হুকুম দেওয়া হলেও এটি কাজে পরিণত হয়নি। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং অভিযান চালান এবং সোমনাথ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের রানী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈ, পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিবপ্রতিষ্ঠার অসুবিধা দেখে, এখান থেকে খানিক দূরে একটি নূতন মন্দির গড়িয়ে সেখানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত সেবা-পূজোর ব্যবস্থা করেন। বাইরের ধাক্কা প্রভৃতি থেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের তলায় একটি গুহায় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা হয়। অদ্যাপি সেখানে নিয়মিত সেবাপূজো চলে আসছে। এই মন্দিরের অভ্যন্তরের জমাট আধ্যাত্মিক ভাব যাত্রী মাত্রেরই মনে গভীর রেখাপাত করে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বরোদার গাইকোয়াড়ের তত্ত্বাবধানে সমগ্র সৌরাষ্ট্রদেশ চলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে 'ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে' দিল্লী-রাজশালা স্তব্ধ ও মোগল-মহিমার শ্মশানশয্যা হয়ে গেছে এবং 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' রূপায়িত হয়ে ভারতের সর্বত্রই অধিকার বিস্তার করতে থাকে। মারাঠা ও রাজপুত রাজারাও আস্তে আস্তে বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করে কালে পূর্ব গৌরবের কঙ্কালে পরিণত হল।

মহাকালের খেলা চলতে থাকে। তারই অপ্রতিহত প্রভাবে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে দোর্দণ্ড প্রতাপী বৃটিশরাজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হয়। (আগষ্ট ১৫, ১৯৪৭)

ভারতের লৌহ-মানব সর্দার প্যাটেল কথা বলেন কম, কিন্তু কাজ করেন তার শতগুণ। তাঁরই অদম্য উৎসাহে, সেই পুরাতন ভগ্নস্তূপের মধ্যে আবার সোমনাথের মন্দির সম্পূর্ণ নূতন করে নির্মিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে নওয়ানগরের জামসাহেব এর ভিত্তি স্থাপন করেন। সম্বৎসরের মধ্যে আরব্ধ কাজ সমাধা হয় এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নূতন মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

সোমনাথ বা প্রভাসপত্তনের কথা অতি সংক্ষেপেই বলা হল। এই সামান্য প্রবন্ধের মধ্যে এর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। ভারতের উপাস্য দেবতা 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। কার সাধ্য ভারত-ভারতীর এই প্রাণের দেবতাকে তার অন্তর থেকে তাড়াবে ? তিনি যে 'সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে'। ধর্মপ্রাণ ভারত-বাসীর ইষ্টনিষ্ঠার এটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। যতকাল ভারতবর্ষ থাকবে, ততকাল এখানে শিবের ডমরু, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ও মা কালীর পাঁঠা চলবেই। এই আপ্তবাণী ত বাজে কথা নয়।

মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিবের রাতুল চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম। তাঁর ললাটস্থ চন্দ্রের প্রভায় সকলের হৃদয়-মন্দির আলোকিত হোক। সকলের শুভ হোক, সকলে মানুষ হোক, এই প্রার্থনা :

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ ॥
সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতি রম্যে
জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(বলরামবাবুকে লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বৃন্দাবনধাম

(১৪ই ফাল্গুন, ১২৯৬)

নমস্কারনিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার পোষ্টকার্ড ও পত্র যথাসময়ে পাইয়া বিস্তারিত সকল অবগত হইলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বোধ হয় এতদিন কলিকাতায় আসিয়া পোঁছাইয়াছেন। যদ্যপি আসিয়া থাকেন, আমার সংখ্যাতীত প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন। সুরেশবাবুর উদরের পীড়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম; শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন সত্বর তিনি আরোগ্য হইয়া যান। হৃষীকেশে উপস্থিত সকলে ভাল আছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। নরেন কি এখন কিছুদিন গাজিপুরে থাকিবেক? পাহাড়ীবাবাকে তাহার উত্তম বোধ হইয়াছে; তিনি উত্তম লোক, আমাদের পূর্বে শুনা ছিল। নরেনের সহিত কিরূপ কথাবার্তা হয়, যদ্যপি কিছু শুনিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। সুবোধ (খোকা) রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিয়া সত্বর পদব্রজে হরিদ্বার যাইবে, এইরূপ বলিতেছে। আমি হাঁটিয়া বোধ হয় এত পথ যাইতে পারিব না, সুতরাং এবার যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব এবার দক্ষিণেশ্বরে কি প্রকার হইল, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। এখানে এবার এ পর্যন্ত বৃষ্টি নাই, শীত খুব কম পড়িয়াছে। এখানে ২৪ প্রহরির ধুম মধ্যে মধ্যে খুব দেখা যাইতেছে। কীর্তনাদি খুব হইয়া থাকে। নিত্যানন্দ-বংশের একটী, তাঁহার নাম নিমাইচরণ গোস্বামী, এখানে আসিয়া আছেন। তাঁহার কীর্তনাদি প্রায় এখানে হইয়া থাকে, লোকটি অত্যন্ত প্রেমিক ও উত্তম কীর্তন করিতে পারেন। তাঁহার সহিত আলাপে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী এখানে প্রায় ২।৩ মাস আসিয়া আছেন। তিনি গোপীনাথের বাগের মধ্যে থাকেন। এস্থান তাঁহার বড় উত্তম বোধ হইতেছে। এখানকার ভাবে এবার তিনি খুব মিশিয়াছেন, তিলক-মালা ধারণ করিয়াছেন ও বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে সর্বদা কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে মধ্যে ২ প্রায় দেখা হয়; তাঁহার এখন কিছুকাল বৃন্দাবনধামে বাস করিবার ইচ্ছা—এইরূপ বলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজীর সঙ্গে প্রায় দেখা হয়, তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত সুখ বোধ হয়। তিনি শারীরিক ভাল আছেন।

হরমোহনের যদ্যপি ছোট edition গীতা ছাপান হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া ২।১ খানি পাঠাইয়া দিবেন ও বরাহনগর মঠ হইতে একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা (জপের জন্য) লইয়া সুবিধামতন পাঠাইয়া দিবেন। আপনাদের আত্মীয় ৺নবীনবাবুর কন্যা ও তাঁহার পুত্র এখানে সত্বর আসিবেন। তাঁহারা সংবাদ দিয়াছেন। যদি সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা হইলে সেই সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।

বাবুরামের শরীর যদ্যপি অসুস্থ থাকে তাহা হইলে পশ্চিমে যাইবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হইতেছে? তাহাকে এখন পশ্চিমে আসিতে নিষেধ করিবেন। তবে যদ্যপি আপনার সহিত আসে তাহা হইলে ভাল, নচেৎ অসুস্থাবস্থায় একাকী কষ্ট পাইবে, কারণ তাহার শরীর বড় মজবুত নহে।

এখানকার শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা উত্তমরূপে চলিতেছে। কামদার ব্রজমোহন ঠাকুর বড় উত্তম লোক। বাস্তবিক এরূপ লোক এখানে থাকার উপযুক্ত। কাহাকেও উচ্চ কথা বলেন না, সকলে তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট। আমি যতদূর দেখিতেছি, খুব উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে, সর্বদা ঠাকুরসেবা ইত্যাদি কার্যে নজর রাখিয়া থাকেন।

আপনার পত্রের ভাবে বোধ হইল যে আপনার এখন এখানে আসার কিছু ঠিক নাই। যাহা আপনার পক্ষে সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা করিবেন। শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শরীর আরোগ্য হইয়া গেলেই উত্তম।

আপনি কেমন থাকেন মধ্যে ২ পত্র দিবেন। বরাহনগরে সকলকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন। শ্রীযুত গিরিশবাবু, অতুলবাবু, সুরেশবাবু, মাষ্টার মহাশয় ও চুনীবাবুকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ফকির কি এবার পরীক্ষা দিয়াছে? উপস্থিত একপ্রকার সকল মঙ্গল। ইতি নিবেদন—তারিখ ১৪ই ফাল্গুন।

নিঃ শ্রীরাখাল

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(বলরামবাবুকে লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বৃন্দাবনধাম

(১৪ই ফাল্গুন, ১২৯৬)

নমস্কারনিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার পোষ্টকার্ড ও পত্র যথাসময়ে পাইয়া বিস্তারিত সকল অবগত হইলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বোধ হয় এতদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। যদ্যপি আসিয়া থাকেন, আমার সংখ্যাতীত প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন। সুরেশবাবুর উদরের পীড়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম, শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন সত্বর তিনি আরোগ্য হইয়া যান। হৃষীকেশে উপস্থিত সকলে ভাল আছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। নরেন কি এখন কিছুদিন গাজিপুরে থাকিবেক? পাওহারীবাবাকে তাহার উত্তম বোধ হইয়াছে; তিনি উত্তম লোক, আমাদের পূর্বে শুনা ছিল। নরেনের সহিত কিরূপ কথাবার্তা হয়, যদ্যপি কিছু শুনিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। সুবোধ (খোকা) রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিয়া সত্বর পদব্রজে হরিদ্বার যাইবে, এইরূপ বলিতেছে। আমি হাঁটিয়া বোধ হয় এত পথ যাইতে পারিব না, সুতরাং এবার যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব এবার দক্ষিণেশ্বরে কি প্রকার হইল, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। এখানে এবার এ পর্যন্ত বৃষ্টি নাই, শীত খুব কম পড়িয়াছে। এখানে ২৪ প্রহরির ধুম মধ্যে মধ্যে খুব দেখা যাইতেছে। কীর্তনাদি খুব হইয়া থাকে। নিত্যানন্দ-বংশের একটী, তাঁহার নাম নিমাইচরণ গোস্বামী, এখানে আসিয়া আছেন। তাঁহার কীর্তনাদি প্রায় এখানে হইয়া থাকে, লোকটি অত্যন্ত প্রেমিক ও উত্তম কীর্তন করিতে পারেন। তাঁহার সহিত আলাপে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী এখানে প্রায় ২।৩ মাস আসিয়া আছেন। তিনি গোপীনাথের বাগের মধ্যে থাকেন। এস্থান তাঁহার বড উত্তম বোধ হইতেছে। এখানকার ভাবে এবার তিনি খুব মিশিয়াছেন, তিলক-মালা ধারণ করিয়াছেন ও বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে সর্বদা কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে মধ্যে ২ প্রায় দেখা হয়; তাঁহার এখন কিছুকাল বৃন্দাবনধামে বাস করিবার ইচ্ছা—এইরূপ বলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজীর সঙ্গে প্রায় দেখা হয়; তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত সুখ বোধ হয়। তিনি শারীরিক ভাল আছেন।

হরমোহনের যদ্যপি ছোট edition গীতা ছাপান হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া ২।১ খানি পাঠাইয়া দিবেন ও বরাহনগর মঠ হইতে একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা (জপের জন্য) লইয়া সুবিধামতন পাঠাইয়া দিবেন। আপনাদের আত্মীয় ৺নবীনবাবুর কন্যা ও তাঁহার পুত্র এখানে সম্ভব আসিবেন। তাঁহারা সংবাদ দিয়াছেন। যদি সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা হইলে সেই সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।

বাবুরামের শরীর যদ্যপি অসুস্থ থাকে তাহা হইলে পশ্চিমে যাইবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হইতেছে ? তাহাকে এখন পশ্চিমে আসিতে নিষেধ করিবেন। তবে যদ্যপি আপনার সহিত আসে তাহা হইলে ভাল, নচেৎ অসুস্থাবস্থায় একাকী কষ্ট পাইবে, কারণ তাহার শরীর বড় মজবুত নহে।

এখানকার শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা উত্তমরূপে চলিতেছে। কামদার ব্রজ-মোহন ঠাকুর বড় উত্তম লোক। বাস্তবিক এরূপ লোক এখানে থাকার উপযুক্ত। কাহাকেও উচ্চ কথা বলেন না, সকলে তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট। আমি যতদূর দেখিতেছি, খুব উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে ; সর্বদা ঠাকুরসেবা ইত্যাদি কার্যে নজর রাখিয়া থাকেন।

আপনার পত্রের ভাবে বোধ হইল যে আপনার এখন এখানে আসার কিছু ঠিক নাই। যাহা আপনার পক্ষে সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা করিবেন। শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শরীর আরোগ্য হইয়া গেলেই উত্তম।

আপনি কেমন থাকেন মধ্যে ২ পত্র দিবেন। বরাহনগরে সকলকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন। শ্রীযুত গিরিশবাবু, অতুলবাবু, সুরেশবাবু, মাষ্টার মহাশয় ও চুনীবাবুকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ফকির কি এবার পরীক্ষা দিয়াছে ? উপস্থিত একপ্রকার সকল মঙ্গল। ইতি নিবেদন—তারিখ ১৪ই ফাল্গুন।

নিঃ শ্রীরাখাল

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় স্বামীজী

ব্রহ্মচারিণী ঊষা

[অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(পূর্বানুবৃত্তি)

[স্বামীজীর দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় অবস্থানকালে যারা তাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যাদের তিনি তাঁর কাজের সহায়করূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং যাদের জীবন তিনি রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন, এরূপ তিনজনকে নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তন্মধ্যে শান্তি একজন। তারপর ছিল সিস্টার ···]

আর একজন ছিল জো। সে অবশ্য লসএঞ্জেলেসে আসার বহু পূর্ব থেকেই স্বামীজীকে জানত। কিন্তু তার নাম এখানে উল্লেখ করার কারণ দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার সঙ্গে তার সংস্রব ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে স্বামীজী ওকল্যাণ্ডে চলে যাবার পরেও শেষ হয় নাই। পরবর্তী সময়ে সে প্রায়ই হলিউড বেদান্ত-সমিতিতে আসত। এই সব সময়ে তার আলাপের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল স্বামীজী। সে প্রায়ই বলত যে, সে নিজেকে স্বামীজীর শিষ্য ব'লে ভাবে না। সে বলত, 'আমি তাঁর বন্ধু' আর বলত, 'তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি আর পূর্বের মানুষ ছিলাম না।' রামকৃষ্ণ মঠের প্রগতি এবং মিশনের কাজের সঙ্গে জো সম্পূর্ণ অভিন্নভাবে মিশে গিয়েছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর জো বহুবার ভারতে গিয়েছিল। অন্যদিকে, তার সাহায্যে স্বামীজীর বহু লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের শিষ্যদের জন্য বেলুড় মঠে একটি অতিথিশালা প্রস্তুত হয়েছিল। শেষবার যখন জো বেদান্ত-সমিতির হলিউড কেন্দ্রে ফিরে আসে তখন সে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের হেমন্ত-কালে, সিস্টারের মৃত্যুর তিন মাস পরে, বেদান্ত-সমিতির হলিউড কেন্দ্রে সে দেহত্যাগ করে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছুকাল পরে বেলুড় মঠের অতিথিশালা থেকে জো একটি তারিখশূন্য অসম্পূর্ণ পত্র লেখে; তার টাইপ-করা প্রতিলিপি আছে; এতে সে স্বহস্তে লিখে ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছে যে এটি যেন রক্ষিত হয়। এই পত্রে জো তার জীবনের উপর স্বামীজীর প্রভাব বর্ণনা করেছে :

"স্বামীজীর যে গুণটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর সীমাহীনতা, আমি কখনও তার তল বা ঊর্ধ্ব বা পার্শ্বদেশ স্পর্শ করতে সক্ষম হই নাই। আমার মনে হয় নিবেদিতারও আকর্ষণের কারণ এইটাই—তাঁর বিস্ময়কর বিস্তৃতি। আহা, এরূপ প্রকৃতি মানুষকে কী মুক্তস্বভাবই না করে তোলে! (এরূপ প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে) নিজের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, আসলে সেইটাই হল সব, তাই নয় কি? যা পাওয়ার, এ থেকেই তা পাওয়া যায়।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, চরম সত্যকে আমি স্থিরবিশ্বাসে নিশ্চিত ভাবে আঁকড়ে ধরতে পেরেছি কি না। হাঁ, পাকা করেই ধরেছি। মনে হয় উহা আমার সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিশে গেছে। স্বামীজীর মধ্যে যে সত্য প্রত্যক্ষ করেছি, তাই আমাকে মুক্তি দিয়েছে। লোকের দোষকে কত তুচ্ছ জিনিস বলে মনে হয়—ক্রীড়া-

ক্ষেত্র রূপে সামনে যখন সত্যের পারাবার বিস্তৃত রয়েছে, ওসব তুচ্ছ কথা আর মনে করা কেন? স্বামীজী আমাকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন; নিবেদিতাকে তিনি যেমন ত্যাগ দিয়েছিলেন, মিসেস এস.-কে যেমন একত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি আমাকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা; এ সবই ছিল তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের অংশবিশেষ। ভারতের আধ্যাত্মিক উপহার হিসাবে তাঁর মহত্ত্ব কিন্তু ত্যাগের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, তাই ভারতীয় এবং ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ (নিবেদিতা) কর্মীরা বলত, "দিবারাত্র আমার কর্ণকুহরে কেবলমাত্র একটি কথাকেই অনুরণিত হতে শুনতে পাচ্ছি—'ত্যাগের কথা স্মরণ রেখো'।"·· আমার ত্যাগ নেই, কিন্তু স্বাধীনতা আছে। ভারতকে উন্নত হতে দেখা ও উন্নতির পথে তাকে সহায়তা করার স্বাধীনতা আমার আছে—সেইটাই আমার কাজ, এবং সে কাজটি আমি কত ভালবাসি! জলন্ত পাবকতুল্য আদর্শবাদীদের নিয়ে গঠিত এই সঙ্ঘটি গাছপালা পুড়িয়ে 'জীবন'-নামক অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসার নতুন নতুন পথ প্রস্তুত করছে—এসব দেখতে (কত ভালবাসি আমি!)·· ।

স্বামীজী হচ্ছেন আমাদের একটি সুদৃঢ় শৈলসদৃশ আশ্রয় এটা আমি অনুভব করি। আমার জীবনে এই প্রয়োজনই তিনি সিদ্ধ করেছেন—পূজা নয়, গৌরব নয়, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সময় পায়ের নীচে অবলম্বন-ভূমির অটলতা! যাক, শেষ পর্যন্ত আমি স্বাধীন হয়েছি। মুক্তির বোধ মনে কী বিস্ময়ই না জাগায়!—আমার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজন এখন আর পাশ্চাত্যে নেই, আছে ভারতে। অতিথিশালায় উপরের দুখানি নতুন ঘর নিয়ে এই বিশাল নদীতীরের নিস্তব্ধতায় স্থানের প্রাচুর্য ও বিপুল বিলাসিতার মধ্যে বাস করছি। কোথাও এত বিলাসিতার কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। জায়গা প্রচুর রয়েছে—কোন আসবাব নেই যার যত্ন নিতে হবে, একরাশ কম্বল, ছবি, ডিস—এসব নেই, আছে শুধু এক সেট চায়ের সরঞ্জাম। জিনিসপত্রের সে ঠোকা-ঠুকি চলে গেছে। কাজ করবার মত, যত্ন নেবার মত কিছুই আর নেই—সবই হাওয়ায় মিলে গেছে। তবু আমি একা নই। (ওটা আমি সহ্যই করতে পারি না)। দেহত্যাগ না করেও স্বর্গের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমি দেখছি—আর এসব কেনই বা? এটাই আশ্চর্য।

'সামান্য বুদ্ধি দিয়ে আমাদের বোকা বানিয়ে রাখা হচ্ছে, কিন্তু এবারে আর আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখতে পাবে না। বুদ্ধির সীমানার ওপারের দু-একটি জিনিস আমি খুঁজে পেয়েছি—তা হচ্ছে প্রেম'—একথা স্বামীজী মিসেস লেগেটকে লিখেছিলেন, তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল হোক।"

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুআরি মাসে যেদিন স্বামীজী মীডদের গৃহ ত্যাগ করে উত্তর ক্যালিফর্ণিয়ায় যান, সেদিন তিনি সিস্টারের অগ্নিকুণ্ডের কাছে তাকের উপর তাঁর পাইপটি রেখে বলেছিলেন, 'এই গৃহ এই অবস্থায় থাকবে না।' ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত-সমিতির একজন সভ্যের বদান্যতায় সম্পত্তিটি উক্ত সমিতির অধিকারভুক্ত হয়েছে। পরবর্তী বৎসরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী মাধবানন্দ (১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সংঘাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন) এবং স্বামী নির্বাণানন্দ—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই দুইজন ট্রাষ্টীর উপস্থিতিতে গৃহটিকে একটি মন্দিররূপে উৎসর্গ করা হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বাড়ীটির বহির্ভাগ যে কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, তা শতাব্দীর পরিবর্তনকালে যে ছবি তোলা হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়। মেজে ও ভিতরের ছাদ মোটামুটি একই রকম আছে। ভিতরটা স্বামীজীর সমকালীন শেষদিকের ভিক্টোরিয়ান পদ্ধতিতে পুনরায় সাজানো হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডটি—যেখানে তিনি তাঁর 'পাইপটি' রেখেছিলেন—একটি দেয়ালের পশ্চাতে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা আবার আগের মতই করা হয়েছে, মীডেরা বাস করার সময়ই ঐ দেয়াল তোলা হয়েছিল। সিস্টার পাইপটিকে বহু বৎসর নিজের কাছে রেখেছিল, পরে স্বামী প্রভবানন্দের নিকট গচ্ছিত করে দেয়। এখন হলিউডে অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে ওটিও রক্ষিত আছে। যে টেবিলটিতে স্বামীজী ভগ্নীদের সঙ্গে বসতেন, সেটি পুনরায় ভোজনাগারে রাখা হয়েছে। স্বামীজী যেখানে শয়ন করতেন, উপর তলের সেই কক্ষটিকে ঠাকুরঘর করা হয়েছে। যে বাগানটিতে তিনি বসে থাকতে ভালবাসতেন, সেটিও আবার সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীজীর দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় আগমনের প্রভাব স্থায়ী হয়েছে। তাঁর বক্তৃতা ও পত্রাবলীতে শক্তি বিধৃত রয়েছে, সেগুলি পড়লে মনে হয়, এই সামনে বসে এখনই যেন তিনি কথাগুলি বলছেন। সিস্টার ও জো-র ন্যায় ভক্ত, যারা স্বামীজীকে ভালবাসত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাজে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সেবারত ছিল, এবং আমাদের সমসাময়িকেরাও এই সব ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাঁর সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। শেষ কথা, মীড-ভগ্নীদের গৃহে স্বামীজীর উপস্থিতির প্রভাব এখনো বজায় আছে, সেখানে গেলে সূক্ষ্ম কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতেই হবে।

দক্ষিণ পাসাডেনা ৩০৯ নং মণ্টেরে রোডের পুরাতন ধরনের বাড়িটি একদল লোকের কাছে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে, আর এই দলটি ক্রমে ভারী হচ্ছে। যাঁর স্পর্শে এই গৃহ ধন্য হয়েছে, যিনি তেজোদীপ্ত ও প্রাণবন্ত ভঙ্গীতে ধর্মনিহিত সত্যকে প্রচার করে তাদের হৃদয় জয় করেছেন, সেই অদ্বিতীয় দেবমানব স্বামীজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য তারা এখানে সমবেত হয়। এই পাশ্চাত্য ভক্তমণ্ডলীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বেদান্তের সংযোগ-সেতু।

"একটি মন হইতে অপর মনে আধ্যাত্মিক তেজ সংক্রামিত করা যায়। যিনি দেন, তিনি গুরু; যে গ্রহণ করে, সে শিষ্য। এইভাবেই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকীর্ণ হয়।"

"যে যত আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের শুদ্ধসত্তাব অনুভবের নামই উপাসনা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

'নচিকেতা'

সাধুসঙ্গ ও তৎপ্রসূত প্রেম সাধারণ জীবকেও অসাধারণ করে তোলে। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, ক্ষণকালের জন্য হলেও সাধুসঙ্গলাভে ভবসাগর পার হওয়া যায়।

আচার্য শঙ্কর কথিত ক্ষণকাল সাধুসঙ্গলাভে সাধারণ এক গৃহীর আচ্ছন্ন প্রতিভা এবং মোহ-মুগ্ধ মন তদীয় শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদ ও অপূর্ব প্রেমস্পর্শে পরিণামে কিরূপ প্রতিভাত ও পরিবর্তিত হয়েছিল, বর্তমান প্রবন্ধে তারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা ৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের গুরু যতিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের কৃপা ও সঙ্গলাভ মাত্র পাঁচ কি ছয় বৎসরের অধিক হয় নাই (১৮৯৭-১৯০২), যদিও তৎপূর্বে তিনি কিছুদিন সাধু নাগমহাশয়ের সঙ্গলাভে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। এই অত্যল্পকাল মধ্যেই শ্রীগুরুর প্রেমস্পর্শে তাঁর অধীতবেদবিদ্যা, শাস্ত্রীয় বিচারের প্রতিভা এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসা কিরূপ ভাবে প্রকটিত হল, স্বামিশিষ্য-সংবাদের বিষয়বস্তু তার সম্যক নিদর্শন। কথাপ্রসঙ্গে ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় সমস্যা এবং তার সমাধান সম্বন্ধে স্বামীজী হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে—উক্ত 'স্বামিশিষ্য-সংবাদে'। শরৎবাবু সাধারণ গৃহস্থঘরে জন্মিলেও সাধু নাগমহাশয়, স্বামীজী ও তাঁর শিবতুল্য গুরুভ্রাতাদের সংস্পর্শে এসে তিনি অশেষ গুণের অধিকারী হয়েছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও ভক্তগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অমায়িক ব্যবহার সর্বজনবিদিত ও আদর্শস্থানীয় ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সাধুদের সস্নেহ সঙ্গলাভের সুযোগে শরৎবাবু প্রকৃতই নবজীবন লাভ করেছিলেন।

বাংলা ১২৭৪ সালের মাঘমাসে (ইংরেজী ১৮৬৮, জানুআরি) কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর মহকুমার কুড়াশী গ্রামে শরৎবাবু এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা—৺রামকমল দেবশর্মা (চক্রবর্তী) ছিলেন—যাজক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর তিন কনিষ্ঠ সহোদর* দেশান্তরে কর্মরত থাকায় তিনি তাঁদের যৌথ পরিবার রক্ষাকল্পে দেশের বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। তখনকার যৌথপরিবার বর্তমান যুগে স্বপ্নাতীত। সংসারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকলেও ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহবন্ধন ও বিশ্বাস অতুলনীয় ছিল এবং সেজন্যই অল্প আয় সত্ত্বেও ঐ সংসারে বারোমাস পূজা-পার্বণাদি যথারীতি পালিত হত। সদ্‌গুণ ও সত্যনিষ্ঠার দরুন রামকমল তাঁর কনিষ্ঠদের নিকট পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা পেতেন।

নিজবাটীর ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বকোণে ছয়গাঁ নামক গ্রামে ৺তারাকান্ত ভট্টাচার্য (পাঠক) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া বিধুমুখী দেবীর সহিত রামকমলের বিবাহ হয়। বিধুমুখী অতীব সরল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন এবং সে কালের তুলনায় তাঁকে বিদুষী বলা চলে। অবসর সময়ে তিনি কখনও অলসতার প্রশ্রয় না

---

*(১) নীলকমল চক্রবর্তী—জমিদারী সেরেস্তার নায়েব।
(২) কালীকমল চক্রবর্তী—স্কুলশিক্ষক
(৩) শশীকমল চক্রবর্তী—ধামরাই স্কুলের শিক্ষক।

দিয়ে পঠন-পাঠনে সবিশেষ আনন্দ পেতেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী ও ভাগবতাদি তাঁহার নিত্যপাঠ্য ছিল। তাঁর সংশিক্ষা এবং সদ্গুণেই বোধহয়, তাঁর দুইপুত্র—শরৎ ও রমেশ পরিণত বয়সে সমধিক যশস্বী হয়েছিলেন। স্বামী বিয়োগের পর বিধুমুখী সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল ৺কাশীবাসী ছিলেন এবং ঐ পুণ্যস্থানেই দেহত্যাগ করেন।

পিতা রামকমলের সংসারে শরৎবাবু প্রথম পুত্রসন্তান বলে শিশুকাল থেকেই তিনি বিশেষ আদুরে ছিলেন। খুল্লতাতদের আদরযত্নে তাঁর গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগবারও জো ছিল না। ছোটকাকা ৺শশীকমলের শিক্ষকতার স্থান ছিল ধামরাই, ঢাকাজেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়। শরৎবাবুর বিদ্যারম্ভ সেখানেই হয়। তিনি যে ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, তখনকার এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি-প্রাপ্তিই তার সম্যক পরিচয়। কবিত্ব-শক্তির পরিচয়ও তাঁর বাল্যকাল হতেই পাওয়া যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষার সমসাময়িক কালে তিনি "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" নামে একখানা কবিতার বই রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই পুস্তক সুপাঠ্য মনে করে দেশস্থ পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'শরৎ-কবি' বলেই সম্বোধন করতেন। পরিণত বয়সে তাঁর কবিত্বশক্তি বাংলা বা সংস্কৃতে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস যথাসময়ে দেওয়া হবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে শরৎবাবু ঢাকা জগন্নাথ কলেজে তখনকার ফার্স্ট আর্টস্ পড়লেন এবং বি-এ পড়ার জন্য কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তি হলেন। বিগত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শরৎবাবু উক্ত কলেজ হতে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি-এ পাশ করলেন। সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় শেষ জীবনে পাওয়া যাবে।

তখনকার দিনে অল্প বয়সেই বিবাহের প্রথা ছিল। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় জলপানি পাওয়ার দরুন এবং খুল্লতাতদের আগ্রহাতিশয্যে ঢাকা জেলার ষোলঘরনিবাসী ৺মদনমোহন বারুডীর জ্যেষ্ঠাকন্যা মোক্ষদায়িনী দেবীর সহিত শরৎবাবুর বিবাহ হল। মদনবাবু তখন ফরিদপুর জেলার সুন্দীপ মুন্সিপির খ্যাতনামা উকিল ছিলেন এবং বিশেষ অবস্থাপন্নও ছিলেন।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পাঠকালীন শরৎবাবু নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওভোগনিবাসী পূজ্যপাদ সাধু নাগমহাশয়ের (৺দুর্গাচরণ নাগ) সান্নিধ্য লাভ করেন, তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর ভাবপ্রবণ মন সবিশেষ উদ্বেলিত হল। সাধু নাগমহাশয়ের জীবন কতখানি উন্নত ছিল, তাহা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিই জাজ্বল্য প্রমাণ। স্বামীজী বলেছেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখলাম না।" এই নাগমহাশয়ের দেবচরিত্রই শরৎবাবুর ধর্মজীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রাথমিক সংবাদাদি তিনি সাধু নাগমহাশয়ের নিকটই অবগত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যে, মেজেণ্টারের ঘরে ঢুকলে গায়ে রঙ ধরে। উদাসীন নাগমহাশয়ের সান্নিধ্যলাভে পাছে শরৎবাবুও সংসারে উদাসীন হয়ে পড়েন, এই আশঙ্কা তাঁর অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে প্রবলতর হল। শরৎবাবুর রচিত 'সাধু নাগমহাশয়ের জীবনী'তে একস্থানে তিনি লিখেছেন: আমার শ্বশুর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বারুডী মহাশয় লোক-পরম্পরায় শুনতে পান যে, নাগমহাশয়ের সংস্রবে এসে তাঁর জামাতা শরৎবাবু লেখাপড়ায় ও

সাধারণ সংসারধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন। প্রকৃত অবস্থা কি জানবার জন্য মদনবাবু একদিন দেওভোগে এসে উপস্থিত হলেন। নাগমহাশয়কে দেখে তাঁর সকল উদ্বেগ দূর হল। সাধুজীর আদরযত্নে ও সরল অমায়িক ব্যবহারে পরমপ্রীত হয়ে মদনবাবু বলেছিলেন, "জামাতা যখন এমন মহাপুরুষের কাছে যাতায়াত করেন তখন তাঁর ভয় বা চিন্তার কারণ কিছুই নাই।" পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সাধু নাগমহাশয়ের কৃপাচ্ছত্রতলে এসেই শরৎবাবুর ধর্মজীবনের সূচনা হল। উদাসীন সাধুর নিয়ত সঙ্গলাভে সাংসারিক বিষয়ে তিনিও খানিকটা উদাসীনই হয়ে পড়লেন এবং সেজন্য কর্মজীবনে তেমন সিদ্ধমনোরথ হতে পারেননি।

অভিভাবকদের ইচ্ছানুযায়ী বি-এ পাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। অন্যান্য বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও ঘোড়দৌড় পরীক্ষায় তিনি আহত হন। তিনি আর এই পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করেননি। কিছুকাল রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের 'প্রাইভেট্ টিউটারে'র কাজ করার পর তিনি ডাকবিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ঐ বিভাগে সুদীর্ঘকাল কাজ করে কটকের (উড়িষ্যা) পোস্টমাষ্টার থাকাকালে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরিজীবনে তাঁর তেমন কোনও উন্নতি কোন দিনই হয়নি। তার প্রধান কারণ—তাঁর স্বাধীন সত্তা। তিনি উপরিওয়ালাদের খোসামোদ তোষামোদাদি আদৌ করেননি, বরং অন্যায় অবিচার দেখলে বাক্সংযম করতেও জানতেন না। শরৎবাবুর প্রধান গুণ ছিল—প্রসন্নচিত্ততা। তিনি তাঁর সামান্য আয়েও সদানন্দেই জীবন কাটিয়েছেন।

অফিসে কাজ করবার সময় থেকেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সুললিত সংস্কৃত স্তব রচনা করে ছাপিয়ে শরৎবাবু বিতরণ করতেন। বোধ হয় আফিসে কাজ করার সময় থেকেই এটি শুরু হয়। শোনা যায়, এর কয়েকটি কপি জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৃতীয় স্তবের কতকাংশ স্বামীজীর বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়, যেখানে তিনি লিখেছেন—

বিরম বিরম বন্ধো। যোগকর্মানুবন্ধাৎ
ভজ ভজ হৃদিপদ্মে রামকৃষ্ণস্য মূর্তিম্।
সুবিহিতমসিঘাতৈঃ ছিন্ধি সংসারপাশান্
স ইহ তব বিমুক্তেঃ কারণং নান্যদস্তি॥

* * *

অনুসর শ্রুতিশীর্ষজ্ঞানবৈরাগ্যমার্গম্
সুখময়পরতত্ত্বে তিষ্ঠ ভো সঙ্গশূন্যে।
নিরবধি জপ বন্ধো। রামকৃষ্ণেতি মন্ত্রম্
অভীরভীরিতি নাদৈঃ পূর্যতাং দিঙ্মুখানি॥

প্রতি বৎসর ঈদৃশ স্তোত্র রচনাকারীর সংস্কৃত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে স্বামীজী তাঁকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে, প্রথমবার বিলেত থেকে আসার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার রাজবল্লভপাড়ার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর তখনো আলাপ হয়নি। শরৎবাবুর জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম। স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) তাঁকে স্বামীজীর নিকট নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামীজী মঠে এসে তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র পাঠ করে ইতিপূর্বেই তাঁর বিষয় শুনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগমহাশয়ের কাছে যে তাঁর যাতায়াত আছে, স্বামীজী তা জেনেছিলেন। স্বামীজী শরৎবাবুকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করে নাগমহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর অমানুষিক ত্যাগ,

উদ্দাম ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করতে করতে বললেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী"। কথাগুলি নাগমহাশয়কে লিখে জানাতে তাঁকে আদেশ করলেন।

স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পর থেকে শরৎবাবু সরকারী কাজেও মনঃসংযোগ যথারীতি করতে পারেননি, সুতরাং তাঁর পদমর্যাদা ও আর্থিক উন্নতি—উভয় পথই রুদ্ধ ছিল। অধিকন্তু 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' প্রকাশিত হবার পর থেকে সরকারের কোপদৃষ্টিও তিনি এড়াতে পারেন নি। কিছুকাল সরকারের গুপ্ত গোয়েন্দারাও তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। এ অবস্থায় কর্মোন্নতি কারুর হয় কি? 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' মাসিকপত্র উদ্বোধনে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু যুবক ধর্ম, সমাজ ও জাতি বিষয়ক বহু সমস্যার সমাধানমানসে ঐ সব বিষয়ে স্বামীজীর মতামত জানবার জন্য শরৎবাবুর নিকট উপস্থিত হতেন। তখন বাংলাদেশ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং যুবকদের মধ্যে একদল বিদেশী সরকারের মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর। জনৈক ডাকবিভাগের কর্মচারীর নিকট উক্ত যুবকদলের সাময়িক আনাগোনাও সরকার মোটেই পছন্দ করলেন না। পরিণামে শরৎবাবুর কর্মজীবন যেন তেন প্রকারেণ চলতে লাগল। সাধারণ চাকুরিজীবী হলেও শরৎবাবুকে সেজন্য কেহই কোন দিন দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেননি। ভগবৎকৃপায় তিনি আত্মতুষ্টই ছিলেন। কর্মজীবনে যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, সকলেই একমুখে বলতেন, শরৎবাবুর অমায়িক ব্যবহার ও আতিথেয়তা খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং চিরদিন মনে রাখার মত। কর্মব্যপদেশে তিনি যেখানে গিয়েছেন, তাঁর বহু বন্ধুবান্ধব, বিশেষতঃ ঠাকুরের ও স্বামীজীর ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ কুমুদবন্ধু সেন শরৎবাবুর বাসায় বহুবার উপস্থিত থাকতেন। প্রথম জীবনে শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন শরৎবাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

সরকারী কর্মে থাকাকালীন শরৎবাবুই বরিশালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন এবং যখন তিনি গয়া, ঝরিয়া, পূর্ণিয়া, দুমকা, ডেরেণ্ডা, রাঁচী, পুরুলিয়া ও কটকে ছিলেন, তখন প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রসঙ্গাদি করতেন। ডেরেণ্ডাতে (রাঁচী) একটি শিববাড়ী ছিল। প্রতি রবিবার শরৎবাবু তথায় ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষণ দিতেন। তিনি যখন গয়ায় ছিলেন, তখন ৺শ্রীশ্রীবিষ্ণুপদ দর্শনমানসে অথবা অন্য কোন কারণে মঠের সাধুসন্ত অনেকেই তাঁর বাসাবাড়ীতে গিয়েছেন, এমন কি, করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে নিয়ে স্বামী সারদানন্দ একবার সেখানে পদার্পণ করেছিলেন। ভাগ্যবান শরৎবাবুর বাসাবাড়ী পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

কটকে থাকাকালীন স্থানীয় উকিল ৺জানকীনাথ বসু এবং তাঁর দুই পুত্র—ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু (জগদ্বরেণ্য নেতাজী) একাধিকবার শরৎবাবুর ডাকঘরের বাসাবাড়ীতে এসে দেখা করেন—ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রসঙ্গাদি শোনবার জন্যই।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদের ১ম খণ্ডের ৬ষ্ঠ বল্লীতে উল্লিখিত আছে—১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ স্বামীজী শরৎবাবুকে আলমবাজার মঠে দীক্ষাদান করেন। স্বামীজী বলেছিলেন: যিনি এই সংসারমায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ

গুরু। শাস্ত্রে বলে—যাঁরা অধীতবেদ-বেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু। তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে,—"নাত্র কার্য বিচারণা।"

১৩২০ সালে ফাল্গুন মাসে শরৎবাবু রচিত ঠাকুর ও স্বামীজী বিষয়ক স্তোত্রসম্ভার ও সঙ্গীতাদি এবং বহু শাক্ত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত 'বাঙালের বাক্য ধর' কবিতা সহ "শ্রীরামকৃষ্ণাদ্য-স্তবমালা" নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ঝরিয়ায় থাকা-কালীন শরচ্চন্দ্র-রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাচালী" জনৈক ভক্ত ৺মাখনলাল হোড় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাচালী রাঁচীর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় নিত্যপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হত। শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র উক্ত পাচালী কাশী সেবাশ্রমে সর্বপ্রথম বহু ভক্তসম্মেলনে সুরলয়সহ পাঠ করে ধন্য হন। ঐ উৎসবে পাচ শতাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলার মূল ঘটনাগুলি অতীব সুন্দর ভাব ও ভাষায় পাচালী আকারে বর্ণিত আছে। ইহাতে অতি অল্প কথায় সুষ্ঠু ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথা বর্ণিত।

চাকুরির প্রথম অবস্থা হইতেই শরৎবাবুর অর্থকষ্ট ছিল। তবে কনিষ্ঠ সহোদর ধনার্জন করিয়াও অকৃতদার ছিলেন বলিয়া তাঁর শেষ জীবনে আর্থিক কষ্ট আর কোনদিনই ছিল না। ধনাঢ্য সহোদরের সহযোগিতায় তিনি দান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। দেশের জনহিতকর কার্যে যথাসাধ্য সাহায্যদান এবং জাঁকজমকের সহিত শারদীয়া পুজাপার্বণের সময় দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও তাহাদিগকে বস্ত্রবিতরণাদি বহু জনহিতকর কাজে শরৎবাবু যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। স্বামীজীর অপার করুণা ও অমোঘ আশীর্বাদে শরৎবাবুর পাচটি ছেলে সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী। তাঁহার দুটি কন্যাও সৎপাত্রস্থা।

সরকারী চাকুরি হতে অবসরগ্রহণের পর কলিকাতায় থাকাকালীন শরচ্চন্দ্র-লিখিত পুরাতন কাগজের মধ্যে তাঁরই রচিত অসম্পূর্ণ একখানা "শ্রীশ্রীঠাকুরের নামামৃত" পাওয়া যায়, এবং অসম্পূর্ণ অংশ তাঁর দ্বারা লিখিয়ে তাঁর বড় নাতির নামে ১৩৪৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত "রামনাম সঙ্কীর্তনে"র মত ঠাকুর সম্বন্ধে "নামামৃত" লেখার জন্য পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ শরৎবাবুকে অনুরোধ জানাবার ফলেই "নামামৃত" সঙ্কলিত হয়। শরৎবাবুর একজন উচ্চশিক্ষিত নাতি বইখানা সঙ্কলন করেন। "নামামৃত"খানি বর্তমানে ৺কাশী সেবাশ্রম হতেই মুদ্রিত ও বিতরিত হয়।

বেলুড় মঠে থাকাকালীন এক সময় স্বামীজী শিষ্যের সংস্কৃতানুরাগ এবং অধীত বেদান্ত-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্যই যেন তাঁকে বেদান্তের একটি ভাষ্য লিখতে আদেশ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও অন্যান্য পণ্ডিত সাধুসন্তগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে এবং শ্রীগুরুর আদেশে শরৎবাবু "বিবেকভাষ্য" নামে বেদান্তের একটি টীকা লিখতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপি ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে এবং সপ্তমখণ্ডে প্রায় সহস্রাধিক 'হাফ ফুলস্কেপ' পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। পাণ্ডুলিপিখানি স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক আদ্যোপান্ত সংশোধিত এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক অনুমোদিত।

শরৎবাবুর দেহান্তের পর পাণ্ডুলিপিটি তাঁর জন্মভূমির গৃহেই পড়েছিল বলে কতকাংশ কীট-দষ্ট হয়। সেই অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পাণ্ডু-লিপিটি উদ্ধার করেছেন। দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপিটি এখনো মুদ্রিত করা সম্ভবপর হয়নি।

শরৎবাবু-রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টস্তবমালা" উচ্চ-শিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীর নিকট খুবই আদরের ধন। তাঁর রচিত শ্রীগুরুসঙ্গীত—"মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্", শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত—"তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম", "জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ, জয় ভবভয়হারী হে" এবং "জয় জয় রামকৃষ্ণনাম—গাও রে", শ্যামাসঙ্গীত—"কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেমতরঙ্গিণী, নাচিছে উলঙ্গিনী আসব-আবেশে হায়" এবং কৃষ্ণসঙ্গীত—"গোপী-মনোরঞ্জন, অঞ্জনগঞ্জন, আঁখিযুগখঞ্জন, মঞ্জীর বাজে পায়"—মঠের প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত বলেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারবাদ বিষয়ে শরৎবাবুর "বাঙ্গালের বাক্য ধর" কবিতাটি খুবই সুপাঠ্য, তিনি বলেছেন—

অসভ্য সুসভ্য দেশ যদি শুনি তাঁর গাথা
হয়ে থাকে তরঙ্গিত—কোটি প্রাণে শান্তিদাতা,
মহামেধা দার্শনিক
মহাজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক
অবাক্ হয়েছে যদি শুনি উক্তি সারবান,
কেন তবে মিথ্যা হবে—"রামকৃষ্ণ ভগবান ?"

"শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টস্তবমালায়" শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রত্যেক সাধুসন্ত এবং গৃহীভক্ত বিষয়ক স্তোত্রটি অতীব মনোরম। উহাতে সকলেরই গুণগ্রাম বিশদ ও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্তবমালার পদলালিত্য ও অনুপ্রাস সদাশয় পাঠকের মনে ভক্তকবি জয়দেবের সুললিত সংস্কৃতকাব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে—ইহা নিঃসন্দেহ। শরৎবাবু শুধু সঙ্গীতরচয়িতাই ছিলেন না, সঙ্গীতেও তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন।

তাঁর কলিকাতাবাসকালে জাপানীদের দ্বারা কলিকাতায় বোমানিক্ষেপের আশঙ্কা দেখা দিল। ফলে, কলিকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ল। সেই হিড়িকে শরৎবাবুও বহরমপুরে তাঁর চতুর্থ পুত্রের বাসায় যেতে বাধ্য হন এবং ৬ মাস পর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক ফরিদপুর জেলার নিজগৃহে নীত হন। তখন তাঁর বয়স ৭৪ বৎসর। বাড়ী পৌঁছবার অন্যূন তিন মাসের মধ্যেই, ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৮ সাল, শনিবার (২৩-৮-৪২), শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তাঁর দেহাবসান হয়।

এর ১১ দিন পূর্ব হতে তাঁর হাঁপানির টান অত্যন্ত বেড়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজীর নাম করতে করতে, তাঁদের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের তেজস্বী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচনাদি, বিশেষ করে স্বামীজীর সহিত তাঁর কথোপকথন "স্বামিশিষ্য-সংবাদ" গ্রন্থখানি অগণিত জনগণকে উচ্চভাবানুপ্রেরিত করে তাঁদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে চিরঅধিষ্ঠিত করে রেখেছে।

'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'

স্বামী ধীবেশানন্দ

স্বীয় দিব্যলীলা-নাটকের শেষ অঙ্কে কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে দুরারোগ্য রোগজীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কথা বলিতেও অক্ষম তখন একদিন ইঙ্গিতে লিখিয়া সমবেত ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন—**'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'**।

প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—'নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘরের'। স্বীয় শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র নরেন্দ্রকেই চিহ্নিত করিয়া তিনি একথাও বলিয়াছিলেন—'এত লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।' তাই দেখিতে পাই নিজের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ঠাকুরের কি বিপুল আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। তিনি পূর্বেই জানিতেন, নরেন্দ্রকে দিয়া জগতের অনেক কাজ হইবে। তাই আচার্যরূপে নরেন্দ্রনাথকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিতেও তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। নরেন্দ্র পাছে একঘেয়ে হইয়া যান, ঈশ্বরের অনন্ত ভাবরাশির দুটি একটি ভাবমাত্র লইয়াই পাছে নরেন্দ্র স্বীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিদ্বত্তা-প্রভাবে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাবিত হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ দল সৃষ্টি করিয়া বসেন, সেজন্য ঠাকুরের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

নরেন্দ্র শক্তি মানেন না। ভগবানের নামে প্রেমাশ্রুবিসর্জনাদি পুরুষপ্রবর নরেন্দ্রের নিকট পুরুষত্বের অবমাননা বলিয়া প্রতিভাত হইত। নরেন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজের ভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে যান, 'মা'-'মা' করেন। মার দিব্যদর্শনের কথা ভক্তগণসমক্ষে বলেন। নরেন্দ্র কিন্তু এসব বিশ্বাস করেন না। বলেন :—ও সব মাথার খেয়াল; খেয়ালবশতঃ অনেকে ঐরূপ দর্শনাদি করে।

তাঁহার নরেন্দ্র কি শেষটায় একঘেয়ে হইয়া যাইবে? কেবল নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই লীন হইয়া থাকিবে? তবে তাহার দ্বারা লোকশিক্ষা হইবে কি করিয়া? জগতের সকলেই তো আর নিরাকার ব্রহ্মোপলব্ধির অধিকারী নয়? শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মাঝে মাঝে একটু চিন্তিত হন, কিন্তু বেশী নয়; কারণ অতীন্দ্রিয় যোগশক্তি-প্রভাবে তিনি পূব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় নরেন্দ্র বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া লোক-কল্যাণার্থ জগতে অবতীর্ণ। সুতরাং কালে নরেন্দ্র লোকশিক্ষক হইবেই। তাই তিনি সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সাধারণ ফুল শীঘ্রই ফোটে এবং শীঘ্রই ঝড়িয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু পদ্মফুল দেরীতে ফোটে এবং থাকেও অনেকদিন। নরেন্দ্র যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'সহস্রদল পদ্ম'। তাই সে ফুলটি ফুটিতে একটু সময় লাগিবে বৈ কি।

দুঃখে পড়িলেই মানুষের প্রকৃত জীবন গড়িয়া উঠে। শত দুঃখের পেষণে নিষ্পিষ্ট মানব স্বীয় পুরুষকারসহায়ে যখন জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় তখনই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক্ বিকাশ ঘটিয়া থাকে। অশেষ দুঃখ-দারিদ্র্যই জীবনের প্রকৃত শিক্ষক। উহাতেই ধৈর্য, সহনশীলতা, আদর্শৈকনিষ্ঠতা ও হৃদয়ের সদ্‌গুণরাজির পরিপূর্ণ প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার সুখের মধ্যে বাস করিয়া সকলেই

উচ্চতত্ত্ব আলোচনা করিতে সমর্থ। কিন্তু দুঃখ যখন মানুষকে দিশাহারা করিয়া ফেলে, চারিদিকে কেবল হতাশার করুণ সুরই যখন কর্ণগোচর হয় তখন কয়জন জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যটিকে স্থির রাখিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন?—নরেন্দ্রের জীবনেও বোধ হয় দুঃখের পীড়ন এই জন্যই প্রয়োজন ছিল। ইহা ঈশ্বরেচ্ছাতেই ঘটিয়াছিল। ইহার অন্য প্রয়োজনও ছিল। ভবিষ্যতে যিনি আচার্য হইবেন, মানবজীবনের সর্ববিধ অবস্থার সহিত তাঁহার পরিচয় থাকা আবশ্যক।

নরেন্দ্রনাথ আজন্ম সুখে লালিতপালিত। হঠাৎ পিতৃবিয়োগে নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ অশেষ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইলেন। মা, ভাই, বোনদের অন্নসংস্থানের কোন উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ শত চেষ্টা করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত একটি কর্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। সুসময়ের বন্ধুরাও এই সংকটকালে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ। অনেকে শত্রুতাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। জ্ঞাতিরা পৈতৃক ভিটাটুকুও কাড়িয়া নিতে বদ্ধপরিকর। সংসার যে কত নীচ, ঘৃণিত, মানুষ যে কত স্বার্থপর, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় পাইলেন। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িয়া, অনাহারে দিন কাটাইয়াও কিন্তু তিনি স্বীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। জীবনের লক্ষ্য ভগবান লাভ—ইহা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। অপরের শত সমালোচনা, কটাক্ষ এবং প্রলোভনও তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অনেক কষ্টে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্মটি জুটিল। কিন্তু তাহাও বেশীদিন রহিল না।

অবশেষে নরেন্দ্র একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার মা-ভাইদের অন্নসংস্থান যাহাতে হয় সেজন্য মা-কালীকে বলিতে হইবে। ঠাকুর বলিলেন—'তুই মাকে মানিস না, তাই তো তোর এত কষ্ট।' ঠাকুরের কথায় অনুরুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্র মা-কালীর মন্দিরে গিয়াও মার নিকট অর্থাদি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

যেদিন নরেন্দ্র সাকারে বিশ্বাসী হইলেন, মাকে মানিলেন, সেদিন ঠাকুরের কি আনন্দ। পুনঃপুনঃ সমবেত ভক্তদের বলিতে লাগিলেন—"নরেন্দ্র মাকে মেনেছে, বেশ হয়েছে, না? কাল সারা রাত 'আমার মা ত্বং হি তারা'—এই গানটি গেয়েছে। এখন ঘুমুচ্ছে।" ঠাকুরের এত আনন্দের কারণ নরেন্দ্র এখন সাকারেও বিশ্বাসী হইয়াছেন। ঠাকুর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। স্বীয় সর্বভাবের পরিবাহক নরেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রকারে যোগ্য করিতে হইবে। সাকার নিরাকার উভয় ভাবেই বিশ্বাস রূপ উহারই সার্থক সূচনা দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের এত আনন্দ।

শ্রীম বলিতেন, "নরেন্দ্র কত কাজ করলেন। বক্তৃতা, প্রচার, মঠস্থাপন, কত কি। কিছুতেই আবদ্ধ হন নাই। কেন? পরমাত্মাকে জেনে করেছেন তাই। তাঁর হাতের যন্ত্র। আত্মদ্রষ্টাকেও তিনি ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন। নরেন্দ্র যদি সমাধিস্থ হয়েই থাকতেন তবে মায়ের কাজ করত কে? ভারত ও জগতের কল্যাণের জন্যই ঠাকুর তাকে কাজে লাগালেন।··

মঠ করা কেন? গুরুভাইরা কেউ কেউ এ প্রশ্ন করায় নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই মঠকে কেন্দ্র করে ভারত ও জগতের Regeneration হবে।' আমেরিকায় তিনি

যা করেছেন তা ঠাকুরেরই কাজ। ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সভ্যতাকে তিনি বীরদর্পে জগতে প্রচার করলেন।

ঠাকুর থাকতেও নরেন্দ্রের দুঃখ গেল না। দুঃখ শরীরের ধর্ম। উহা থাকবেই। তবে বিষয়ীদের মত কাবু করতে পারে না। অত দুঃখ পেয়ে তবেই না তিনি মহাপুরুষ হলেন? তাই পরে নরেন্দ্র বলেছিলেন: যারা দুঃখকষ্ট পায় নাই, তারা কি আবার মানুষ? ধনী, বিদ্বান, বুড়ো হলেও তারা Babies. Little babies. কত কষ্ট তিনি পেয়েছেন। আলমোড়ায় তপস্যায় বসেছেন। খবর গেল ভগ্নী আত্মহত্যা করেছে। তাকে খুব ভালবাসতেন। হৃষীকেশে প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না।"

নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, দুঃখের আগুনে না পুড়িলে মানুষ মহৎ হয় না। তিনি নিজেও দুঃখের আগুনে পুড়িয়াছিলেন। দুঃখের আগুনে, তপস্যার আগুনে পুড়িয়া খাঁটি সোনা হইয়াছিলেন। বিদেশেও তিনি যখন একাকী, সাহায্য করিবার কেহ নাই—তাঁহার বিরুদ্ধে শত ষড়যন্ত্র এবং নানা কুৎসিত অপবাদ রটনা করিতেও মিশনারীরা কুণ্ঠিত হয় নাই। বন্ধুরা সে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন: আমি কি এ সব ভয় করি? আমি জানি সংসারটা গোষ্পদজলতুল্য অতি তুচ্ছ, মিথ্যা, এ সব শিশুরা আমার কি করিবে? সত্যই জয়ী হইবে।

এই দুর্জয় সাহস, অপরিসীম মনোবল তিনি কোথা হইতে পাইলেন? ইহা তাঁহার আত্মানুভূতির শক্তি। সাধনসহায়ে ও গুরুকৃপায় তিনি অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং সদা সর্বব্যাপী চেতন সমুদ্রেই যেন তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। জগৎটা একটা মিথ্যা ছায়ার মত তাঁহার কাছে ভাসিত, তাই কোন আঘাতেই মষড়াইয়া পড়িতেন না। উহাতে যেন তাঁহার অন্তরের শক্তি আরও অধিকতর বেগে প্রকাশ পাইত। তাই নির্ভীক অন্তরে তিনি বলিয়াছেন—

'ভাঙো মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্য পরম।
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সম্ভাষিতে,
জেনো স্থির—আমি সেই, 'সোঽহং সোঽহম্।'

মুক্তির পথে সহস্র প্রতিবন্ধক আসিয়া সাধককে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়। দুর্বল মানব যাহাতে ভীত না হয় সেজন্য তিনি বলিতেছেন—

'রোষদীপ্ত মূর্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব—তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।'

—এ যেন তাঁহার নিজেরই প্রথম জীবনের প্রতিকূল আবর্তমধ্যেও লক্ষ্যৈকনিবদ্ধদৃষ্টির একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি। তৎকালে স্বার্থপর সংসারের যে নগ্ন চিত্র তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে:

'দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার,
পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব,
হেথা কোথা শান্তির আকার?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়—
কেবা পারে ছাড়িতে সংসার?
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর,
সব মর্ম দেখেছি এবার;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক !
এ জগতে নাহি তব স্থান ;···
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ,
তবে পাবে এ সংসারে স্থান।'

সংসারবিষয়ে কি নিদারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতা। মনে রাখিতে হইবে এই অভিজ্ঞতা তাঁহার তখনই হইয়াছিল যখন তিনি ২০।২১ বছরের যুবকমাত্র। তারপর আসিয়াছিল তাঁহার তীব্র সাধনার জীবন। অনশনে অর্ধাশনে অলৌকিক তীব্র বৈরাগ্যবান্ নরেন্দ্রনাথ তখন সাধনার খরস্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সে সাধনার বর্ণনাও তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

'বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ,
অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়,
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?'

এই অলোকসামান্য তপস্যাপ্রভাবে নরেন্দ্রনাথ কি তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন ? তাঁহার নিজ মুখেই তাহা আমরা শুনিতে পাইয়াছি,—

'শোন বলি মরমের কথা,
জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর,
এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্রতন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম,
'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।
জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর,
ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট-অণুকীট,
এই প্রেম হৃদয়ে সবার।'

সর্বভূতে এক প্রেমময়ের সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্রনাথ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-লাভের জন্য বাল্যাবধি তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুল ব্যাকুলতার পর্যবসান এইরূপেই ঘটিয়াছিল। যে ব্যাকুলতা একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল উহাই তাঁহাকে এখন লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিল। সর্বভূতে এক প্রেমময়ের দর্শন—এক ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্বসাধনার শেষ কথা ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন।

শ্রোত্রিয়ত্ব অর্থাৎ বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান, বিজ্ঞতা অলোকসামান্য মেধাবী নরেন্দ্রনাথের পূর্ব হইতেই ছিল। এখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠতা লাভ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল। লোকশিক্ষা দিবার আধারটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইল। নরেন্দ্রনাথ এখন আচার্যপদবীতে আরূঢ় হইলেন। সাধক নরেন্দ্রনাথ এখন আচার্য বিবেকানন্দ হইলেন। মৃত্যু, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, ধর্মাধর্ম - সবেতেই এক পরমাত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ এখন কৃতকৃত্য, স্বস্থ। আর কোন কর্তব্যই তাঁহার এখন অবশেষ নাই। তাই তখন তিনি ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া জীবশিক্ষাদানে ব্রতী হইলেন। ঈশ্বরপূজন—এই বুদ্ধিপূর্বক সর্ব-স্বার্থচিন্তারহিত হইয়া সর্বভূতে সেই প্রেমময়ের সেবা, ইহাই পরমার্থপ্রাপ্তির অত্যুৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন।

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করিয়াও স্বামীজী জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। নরনারায়ণের সেবায় নিজেকে তিনি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। সকলকে শিখাইয়াছেনও তাহাই :—

'ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।'

ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তখনই সাধকের হৃদয়ে আত্মজিজ্ঞাসা জাগে ও পরমার্থতত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়—ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের সুস্পষ্ট ঘোষণা। পূর্বপূর্ব যুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্যগণ শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, অগ্নিহোত্রাদির কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিলুপ্তপ্রায়। এখন সে সব করিবার সুযোগ ও অবসর কাহারও নাই। তাই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যুগোপযোগী সাধনের বিধান করিলেন :

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীব-শিব, শিববুদ্ধিতে জীবসেবা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি কর—ইহার যুগাচার্যের অভিনব বাণী। এই মহান্ আদর্শটি নিজেও জীবন দ্বারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। নিষ্কাম সেবা দ্বারা ধন্য হইবার সুযোগ প্রদান করত: ঈশ্বরই সাধকের নিকট জীবরূপে উপস্থিত—এই জ্ঞানে সেবা করিতে পারিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তখন উপাসনায় পর্যবসিত। শ্রদ্ধার সহিত এই সাধনের দ্বারা হৃদ্‌গত সর্বপাপ, ভোগবাসনা ও চিত্তবিক্ষেপাদি দূর হইয়া গেলে সাধকের সাত্ত্বিক হৃদয় তখন শান্ত, অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে এবং অচিরেই ও অল্পায়াসেই বেদান্তবিদ্যার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে সাধক তখন কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুমুখে শ্রুত এই সাধন-রহস্যটি সকলের কল্যাণের জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বাচার্যগণের তুলনায় ইহা স্বামীজীর যুগোপযোগী একটি বিশেষ অবদান।

শ্রীম বলিতেন,—"সেবা শুধু খাওয়ান-পরান নয়। জীবকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জেনে ভালবেসে সেবা। যেমন মানুষ নিজের জনকে ভালবাসে, নিজেকে ভালবাসে। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মত অপরেরও করা। নিজের স্বার্থ, ভোগবুদ্ধি থাকবে না—তবে হল নিষ্কাম কর্ম। দেখ স্বামীজী কেমন ছিলেন। জগতে এত মান পেয়ে ফিরে এসে এক কৌপীন প'রে আছেন। সব দিয়ে দিলেন গুরুভাইদের। ভক্তদের লিখলেন—'আপনারা আমার খাওয়া-পরার জোগাড় করে দিন। আমি ভিক্ষা করে খাচ্ছি।' পূর্বের ন্যায় সেয়ারের গাড়ীতে পাঁচ পয়সা দিয়ে বরানগর যাতায়াত করলেন। খালি পা, হট্‌হট্ করে চলছেন।··· স্বামীজী কালিকম্লি-বাবার কথা বলতেন। বলতেন—'ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্মী ঐ একটি সাধুকে দেখেছি। চাঁদা করে লাখ লাখ টাকা তুললেন, তা দিয়ে উত্তরাখণ্ডের সব রাস্তাঘাট, ধর্মশালা, সদাব্রত করালেন। হৃষীকেশে সাধুদের জন্য অন্নসত্র। তিনি নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন. রুটি সেঁকতেন। অপর লোকও সাহায্য করত। সাধুদের সেই রুটি দিচ্ছেন। নিজেও সাধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই রুটি ভিক্ষা নিচ্ছেন। এদিকে উলঙ্গ। এক কালো কম্বল গায়ে। কাজ যখন ঠিক চলতে লাগলো তখন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। আজও তাঁর খোঁজ কেউ জানে না। এর নাম নিষ্কাম কর্ম। কোন আসক্তি নাই।'"

সমালোচনা

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ॥ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রণীত॥ মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত॥ পৃষ্ঠা ১৮০ + ।৵০ ; দাম পাঁচটাকা।

শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ ইতিপূর্বে বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য রচনা করে, তিনি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঐতিহ্যের নৈষ্ঠিক ব্রতচারী, তার সুযোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন। সম্প্রতি-প্রকাশিত 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি তাঁর দুর্লভ মনন ও শিল্পরূপের আর একটি সপ্রশংস প্রমাণ উপস্থাপিত করল। এ বিষয়ে যাঁরা চিন্তার দীপবর্তিকা জেলে গুহাহিত সত্যের মুখোমুখি হতে চান, তাঁরা অধ্যাপক ঘোষকে অন্তর থেকে সাধুবাদ দেবেন। মনের সঙ্গে হৃদয়ের, তত্ত্বের সঙ্গে রসের, আলোচনার বিশ্লেষণ এবং সুবলয়িত সংশ্লেষণের যে পরিচয় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিকশিত হয়েছে, আধুনিক কালের চিন্তাশীল মহলে তার সমাদর সর্বজনীন হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইদানীং বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের কর্মকৃতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। কেউ ভাবের ফুলচন্দনে, কেউবা মনের প্রদীপ জেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তত্ত্ব-সাধনার স্বরূপ নির্ধারণের অভিপ্রয়াসী হয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই বইখানিতে সেই আলোচনার একটি মনোজ্ঞ শিল্প-আলেখ্য রচনা করেছেন।

গ্রন্থটির দুটি অংশ—(১) স্মরণ, (২) মনন। 'স্মরণে' কয়েকটি উপচ্ছেদে (শ্রীরামকৃষ্ণ, কামারপুকুর, বিশালাক্ষী, পঞ্চবটী, দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড়) তিনি স্মৃতিচারণা করেছেন আপন মনে, আর স্বগতোক্তি করেছেন আপন ভাষায়। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত স্থানগুলিতে তিনি উপস্থিত হয়েছেন, গৈরিক ধূলি সর্বাঙ্গে স্পর্শ করেছেন, 'অবতারবরিষ্ঠে'র পুণ্য-আবির্ভাবকে সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। যে-কোন হৃদয়বান পাঠক এই অংশ পড়তে পড়তে লেখকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবেন। আবেগ এখানে দ্বাররক্ষী, লেখক এখানে 'রূপদক্ষ'। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি-রঞ্জিত পথঘাট লেখকের কাছে আবেগ ও কল্পনার রসে রূপময় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক নানা ধরনের তত্ত্বকথারও অবতারণা করেছেন, কিন্তু "আপন মনের মাধুরীই" তাঁর লেখনীকে শিল্পীর তুলিকায় পরিণত করেছে। এই অংশে তাঁর প্রতিভা প্রকৃত আর্টিস্টের প্রতিভা।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ 'মননে'র কয়েকটি উপচ্ছেদে (শ্রীরামকৃষ্ণ—যুগজীবন সাহিত্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, অপূর্ব গৃহী, অপূর্ব সন্ন্যাসী) তিনি প্রধানতঃ চিন্তনের জগতে পদচারণা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ তাৎপর্য, তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক, গার্হস্থ্যধর্ম ও সন্ন্যাসজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ঐতিহ্যের বিচার করেছেন, আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনসাধনার গভীরে অবতরণ করেছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অংশটি বাংলার সংস্কৃতি-সাধনার একটি স্মারকপঞ্জী হয়ে থাকবে। ইতিহাসের ছায়াপটে দেশ ও কালের যে রূপ ফুটে ওঠে, তাকে বিশেষ ব্যক্তি ও যুগের মধ্যে প্রতিফলিত করে দেখাই যথার্থ ঐতিহ্যের

বিচার। সে দিকে লেখক অতিশয় পারঙ্গম, তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষ আবাল্য যুক্ত হয়ে আছেন। ফলে এ বিষয়ে আলোচনা-বিচার-বিশ্লেষণ তাঁর ন্যায্য অধিকার। সেই অধিকার তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সন্ন্যাসধর্মের আলোচনায় তিনি যে দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমরা ভক্তি করি। লেখকের রচনায় সেই ভক্তির সঙ্গে যুক্তি সংযোজিত হওয়ার ফলে গ্রন্থটি মণিকাঞ্চনের শিল্পরূপ ধারণ করেছে। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার জাতির ঐতিহ্যস্বার্থেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। মণ্ডল বুক হাউস শোভন আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি পবিত্র কর্তব্য করেছেন।

—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-ভজন—স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী ১ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৬, মূল্য ৪০ পয়সা।

পুস্তিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাত্রিক ভজন ও স্তোত্র, শ্রীশ্রীমায়ের স্তব ও প্রণামমন্ত্র এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্' বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট। পুস্তিকাটি ভক্তগণের নিত্যসঙ্গী হইবার উপযুক্ত।

কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ—প্রকাশক: শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ১৩।১, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উত্তর ব্যাটরা, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১৩৬, মূল্য ২৲।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য জ্ঞান মহারাজের জীবন অনন্যসাধারণ। তিনি শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুযায়ী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে রূপায়িত করিতে জীবন উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে তাঁহার জীবনের একটি রূপরেখা পাওয়া যাইবে। 'কথাপ্রসঙ্গে' নামক পরিচ্ছেদে সহজ সরল ভাবে বর্ণিত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার'—এই পর্যায়ে অনেকগুলি ভাবপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের শেষাংশে সেই সকল পুস্তিকা হইতে 'সারকথা' শিরোনামে কতকগুলি অমূল্য কথা সংযোজিত হইয়াছে, যথা :—

(১) "কোন প্রশ্নে তোমাদের নাহি অধিকার,
কাজ কর, করে মর,—এই কর সার।"

(২) "দেহের শান্তি ঘুমে, মনের শান্তি নামে।"

Seminar on Swami Vivekananda's Teaching (Swami Vivekananda Centenary Memorial Seminar no. 1, May 1 to May 7, 1964): Sri Ramakrishna Misson Vidyalaya, Coimbatore, South India Pp 133.

স্বামীজীর শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের সার্থকথা তাঁহার সঞ্জীবনী বাণীর অনুধ্যানে ও জীবনে তাহার রূপায়ণে—এই চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া স্মরণিকাটির প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। ১লা মে হইতে ৭ই মে, ১৯৬৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে সমস্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। Swami Vivekananda's Philosophy of Life, Swami Vivekananda on Religion; Universal Religion, Swami Vivekanada's Teaching in Education, Swami Vivekananda on Role of Women; Swami Vivekananda on Role of Youth, India and Her Regeneration. প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২রা জানুআরি, ১৯৬৬, বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী পাঠ ও সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানের পর স্বামী নির্বাণানন্দজীর নির্দেশে স্বামী বন্দনানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার ও কার্যধারা সম্বন্ধে সুন্দর বিবৃতি দেন। অতঃপর শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণে বলেন : রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপ্রসারের অলক্ষ্যে রহিয়াছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আশীর্বাদ। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে যে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই উপাসনা। আদর্শ জীবন গঠনই সবচেয়ে বড় কাজ। পবিত্রতা ও ত্যাগ আমাদের মূল মন্ত্র। জীবনে আদর্শ রূপায়িত হইলে তবেই অপরের মধ্যে ভাবসঞ্চারের শক্তি আসে।

সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতির সারানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর ৫৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মিশনের বহু উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করিয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের কার্যাবলী জনসাধারণ ও সরকারের স্বীকৃতি সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছে।

কর্মপ্রচার

১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে মিশনের কার্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অঙ্গহিসাবে কনখল সেবাশ্রম, চেরাপুঞ্জি আশ্রম ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী ভবন (সভাগৃহ ও গ্রন্থাগার) উদ্বোধন, পেরিয়ানায়কেনপালয়ম আশ্রমে ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা ও মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন, রেঙ্গুন সেবাশ্রমে সেন্টিনারি মেমোরিয়েল বিল্ডিং সংযোজন এবং পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে জুনিয়র সেকশনের জন্য বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৭ জন সাধু-সদস্য ও ১০ জন গৃহস্থ-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৫, মার্চ-এর শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৭০ (সাধু ৩৬০, ভক্ত ৩১)।

কেন্দ্র সংখ্যা

মূল কেন্দ্র (বেলুড়) সহ ১৯৬৫, মার্চ মাসে পূর্ব বৎসরের ন্যায় মিশনের কেন্দ্র ছিল ৭২টি। তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮; ব্রহ্মদেশে ২; ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া, বাকী ৫৭টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিসাবে : পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, উড়িষ্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও কেরলে একটি করিয়া।

প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য :

সকলেই অবহিত যে, ভারত ও পাকিস্তানে সংঘর্ষের ফলে বর্তমানে আমাদের দেশকে এক অতি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। ইহাতে মিশনকেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। সব চেয়ে

বড় সমস্যা পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রগুলিকে লইয়া, এই কেন্দ্রগুলির সহিত সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলির চারজন কর্মীকে (ভারতীয় নাগরিক) অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানে অবস্থিত মিশনের অপর চারজন কর্মীকে (পাকিস্তানের নাগরিক) অবশ্য অন্তরীণ করা হয় নাই। পাকিস্তানে মিশনের কেন্দ্রগুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, তাহাও ঠিক জানা নাই।

মিশনের আর একটি বিপত্তি উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রেঙ্গুন সেবাশ্রম রাষ্ট্রীয়করণের ফলে মিশনের কর্মীদিগকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ পাঁচটি বিভাগ: (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ: ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত দুঃস্থ জনগণের মধ্যে সেবাকার্য গত বর্ষের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে জানুআরি মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে দাঙ্গার ফলে সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু অবর্ণনীয় অবস্থায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতভূমিতে আসিতে থাকে। এই সময় তাহাদের জন্য খাদ্য, পরিচ্ছদ, ঔষধাদির বিশেষ প্রয়োজন হয়। মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে গেদে, পেট্রাপোল, বানপুর ও হিঙ্গলগঞ্জে চারটি এবং আসামে হরিমুরা ও গোয়ালপাড়া জেলায় দুইটি রিলিফ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। মে মাসে রায়পুরের সন্নিকট কুরুদ ক্যাম্পে সেবা-কার্য সম্প্রসারিত করা হয়।

গেদে কেন্দ্রে মিশন কর্তৃক ২,১৮৪ খানি ধুতি, ১,২১৪ খানি শাড়ি, ২,২৯৯টি ছোটদের পোশাক, ৬ খানি কম্বল, ৯৭টি চাদর, ৯টি গামছা বিতরিত হয়; এগুলি সবই নূতন। ইহা ছাড়া ২,০৮০ খানি পুরাতন বস্ত্রও বিতরিত হয়। প্রায় ৫৭ কুইন্টাল চিঁড়া, ২০ কুইন্টাল গুড়, ৯৫৩টি এনামেলের থালা এবং প্রচুর পরিমাণে বিস্কুট ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য বিতরণ করা হয়। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এই কেন্দ্রটি বন্ধ করা হয়।

পেট্রাপোল রিলিফ-কেন্দ্রে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ হইতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মোট ১,২৫,৩৭৩ জন লোকের মত রান্না-করা খাদ্য বিতরিত হয়। পরে রাজ্য সরকার কর্তৃক রান্না-করা খাদ্য-বিতরণ আরম্ভ হইলে মিশন শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র বিতরণ করে। বিতরিত দ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণ: নূতন ১,৫৫৫ খানি ধুতি, ১,৫৬৮ খানি শাড়ি, ৩,৩৯০টি শিশুদের পোশাক, ১৮৪টি চাদর, ১১ খানি গামছা. পুরাতন ২,২৪৬ খানি কাপড়-জামা, ২২ কুইন্টাল চিঁড়া, প্রায় ১১ কুইন্টাল গুড়, ৫৪৩টি এনা-মেলের থালা ও ৪৪১টি গ্লাস। সেবাকেন্দ্রটি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বন্ধ করা হয়।

বানপুর গভর্নমেণ্ট ক্যাম্প পরিচালনার ভার মিশনের হস্তে আসে ১লা জুন। গভর্নমেণ্ট ও মিশনের যুক্ত ব্যয়ে এখানে ৩৬,২৪৯ জন লোকের মত রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মিশন কর্তৃক নূতন ১২০ খানি ধুতি, ১১১ খানি শাড়ি, ৯২টি ছেলেমেয়েদের পোশাক, ৫১ খানি চাদর ও ১৬৬ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি এবং তৎসহ প্রায় ২৯ কুইন্টাল চিঁড়া, ১৩ কুইন্টাল গুড়, ১৯৮টি এনামেলের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য বিতরণ করা হয়। এই সেবাকেন্দ্রটি ১লা নভেম্বর বন্ধ করা হইয়াছে।

হিঙ্গলগঞ্জ রিলিফ-কেন্দ্রে রান্না করিয়া ৭,৪৩০ জন লোককে খাওয়ানো হইয়াছে।

আসামে হরিমুরা কেন্দ্রে মিশন কর্তৃক নূতন ২,৪৭৭ খানি ধুতি, ১,২১৪ খানি শাড়ি, ২,২৯৯টি পোশাক, ৬টি কম্বল, ৯৯টি চাদর, ৯টি গামছা ও পুরাতন ২,০৮০টি জামাকাপড় এবং প্রচুর পরিমাণ বার্লি, বিস্কুট, বেবি-ফুড, গুঁড়া দুধ এবং ১,২৮৫টি ডেকচি, ৪৬৬টি হাণ্ডা, ৯৭৫টি থালা, ১৭১টি টিনের পাত্র, ৮৭৩টি হ্যারিকেন লণ্ঠন, ৫৬ কেজি কাপড়কাচা সাবান, এবং ১২,৭৫০ টাকা মূল্যের ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই সেবাকেন্দ্র কর্তৃক ৯টি বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছিল, (মোট ছাত্রসংখ্যা ১,৯৬১)। ইহা ছাড়া ৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (একটি পুরুষদের জন্য এবং ৩টি মহিলাদের জন্য) খুলিয়া ৪৪ জন বয়স্ক পুরুষ ও ১১৪ জন বয়স্ক মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া হইত, ১০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সেবাকেন্দ্র কর্তৃক বামিনগাঁও অঞ্চলের ৬,০০০ জন দুঃস্থকেও সাহায্য দেওয়া হয়। আসামে রিলিফ-কেন্দ্র ১৮ই জুন বন্ধ করা হয়।

১৭ই মে মধ্যপ্রদেশে ৩নং কুরুদ ক্যাম্পে মিশন কর্তৃক সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। এই ক্যাম্পে ১০,০০০ উদ্বাস্তু সমবেত হইয়াছিল। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেবাকার্য চালানো হয়। এই সময়ের মধ্যে নূতন ৪,৩৫০ খানি ধুতি, ১০,৭৭৬ খানি শাড়ি, ১৫,৩৬৯ পোশাক-পরিচ্ছদ, ১০,৪২০ খানি কম্বল, ৪১৮টি চাদর, ১৩,০০০ পুরাতন জামাকাপড়, ৫৫৪ কেজি বার্লি, ৬৭ কেজি বিস্কুট, ৯ কুইন্টাল মুড়ি ৬০০ কেজি চিনি, ৮০,৮৫০টি মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট, ৫৫০টি এ্যালুমিনিয়ামের বাসন, ৯৪৪টি এনামেলের থালা, ১,০০২টি হ্যারিকেন, এবং প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও বিতরণ করা হইয়াছিল। বিতরিত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে মাল্টি-পারপাস ফুড, হর্লিকস, সুতার গুলি, সূচ, বই, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্প হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারির মাধ্যমে ৭৫০ রকমের ঔষধও বিতরণ করা হয়। ২০০ খানি পুস্তক সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারও খোলা হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত এই সমস্ত সেবাকার্যে প্রায় ২,৩৮,৮০০ টাকা ব্যয় হয়। বেলুড় প্রধান কেন্দ্রের সহিত রহড়া, নরেন্দ্রপুর ও আসানসোল শাখাকেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সেবাকার্য সুসম্পন্ন হয়।

প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে কাটিহার আশ্রম কর্তৃক পূর্ণিয়া শহরের সন্নিকট বেলা গ্রামে জমি ক্রয় করিয়া ৭৫টি ছিন্নমূল পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কলোনিতে ৫টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুআরির প্রথম সপ্তাহ হইতে রামেশ্বরে এবং মণ্ডপম্ ও রামনাথপুরমের মধ্যবর্তী অঞ্চলস্থ উচিপল্লীতে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র কর্তৃক সাইক্লোন-রিলিফ আরম্ভ করা হয়। সেবাকার্যটি আলোচ্য বর্ষে শেষ হয় নাই বলিয়া বিস্তৃত বিবরণ এবার দেওয়া হইল না; ২৪-৩-৬৫ পর্যন্ত ঝটিকাবিধ্বস্ত দুঃস্থগণের এই সেবাকার্যে প্রায় ৯৫,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

(২) চিকিৎসা: ভারত, পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশে মিশনের অনেক কেন্দ্রেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা হয়। বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুন সেবাশ্রম, কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রাঁচির যক্ষ্মা-হাসপাতাল—এইসব হাসপাতাল ছাড়াও বোম্বাই, কানপুর, সালেম ও নিউদিল্লীর

সেবাকেন্দ্রগুলিতে আপৎকালীন- ও পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি শয্যা সংরক্ষিত আছে। নিউদিল্লীস্থিত চিকিৎসালয়টি টি. বি. রোগীদের জন্ম। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও রেঙ্গুন হাসপাতালে গভর্নমেন্টের অনুমোদিত পরিসেবিকা-শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেবা-প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন' খোলা হইয়াছে, ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ১,০৭৬, এগুলিতে ১৯,৪২৪ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫০টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে পুরাতন রোগীসহ মোট ২৪,২৩,৫২৯ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(৩ **শিক্ষা :** মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা নিম্নলিখিত রূপ :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
কলে	মাদ্রাজ	} ২,৩৬৭	
"	রহড়া (২৪ পরগণা)		
" (আবাসিক)	বেলুড় নরেন্দ্রপুর		
" প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ	পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	১৭০	
বি. টি কলেজ	বেলুড়, পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	২৩৩	
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (পোস্ট গ্রাজুয়েট)	রহড়া	} ৩৯৩	২৪৪
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (জুনিয়র)	রহড়া সরিষা, সারগাছি		
বেসিক ট্রেনিং স্কুল	পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম, মাদ্রাজ		
শারীর শিক্ষা কলেজ	পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	১০০	
গ্রামীণ " "	"	১০৩	
কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়	"	৬১	
সমাজ-শিক্ষা সংগঠক-শিক্ষণ কেন্দ্র	বেলুড়, পেরিয়ানায়কেনপালয়ম	২৬১	

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	বেলুড়, বেলঘরিয়া, মাদ্রাজ, পেরিয়ানায়-কেনপালয়ম	} ১,৬০৯	
জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল	৮	} ৪১,৬৭৫	১৬,১৫৯
ছাত্রাবাস (কয়েকটি অনাথাশ্রম-সহ)	৭৫		
চতুষ্পাঠী	৩		
বহুমুখী বিদ্যালয়	১২		
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮		
উচ্চ বা মাধ্যমিক "	১৪	(মোট ৫৭,৮৩৪)	
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরাজী "	৩৫		
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক "	৪৯		
নিম্নশ্রেণীর ও অন্যান্য "	৫৭		
পরিসেবিকা-শিক্ষণ কেন্দ্র	২		

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে পরিব্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (Institute of Culture) কর্তৃক পরিচালিত দিবা-ছাত্রাবাসে (Day Hostel) ৪০০ জন ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতেছে। এখানে মানবতা ও সংস্কৃতি-শিক্ষা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; উভয় বিভাগে আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৭২ ও ৬৯২।

(৪) **সাহায্য :** প্রধান কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্রগুলির পরিচালনা হইলেও এখান হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে কিছু সাহায্যদানও করা হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিত ভাবে ১০৮টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ২১৮ জন ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, সাহায্যপ্রাপ্তগণের মধ্যে সিন্ধুর উদ্বাস্তুগণ স্থায়ি-ভাবে, এবং দুইটি বিদ্যালয়, ১৭০টি পরিবার এবং ৪৯ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। সাহায্যের মোট পরিমাণ ২৬,৪৭৩

টাকা। ইহা ছাড়া কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৫,৩৩০ টাকা।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতিঃ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিফলিত ভারতের সমন্বয়-মূলক প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। জনসভা, আলোচনা-সভা পুস্তক-প্রকাশন ও উৎসবাদির মাধ্যমেও আধ্যাত্মিক ভাববিস্তার করা হইয়া থাকে।

উপজাতীয় অঞ্চলে কর্মপ্রসার

আসামে খাসি ও জয়ন্তিয়া পর্বতাঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে মিশনের কর্ম প্রসারিত হইতেছে। নেফা (NEFA) অঞ্চলেও কর্মধারা সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীসারদানন্দ-জন্মোৎসব

'উদ্বোধন'-ভবনে গত ১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫) পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের শততম জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। ছাদের উপরে ও নীচের তলায় যে ঘরে বসিয়া স্বামী সারদানন্দজী কাজ করিতেন, সেখানেও তাঁহার প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। উৎসবের অঙ্গহিসাবে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, স্বামী সারদানন্দজীর জীবনী ও বাণী পাঠ ও আলোচনা, ভজন, ভোগরাগ প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। রাত্রে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৯শে পৌষ (১৩. ১. ৬৫) স্বামী বিবেকানন্দের ১০৪তম জন্মোৎসব পূজা, বেদগীতি, কালীকীর্তন, কঠোপনিষদ পাঠ প্রভৃতি সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী বন্দনানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন: স্বামীজী যেন যুক্তিপ্রবণ বিশ্লেষণপরায়ণ তৎকালীন বিশ্ব-মনের মূর্ত জিজ্ঞাসা রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দেশমত চলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধিলাভে ঈশ্বরের অস্তিত্বে নিঃসংশয় হইয়া পরে নিজের কথায় আধুনিক জগতের মনের সব সংশয় মিটাইয়া গিয়াছেন। স্বামী বন্দনানন্দ (আমেরিকার হলিউড কেন্দ্র হইতে কিছুদিনের জন্য ভারতে প্রত্যাগত) বলেন যে, স্বামীজীর যে কথাগুলিকে তিনি আমেরিকাবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করিতে দেখিয়াছেন তাহা হইল: ধর্ম মানে অনুভূতি, ঈশ্বরই আমাদের স্বরূপ—এই স্বরূপ উপলব্ধির নামই ধর্ম; কোন শাস্ত্র বা ধার্মিক ব্যক্তির কথা 'মানিয়া লইবার' প্রয়োজন নাই—নিজের চেষ্টায় ধর্মনিহিত সত্যগুলি উপলব্ধি করিয়া উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লও; ধর্ম 'সায়েন্টিফিক'—বিজ্ঞানীদের

সত্যান্বেষণের ধারা অনুসারে পরীক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির সত্যতা যাচাইয়া লওয়া যায়। স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন: দেশের তৎকালীন পরিবেশের তাগিদে প্রথমাবস্থায় আমরা স্বামীজীকে প্রধানতঃ 'বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী' ও 'স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। স্বামীজীও এদেশে আসিয়া স্বদেশপ্রেম এবং আমাদের তেজবীর্যের পুনরুজ্জীবনের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছিলেন। উহার প্রয়োজনও ছিল। এখন অন্য প্রয়োজন আসিয়াছে—স্বামীজীর বিশ্বজনীন চিন্তাগুলির দিকেই এখন আমাদের বেশী মনোযোগী হইতে হইবে।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী: যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ-রাগ, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন অবলম্বনে কথকতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র ভক্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। অপরাহ্ণে স্বামী জীবানন্দ কর্তৃক গীতা-ব্যাখ্যার পর স্বামী বোধাত্মানন্দ-জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি মহারাজ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও স্বামী অজজানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রামায়ণ-কীর্তন (অঙ্গুরী-সংবাদ) শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: মধ্যাহ্নে বিশিষ্ট গায়ক-সাম্প্রদায় কর্তৃক মাথুর-লীলা-কীর্তন, রাত্রে কাসুন্দিয়া মায়ের মন্দির কর্তৃক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে পালাকীর্তন এবং অপরাহ্ণে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক উপনিষদ্-ব্যাখ্যার পর জনসভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ (সভাপতি), স্বামী মহানন্দ ও স্বামী সুপর্ণানন্দের মনোজ্ঞ ভাষণ।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যায় স্বামী তীর্থানন্দ ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে বিশিষ্ট তরজা-গায়ক-সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ' তরজা-গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে যথারীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু ভক্তের সমাগমে ও ভজনকীর্তনে যোগোদ্যান আনন্দমুখর হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই এই উৎসবটিতে ভক্তগণ বিমল আনন্দ উপভোগ করেন।

উৎসব ও সভা

মেদিনীপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৪ই ডিসেম্বর কৃষ্ণা সপ্তমীতে জননী সারদাদেবীর ১০৩তম জন্মতিথি পূজা-হোমাদিসহ উদ্‌যাপিত হয়। শহর ও মফস্বলের বহু ভক্ত নরনারী সমবেত হন এবং প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজ।

১৮ই ডিসেম্বর একাদশীতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্ণে মন্দিরে শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন হয় এবং সন্ধ্যায় 'আনন্দভবন হলে' স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন।

১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

বেলঘরিয়া ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী ভবনে' স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ১৩ই নভেম্বর দেশরক্ষার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ জওয়ানদের জন্য শিল্পপীঠের ছাত্রগণের রক্তদান উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সকল ছাত্রই রক্তদানে ইচ্ছুক থাকিলেও বর্তমানে সংরক্ষণের উপযোগীরূপে মাত্র ৫০ জন ছাত্রের রক্ত লওয়া হইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ দেশের সঙ্কট-মুহূর্তের প্রয়োজনে সপ্তাহে একরাত্রি করিয়া উপবাস করিতেছে এবং অবসরসময়ে নিজেদের শ্রমে খাদ্য উৎপাদনে ব্রতী হইয়াছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে ছাত্রগণের উৎসাহের প্রশংসা করিয়া আদর্শদেশসেবকরূপে জীবন-গঠনের জন্য তাহাদের অনুপ্রাণিত করেন।

ব্রহ্মচারী বিশ্বচৈতন্যের দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪টা ২৩ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী বিশ্বচৈতন্য (প্রহ্লাদ মহারাজ) ৬৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ উচ্চ রক্তচাপে ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং লখ্‌নৌ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত এস. এন. রতনঝঙ্কারের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে বহু বৎসর যাবৎ বাস করিয়া ভজনাদির মাধ্যমে তিনি তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যাকে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর সেবায় বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে মঠের একজন উচ্চস্তরের সঙ্গীতাভিজ্ঞের অভাব ঘটিল। তাঁহার আত্মা ভগবৎপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ।। শান্তিঃ।।।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর ঃ গত ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার (দক্ষিণেশ্বর) শ্রীসারদামঠে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ত্রয়োদশাধিক শততম জন্মোৎসব একটি শুচিস্নিগ্ধ এবং ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মঙ্গলারতি এবং দেবীসূক্ত পাঠের পর বেলা ৭টা হইতে ১২॥ টা পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচার পূজা হোম এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়।

বাহিরে সুসজ্জিত মণ্ডপে পত্রপুষ্প-সুশোভিত শ্রীশ্রীমায়ের বৃহৎ প্রতিকৃতির সম্মুখে নিবেদিতা বিদ্যালয়, উইমেন্স ওয়েলফেয়ার সেণ্টার এবং বিদ্যাভবনের ছাত্রীগণের সুললিত কণ্ঠের মাতৃবন্দনায় মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। অতঃপর ১১-১২টা পর্যন্ত উক্ত মণ্ডপে প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা সহজ এবং সুন্দরভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনালোচনা করিয়া সমাগত ভক্ত মহিলাদের তৃপ্তি দান করেন। অপরাহ্ণে প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগণিত ভক্ত মহিলার শুভাগমনে মঠে এক সানন্দ এবং পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এবার দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন প্রকার অন্নপ্রসাদ বিতরণ সম্ভব হয় নাই।

বারাসত ঃ রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিন পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীর ১১০তম জন্মোৎসব পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা, ভজন, কথকতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিবানন্দ মহারাজের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় মজুমদার। উৎসবক্ষেত্রে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভারতের তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্র বিহারের অন্তর্গত চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গত ১৪ই নভেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

চন্দ্রপুরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বর্তমানে যে দুইটি টার্বো জেনারেটর যন্ত্র বসানো হইয়াছে তাহা হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলিবে। তৃতীয় টার্বো জেনারেটরটি বসাইবার আয়োজন করা হইতেছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হইলে এখান হইতে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

চন্দ্রপুরা বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইয়াছিল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এবং ইহার প্রথম ইউনিটটিতে কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কেন্দ্র সমূহের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও আধুনিক। কেন্দ্রটির বিশেষত্ব হইল ইহার 'ইলেক্ট্রস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরস্' যন্ত্র, যাহা 'মেকানিক্যাল ডাস্ট কালেক্টারের' সঙ্গে একযোগে সমস্ত স্থানটির বায়ু বিশুদ্ধ রাখিয়াছে।

পরলোকে ভক্ত কালীপ্রসন্ন দাস

পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কালীপ্রসন্ন দাস গত ৩১শে অক্টোবর কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিন দিন পূর্বে তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার কর হইয়াছিল।

করিমগঞ্জ সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠায় যাঁহাদের অবদান অবিস্মরণীয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। উক্ত কাজে তিনি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

শেষজীবনে কর্মব্যপদেশে তিনি বহু বৎসর লক্ষ্ণৌতে অতিবাহিত করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ। ও শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥।

পরলোকে বীরেশ্বর দত্ত

ভারতের বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড কোম্পানীর অন্যতম ডিরেকটর ও মেসার্স ভোলানাথ পেপার হাউস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বীরেশ্বর দত্ত গত ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ (৭. ১২. ৬৫) মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন।

কর্মসূত্রে উদ্বোধনের সঙ্গে বহু দিন হইতে তাঁহার যোগাযোগ ছিল। সদ্‌ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১০ই ফাল্গুন (২২. ২ ৬৬) মঙ্গলবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা পাঠ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুআরি) রবিবার এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে। বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতির জন্য ভক্তগণকে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হইবে না।

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ ১৩৭২ সংখ্যায় ৬৫৯ পৃষ্ঠা, ২য় কলম, ৯ম লাইনে "খুড়তুতো" স্থলে "পিসতুতো" পড়িবেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ

জন্ম : ১৬ই জানুআরি ১৮৮৯ মহাসমাধি : ২৭শে জানুআরি, ১৯৬৬

অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর মহাসমাধি

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার (২৭. ১. ৬৬) রাত্রি ১-১৫ মিনিটের সময় মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।

ইহার কয়েকদিন পূর্ব হইতে চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। তাঁহার পূতদেহ বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান হইতে প্রত্যুষে যাত্রা করা হয়; যাইবার পথে সকাল ৬॥টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের বাটী পৌঁছিলে মাল্যাদিপ্রদান ও আরাত্রিক করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। সেখান হইতে সকাল ৭টায় (১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুআরি) বেলুড় মঠ পৌঁছাইয়া তাঁহার পূতদেহ অতিথিভবনে রাখা হইয়াছিল, সেখান হইতে পুষ্পমাল্যাদিশোভিত পালঙ্কে করিয়া বেলুড় মঠের পুরাতন মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হয় সাড়ে এগারটার সময়। সকালে মঠে পৌঁছিবার পর হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষণ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার নিকট বসিয়া বেদপাঠ ও ভজনাদি করিতেছিলেন। মঠপ্রাঙ্গণে আসিবার পর সমবেত কয়েক সহস্র ভক্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে দুপুর ১২॥টার সময় তাঁহার পূতদেহ গঙ্গাতীরে মঠের পুরাতন ঘাটে লইয়া যাইয়া সন্ন্যাসিগণ আরাত্রিকাদি ক্রিয়া সমাপন করিবার পর উহা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীস্বামীজী ও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির হইয়া শেষকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বাহিত হয় এবং ১-১৫ মিনিটের সময় চিতাগ্নিতে আহুত হয়।

* * * *

স্বামী যতীশ্বরানন্দের পূর্বনাম সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুআরি, বুধবার, পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় নন্দনপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কোনও সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। সুরেশচন্দ্রের মাতা বিধুমুখী দেবীও ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন।

জলপাইগুড়ি এবং বগুড়াতে সুরেশচন্দ্রের শিক্ষাজীবনের প্রথমভাগ কাটিয়াছে, পরে রংপুর জেলার কোন বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজসাহী ও কোচবিহারে কিছুদিন পড়াশুনা করিয়া কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আসিয়া তিনি ভর্তি হইয়াছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জানা যায়,

সংস্কৃতে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ায় সুরেশচন্দ্র বি.এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। অত:পর আরও এক বৎসর তিনি এম.এ. পরীক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করিলেও বৈরাগ্যের প্রেরণায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত সংসারের বাহিরেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। বেলুড় মঠের সহিত যোগাযোগ এবং সেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীর দিব্য সংস্পর্শের ফলে সুরেশচন্দ্রের মনে সংসার-অনাসক্তির বীজ অঙ্কুরিত ও উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবার সুযোগ লাভ করে। মাতাপিতা স্বাভাবিক প্রেরণাবশে তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্র একদিন তাঁহার গর্ভধারিণীকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, তিনি ভগবানলাভের সঙ্কল্প লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণমঠে যোগদান করাই মনস্থ করিয়াছেন এবং সেখানে যদি তিনি আদৌ সিদ্ধমনোরথ না হন, তবে অবশ্যই গৃহে ফিরিয়া মাতাপিতার অভিপ্রায় মত সংসার করিবেন।

সামান্য কিছু পাথেয় সম্বল করিয়া, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুরেশচন্দ্র মাত্র ২২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে আসিয়া যোগদান করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গগণের অন্যতম শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ মহারাজ যখন মাদ্রাজে ছিলেন, তখন তাঁহারই কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দুই বৎসরকাল তিনি 'প্রবুদ্ধ-ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, পরে এক বৎসরের জন্য তিনি বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯২৬ হইতে '৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণমঠের পরিচালনভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যতীশ্বরানন্দজী বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন-সভার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি জার্মাণীতে বেদান্ত-প্রচারকরূপে প্রেরিত হন। ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যাণ্ডের সেণ্টমরিজ্, জেনেভা প্রভৃতি অঞ্চলেও ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়ান, পরে হল্যাণ্ড, প্যারিস এবং লণ্ডনেও কিছুকাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকালে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মাণী ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহারই অক্লান্ত উদ্যমে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফিলাডেলফিয়াতে একটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত কেন্দ্রের দায়িত্বভার সাফল্যের সহিত বহন করেন। অবশেষে য়ুরোপ হইয়া ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন লক্ষ্য করিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষাদি প্রদানের অধিকার প্রদান করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি যেমন সুবক্তা, তেমনি চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন। "এডভেঞ্চারস ইন রিলিজিয়াস লাইফ," "য়ুনিভার্সাল প্রেয়ার্স" এবং "ডিভাইন লাইফ" তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেশ-বিদেশের বহু নরনারী, তাঁহার

জীবন হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সুমিষ্ট আচরণ, সহানুভূতিশীল হৃদয়, উদার ধর্মভাব এবং গভীর অন্তর্জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে তাঁহার শরীরে নানা ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। চিকিৎসকগণের পরামর্শানুযায়ী স্থান পরিবর্তন ও চিকিৎসাদির জন্য গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে ব্যাঙ্গালোর হইতে বেলুড় মঠে আনয়ন করা হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার শরীর অতি দ্রুত অবনতির পথেই চলিতে থাকে এবং বহুমূত্র ও আরও কয়েকটি জটিল উপসর্গ আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া ২৪শে জানুআরি, '৬৬, তাঁহাকে কলিকাতাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইল।

দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি যেন তাঁহার অন্তিমকাল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছিলেন। প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, "মহারাজ আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়েছেন। আর এ শরীর রেখে কী লাভ? এ শরীর এখন চলে যাওয়াই ভাল।" জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত একটি জীবন এইভাবেই নিত্যসত্তায় লীন হইয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

*   *   *

মহাপ্রয়াণের পর ত্রয়োদশ দিবসে, ২৫শে মাঘ (৭. ২ ৬৬) সোমবার দিন বেলুড় মঠে বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল। বহু সাধু-ব্রহ্মচারী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কয়েক সহস্র ভক্ত এই দিন বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকাল ৩॥ টায় স্বামী ওঙ্কারানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও সভাপতি মহারাজ চিত্তস্পর্শী ভাষায় স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য, নিয়মানুবর্তিতা, তপস্যা ও উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের কথা আলোচনা করেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেন, সাধনভজনকে কেন্দ্র করিয়া তিনি অন্য কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেন, সস্নেহ ব্যবহারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন সকলকেই। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী যতীশ্বরানন্দজীর জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরে বলেন যে গুরুর মাধ্যমে আমরা রামকৃষ্ণভাবসমুদ্রেরই স্পর্শ পাই—আমাদের দৃষ্টি কোন গণ্ডীতে সীমায়িত না করিয়া যেন সদাপ্রসারিত রাখিতে পারি সেই অসীম বিস্তারের দিকে। তিনি বলেন, গুরুর উপদেশমত জীবনযাপন করাই হইল গুরুর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদন। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী বলেন, স্বামী যতীশ্বরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের জীবনে যে আদর্শ দেখিয়াছিলেন, সেই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন নিজ জীবনে। শুধু আজ শ্রদ্ধার্পণের দিনে নয়, সারাজীবন সেই আদর্শের অনুধ্যান ও জীবনরূপায়ণের চেষ্টা করিলেই তাঁহার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে।

দিব্য বাণী

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং

দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং

সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং

যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥১

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং

প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং

কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং

যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥২

—স্বামী বিবেকানন্দ

নবদেব ! প্রভু, তোমাবই হউক জয় !

শক্তি-সাগর-সম্ভূত তুমি উর্মি,

প্রেম-হিল্লোলে প্রেমময, লীলাময,

সংশয-বাক্ষস নাশে তুমি

উদ্যত মহা অস্ত্র,

ভববোগহাবী ! শবণ লইনু

শ্রীগুরু, তোম্যবই পায !

নবদেব ! প্রভু, তোমাবই হউক জয় !

সমাহিত তব চিত্ত, হে দেব,

অদ্বয-মহাতত্ত্বে

আবৃত সদা ভকতি-বসনে

প্রোজ্জ্বল, মধুময !

লোককল্যাণ-নিবত সদাই

অদ্ভুত তব কর্ম,

ভবরোগহারী ! শরণ লইনু

শ্রীগুরু, তোমারই পায় !

নরদেব ! প্রভু, তোমারই হউক জয় !

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন স্থূলশরীরে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, আনন্দের হাট-বাজার বসিয়া থাকিত সেই ঘরটিতে। যিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁহার সহিত তিনি সর্বদা এক হইয়া থাকিতেন, আবার একই সঙ্গে তাঁহার বিশ্বরূপ--লীলামূর্তিও দর্শন করিতেন। 'ভাবমুখে অবস্থান', 'অবতার' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা ব্যতীত যুক্তির দিক দিয়া ইহা ধারণা করা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়াছেন: তিনি সাকারও, নিরাকারও, এবং আরও কত কি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের এই অবস্থাকে 'বিজ্ঞানী'র অবস্থা বলিয়া, শ্রীভগবানকে সাকার, নিরাকার সব ভাবে প্রত্যক্ষ করার পরের অবস্থা বলিয়া বর্ণনাকালে ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন—"বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে ·· ··ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ·· ···একমতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে।" একমতে অর্থাৎ অদ্বৈত মতে—এমতে চরম সত্যকে 'দর্শন' করা যায় না। নিজেই নিজেকে দেখা যায় না; দেখিতে হইলে, এই মতে, যুক্তির দিক দিয়া, যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে নিজেকে আলাদা করিতে হয়। যুক্তির দিক দিয়া, নিজেকে একটু নামাইয়া আনিয়া দেখিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ইহা নিজেই নিজেকে দেখা, এবং এই অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানেরও পরের অবস্থা, আগের নহে।

সাকার হইতে নিরাকারে, ইহা আমরা বুঝি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত-সাধনার পূর্বে মা-কালীর চিন্ময়ী মূর্তি জ্ঞানখড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহারও পারে চলিয়া গেলেন, ইহাও যুক্তির দিক হইতে ধারণা করা যায়। কিন্তু তাহারও পরের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তির অতীত।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু অবতার পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে তাই ধারণা করা অসম্ভব, উপলব্ধি ছাড়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের সব তত্ত্বের ধারণাই অস্পষ্ট থাকে: শাস্ত্র পড়ে তাঁকে এক রকম বোঝা যায়, সাধন করে আর এক রকম। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, তখন আর এক রকম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বিবেকবৈরাগ্যহীন শাস্ত্রচর্চার বিশেষ মূল্য দিতেন না। বারে বারে তিনি বলিয়াছেন, যে ভাবেই হোক তাঁর দিকে আগাইয়া যাওয়াই হইল আসল কাজ। তারপর বোঝাবুঝি পরে আপনি হইয়া যাইবে—যদুমল্লিকের সঙ্গে একবার দেখা হইলে তাহার কোথায় কি আছে, সবই জানা যাইবে। "কি জান, এটা (সাকার ও নিরাকার দর্শনে কিরূপ অনুভূতি হয়) ঠিক বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতর রত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর—দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, 'ঐ আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙ্গলুম,—ঐ রত্ন বার করলুম।' শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে হয় না। সাধন করা চাই।"

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে*

স্বামী সারদানন্দ

আমাদিগের স্মরণ আছে, বেলা দুই প্রহরের কিছু পূর্বে সেদিন[১] আমরা সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটস্থ নরেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও সেদিন আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন। প্রথম দর্শন-দিন হইতে আমরা নরেন্দ্রের প্রতি যে দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিযোগে উহা সেদিন সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতঃপূর্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অদ্যকার প্রাণস্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অন্তরে নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈতন্য ও ঈশা প্রভৃতি জগদ্‌গুরু মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যে সকল অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তদ্রূপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিত্যই ঘটিতেছে—ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কারবন্ধন মোচনপূর্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্থ করিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন অথবা তাহার জীবনগতি আধ্যাত্মিক পথে এরূপভাবে প্রবর্তিত করিতেছেন যে, অচিরে ঈশ্বরদর্শন উপস্থিত হইয়া চিরকালের মত সে কৃতার্থ হইতেছে। আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অন্তরের অদ্ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নরকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়। চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়। (তোরা কে নিবি রে আয়।)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। (গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে)
নদে ভেসে যায়।"

গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সত্যসত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পরে বলিতেছেন) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে, পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন!"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া তামসী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না। কারণ নরেন্দ্রের জলন্ত ভাবরাশি মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে—যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপসৃত হইয়াছে, আর অহেতুকী কৃপার প্রেরণায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সান্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তন করারূপ সত্য—যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনা-সম্ভূত—তাহা তখন জীবন্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে!

---

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' হইতে

১ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শীতকাল

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী অদ্বৈতানন্দজীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শরণং

শ্রীবৃন্দাবন ধাম

৭ই ভাদ্র, সন ১৩০০ সাল

(২২. ৮. ১৮৯৩)

গোপাল দাদা,

আমরা অনেকদিন পরে তোমার আশীর্বাদপত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমরা যখন বোম্বে ছিলাম তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম। পরে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে আবু পাহাড়ে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া যান, আমরা সেখানে প্রায় তিনমাস থাকিয়া নীচে নামিয়া গঙ্গাধরের সহিত মিলিত হই ও একসঙ্গে জয়পুরে আসি। তথায় পনের দিন ছিলাম। প্রায় একমাস হইল এ ধামে আসিয়াছি, শীঘ্রই ব্রজের গ্রামে যাইবার বাসনা আছে। গঙ্গাধর খেতড়িতে গিয়াছে। তাহার নিকট হইতে পত্রও পাইয়াছি, সে ভাল আছে। আলমোড়া হইতে তারক দাদাও পত্র লিখিয়াছেন, তিনিও ভাল আছেন। আমাদের ৺কাশী যাইবার খুব ইচ্ছা আছে, এখন বিশ্বনাথের দয়া হইলেই হয়। কলিকাতা বরাহনগরের চিঠি আসিয়াছে, গুরুদেবের কৃপায় সংবাদ মঙ্গল। আমাদের প্রণাম জানিবে। আমরা এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি।

বাগবাজারের হরিমোহনকে তুমি চেন বোধ হয়, আমাদের মঠে কখন কখন আসিত। বেশ ফুটফুটে, পাতলা, ছোট, বছর ১৯।২০ আন্দাজ বয়স, এখন ২৫।২৬ হইবে ; সে বাটী হইতে রাগ করিয়া আজ দেড় মাস হইল পালাইয়াছে। তাহার কাকা আমাদের পত্র লিখিয়াছে। যদি সন্ধান পাও আমাদের অথবা নিমাইচরণ ঘোষ ৫৩নং রাবুপাড়া লেন বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় অনুগ্রহ করিয়া খবর দিলে বিশেষ পরোপকার করা হইবে। হরিমোহনের ঠাকুরমা ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা, তাহার শোকে মৃতকল্পা হইয়া রহিয়াছে। আমরা হরিদ্বারেও কোন পরিচিতের নিকট এই জন্য এক পত্র লিখিতেছি। গঙ্গাধরকেও লিখিয়াছি ও পুনরায় লিখিব। তুমি কেমন আছ? নিবেদন ইতি।

দাস

শ্রীরাখাল ও হরি

শ্রীরামকৃষ্ণ

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমাকে প্রণাম চির-অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার।
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানে নি আর।
দুহাতে কেবল বিলালে অমল জগন্মাতার মহাপ্রসাদ,
ভুলিয়া মায়ায় ভুলিয়া ধরায় ছিলাম আমরা যাহার স্বাদ।

গাহিলে মধুরে: "যে শিশুর সুরে কেঁদে ডাকে: 'মাগো কোথা তুমি,'
'আয় আয়' ব'লে টেনে নেয় কোলে মা তারে—কপোলে স্নেহে চুমি'।
সে-প্রেমময়ীর প্রেমই বুকে বুকে ঝরে যুগে যুগে মধুরিমায়,
সে-আলোময়ীর নয়নমণির আলো জ্বলে রবি শশি তারায়।

"মা তারেই পায় দেন ঠাঁই—চায় গহন হিয়ায় যে তাঁহারে,
চরণে তাঁর যে শরণ না চায়—ঘুরে মরে হায় সে আঁধারে।
মানবজীবন সফলসাধন হয় শুধু সুধাপরশে তাঁর।
সে-সুধায় যার মিটে ক্ষুধা—তার থাকে কি অভাব ভুবনে আর?

"জ্ঞানের গরব, বিভূতি বিভব কত ছলে জনে জনে ভুলায়।—
সোনার-হরিণ মৃগয়ায় করে উধাও রঙিন সুখ-আশায়।
জানিতে সে চায়—বনবীথিকায় আছে কত শাখা, পাতা ও ফুল।
শুধু যায় ভুলে—ফলই প্রাণদাতা, বিদ্যাভিমান মিথ্যামূল।"

চাও নি কিছুই আপনার তরে, করো নি চিন্তা—কী হবে কাল।
ঝরালে মোহন অমৃত-বচন পতিতপাবন রূপে দয়াল।
তা'ই যোগী মুনি কবি জ্ঞানী গুণী গায় নাম তব আঁখিজলে:
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ লুটালো তোমার পদতলে।

(কোরাস)

ধনজনমান-কামনার মোহে দেখে আমাদের অন্ধ ম্লান
ঝলকিয়া নিশা উজলিয়া দিশা উছলিয়া ঊষা এলে মহান্।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ

স্বামী আদিনাথানন্দ

ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনে অবিরত অন্তরে-বাহিরে দেবাসুর-দ্বন্দ্ব আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কখনও দেবশক্তির প্রাধান্য, কখনও বা আসুরিক শক্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যখনই আসুরিক শক্তি প্রাধান্য লাভ করে, ঐশীশক্তিসম্পন্ন কোনও মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের অবতার মানবকল্যাণে দেহধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন ও পথভ্রষ্ট, হতবুদ্ধি মানবকে অমৃতের সন্ধান দেন। ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একদিকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যখন প্রাণচঞ্চল পাশ্চাত্য জড়সভ্যতার মোহে নিজস্ব কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল এবং অপরদিকে অতৃপ্তভোগতৃষ্ণা ও নিত্য নূতন ভোগবাসনার আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবনে বিভ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত পাশ্চাত্যবাসী অগ্নি-উদ্গীরণে উন্মুখপ্রায় আগ্নেয়গিরির শিখরে আরূঢ় থাকিয়া আত্মধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছিল, তখন মানবের কল্যাণার্থে মানবপ্রেম ও ধর্ম-সমন্বয়ের অভয়বাণী প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার আবির্ভাবে ভারত ও পাশ্চাত্যে ধর্ম-জগতে এক নব জাগরণ সূচিত হয়। পাশ্চাত্য মনীষী রোমা রোলাঁ এই আবির্ভাবকে 'নবযুগের পথপ্রদর্শক' এবং নব জীবনের 'দিশারী' রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন (the pilot and guide for the needs of the new age)।

প্রায় সার্ধ এক শতাব্দী পূর্বে কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাঁহার আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের নব-জাগরণের মূল উৎস, যাঁহার উপদেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তঃকলহ-সমাধানের উপায় সুগম হইয়াছে, যাঁহার পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী নিজ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বাহিত হইয়া অগণিত নরনারীর প্রাণে শান্তি সিঞ্চন করিয়াছে, আজ হিংসা, দ্বেষ, ভয়, সন্দেহ ও নব নব বিভীষিকাময় ধ্বংসাত্মক অস্ত্রসম্ভার-সজ্জায় সন্ত্রস্ত মানবজাতির হৃদয়ে সাহস, বিশ্বাস ও প্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া শান্তিস্থাপনে তাঁহার জীবন ও শিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন।

আজ তিনি স্থূল দেহে ধরাধামে প্রকট না থাকিলেও তাঁহার অভিনব জীবনাদর্শ, অভূতপূর্ব শিক্ষা ও অমূল্য উপদেশই মানবজাতির একমাত্র পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণা দিতে সক্ষম। এই দিব্য জীবন ও বাণীর স্মরণ, মনন, প্রণিধান ও অনুসরণই মানবকল্যাণের একমাত্র পন্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, নবাবী আমলের মোহর, যত মূল্যবানই হউক, অন্য যুগে অচল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত পথেই বর্তমান মানব মুক্তিপথের সন্ধান পাইবে। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রাক্কালে প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও অবতার পুরুষদের বাণী যুগপ্রয়োজন-সাধনে অচলপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ সেগুলির কোনটিকেই বর্জন করিতে না বলিয়া স্বীয় ব্যবহারিক জীবনের ও উপদেশের মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, সকল ধর্মেরই অন্তর্নিহিত সারমর্ম সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং সকল ধর্মই মানুষকে অভীপ্সিত

পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতে পারে। স্থানকালপাত্র-ভেদে এবং অভিরুচি অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষের অগ্রগতির ধারা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কাজেই প্রাচীন ধর্ম সবগুলিই থাকা চাই, শুধু সেগুলিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যুগোপযোগীভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ নবীন দৃষ্টিভঙ্গি মানবজাতির মৈত্রী, ঐক্য ও শান্তির পথ সুগম করিতে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় হইতে ভারতের সর্বত্র এক নবীন আধ্যাত্মিক প্লাবন আসিয়াছে এবং তাহার তরঙ্গ পাশ্চাত্যেও গিয়া পৌছিয়াছে। নবজীবনের স্পন্দন এবং অতীত আধ্যাত্মিক গৌরবের জাগ্রত চেতনা ভারতকে ভরপুর করিয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য স্থানে বহুসংখ্যক কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁহার সার্বজনীন, অনুপম, উদার বাণী জড়সর্বস্ব জগতে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে নিজস্ব কৃষ্টি ও আনুষ্ঠানিক আদর্শের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ভাববিনিময়ের পথ বহুলাংশে সুগম করিতেছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বস্টনে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে এক ভাষণে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সরোকিন বলিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও বেদান্ত প্রচারের সফলতা বর্তমান মানবেতিহাসে দুইটি মৌলিক প্রক্রিয়া সংঘটনের লক্ষণ।' স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে জগতে এক নবীন সভ্যতার প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছে; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কৃষ্টির যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা সম্মিলিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মাহাত্ম্য ও বর্তমান মানবজাতির জীবনে তাঁহার আধিপত্যের হেতু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই মনে ভাসিয়া উঠে।

বিগত চারি সহস্র বৎসর ব্যাপী ভারতীয় কৃষ্টি যে আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ, তাঁহার জীবনে তাহাই পুনঃপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়-বহির্ভূত সব কিছুতে, আধ্যাত্মিক সত্যেও আস্থা হারাইতে থাকে এবং ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ও জাগতিক সুখভোগকে জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞানে তৎপ্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়, সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া প্রমাণ করেন যে, ঈশ্বর ও আত্মা সত্য এবং আন্তরিকতার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চেষ্টা করিলে এই জীবনেই এ সত্য উপলব্ধি করা সকলেরই পক্ষে সম্ভব। যোগ, সমাধি, জীবন্মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার নিকট শুধু কথার কথা ছিল না, কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে, সর্বোচ্চ স্তরেও আরোহণ করিয়াছিলেন এবং নিজের এই উপলব্ধি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত সত্যগুলিকে এই ঘোর নাস্তিকতা, অবিশ্বাস ও জড়বিজ্ঞানের যুগে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতে ও পাশ্চাত্যে চিন্তাধারার বর্তমান প্রবণতার একটি হইল, ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা, অর্থাৎ ঈশ্বরসম্পর্ক-বর্জিত সৎপথে জীবনযাপন। মানবধর্মীদের মতে সমাজের হিতসাধন এবং সঙ্গতি- ও সহযোগিতা-বিধান করাই যথেষ্ট; ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে বৃথা চিন্তা অবান্তর, কারণ এই সকল বিষয় দুর্জ্ঞেয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবন দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই আদর্শ ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। তাঁহার জীবনের শিক্ষায় প্রথমে ঈশ্বরের ও তৎপরে জগৎসংসারের স্থান। যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় তিনিও বলিয়াছিলেন, 'প্রথমে স্বর্গরাজ্যের সন্ধান কর, বাকী সব পরে আপনিই আসিবে।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন: বিদ্যাসাগর জানে না যে, মানুষের অভ্যন্তরে

একটি রত্ন আছে; মানুষের অন্তরে ঈশ্বর রহিয়াছেন—তিনিই এই রত্ন, জীবনে সর্বাগ্রে তাঁহাকেই জানিতে হইবে। চিন্তায় ও আচরণে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করিয়া কি ভাবে জীবনের আমূল পরিবর্তন-সাধন সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা বলিয়া ও নিজজীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসার-ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী না হইয়াও সাংসারিক কর্তব্যের মধ্যে থাকিয়াই ভগবানলাভ করা যায়, ইহার উপায়, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রাখিয়া কাজ করা, অন্তরে বৈরাগ্য ও প্রশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা এবং যে ঐশী শক্তি আমাদের জীবন, কর্মক্ষমতা ও সত্তা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহার উপর নির্ভরতা অভ্যাস করা। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম বিশ্বমানবিকতা প্রচার করেন। তাঁহার মানবিকতা বর্তমান চিন্তা-জগতে এক নূতন ধারার সূচনা করিয়াছে, কারণ তাহা ঈশ্বরদর্শন-রূপ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি-সঞ্জাত। একমাত্র সামাজিক কর্তব্য বা মানব-প্রীতি সাধন করিলেই আমাদের অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না, আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান হয় না। তিনি ঈশ্বরারাধনা ও নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা উভয়কেই সমান প্রাধান্য দিয়াছেন; আমাদের নীতি হওয়া উচিত নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ সাধন—এই তাঁহার শিক্ষা। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

পূর্ণতালাভের জন্য জীবনে আত্মোপলব্ধি ও জীবসেবার মিলিত রূপায়ণের প্রয়োজন। সুতরাং 'মানুষের অন্তরে দেবতা বাস করেন এবং মানুষই দেবতায় পরিণত হয়'—তাঁহার এই শিক্ষা উচ্চতর আদর্শস্থানীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি-প্রস্তুতির সহায়ক, যেখানে মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ও ধর্মে-ধর্মে ভেদের কোন স্থান নাই। যে সকল বাধা মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে তাহা সবই, সর্ববিধ বর্জন ও ভেদই ইহা দ্বারা দূরীকৃত হইবে। তিনি এমন এক আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়াছেন, যেখানে সর্ববিধ উগ্রতা, তিক্ততা ও মতভেদ পরিহার করিয়া সকল ধর্মই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম। এই মতানুযায়ী মানুষ অসত্য হইতে সত্যে পৌঁছায় না, শুধু সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে পৌঁছায়। নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটিই নিজস্ব প্রকৃতি ও ধারণাশক্তি অনুযায়ী স্বর্গরাজ্যে প্রবেশলাভের সহায়ক বিভিন্ন ধাপ—ইহা বুঝিতে পারিলে ধর্মসম্বন্ধীয় সব দ্বন্দ্ব, সব ধর্মান্ধতা দূরীভূত হইবে। বর্তমান কালে ইহার বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন নাই। সুদূর অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অদ্যাবধি ভারতের বিভিন্ন অংশে ঋষিকণ্ঠনিঃসৃত যে জাতীয় সুরলহরী ধ্বনিত হইতেছে, তাহাই জোরালো করিয়া আমাদের শ্রবণগম্য করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বেশ সুন্দর ভাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, 'অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শন' (Life in the perspective of the Eternal)

শ্রীরামকৃষ্ণের একক জীবনে মানবজাতির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, একেশ্বরবাদ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, শাক্ত মত, বৈষ্ণব মত অথবা অন্য কোনও প্রকার আরাধনা বা অনুষ্ঠানগুলির কোনও একটি বিশেষ অংশ নয়। স্বীয় জীবনে কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি মানবজাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের সত্যতা আপন অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত করেন। এই কারণেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

করিবার সময় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উচ্চভাব প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করেন।

ধর্মজগতে তাঁহার আর একটি অবদান, পারমার্থিক বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে পথ সর্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহা বাছিয়া লইয়া আন্তরিক ভাবে তাহাতে লাগিয়া থাকাই তাহার কর্তব্য। বিভিন্ন মতবাদ, অনুষ্ঠান ও সাধনপদ্ধতি লইয়া বিবাদে কোনও সার্থকতা নাই, কারণ উপযুক্ত উপদেষ্টার অধীনে আন্তরিকতার সহিত সাধন করিলে প্রত্যেকটিই ঈশ্বরোপলব্ধির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম।

সুতরাং তাঁহার শিক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বিভিন্ন প্রকার মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আলোকের উচ্চ শিখরে উন্নীত করিবার পন্থারূপে সকল ধর্মেরই সহাবস্থানের (co-existence) অধিকার রহিয়াছে। পৃথিবীতে এই হিতকারী শিক্ষা সর্বথা গৃহীত না হওয়ায় মানবজাতিকে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। যতশীঘ্র ইহা সম্যক গৃহীত হইবে তত শীঘ্রই বিভিন্ন ধর্মে মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপিত হইবে এবং ধর্মান্ধতা- ও একদেশিকতা-জনিত অনৈক্য দূরীভূত হইবে।

প্রকৃতধর্মাচরণে জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের অসীম শক্তি নিহিত, তাঁহার জীবনই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ভারতে শুধু সমাজসংস্কার বা আর্থিক পরিকল্পনা দ্বারা সামাজিক ক্রটি বা কুসংস্কার দূর করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক বক্তৃতা অথবা সময়ে সময়ে সাধুতা, দেশপ্রীতি ও সমাজসেবার উপদেশ দ্বারা জাতি তাহার স্বাভাবিক দুর্বলতা পরিহার করিযা সজীবতা ও বল সঞ্চয় করিতে পারে না। ধর্মানুরাগ, আত্মত্যাগ-প্রবণতা ও জনসেবার ভাব দ্বারাই সমাজসংস্কার ও নরনারীকে আদর্শ নাগরিকে পরিণত করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুপম জীবন ও সুউচ্চ প্রেরণাদায়ক উপদেশ ব্যষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এক সুসভ্য ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন পুনরুজ্জীবিত সমাজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিষ্ঠ জাতি গঠনে সহায়তা করিবে। সেই নবগঠিত জাতি ও সমাজ জগৎকে চমৎকৃত করিবে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীকে যদি ব্যাপক হিংসাদ্বেষ এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিলব্ধ অস্ত্রাদিজনিত ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করিতে হয় এবং মানবজাতিকে যুদ্ধভীতি হইতে মুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষে-মানুষে একটি নূতন ধরনের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। মানুষকে শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীব বলিয়া মনে না করিয়া, তাহার সত্তায় নিহিত গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিলেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা হইবে।

মানবজাতির প্রয়োজন বিচার ও প্রেমের নির্দেশানুযায়ী জীবনযাপন করিতে শিক্ষা করা। বিশ্বমানবের একত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করিবার পন্থারূপেই জীবনকে গ্রহণ করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক, যাহাতে মানবজাতি স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিকট আত্মসমর্পণ না করে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ অনুসরণ করিলেই মানবজীবনের এক নূতন তাৎপর্য প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের দৃষ্টিপথে প্রেমময়, সেবাপরায়ণ ও ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবনালেখ্য উদ্ঘাটিত হইবে।

শক্তির উৎস

ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

বিজ্ঞানে বিশেষ অর্থে 'কাজ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কোন জিনিসকে বলের বিপরীতে স্থানান্তরিত করা হ'লে বলা হয় কাজ করা হয়েছে। কাজের পরিমাণ হ'ল, যতটা দূরে স্থানান্তরিত করা হ'ল সেই দূরত্ব ও বলের পরিমাণের গুণফল। যখন কোন ভারী জিনিসকে উঁচুতে তোলা হয় তখন মাধ্যাকর্ষণের বলের বিরুদ্ধে ভারটি স্থানান্তরিত হয় বলেই কাজ করা হয়। যখন পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে রেখে কোন জিনিসকে সরান হয় তখন ঘর্ষণের বলের বিরুদ্ধে এই কাজ করা হয়। যখন কোন ঘড়িতে দম দেওয়া হয় তখন স্প্রীংএর পরমাণু-গুলির পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

শক্তি হ'ল কোন জিনিসের কাজ করার ক্ষমতা। সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষমতাই ছিল শক্তির একমাত্র উৎস। কালক্রমে পশুদের বশে আনার পরে ঘোড়া, গরু ও উট-জাতীয় পশুর দৈহিক ক্ষমতা হ'ল শক্তির অন্য উৎস. বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শক্তির বিভিন্ন উৎস মানুষের আয়ত্তে এসেছে—যেমন কয়লা বা তেলের রাসায়নিক শক্তি, বায়ুর গতির শক্তি, উচ্চস্থানে সঞ্চিত জলের শক্তি। বাষ্পীয় যন্ত্র (Steam engine), বায়ু-নির্ভর যন্ত্র (Wind mill) ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র (Electric generator) ব্যবহার করে ঐ শক্তির উৎস-গুলি থেকে শক্তিকে মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। এই বিভিন্ন ধরনের শক্তির উৎস নিয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা জিনিস থেকে শক্তি আহরণ করা হ'লেও শক্তির মূল উৎস হ'ল দুটি। একটি হ'ল রাসায়নিক শক্তি এবং দ্বিতীয়টি হ'ল সূর্যের শক্তি। কয়লা বা তেল পুড়িয়ে যখন বাষ্পীয় বা তৈলচালিত (Diesel) যন্ত্র চালান হয় তখন কয়লা বা তেলের রাসায়নিক শক্তিই ব্যবহার করা হয়। আবার যখন বায়ুর গতিবেগের সাহায্যে বায়ু-নির্ভর যন্ত্র চালানো হয় বা জলধারার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তখন সূর্যের শক্তি ব্যবহার করা হয়। সূর্যের শক্তিই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপ সৃষ্টি ক'রে বায়ুতে গতি সঞ্চারিত করে এবং সমুদ্রের জলকণাকে বাষ্প করে—যে বাষ্প তুষাররূপে উচ্চস্থানে সঞ্চিত হয় এবং জলধারা হ'য়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। তাই রাসায়নিক শক্তি ও সূর্যের শক্তির মূল কথা কি তা জানা গেলে শক্তির মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

অণু ও পরমাণুর গঠন থেকে রাসায়নিক শক্তি কিভাবে সৃষ্ট হয়, তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে থাকে একটি কেন্দ্রীন এবং এই কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় কতকগুলি ইলেকট্রন। কেন্দ্রীন ধনাত্মক (Positive) তড়িৎযুক্ত এবং ইলেকট্রন ঋণাত্মক (Negative) তড়িৎযুক্ত। তড়িতের গুণ হ'ল—বিপরীতধর্মী তড়িৎযুক্ত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। স্বাভাবিক ভাবে তাই মনে হয়, পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীনের সঙ্গে ইলেকট্রনগুলির মিলিত হ'য়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায় কেন্দ্রীনের সঙ্গে মিলিত না হ'য়েও ইলেকট্রনগুলি বিশেষ

বিশেষ দূরত্বে কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরতে থাকে। কেন এই বিশেষ দূরত্বের কক্ষগুলিতে ইলেকট্রনগুলি স্থায়িভাবে থাকতে পারে তার সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—একে প্রকৃতির একটি নিয়ম রূপেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরতে থাকা অবস্থায় ইলেকট্রনগুলিতে শক্তি সঞ্চিত থাকে। প্রথমতঃ, ইলেকট্রনগুলির গতিজনিত শক্তি—যে ধরনের শক্তি থাকে একটি ছুড়ে দেওয়া গোলকে বা বলে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীনের বলক্ষেত্রে অবস্থানজনিত শক্তি—যে ধরনের শক্তি থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে রাখা কোন ভারে। সৃষ্টির গোড়াতেই যখন বিশ্বের যাবতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণু তৈরী হয় তখনই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলিতে এই শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। যৌগিক পদার্থের অণুর ইলেকট্রনগুলিতেও এমনি শক্তি থাকে। যেমন, একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু, এই অণুতে আছে দুটি অক্সিজেনের পরমাণু ও একটি কার্বনের পরমাণু। সাধারণভাবে তাই ভাবা যেতে পারে, একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণুর ইলেকট্রনগুলিতে সঞ্চিত শক্তির মোট পরিমাণ হবে দুটি অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রন ও একটি কার্বনের পরমাণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তির যোগফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। কেননা যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু গঠিত হয় তখন কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি শুধুমাত্র একটি কেন্দ্রীনের বলক্ষেত্রে থাকে না—থাকে তিনটি কেন্দ্রীনের মিলিত বলক্ষেত্রে।

যখন কয়লা বা তেল পোড়ান হয় তখন যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তাতে পরমাণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে নূতন অণুর সৃষ্টি করে। যেমন ধরা যাক কার্বনের বা শুদ্ধ কয়লার দহন। এই দহনের সময়ে কার্বনকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে রেখে উচ্চ তাপমাত্রায় আনা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণুগুলি সহজেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণু তৈরী করে এবং এই তৈরী হওয়ার ঘটনাটিই হ'ল কার্বনের দহন। দহনের পূর্বে একটি কার্বন ও দুটি অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রনে যে শক্তি থাকে, দেখা যায় দহনে তৈরী কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ তা থেকে কম। এই উদ্বৃত্ত শক্তিই দহনের সময়ে তাপরূপে প্রকাশিত হয় এবং 'কাজ'-এ লাগে। এরকম যে সব রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপ উৎপন্ন হয়—তার সবগুলিতেই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের নিকটে থাকার জন্য ইলেকট্রনের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে সেই শক্তিই ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যেতে পারে, রাসায়নিক শক্তির উৎস হ'ল কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের পরস্পরের বন্ধনজনিত শক্তি। যখন পরমাণুগুলি প্রথমে তৈরী হয়েছিল তখন অন্য কোন উৎস থেকে এই শক্তি এসেছিল। আবার সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত শক্তি আহরণ করে উদ্ভিদজগৎ নিত্য নূতন অণু তৈরী করছে এবং এই শক্তি দাহ্যপদার্থে সঞ্চয় করছে। রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকালে পরমাণুর ইলেকট্রনে সঞ্চিত শক্তি বা সূর্য থেকে আহরণ করা শক্তিই মানুষ ব্যবহার করে।

ভাবা যেতে পারে যে, সূর্যের শক্তিও কোন রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছে। রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট ভরের জিনিস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের শক্তি পাওয়া যেতে পারে, শক্তির এই পরিমাণ বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনে বিভিন্ন। কিন্তু সূর্যের ভর নিয়ে

হিসেব করলে দেখা যায় যে, মানুষের জানা কোন রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে সূর্যের পুরো শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে না। তাই বহুদিন পর্যন্ত সূর্যের শক্তির উৎস মানুষের নিকট ছিল অজ্ঞাত। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদার্থ বিজ্ঞান নূতন কয়েকটি ঘটনা আবিষ্কৃত হয়, যা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা করে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন বস্তুর গতিজনিত শক্তি বৃদ্ধি পেলে বস্তুটির ভরের পরিবর্তন হয়, এবং ভরও হচ্ছে শক্তিরই অন্য রূপ। কাজেই গতিহীন অবস্থাতেও সব বস্তুতে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত আছে। এই শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের বন্ধনজনিত শক্তির চেয়ে বহুগুণ বেশী। ভরের প্রধান অংশ কেন্দ্রীনে থাকে; তাই ভাবা যেতে পারে যে ভরজনিত শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রীনকে আশ্রয় করেই আছে। যদি কোন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীনের ভরের পরিবর্তন করা যায় তাহলে তার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। কিন্তু যত রকমের পরিবর্তনের কথা জানা ছিল, দেখা গেছে সে সবক্ষেত্রেই কেন্দ্রীন অপরিবর্তিত থাকে।

বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন নিয়ে অনুসন্ধান করলে কিভাবে কেন্দ্রীনের ভরের পরিবর্তন হ'তে পাবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরমাণুর কেন্দ্রীন তৈরী হয় নিউট্রন- ও প্রোটন-কণার সমন্বয়ে। যেমন ধরা যাক হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন। এই কেন্দ্রীনে আছে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন। আশা করা যায়, হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর হবে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটনের ভরের যোগফল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর এই যোগফলের চেয়ে কিছুটা কম। এই ভরের তারতম্যের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভরের বিচ্যুতি' (Mass defect)। ভরের বিচ্যুতি থাকায় প্রমাণিত হয় যে, যখন দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন পরস্পরের নিকটে এসে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী করে, তখন এদের ভরের কিছুটা অংশ এই কার্যে ব্যয়িত হয়। কাজেই হিলিযামের কেন্দ্রীন থেকে যদি নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে আলাদা করতে হয়, তাহ'লে ঐ ব্যয়িত ভরের সমপরিমাণ ভর পুরোপুরি শক্তিতে রূপায়িত হ'লে যতখানি শক্তি হয়, বাইরে থেকে ততখানি শক্তি সেখানে দিতে হবে। এজন্য, ভরের বিচ্যুতি আছে বলে, বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীনগুলি স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং সহজে তাদের মধ্যে পরির্তন আনা যায় না। ভরের বিচ্যুতির সমপরিমাণ শক্তিকে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীনের বন্ধনশক্তি। তাই যে কেন্দ্রীনের ভরের বিচ্যুতি যত বেশী, তার বন্ধনশক্তি এবং ফলে স্থায়িত্বও ততই বেশী হবে। সবচেয়ে কম প্রটোনযুক্ত কেন্দ্রীনের ভরের বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা কম। কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা বাড়লে ভরের বিচ্যুতি বাড়তে থাকে, আবার আশিটির বেশী প্রোটনের সংখ্যা হ'লে ভরের বিচ্যুতি কমতে থাকে। এ-থেকে বোঝা যায়, যদি কম প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনকে বেশী প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনে পরিবর্তিত করা যায় বা আশিটির বেশী প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনকে কম প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রীনে পরিবর্তিত করা যায়, তাহ'লে শক্তি উৎপন্ন হবে, কেন না পরিবর্তনের পরের কেন্দ্রীনের ভর পরিবর্তনের পুর্বের কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে কম হবে। যে ভর এভাবে হারিয়ে গেল, সেই ভর শক্তি হ'য়ে দেখা দেবে। কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তন করা যেতে পারে তার কোন উপায় বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। কতকগুলি নূতন

ঘটনা থেকে বলা যেতে পারে, আকস্মিকভাবে এই পরিবর্তনের রহস্য ধরা পড়েছে।

রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কারের পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বেকারেল দেখতে পান, কতকগুলি পদার্থ থেকে রঞ্জনরশ্মির মতই ছবি তুলবার কাগজে ছাপ ফেলার ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি আপনা হ'তেই বের হয়। এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radioactive ray) এবং পদার্থগুলিকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির মধ্যে থাকে কিছু গতিশীল ইলেকট্রন বা বীটা রশ্মি, কিছু আলো এবং রঞ্জনরশ্মির চেয়েও শক্তিশালী রশ্মি বা গামা রশ্মি এবং কিছু গতিশীল কণা বা আলফা কণা। দেখা যায়, আলফা কণা হ'ল হিলিয়ামের কেন্দ্রীন। তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে আলফা কণার উপস্থিতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তেজস্ক্রিয়ায় পরমাণুর কেন্দ্রীন পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারাও দেখা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনে পদার্থের রাসায়নিক গুণও পরিবর্তিত হয় বা পরমাণুগুলি নূতন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনে যে ভর বিলুপ্ত হয় সেই ভরের শক্তিই বীটা ও আলফা রশ্মির গতিজনিত শক্তি ও গামা রশ্মির শক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু সাধারণভাবে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের খুব অল্প অংশেরই পরিবর্তন হয় বলে তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এক সঙ্গে খুব বেশী শক্তি পাওয়া যায় না। কয়েকটি বিশেষ পদার্থেই তেজস্ক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে পরমাণুর পরিবর্তন হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫। সাধারণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে এর রাসায়নিকগুণের কোন পার্থক্য নেই কিন্তু কেন্দ্রীনের গঠনে সামান্য বিভেদ আছে। এই ইউরেনিয়ামের একটি বিশেষ পরিমাণের বেশী একই সঙ্গে রাখা হ'লে তেজস্ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হ'তে থাকে। তাই ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার একটি বিশেষ মাধ্যম হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫। পারমাণবিক চুল্লীতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় বা পারমাণবিক বোমায় যে শক্তি প্রকাশিত হয় তা হ'ল ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা সমধর্মী অন্যান্য কেন্দ্রীনের শক্তি।

তেজস্ক্রিয়ায় খুব অল্পপরিমাণ পদার্থ থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সূর্যে ইউরেনিয়াম বা সমধর্মী পদার্থের পরিমাণ সম্পর্কে যতটা হিসেব পাওয়া যায়, সে হিসেব থেকে তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যের শক্তির উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয় না। আগেই দেখান হয়েছে যে, যেমন উচ্চসংখ্যার প্রোটনযুক্ত পরমাণুর কেন্দ্রীনের পরিবর্তনে শক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি খুব কম সংখ্যার প্রোটনযুক্ত পরমাণুর কেন্দ্রীন উচ্চসংখ্যার প্রোটনযুক্ত পরমাণুর কেন্দ্রীনে পরিবর্তিত হ'লে ভরের পরিবর্তন হ'য়ে শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন সহজে ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন কার্বনের দহনের জন্য কয়লাকে উচ্চতাপমাত্রায় আনতে হয়, তেমনি হাইড্রোজেনকেও খুব উচ্চ তাপমাত্রায় আনলেই হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন থেকে হিলিয়ামের কেন্দ্রীন সৃষ্টি হ'তে পারে। এই তাপমাত্রা সাধারণভাবে তৈরী করা অসম্ভব। নানারকম পরীক্ষা এখনও চলছে কিন্তু পরীক্ষাগারে বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই পরিবর্তন এখনও করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এভাবে প্রচুর শক্তি যে উৎপন্ন হ'তে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে হাইড্রোজেন বোমায়। পারমাণবিক বোমার শক্তি ব্যবহার করে উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি করে হাইড্রোজেন বোমায় হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিবর্তিত করা হয় এবং তার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে, সূর্যের

শক্তিও আসে এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, শক্তির উৎস হ'ল দুটি। একটি হ'ল ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীনের বন্ধনজনিত শক্তি—যে শক্তি রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি হ'ল কেন্দ্রীনের আভ্যন্তরীণ প্রোটন ও নিউট্রনের বন্ধনশক্তি—যে শক্তি আসে সূর্য থেকে বা উৎপন্ন হয় পারমাণবিক চুল্লীতে। প্রকারান্তরে রাসায়নিক ও পারমাণবিক শক্তি—এই উভয় ক্ষেত্রেই ইলেকট্রন বা নিউট্রন ও প্রোটনের পরস্পরের নিকটে অবস্থানজনিত শক্তিই ব্যবহৃত হয়।

যদি কোন প্রক্রিয়ায় সত্যসত্যই কেন্দ্রীনের প্রোটন ও নিউট্রন বা ইলেকট্রনকে বিলুপ্ত করা যায় তাহ'লে আইনস্টাইনের সূত্রানুসারে এদের ভরের বিলোপ হ'য়ে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হবে। বিভিন্ন কণা নিয়ে পরীক্ষার ফলে সাম্প্রতিক কালে এভাবে শক্তির নূতন উৎস আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দেখা গেছে, বিশ্বে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া আরো অনেক কণা থাকতে পারে। ঠিক ইলেকট্রনের ন্যায় একটি কণা আছে যার ভর এবং সব গুণই ইলেকট্রনের ন্যায়, কিন্তু তড়িৎ বিপরীতধর্মী। এই কণাটির নাম হ'ল পজিট্রন। যদি কোন প্রক্রিয়ায় একটি পজিট্রন ও ইলেকট্রনে সংঘাত হয় তাহ'লে এরা পুরোপুরি বিনষ্ট হয় এবং এদের ভরের সমপরিমাণ শক্তি দেখা দেয়। কিন্তু এভাবে শক্তি উৎপন্ন করার কার্যকরী কোন উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। হয়ত ভবিষ্যতে এমনি কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভরকে সোজাসুজি শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হবে। মানুষের সভ্যতায় সেদিন একটি বিশেষ দুশ্চিন্তার অবসান হবে, কেন না সেদিন মানুষের হাতে আসবে শক্তির কাঁচামালের এমন এক খনি, যা চিরদিন থাকবে পূর্ণ। শক্তির বর্তমান উৎসগুলি ফুরিয়ে গেলে কি হবে—এ ভাবনা সেদিন মানুষকে আর ব্যস্ত করতে পারবে না।

পাঙ্গী পাহাড়

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পাঙ্গী পাহাড় পূর্ণ্য হল রক্তরাঙা অরুণরাগে,
কুঞ্জ ছেয়ে কেয়ূর-কাকন গড়ল কুসুম পদ্মরাগে।
অবাধ চড়াই-উৎরায়েতে অমর্ত্যলোক পড়ল ধরা,
হৃষ্ট হ্রদের ধোঁয়ার খেয়া পাল উড়ালো গন্ধভরা।
বিশ্বরূপের সেবাশিবির স্বপ্নভরা বনস্পতি
দেওদারেরই সবুজ পাতায় আঁকলো কী এ অমরজ্যোতি!
বিশাখা ও ইরাবতীর তটরেখায় ছন্দ জাগে,
মন্দিরেতে বাসুকী নাগ যেন মকরন্দ মাগে!
গহন চীড়ের বনের নীড়ে নন্দনলোক হল ধরা,
ঝোরার তানে পাখির গানে শৈলনিবাস ক্লান্তিহরা।
প্রজাপতির পাখায় জ্বলে সবজি ক্ষেতের সবুজ পরশ,
প্রাণ জাগানো ওকের পাতায় রাত্রিশেষের দিব্য হরষ!
পাঙ্গী পাহাড় সঙ্গী পেল হীরকখচা বরফচূড়ায়,
আহা একি রক্ত-রবি হিমালয়ের অমা উড়ায়!

মৌলনা রূমীর অধ্যাত্মকাব্য[১]

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

ভূমিকা[২]

সেই গূঢ় রহস্যের উপলব্ধি ও তাহাতে নিশ্চয়স্থিতি লাভার্থে এই কাব্যগ্রন্থ (সত্য) ধর্মের পরম উৎসস্বরূপ। ইহা ভগবানের পরম বিজ্ঞান, সুদর্শন পন্থা ও তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ। বেদীমূলের বর্তিকার ন্যায় এই প্রদীপ[৩] উষার প্রভা হইতেও দেদীপ্যমান।[৪] ইহা তরু-গুল্ম ও প্রস্রবণ সমন্বিত হৃদয়-স্বর্গোদ্যান—যাহার একটি প্রস্রবণ এই (ধর্ম-) পথের পথিকদের উপযোগী 'সল্‌সবীল্‌'[৫] নামে অভিহিত। ভগবৎ জ্ঞানী ও প্রেমিকদের নিকট এই গ্রন্থ একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল ও প্রকৃষ্ট বিশ্রামস্থান। ধার্মিক ব্যক্তিগণের নিকট ইহা পরম উপাদেয় ও আহায ও স্বাধীন ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা অতি মনোরম ও আনন্দদায়ক। আর ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের জন্য মিশরের নীল নদের (জলের) ন্যায় ইহা একটি পানীয় দ্রব্য, কিন্তু অবিশ্বাসী ও ফর'উনের[৬] অনুসরণকারীদের পক্ষে বিষাদময়, যেমন সর্বশক্তিমান ভগবান বলিযাছেন, "তিনি অনেককে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, আবার অনেকে ইহাদ্বারা প্ররোচিত হইয়াছেন।"[৭] ইহা (ভগ্ন-) হৃদয়ের নিদান, ব্যথিতের সান্ত্বনা ও কোরানের ব্যাখ্যাতা। ইহা মহৎ দান-সামগ্রীর প্রাস্তর ও (দুর্বল-) চরিত্রের উৎকর্ষসাধক। ইহা সেই (শুদ্ধাত্মাদের) শুদ্ধ হস্তের পূত লেখনী দ্বারা (রক্ষিত) যাঁহারা সর্বদা "পবিত্রাত্মা ব্যতীত কেহই ইহা স্পর্শ করিতে পারে না"[৮] —এই নিষেধ-বাক্য বলিয়া

---

১ প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী একজন শ্রেষ্ঠ সুফী দার্শনিক। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ইরানের অন্তর্গত বল্‌খ্‌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল তদানীন্তন রোমের কোনিয়া শহরে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে তথায়ই প্রাণত্যাগ করেন। আর একজন প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী কবি তাঁহার এই **মস্‌নবীয়ে-মনবী** (বা অধ্যাত্ম-কাব্য)-কে পরবর্তীকালে 'ফারসী কাব্যে কোরান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নিকট ইহা একটি পবিত্র গ্রন্থ।...

২ মূল রচনা আরবী গদ্যে লিখিত।

৩ মন্দির বা মসজিদে ক্ষুদ্র প্রদীপটি যেমন ভগবৎ-আলোর প্রতীকস্বরূপ, তেমনি কবিবরের কাব্যগ্রন্থটি যেন সেই উজ্জ্বল প্রভারই বিকিরণ-মাত্র।

৪ তুঃ কোরান ২৪, ৩৫।

৫ 'সল্‌সবীল্‌' অর্থে কবি বুঝিয়াছেন "পথ (বা তাঁহাকে জানিবার উপায) জিজ্ঞাসা কর" (তুঃ মস্‌নবী, ৬ খণ্ড, ৩৫০২)।

৬ ফর'উন্‌ বা Pharaoh প্রাচীন মিশর-দেশের একজন রাজা। তাঁহার দুষ্কৃতিপূর্ণ অত্যাচারের জন্য তিনি অবশেষে ভগবৎ-অনুগৃহীত মূসার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

৭ তুঃ কোরান ২; ২৬। এই পবিত্র গ্রন্থের তত্ত্বপূর্ণ কাহিনীসমূহের উদ্দেশ্যে এই উক্তি করা হইয়াছে। কবিবর নিজেও এই কাব্যের ষষ্ঠ খণ্ডে ৬৫৫ এবং তাহার পরবর্তী পঙ্‌ক্তি-সমূহে বলিয়াছেন, অনেকেই তাঁহার অধ্যাত্ম-কাব্যের তত্ত্বপূর্ণ কাহিনীগুলির গূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিয়া হয়ত প্রবঞ্চিত হইবেন।

৮ তুঃ কোরান ৫৬; ৭৮।

অসিয়াছেন। "সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে মিথ্যাচার কখনও ইহার নিকটবর্তী হইতে পারে না।"[৯] কারণ, ভগবানই ইহা রক্ষা করিয়া পরিদর্শন করিতেছেন। বস্তুতঃ "তিনিই পরম রক্ষক ও দয়াশীলদের মধ্যে পরম দয়ালু।"[১০] পরম শক্তিশালী ভগবানের নির্দেশিত এই গ্রন্থের আরো অনেক সুমহান আখ্যা রহিয়াছে। তবে আমরা এই অল্প (আখ্যা-) দ্বারাই ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতেছি। কারণ, অল্পই বহুর পরিমাপক, ক্ষুদ্র জলকণাই জলস্রোতের গুণ-নির্দেশক; এবং একটি তণ্ডুলকণাই বিশাল শস্য-ভাণ্ডারের প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হয়।

পরম দয়ালু ভগবানের কৃপাপ্রার্থী বল্খ্‌বাসী হুসেনের পৌত্র ও মুহম্মদের পুত্র এই হীন সেবক (জলালুদ্দীন) মুহম্মদ তাঁহাকে নিবেদন উদ্দেশ্যে বলে, "আমার প্রভুর ইচ্ছায় আমি এই কাব্যকে ছন্দিত শ্লোকে পরিবর্ধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছি --যাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে আশ্চর্য কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য প্রবচন, সুমহান আলোচনা, অমূল্য ইঙ্গিত, তপস্বীদের গোচারণ ও ভক্তদের উদ্যান —যাহার প্রত্যেকটি প্রকাশে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থে পরিপূর্ণ। আর আমার পরম আশ্রয় ও নির্ভর সেই প্রভু—যিনি আমার দেহে আত্মারূপে অবস্থিত ও আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের পরম সম্পদ—সেই শেখ যিনি জ্ঞানীদের আদর্শ, সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসীদের চালক, বিনশ্বর প্রাণীদের সহায়ক ও তাহাদের চিত্তবৃত্তি ও বিবেকের নির্ভর—যাঁহার উপর ভগবান তাঁহার সৃষ্টজীবের ভার অর্পণ করিয়াছেন—সেই নির্বাচিত মানব, যিনি অবতারের কর্তব্য পালনকারী ও সেই গূঢ় রহস্যের জন্যই নির্বাচিত, দেবলোকের ধনাগারের দ্বারোদ্ঘাটনকারী, মর্ত্যলোকের ধনসম্পদের বিশ্বস্ত অধ্যক্ষ, গুণসমূহ বা বিভবাদির উৎস, **সত্য ও ধর্মের ক্ষুরধার অসি (হুসামুল্‌-হক্‌ ও অল্‌-দীন্‌)**—অল্‌-হসনের পৌত্র ও মুহম্মদের পুত্র হসন—যিনি ইবনে-অখী তুর্ক[১১] নামে সমধিক পরিচিত,—সেই আধুনিক আবু ইয়জীদ,[১২] সমকালীন জুনয়দ,[১৩] —সেই পবিত্র সদ্বংশ জাত উর্মিয়হ অধিবাসী পবিত্র আত্মা—তাঁহাদের সকলের উপর ভগবৎ-করুণা বর্ষিত হউক—সেই সাধক-প্রবরের বংশধর,—যাঁহার "সায়াহ্নে আমি ছিলাম কুর্দ-অধিবাসী, আর প্রাতঃকালে আরব-অধিবাসী"—উক্তির জন্য সেই মহামানব[১৪] চিরসম্মানিত। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ চিরশান্তি লাভ করুন। কত মহান সেই পুরগামী ও তাঁহার অনুগামী।

তাঁহার এমন একটি বংশ যাহাকে সূর্য তাহার কিরণ-ছটায় আচ্ছাদিত করিয়াছে—এবং সেই বংশগৌরবে তারকারশ্মি নির্বাণ-প্রায়। তাঁহাদের অঙ্গণ ভাগ্যের "কিব্‌লহ"[১৫]-স্বরূপ,—

৯ তুঃ কোরান ৪১, ৪২।

১০ তুঃ কোরান ১২, ৬৪।

১১ অর্থাৎ 'অখী-তুর্ক' নামক তুরস্ক দেশের একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কবিবরের প্রিয় শিষ্য এই হুসামুদ্দীন তাঁহার গুরুর দেহাবসানের অব্যবহিত পরে রূমী-প্রবর্তিত 'মৌলবী' সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাতা হন।

১২ বিস্তাম-অধিবাসী ইয়জীদ বা বায়জীদ একজন প্রসিদ্ধ ফারসী সূফী সাধক। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৩ বাগদাদের অধিবাসী সূফী সাধক জুনয়দ ৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন।

১৪ কুর্দ-অধিবাসী আবুল-ওফার সহিত এই সাধক-প্রবরকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। আবার কাহারো মতে তিনি শিরাজ আবু আব্দুল্লাহ বাবুনী বা আবু হফ্‌স্‌ অল্‌-হদ্দাদ।

১৫ 'কিব্‌লহ' অর্থ লক্ষ্যস্থল বা বেদীমূল।

যেখানে আধ্যাত্মিক রাজবংশীয়গণ সম্মানিত হইয়াছেন, ইহা আশার "কাবা"-স্বরূপ, যেখানে কৃপার অভিলাষিবৃন্দ চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইরূপ আকর্ষণ অবলীলা-ক্রমে চলিতে থাকুক, যতদিন তারকারাজি উদ্ভাসিত হয় এবং সূর্য প্রাচ্যাকাশে দীপ্তিমান থাকে—এবং অবশেষে সৎ, পবিত্র, আত্মজ্ঞান ও দিব্যভাবাপন্ন সুমহান ব্যক্তিদের সমৃদ্ধির কারণ-রূপে বিবর্তন লাভ করুক—তাঁহারা যেমন অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন, তেমনি মৌন হইয়াও সর্বজ্ঞ, অদৃশ্য হইয়াও সর্বত্র বিদ্যমান ; এবং সূত্রাবরণের অন্তরালে সম্রাট ও দেশকালের নায়করূপে বর্তমান—তাঁহারা যেমন সর্বগুণসম্পন্ন, তেমনি ভগবৎ-নিদর্শনের আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। "হে সর্বজীবের প্রভু, তুমি চিরস্থায়ী হও।"—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যাহা কখনই অগ্রাহ্য হইবে না এবং যাহা সর্বকালে সর্বলোকে সমর্থন করিবে। —এই উভয়লোকের প্রভু ভগবানকে প্রণাম জানাই, এবং সেই প্রভু তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-পুরুষ মুহম্মদ[১৬] ও তাঁহার পবিত্র ও শুদ্ধাত্মা অনুগামীদের (সর্বদাই) আশীর্বাদ করিতেছেন।"

প্রস্তাবনা[১৭]

শুনরে, কী যে ব্যথা বাঁশী বলে,
বিরহের ব্যথাই যে সে বলে।[১৮]
ঘর হ'তে মোরে ছিনে এনেছে যবে,
মোর সুরে কাঁদে স্ত্রী-পুরুষ সবে।
দগ্ধ হিয়া চাইরে বিচ্ছেদ তরে,
প্রেম-ব্যথা যে তবে কইতে পাইবে।
রয়েছে যে তার বঁধু থেকে সরে,
সে-ই যে খুঁজে বঁধু মিলন তরে।
যে সভায়ই গাইবে আমার বেদন,
দুঃখি-সুখী সবাই যে আমার পরাণ।
নিজ-ভাবে সে, বঁধু যে মানয়ে ;
মর্মব্যথা যে কভু না পুছয়ে।
কৈ তফাৎ গোপন-কথা ও ক্রন্দনে ?
চোখ ও কান যে অন্ধ সে সুদর্শনে।[১৯]
দেহ ও প্রাণে নেই কভু রে আবরণ ;
অন্তর্দৃষ্টির নেই তবু কিছু মনন।
বেণু-সুরে যে আগুন, নয় হাওয়া।
নেই যেথা সে আগুন,
হোক হাওয়া।[২০]
প্রেম-বহ্নি আছে এ বেণু-অন্তরে,
প্রেম-নৃত্য আছে এ সুরা-অন্তরে।১০॥

---

১৬ অর্থাৎ পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ। মুহম্মদের শব্দগত অর্থ—যে প্রশংসার যোগ্য।

১৭ এখানেই কাব্যারম্ভ বা সূচনা। এই কাব্যাংশটিকে কোন ব্যাখ্যাকার "নঈ-নামহ" (বা বাঁশীর জীবন-কাহিনী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলা যাইতে পারে যে মানুষেরই আত্মস্বরূপটি যেন বাঁশীরূপে নিজের দুঃখব্যথা বর্ণনা করিতেছে।

১৮ মূল ছন্দানুযায়ী কাব্যানুবাদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। তথায় আছে: ফা'ইলাতুন্ ফা'ইলাতুন্ ফা'ইলুন্ অর্থাৎ দীর্ঘ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, দীর্ঘ উচ্চারণের পুনরুক্তি ও শেষ পর্বে একটি দীর্ঘ-উচ্চারণের সংক্ষেপ। (অর্থাৎ – ⏑ – –/ – ⏑ – –/– ⏑ –) আর ফারসী মসনবী-কবিতার ন্যায় এখানেও প্রত্যেক শ্লোকের উভয় চরণের অন্ত্যমিল রহিয়াছে।

১৯ কবির অন্তরের কথা কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না।

২০ আগুন অর্থে ভগবৎ-প্রেম। যাহার প্রাণে সেই প্রেম-বহ্নি নাই, সে কেবল বাসনা-অগ্নিতে জ্বলিয়া মরিবে। 'হাওয়া' ফারসীতে দ্ব্যর্থক—বায়ু ও বাসনা।

বিরহীদের বাঁশরী হয় আত্ম-জন,
পর্দা তার পর্দা মোদের করে ছেদন।[২১]
বাঁশরীর সে ঔষধি আর সে গরল,—
সে তৃষা আর নিগ্রহ যে
দেখি বিরল।[২২]
বাঁশরীতে রক্ত-রাহার বিবরণ,
প্রেম-গাথা মজনুনের সে বিবরণ।[২৩]

রক্ত-রাহার বিবরণ—অর্থাৎ প্রেম-পথে একদিকে যেমন প্রেমের আকুলতা ও বিরহে দুঃখ-কষ্টে ভরা জীবন, তেমনি আবার বন্ধুর মিলনের আনন্দোল্লাসে রক্তে রঙ্গীন পথ।

গোপনাচারী বন্ধু বেহুশ যে হয়,
গুপ্ত-বিষয় কানাকানিতেই রয়।[২৪]
দুঃখে যার দিনগুলো রয় ভরা,
বহ্নি সাথে দিনগুলো ভাগ করা।
যায় যদিরে দিন, বলি, চল্—নাই ভয়,
তুমিই কেবল থাক, হে গুণময়।[২৫]
মীন নহে যে, সে জলে প্রাণান্ত হয়,
রুজি যার হারা, রুজে দেরীই হয়।[২৬]
পক্ক যে তার হাল বুঝিবে কি বা থাম্;
তাই আর আলোচনা নয়, অস্-সলাম্।[২৭]
খোলরে বাঁধ, মুক্ত হও, আমার তনয়!
স্বর্ণরৌপ্য-শৃঙ্খল আর তোদের ত নয়।
ঢাল কুঁজায় জল যদি বা সাগরের,—
জল ধরিবে তা কত আর?—
এক দিনের[২৮]। ২০॥
লুব্ধ-কুঁজো হয় কভু কীরে পূরণ?
তৃপ্ত হইলে শুক্তি মুক্তায় তা পূরণ।
বস্ত্র যার প্রেমে হয়েছে ছিন্ ও ভিন্;
লোভ-ও-আর সব পাপ হতে সে
বিচ্ছিন্।[২৯]

---

২১ প্রেমের প্রতীক বাঁশরীর সুরের (বা পর্দার) আকর্ষণে আমাদের পর্দা বা মালিন্যের অন্ধকার দূর হইয়া যায়।

২২ সদসৎ-এর সুসমঞ্জস সম্মিলনেই প্রেমের বা সুন্দরের প্রকাশ। তাই প্রেমের একদিকে যেমন উচ্ছলতা, তেমনি অন্যদিকে রহিয়াছে সংযমের দৃঢ় বন্ধন।

২৩ মজনুঁ সুফী সাহিত্যের একজন আদর্শ প্রেমিক। লয়লা-মজনুনের প্রেম-কাব্য ফারসী-সাহিত্যে চির-প্রসিদ্ধ।

২৪ ভগবৎ-তত্ত্ব অতি রহস্যপূর্ণ এবং ইহার শিক্ষা একদিকে যেমন গুরু-পরম্পরায় দেওয়া হয়, তেমনি আবার তাহা কেবল আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিকেই অতি সতর্কভাবে দান করিতে হইবে। এবং এই জ্ঞান কেবল বেহুশ (বা অজ্ঞান) অর্থাৎ পার্থিব ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের উর্ধ্বে উঠিতে পারিলেই লাভ করিতে পারে।

২৫ প্রেম-তত্ত্বের শেষ **ফনা কী অল্লাহ** বা ভগবৎ-সত্তায় নিজকে নিমজ্জিত করা। তখন কেবল তিনি ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।

২৬ মীন বা মৎস্যকে ভগবৎ-প্রেমিকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই ভগবৎ-প্রেম সময় না হইলে লাভ হয় না, আবার, যথাসময়ে ইহা সকলেই লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

২৭ খাঁটি প্রেমিককে পক্ক বলা হইয়াছে। তাঁর হাল বা (ভগবৎ-) অবস্থা থাম্ অর্থাৎ কাঁচা বা (ভগবৎ-প্রেমে) অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কি বুঝিবে? তাই থাম-খেয়ালী ব্যক্তিদের নিকট এই সকল গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা না করিয়া **অস্-সলাম্** বা বিদায় নেওয়াই ভাল।

২৮ আমাদের লোভ ও তৃষ্ণা যেন কুঁজোর জল, আর ভগবৎ-প্রেম সাগরের জল। বস্তুতঃ তাঁর প্রেমের পরিমাপ করা যায় না। তাই আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব সেই তত্ত্বের কতটুকুই বা বুঝিতে পারিবে!

২৯ বস্ত্র যেন শরীর বা পার্থিব কামনা-বাসনা। এই বসনের রূপক বাসনাদির উর্ধ্বে উঠিতে পারিলেই মানুষ ভগবৎ-প্রেম লাভ করে।

হে মোদের প্রেমের পশারি, তুষ্ট হও ;
হে কবিরাজ, নাশ তাপ ও কষ্ট সব।[৩০]
সব অহঙ্কার ও যশের হে ঔষধি।
হে তুমি মোদের প্লেতো ও গেলেন-নিধি।[৩১]
প্রেম-টানে দেহ ভূ-র যায় স্বর্-এ,
নাচয়ে পাহাড় চতুর সে রঙে রে।[৩২]
তূর-ও প্রাণ পায় প্রেম-টানে (হে) প্রেমিকা।
মত্ত তূর্ ও **খর্‌র মূসা স্বা'ইকা**।[৩৩]

* * *

যার কবি-মানস সনে না হয় মিলন,
স্বর যদি বা রয় শতেক—তা নয় কথন।
যায় রে ফাগুন, তবে যে ঝরল ফুল।
পিকরব শুনাইবে কী আর কোকিল ?

মাশুক-ই যে সব,—ও আশেক কায়ারে,
জীয়তা মাশুক,—আর আশেক
মৃতরে।[৩৪] ৩০ ॥

তার যবে না রয় এ-প্রেমে বাসনা ;
মন্দভাগ্য বিহগ, নেই পাখনা।[৩৫]
আগ ও পাছের কেমনে খেয়াল করি ?
আমার বন্ধুর অসীম রূপকে স্মরি।[৩৬]
প্রেম ত চায়, তারি কথা হোক রে প্রকাশ ;
দীপ্ত না হইলে মুকুর,—কোথা বিকাশ ?
জান, হয় না কেন দর্পণ ভাস্বর ?
মুখশ্রী মালিন্যে যে রইল ভর।[৩৭]
শুনরে বন্ধু এ কাহিনী সবে,
গূঢ় সে সত্য বলিরে তবে। ৩১ ॥

---

৩০ প্রেম চিরঞ্জীব, তাই ইহাতে তুষ্ট থাকিতে সকলকে আহ্বান করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমেই আমরা সকল পার্থিব দুঃখ-তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি—তাই প্রেমই যেন কবিরাজ।

৩১ গ্রীক প্লেতোন্ হইতে আরবীতে ইফ্লাতুন্ এবং গ্রীক গেলেনোস্ হইতে জালীনূস্। মহান প্লেতো (Plato) এবং গেলেন (Galen) যথাক্রমে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ ও ২য় শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক প্রেমতত্ত্ব (Platonic love)-বিশ্লেষক ও চিকিৎসক হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

৩২ এখানে কোরানের "শবে-মি'রাজ"-এর উল্লেখ করা হইয়াছে মনে হয়। সেই পবিত্র রাত্রে পয়গম্বর মুহম্মদ ভগবৎ-প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার প্রসিদ্ধ বুরাক্ (-অশ্বে) চড়িয়া স্বর্গ (বা স্বঃ) রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন।

পাহাড় অর্থে "তূর্" পাহাড়—যেখানে পয়গম্বর মূসা ভগবৎ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আবার, জড়-দেহকে পাহাড়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৩৩ বা "মত্ত তূর-দেহ ও মূসা-প্রাণ ফিকা"। কোরানে (৭ ; ১৩৯) রহিয়াছে "খর্‌র মূসা স্বা'ইকান্" অর্থাৎ (পয়গম্বর) মূসা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

৩৪ মাশুক (বা ম'শূক্) অর্থ যাঁহাকে ভালবাসা যায়—সেই একক প্রিয়তম। 'আশিক্' অর্থ প্রেমিক বা যে ভালবাসে। সেই প্রিয়তম বা একক পুরুষই যেন কেবল চিরঞ্জীব, আর অন্য সব বস্তু, বিষয় বা প্রাণী (এমন কি মানুষ পর্যন্ত) যেন তাঁহার প্রকাশ-রূপ মাত্র। এই সকল তাঁহারই মৃত কায়া-রূপ ছায়া (বা মায়া) মাত্র।

৩৫ সাধারণ জীবকে মন্দভাগ্য পাখির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি, ডানা থাকিয়াও নাই।

৩৬ সেই অসীম ও অনন্তের পরম-স্বরূপ সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে বর্ণনা করা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহাকে জানিতে হইলে নিজেও সেই-ভাবে ভাবিত হইতে হইবে।

৩৭ জীবাত্মাকে ময়লাযুক্ত আয়না বা দর্পণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই মুকুর যেন ভগবৎ-স্বরূপেরই দর্পণ। ইহা পবিত্র হইলেই তাঁহার স্বরূপটি জীবের মানস-পটে প্রতিফলিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা*

স্বামী নির্বেদানন্দ

অজানা সাগর-বুকে পাড়ি

শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে সব সময় মায়ের সেবা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, মায়ের মোহিনী হাস্য-মদিরা আকণ্ঠ পান করত তাঁর মন। মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁর প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার আগুন জ্বলে উঠল, মায়ের দর্শনলাভ ছাড়া আর অন্য কোন কিছুতে তা নিভবার নয়। সাধারণ পুরোহিতের মত শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতির বিধিবদ্ধ পথে শ্লথপদে চলে পরিতৃপ্ত হ'তে পারছিলেন না তিনি, সাধারণ পূজারীর মত মার কাছে ধন, মান ও পার্থিব সফলতা কামনা করার ভেতরেও কোন রসবোধ আনতে পারছিলেন না। তাঁর মন এসব তুচ্ছ কামনার নাগালের বহু ঊর্ধ্বে সব সময় উঠে থাকতো। ভগবানকে সামনাসামনি দেখার জন্য তাঁর প্রাণের আকুলতা বেড়েই চলল। মায়ার যে পর্দাটির আড়াল থাকায় জীবন্ত দেবীকে দেখতে পাওয়া যায় না, সে পর্দাটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য দুর্বার আগ্রহ তখন কেশরীর মত অস্থির পদসঞ্চারে তোলপাড় করে দিচ্ছে তাঁর হৃদয়, পাষাণ-প্রতিমায় একটুখানি প্রাণের স্পন্দন দেখার জন্য তিনি তখন অধীর হয়ে উঠেছেন। মন তাঁর কিছুতেই মানতে চাইত না যে ধর্ম শুধু কল্পনা-বিলাস, জগন্মাতার অস্তিত্ব শুধু রূপকথার কাহিনী—মানুষের মনগড়া স্বপ্নমাত্র। বালকের মত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন যে রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য ভক্তেরা মায়ের দিব্যদর্শনলাভে সত্যই ধন্য হয়েছিলেন। কাজেই সে মহানন্দময় দর্শন লাভে তিনিই বা বঞ্চিত হবেন কেন? এ চিন্তা তাঁর হৃদয়ে শাণিত তীরের মত এসে বিদ্ধ হত। তিনি স্পষ্ট অনুভব করতেন যে পরমানন্দময়ী মা কাছেই আছেন, অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। বারে বারে আশার আলো জ্বেলে মা আবার নিরাশার অন্ধকারে সব ঢেকে ফেলছেন।

সংসারের সব কিছুই তখন তাঁর বিস্বাদ লাগছিল। মনে হত, অমৃতত্ব ও আনন্দের চিরন্তন উৎসমুখই যদি খুলতে না পারা গেল, তাহলে দিনের পর দিন এই দুর্বিষহ জীবনটাকে টেনে চলার কোন অর্থই হয় না। মায়ের করুণায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে বালকের মত অসহায়ভাবে অবিরাম প্রার্থনায় তিনি মার কাছে অনুনয় জানাতেন অপার মহিমা নিয়ে দেখা দেবার জন্য। মায়ের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন, আর মাঝে মাঝে বাঁধনহারা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন ভজন ও স্তোত্রাদির মাধ্যমে হৃদয়বিদারী প্রার্থনায়। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে বেদনাশ্রুপ্লাবিত নয়নে হতাশ হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তেন, গড়াগড়ি দিয়ে করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করতেন: আর একটা দিন চলে গেল, মা, তোর দেখা পেলাম না! তীব্র আবেগের ঝড়ে তাঁর মন তখন সংসার থেকে উড়ে এসে বেদনা-সাগরের বুকে ভেসে চলেছিল, নির্মম তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হয়ে। মায়ের দেখা না পাওয়ার বেদনায় তিনি এত কাতর হতেন যে বাহ্য জগতের অস্তিত্বই ভুলে যেতেন; ভগবদ্দর্শনের পথের বাধাগুলিকে প্রাণপণ প্রয়াসে সরিয়ে

---

* লেখকের মূল গ্রন্থ "Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance" হইতে অনূদিত।

দিতে চাইতেন। কালীবাড়ীর একপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ একটি পতিত কবরখানা ছিল, দিনের বেলাও ভয়ে কেউ সেদিকে যেতে চাইত না। সেখানে গিয়ে একটি আমলকী গাছের নীচে বসে সারারাত তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতেন। যাবার আগে উলঙ্গ হয়ে, এমনকি উপবীত পর্যন্ত খুলে রেখে যেতেন। মাতৃধ্যানে নিমগ্ন হবার আগে এভাবে লজ্জা- জাতি- ও ভয়-জনিত সর্ববিধ দুর্বলতাকে তিনি পদদলিত করে যেতেন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণে কালীবাড়ীর লোকেরা কে কি ভাবছে, ভ্রূক্ষেপও করতেন না সেদিকে।

হিন্দুদের চিত্তনিয়ন্ত্রণ-বিজ্ঞান যোগমার্গের সঙ্গে কোন পরিচয় তাঁর ছিল না; শুধু হৃদয়ের প্রচণ্ড ব্যাকুলতা সম্বল করে তিনি পথে নেমেছিলেন। নিজ অকপট হৃদয় যে পথ দেখাচ্ছিল, সেই বিপদসঙ্কুল পথ ধরেই নির্ভয়ে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। নিজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দাবদাহ তাকে দৈহিক সহ্যশক্তির প্রায় শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল। ভাবাবেশে তাঁর বুক ও মুখ লাল হয়ে উঠত, অজস্র অশ্রু ঝরে পড়ত গণ্ডবেয়ে, থেকে থেকে দেহে কম্পন জাগত, করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠত চোখের কোণে—মর্মন্তুদ ক্রন্দনে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। যাঁরা দেখতেন তাঁদের বুক ফেটে যেত। বিরহের এই তীব্র জ্বালা আর সইতে না পেরে একদিন তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উন্মত্তের মত নিজ জীবনের অবসান ঘটাতে ছুটে চললেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মা তাঁকে কৃপা করলেন। মায়ার পর্দা সরে গিয়ে চোখের সামনে দিব্য-দর্শনের পথ অবারিত হল, সমাধির পরমানন্দ সাগরে তিনি মগ্ন হলেন।

এই দর্শন সম্বন্ধে তিনি নিজমুখে বলেছেন, "মার দেখা পেলাম না বলে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নেঙরায়, মনে হল হৃদয়টাকে ধরে কে যেন সে রকম করছে। মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। অস্থির হয়ে ভাবলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নেই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তার ওপর পড়ল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করব ভেবে উন্মত্তের মত ছুটে সেটা ধরতে যাচ্ছি, এমন সময়……ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই।—আর দেখছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র—যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন গর্জন করে গ্রাস করবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হচ্ছে। দেখতে দেখতে সেগুলি আমার ওপর আছড়ে পড়ল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলিয়ে দিলে। হাঁপিয়ে, হাবুডুবু খেয়ে, সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বাইরে যে কি হয়েছে, কোন দিক দিয়ে সেদিন ও তার পরদিন যে গেছে, তার কিছুই জানতে পারিনি। অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলাম।"

দুদিন পরে দিব্যানন্দময় সমাধি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যুত্থিত হলেন। সমাধিভঙ্গ-কালে প্রেম-মধুর-কণ্ঠে আবেগ-কম্পিত অধরে "মা" বলে ডেকে উঠেছিলেন তিনি। এভাবে তরুণ পুজারীর চিত্ততরণী আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড়ে তরঙ্গের তালে তালে নাচতে নাচতে অজানা সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে, ঝড়ের গতি যখন সেদিকে নিয়ে গেছে তখন সেদিকে চলেও অবশেষে নিরাপদ তটভূমে এসে ভিড়ল, দিব্যানন্দরূপ আনন্দধামের তীরে পৌঁছে দিল '

তাঁকে। দুদিন বিশ্রামের অবকাশও পেলেন তিনি সেখানে। কিন্তু স্বল্পকালের আনন্দ-উপভোগ শেষ হতেই আবার সে ব্যাকুলতার ঝড় এল প্রবলতর বেগ নিয়ে, তটভূমি থেকে টেনে এনে আবার তাঁকে ভাসিয়ে দিল যাতনার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পারাবারে।

পুনরায় দেখা দিয়ে ধন্য করার জন্য মায়ের কাছে করুণ প্রার্থনায় দিনগুলি তাঁর আবার ভরে উঠল। প্রথম দর্শনের পর দর্শনেচ্ছা তীব্রতর হওয়ায় দিব্যানন্দের রাজ্যে পুনরায় পৌঁছুবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ভয়াবহ হয়ে উঠল। পাগলের মত হয়ে উঠলেন তিনি। মায়ের বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কখনো কখনো তিনি মাটিতে ঘসে মুখ রক্তাক্ত করে তুলতেন। তাঁর করুণ ক্রন্দন শুনে চারিদিকে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে যেত। কিন্তু সে অবস্থায় মন থেকে বিশ্বজগৎ মুছে যেত বলে তাঁর বোধ হত, লোকগুলি যেন স্বপ্নে দেখা বা ছবিতে আঁকা মানুষের মত অবাস্তব। তাদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে চলতেন তিনি।

প্রথমদর্শনের অব্যবহিত ফলস্বরূপ তাঁর অন্তরের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ও বিরহযন্ত্রণার অস্থিরতা আরও বেড়ে উঠলেও সে দর্শন তাঁকে অজ্ঞাতপদসঞ্চারে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছিল অধ্যাত্মচেতনার এক নতুন দেশে। বিরহযন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত, তখন উচ্চ ভাবভূমিতে উঠে জগন্মাতার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করতেন তিনি। এভাবে বারে বারে ভাবসমাধিস্থ হয়ে তিনি চিন্ময়ী মাকে সাক্ষাৎ দেখতেন। দেখতেন মা হাসছেন, কথা কইছেন, অশেষ প্রকারে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কখনো বা পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতের মত জ্যোতিঃ দেখতেন, কখনো বা দেখতেন কুয়াশার মত জ্যোতিতে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে। আবার কখনো বা গলিত রূপার মত উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গ দিক্-দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে ফেলত। চোখ বুজেও দেখতেন, আবার চোখ মেলেও এই সব দেখতে পেতেন।

তাঁর শুদ্ধ মন সাধারণ মনের সীমা ছাড়িয়ে আরো বহু, বহুদূরে চলে গেল; আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এতদিন সে যা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, নিঃসংশয়ে তার নাগাল পেল সেখানে।

এখন ধ্যান করতে বসলেই মা তাঁকে দেখা দিতেন। শুধু দেখা দেওয়া নয়, তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন, দৈনন্দিন জীবনের বহু বিষয়ে উপদেশও দিতেন। এই সময় ধ্যানকালে তাঁর বহু বিচিত্র অনুভূতি হত। অনুভব করতেন, শরীরের গ্রন্থিগুলি কে যেন তালা বন্ধ করে দিচ্ছে, যাতে ধ্যানকালে ঈষন্মাত্র অঙ্গচালনাও সম্ভব না হয়, বন্ধ করার শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনতে পেতেন। তারপর নিশ্চল ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। যতক্ষণ না আবার বিপরীত দিক থেকে ঐরূপ শব্দ শুনতে পেতেন এবং অনুভব করতেন যে গ্রন্থিগুলি সব খুলে দেওয়া হল, ততক্ষণ পর্যন্ত আসন ছেড়ে ওঠা বা নিশ্চল শরীরে সামান্য স্পন্দন জাগান-ও তাঁর সাধ্যায়ত্ত থাকত না।

অচিরে দৃষ্টিপথের সব বাধাই নিঃশেষে অপসৃত হল; মায়ের দর্শনলাভের জন্য ধ্যান করা বা ভাবস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজনই আর রইল না। মন্দিরে আর প্রতিমা দেখতেন না তিনি, পাষাণ-কায়া চিরতরে বিদায় নিল তাঁর কাছে, চিন্ময় দেহ নিয়ে মা এসে দাঁড়ালেন সেখানে। খালি চোখেই সব সময় তিনি দেখতে পেতেন, মন্দিরে প্রসন্ন-হাস্যময়ী করুণামৃতবর্ষিণী জীবন্ত জগজ্জননী দাঁড়িয়ে আছেন। নাকের কাছে হাত রেখে দেখেছেন, মা সত্যই নিশ্বাস ফেলছেন। রাত্রে দীপালোকে তন্নতন্ন করে

খুঁজেও মন্দিরতলে মায়ের জ্যোতির্ময়ী মূর্তির কোন ছায়াপাত দেখতে পান নি। নিত্যসেবার কাজকর্ম শেষ করে রাত্রে ঘরে শুতে গিয়ে মায়ের পায়ের মলের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন—মনে হয়েছে, মা যেন বালিকার মত দ্রুতপদে দোতালায় উঠছেন। কম্পিতবক্ষে তখনই ঘর থেকে ছুটে বেরিযে এসে বাইরের উঠানে দাঁড়িযে স্পষ্ট দেখেছেন, মা দোতালার আলসের ওপর উঠে আলুলায়িতকেশে দাঁড়িয়ে আছেন, গঙ্গাদর্শন করছেন।

এই সব দর্শনের ফলে মায়েব একেবারে কোলের ওপব উঠে বসেছিলেন তিনি, শিশুব মত আগ্রহ নিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধবেছিলেন। মায়ের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা তাঁকে সব কিছু ভব্যতার সীমার বাইবে নিয়ে এসেছিল। বৈধী পূজাবিধি তাঁকে আর বেঁধে রাখতে পাবল না। হৃদয়ে দিব্যপ্রেম উথলে উঠল; প্রথা, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, এমনকি সাধারণ ঔচিত্য-বোধেরও কোন স্থান আর রইল না সেখানে। বাহ্যজগতেব বস্তুর চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে, আরো নিবিড়ভাবে তিনি স্নেহময়ী জননীরূপে চিন্ময়ী মাকালীকে সাক্ষাৎ দেখতে পেতেন। কাজেই আদুরে ছেলের সহজাত ভালবাসা নিয়ে তিনি তো মাকে আদর করতে ছুটবেনই! কখনো দেখতেন, মন্ত্রপাঠ করে অন্নাদি নিবেদন করার আগেই মা খাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছেন। কখনো হাতে কিছু অন্ন তুলে নিয়ে নিজেই সিংহাসনের কাছে গিয়ে মায়ের মুখে তুলে ধরতেন, আব্দারের সুরে খেতে বলতেন তাঁকে। কখনো বা আগে নিজে কিছুটা খেয়ে বাকীটা মায়ের মুখের কাছে তুলে অতি সহজ ভাবে বলতেন, "আচ্ছা মা, আমি খেয়েছি, এবার তুই খা।" ভাবাবেশে বুক মুখ সব প্রায়ই লাল হয়ে উঠত, সে অবস্থায় কম্পিত পদে মায়ের কাছে এগিয়ে এসে আদর করে মায়ের চিবুক ধরে গান ধরতেন, গল্প করতেন, পরিহাস করতেন, কখনো বা নাচতেই সুরু করতেন। কখনো বা রাত্রে ভোগের পর মাকে শয়ান দিয়ে বলতেন, "আমাকে শুতে বলছিস? আচ্ছা মা, শুচ্ছি"; বলেই, মায়ের শয্যায় শুয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। প্রতিদিন প্রভাতে মায়ের মালা গাঁথার জন্য যখন পুষ্পচয়ন করে বেড়াতেন, দেখে মনে হত যেন কারো সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছেন তিনি—কখনো হাসছেন, কখনো বা আনন্দে অধীর হয়ে উঠছেন। রাত্রে কোন-দিন ঘুমাতেন না, ভাবস্থ হয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, না হয় গান গেয়ে, আর না হয় আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মাঝে মাঝে আরও গভীর হযে উঠত, মায়ের সঙ্গে একাত্মবোধ এসে যেত। সে সময় তাঁর আচরণ হয়ে উঠত আরো গুরুতর, আরো ভয়াবহ, দেখে মনে হত, তিনি মন্দির অপবিত্র করে ফেলছেন। এ অবস্থায় ফুল-বিল্ব-দলে অঞ্জলি ভরে আগে নিজের বিভিন্ন অঙ্গে, এমন কি পায়ে পর্যন্ত ঠেকিয়ে পরে তা তুলে দিতেন মায়ের চরণে।

ঈশ্বর-প্রেমে যাঁরা উন্মাদ, তাঁরা শাস্ত্রবিধির পারে চলে যান; তাঁদের আচরণ বিধিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। সে প্রেমোন্মত্ত মনের গভীরতার পরিমাপ করবে কে? দিব্যপ্রেমের যে রহস্যময় প্রবল প্রবাহ তাঁদের জীবন থেকে সব বিধি-নিষেধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাঁদের কথায় ও আচরণে অনন্যসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলে, সে প্রেম সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাই বা হবে কার? আর-এক জগতের লোক হয়ে যান তাঁরা। আমাদের সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁদের বেঁধে রাখতে পারে না, নিয়মের প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁরা

নিয়মের গণ্ডি পার হয়ে চলে যান। এ-জাতীয় জীবন-প্রবাহ কখনো মানুষের ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত হয়ে, মানুষের গড়া বাঁধ দিয়ে ঘেরা জলপ্রণালীর প্রবাহের মত বয়ে চলতে পারে না। এ জীবন ভগবদ্-প্রেমামৃতে পূর্ণ হয়ে অসীম সাগরের মত অন্তহীন মহিমায় সগৌরবে তরঙ্গায়িত হয়ে চলে।

তবে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝবেই। শুদ্ধ হৃদয়ের ভাব তারা ধরতেই পারে না। সে জন্য জীবনের ধরাবাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখলেই, তার কারণ তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, তারা সেটাকে পাগলামি বলে স্থির-সিদ্ধান্ত করে বসে। এদিকে নিজেদের ধর্মজ্ঞ বলে তারা অভিমানও রাখে খুব, ভাবে, পূজারী যদি পূজাবিধি লঙ্ঘন করল, যদি ন্যায়-অন্যায়-বোধরহিতই হল, তাহলে প্রতিমা ও মন্দির অপবিত্র হতে আর বাকী রইল কি। মানসিক বিকার ছাড়া আর অন্য কোন কারণেও যে মানুষের আচরণ এরূপ হতে পারে, সেকথা কল্পনাতেও আসে না তাদের। এই সব ধর্মধ্বজীর দল, অধ্যাত্মবিদ্যার এই সব পণ্ডিত-মূর্খের দল যদি তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহলে জগতের সমস্ত সত্যদ্রষ্টাদের, আচার্যদের ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নিজেদের বিবেচনা-মত উচিত শিক্ষা-ই দিয়ে দিত। একবার ঘটেছিলও তাই, ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ত এরূপ এক ব্যক্তির আচরণের বিচারাধিকার যখন তারা জোর করে নিজের হাতে টেনে নিয়েছিল, তখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতেও দ্বিধা বোধ করে নাই।

অবশ্য সমাজের সাধারণ পর্যায়ে একদল লোক সব সময় থাকেন, ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত ব্যক্তির অসাধারণ আচরণের মধ্যে যাঁরা গগনচুম্বী আধ্যাত্মিকতার আভাস পান। এইসব দেবমানবদের প্রবল আকর্ষণে তাঁরা আকৃষ্ট হন এবং এঁদের সেবা করার ও আশ্রয় দেবার অধিকার পেলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেন। দেবদূতের মত এসে বহিরাচারপ্রিয় ছিদ্রান্বেষীদের ক্রোধোন্মত্ততার হাত থেকে তাঁরা সযত্নে রক্ষা করে চলেন এই সব দেবমানবদের।

দক্ষিণেশ্বরের এই তরুণ পূজারীটির দেব-সেবায় তথাকথিত স্বেচ্ছাচার ঘটছে দেখে কালী-বাড়ীর বিকৃতরুচি কর্মচারীরাও ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের রোষবহ্নি থেকে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বাঁচাবার জন্য পূর্বোক্ত দেবদূতের মতই এসে হাজির হয়েছিলেন মন্দিরের স্বত্বাধিকারিণী রানী রাসমণি ও তাঁর জামাতা মথুরবাবু। এ-দুজন ভক্তের অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অসীম শ্রদ্ধা যদি না জেগে উঠত, তাহলে কি যে ঘটত, তা বলা কঠিন। কালীবাড়ীর কর্ম-চারীরা হয়ত দলবেঁধে আক্রমণই করে বসত তাঁকে। অন্তরের সহজাত জ্ঞান হতেই রানী রাসমণি ও মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদনা ধরতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেয়েছিলেন যে জগজ্জননীর প্রতি যথার্থ ও অনন্যসাধারণ ভক্তি-প্রেমের ফলেই তাঁর পূজা এমন অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। বোধ হয় আরো একটু বেশী বুঝেছিলেন তাঁরা, বোধ হয় বুঝেছিলেন, মা কালীই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে থেকে তাঁকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন, তাঁর আচরণ বাহ্যদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও দৈবী ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে সেখানে। দু-একটা ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। রানী রাসমণি একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, কালীমন্দিরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভজন শুনছেন। ভজন শুনতে শুনতে মায়ের ধ্যান করার সময় হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি; মায়ের চিন্তা ছেড়ে একটা মামলার চিন্তায় তাঁর মন চলে গেল, মন্দিরে বসে সেই চিন্তাতেই তিনি-ডুবে গেলেন।

মনোযোগের অভাব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ রানীর কোমল অঙ্গে করাঘাত করে তিরস্কার করলেন—"এখানেও ঐ চিন্তা।" রানী চমকে উঠলেন, নিজের দোষ দেখতে পেয়ে শিক্ষকের কাছে তিরস্কৃতা বালিকার মত লজ্জিতা হলেন। ক্রোধোন্মত্তা হলেন না, বা মন্দিরের স্বত্বাধিকারিণীর প্রতি তাঁর একজন সামান্য কর্মচারীর এই আচরণকে অন্যায় বলেও ভাবলেন না। ভাবলেন, তাঁর শিক্ষার জন্য মা নিজেই এ শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর মানসিক অবস্থার উপযুক্ত এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জেনে এ শাসন তিনি গ্রহণ করলেন দীনভাবে। পূজারীকে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, মন্দিরের কর্মচারীরা যাতে এ নিয়ে আলোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সামান্য আঘাতও না দিতে পারে, তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলতে পর্যন্ত না পারে, তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করলেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিত্যকর্ম সমাধা করা শরীরের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মন তাঁর ভাবস্থ হয়েই থাকত, ইন্দ্রিয়জগতের বহু উর্ধ্বে উঠে সর্বদা আনন্দসুধা পান করত। সেজন্য জাগতিক নিয়মের দাবীর শৃঙ্খলে সে আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইল না। তাছাড়া তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীও বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, পুরোহিতের কাজের বোঝা আর সে বইতে পারছিল না, বিশ্রাম চাইছিল। মথুরবাবুকে সেকথা জানালেন তিনি। মথুরবাবুও সানন্দে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবর্তে কিছুদিন কাজ করার জন্য তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়কে অনুমতি দিলেন। এভাবে ধরাবাঁধা দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে রেখে কিছুদিনের মত তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবসর পেলেন, এবং নির্বাধে ছুটে চললেন মনের আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশে।

এরই কাছাকাছি কোন সময়ে অধ্যাত্মসাধনার উপযোগী করে তোলার জন্য হৃদয়ের সহায়তায় তিনি আমলকী গাছের, চারিদিকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে সেখানে আরো চারটি পবিত্র বৃক্ষ রোপণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সাধনা এই একত্রসন্নিবিষ্ট ছায়াবহুল গাছগুলির নীচে একটি বেদীর উপর সাধিত হয়। স্থানটি এখন পঞ্চবটী নামে পরিচিত। দক্ষিণেশ্বর-মন্দির-দর্শনার্থী তীর্থযাত্রীরা এই স্থানটিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীস্বরজিৎ মুখোপাধ্যায়

যুগে যুগে যত নরদেহে লীলা আছে,
আমারে হে প্রভু, রাখিও তোমার কাছে!
ধূলি-ধূসরিত তপ্ত মেদিনী পথে
আসিবে আতুর দূর-দূরান্ত হতে,
তব চাহনির করুণাকিরণ-স্নানে
ফুটিবে পুষ্প কত যে শুষ্ক প্রাণে,
স্নেহ-সুশীতল গৃহ-প্রাঙ্গণ মাঝে
কত না হৃদয় জুড়াবে সকাল সাঁঝে!

ব্যাকুল হইয়া আমি রব পথ-পাশে
করুণাধারার প্লাবন দেখার আশে,
পথধূলি লয়ে রাখিব মাথায়
রহিব সবার পিছু—
লীলা দেখিবার অধিকার ছাড়া
চাহিব না আর কিছু!

চিকাগো বক্তৃতার গুরুত্ব

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যে অবিস্মরণীয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। একটি মাত্র বক্তৃতায় জগতের চিন্তাধারায় এইরূপ বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টির দ্বিতীয় আর কোন দৃষ্টান্ত নাই। বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তুলনাহীন এই বক্তৃতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। আধুনিক জগতের চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে ইহা নবদিগন্তের উন্মোচন করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্মমহাসভায় নিয়মানুগত প্রতিনিধি না হইয়াও যোগদান করিয়াছিলেন, সেই ধর্মসম্মেলনে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দুধর্ম আমন্ত্রিত হয় নাই। স্বামীজী স্বেচ্ছায় স্বয়ং হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্বের ভার যদি গ্রহণ না করিতেন, তবে সেই ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের বাণী কেহ শুনিতে পাইত না এবং হিন্দুধর্মের কথা না জানিলে ভারতবর্ষের জীবন-সাধনার মর্মবাণীর কথাও পৃথিবীর সেই সুধী-সম্মেলনের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। কারণ বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি যে সকল ধর্ম প্রতিনিধি-প্রেরণের সুযোগ লাভ করিয়াছিল তাহারা ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির আংশিক পরিচয় মাত্র বহন করে।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজী যে কয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরূপ জগৎসভায় অবিচলিত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চিকাগো বক্তৃতাই হিন্দুধর্ম এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের পূর্ণ মহিমার পুনরাবিষ্কার। পাশ্চাত্য সভ্যতার জগদ্ব্যাপী বিস্তৃতির প্রথম পর্বে ভারতবর্ষ এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য সমাজে প্রবল অবজ্ঞারূঢ়ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে তাই স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, ইহা বিদেশীর "ঘৃণাস্পদ" ও স্বদেশীর "ভ্রান্তিস্থান"। সেই ঘৃণা ও ভ্রান্তির সুস্পষ্ট চিত্র ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রধান ধারক ও বাহক ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ঘৃণা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের Accademy নামক আলোচনা-সভার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ডিরোজিওর সমসাময়িক হরমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings." (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ১১০) ইঁহাদের সমকালীন রামমোহন ভারতবর্ষের ধর্ম-জীবনের ইতিহাসকে আদ্যোপান্ত অসভ্যতার নামান্তর বলিয়া অবশ্য প্রচার করেন নাই। পাশ্চাত্য Monotheism বা একেশ্বরবাদ তত্ত্বের সাক্ষাৎ যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদে মিলিবে, ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য। কিন্তু উপনিষদের যুগ ব্যতীত অন্যান্য যুগে হিন্দুধর্মের বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার কি পরিমাণ অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাঁহার একাধিক উক্তিতে সুপরিস্ফুট। হিন্দু-ধর্মের সাকারোপাসনার প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণায় ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত হিন্দুধর্মের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রামমোহন বলিয়াছিলেন '(Hindus) prefer custom and fashion to the authorities of their scriptures and therefore continue

under the form of religious devotion, to practise a system which destroys, to the utmost degree, the national texture of society and prescribes crimes of the most heinous nature, which even the most savage nations would blush to commit unless complled by the most urgent necessity. (Preface to Ishopanishad) উপনিষদের যুগের পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিকাশ রামমোহনের দৃষ্টিতে একান্ত গর্হিত ছিল। তাই Translation of An Abridgement of Vedanta গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন—"...inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindoo idolatry destroys the texture of society."

যে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ব্যতীত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রামমোহন প্রশংসার যোগ্য আর কিছুই খুঁজিয়া পান নাই, সেই ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধেও রামমোহনের সর্বাঙ্গীন আস্থা ছিল না। এই জন্যই বেদান্ত-গ্রন্থের রচয়িতা রামমোহন Lord Amherst-এর নিকট লিখিত পত্রে বলিয়াছিলেন, 'Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence." · হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বদেশীয়গণের যখন এইরূপ বিরূপ মনোভাব, তখন তাহার প্রতি বিদেশীয়দিগের কি ধারণা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় প্রচারকগণের এবং Alexander Duff প্রমুখ খৃষ্টান নেতাগণের হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের মধ্যে বিদেশীর ঘৃণা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

দেশে ও বিদেশে হিন্দুধর্মের প্রতি এই দীর্ঘকালস্থায়ী ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রাবল্যের সম্মুখে আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ অকুণ্ঠিত চিত্তে হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ঘোষণা করিলেন। সে ঘোষণা কেবলমাত্র আবেগসর্বস্ব ছিল না। তাহার পশ্চাতে হিন্দুধর্ম ও ভারত-ইতিহাসের নির্ভুল বিশ্লেষণ এবং হিন্দুধর্মের দার্শনিক তাৎপর্যের মর্মোদ্ঘাটন অলৌকিক প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল।

হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক. ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন—"I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance ··· I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have *gathered* in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to Southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand *Zoroastrian nation*."

এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অন্তরালে হিন্দুধর্মের যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল তাহা নির্দেশ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "To him (a Hindu) all the religions, from the lowest fattishism to the highest absolutism mean so many attempts of the human soul to grasp and realise the Infinity each determined by the conditions of its birth and association, and each of these marks a stage of progrees ; and every soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength, till it reaches the glorious Sun."

হিন্দুধর্ম যে কোন পরলোক-সম্পর্কিত মতবাদে

বিশ্বাসের নামান্তর নয়, হিন্দুধর্ম যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়, একথা পরিস্ফুট করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realising—not in believing, but in being and becoming."

হিন্দুধর্ম মানুষকে কেবল দেহধারী জীবমাত্র বলিয়া গণ্য করে না। তাই মানুষের দেহগত জীবনের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ক্ষুদ্রতাকে সে সার সত্য বলিয়া গ্রহণও করে না। আত্মার পরিপূর্ণতার মধ্যেই হিন্দুধর্ম মানুষের জীবনের রহস্যের চরম নিষ্পত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই হিন্দুধর্ম মানুষের অপূর্ণতা হইতে মুক্তিলাভের যে পথ নির্দেশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"Therefore to gain this infinite universal individuality this miserable little prison-individuality must go. Then alone can death cease when I am one with life, then alone can misery cease when I am one with happiness itself, then alone can all errors cease when I am one with knowledge itself."

এই বিশ্বজগতের স্বরূপ বিশ্লেষণে হিন্দুধর্ম যে গভীর প্রজ্ঞাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীও যে তাহার অনুকূল, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"Manifestation and not creation is the word of science today and the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusions of science."

বিদেশী প্রচারক ও রামমোহন প্রমুখ স্বদেশী সমালোচক পৌত্তলিকতার অভিযোগে হিন্দুধর্মের যে নিন্দা রটনা করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাহারও সার্থক প্রতিবাদ করিয়া সে অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলেন। পৌত্তলিক ভাবধারা হিন্দুর নৈতিক অধঃপতনের কারণ বলিয়া রামমোহন বারংবার হিন্দুধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন। নিম্নাধিকারীর পক্ষে ঈশ্বর-উপাসনায় মূর্তিপূজার স্থান আছে, একথা কোন কোন সময়ে উল্লেখ করিলেও রামমোহনের মূর্তি-পূজা সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার ছিল যে, ইহা পুণ্যের পরিবর্তে কেবল পাপের উদ্ভবস্থল। তিনি ঈশোপনিষদের ভূমিকায় তাই বলিয়াছিলেন—"*Fatal* system of *Idolatry* induces the violation of every humane and social feeling—and moral debasement of a race" স্বামীজীর অভিজ্ঞতা মূর্তিপূজা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাক্ষ্যদান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ অথবা তুলসীদাস ও মীরাবাঈ প্রভৃতির সাধনা রামমোহনকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া স্বামীজী যাহা জানিয়াছিলেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি তাহাই উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"The tree is known by its fruits. When I have seen amongst them that are called idolaters, men, the like of whom in morality and spirituality and love I have never seen anywhere, I stop and ask myself, can sin beget holiness?" সাকারোপাসনার মধ্য দিয়া অন্যান্য ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটি নির্দেশ করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas, and tries to force society to adopt them. It places before society only one coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit

John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the absolute can only be realised, or thought of, stated through the relative, and the images, crosses and crescents are simply so many symbols—so many pegs to hang the spiritual ideas on"

সকল ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মের মধ্যেও যে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে স্বামীজী দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু ধর্ম-জীবনে সেই ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষেত্রেও হিন্দুধর্মের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার বিশিষ্টতাকেই প্রকটিত করিয়াছে। পরকে উৎপীডনের দ্বারা হিন্দু আপনাকে কলঙ্কিত করে নাই। তাই স্বামীজীর কণ্ঠে এই প্রদীপ্ত বাণী ধ্বনিত—

"The Hindus have their faults, they sometimes have their exceptions, but mark this, they are always for punishing their own bodies, and never for cutting the throats of their neighbours. If the Hindu fanatic burns himself on the pyre, he never lights the fire of Inquisition."

মানুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার যথার্থ অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ ঘটিতে পারে, ইহাই হিন্দুধর্মের আবিষ্কৃত সত্য। সেইজন্য অধ্যাত্ম-জীবনের কোন একটি পথকে হিন্দুধর্ম কোন ক্রমেই একমাত্র পথ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। সেই কথা ব্যক্ত করিয়া স্বামীজী বলিলেন—

"To the Hindu, then, the whole world of religions is only a travelling, a coming up of different men and women, through various conditions and circumstances, to the same goal. Every religion is only evolving a God out of the material man, and the same God is the inspirer of them all."

এই জন্যই হিন্দুধর্ম সকল ধর্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সকল ধর্মের প্রতি তাহার মনোভাব মৈত্রীভাবপূর্ণ। মানবজাতির অধ্যাত্ম-জীবনের বৈচিত্র্যকে পূর্ণ বিকশিত করিবার জন্য সকল ধর্মের অনুশীলন যে প্রয়োজন, হিন্দুধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিস্ফুট করিয়া স্বামীজী ধর্মমহা-সভায় তাঁহার সমাপ্তিসূচক ভাষণে এই কারণে এই মহৎ ও উদার বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it Does the seed become the earth, or the air, or the water? No It becomes a plant, it develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant-substance and grows into a plant. Similar in the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Chirstian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth."

সকল ধর্মের সমস্ত বিবাদের ইহাই যথার্থ মীমাংসা। হিন্দুধর্মের ইহাই মূল কথা। চিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজীর পুণ্যবাণী মানব-সমাজকে সর্বযুগের ধর্মবিরোধের সার্থক সমাধানের মন্ত্র দান করিয়া সর্বকালের ও সর্ব দেশের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্র্যের অক্ষয় সেতু রচনা করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

১৯০৬ সালে কলিকাতায় এফ. এ. পড়িবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের সহিত পরিচিত হই। ঠাকুরের কথামৃত ও স্বামীজীর রাজযোগ একই সময়ে আমার হস্তগত হয়। এই বই ও আরও সব বই পড়িয়া এক নূতন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করি। এই সময় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট দীক্ষা লইবার ও ধর্মজীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে সময় লাগে।

১৯০৭ সালে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া রাজসাহীতে বি. এ. পড়িতে যাই। সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া আবার কলিকাতায় আসি ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মের পর। শ্রীশ্রীমহারাজ এই সময় মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া উড়িষ্যাতে ছিলেন। ১৯১০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে সর্বপ্রথম তাঁহাকে দর্শন করি। উৎসবের পর তিনি ৺পুরী চলিয়া যান। এই সময় আমি সীতাপতির সহিত বেলুড়মঠে গিয়া সাধুদের সহিত পরিচিত হই। শনি-রবিবার বেলুড় মঠেই কাটাইতে আরম্ভ করি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি মহারাজগণ আমাকে তাঁহাদের আপনার করিয়া লন। ১৯১০ সালের শেষে স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন কলিকাতা আসেন তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে আমার এক অপূর্ব যোগ আছে বোধ করিতাম। তাঁহার প্রতি ভক্তি-ভালবাসায় বিহ্বল হইয়া যাইতাম। অন্য মহারাজদের বেলায় এরূপ হইত না।

কলিকাতায় ও বেলুড়ে মহারাজের নিকট খুবই যাইতাম। তাঁহার দর্শন ও এক-আধটু সেবা করিবার সুযোগও পাইতাম। একদিন বিনোদ-বাবুদের বাড়ীতে কি উৎসব, অনেক সাধুভক্ত আসিয়াছেন। আমি মহারাজকে বড় হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছি, মহারাজ হঠাৎ আমাকে বলিলেন—"দেখ্, শরীর মন সংসারকে দিলে সংসার সব নষ্ট করিয়া দেয়। ভগবানকে দিলে তিনি সব—স্বাস্থ্য, চেহারা, মন—ভাল অবস্থায় রাখিয়া দেন।" আমার সাধু হইবার ইচ্ছা খুবই ছিল। মহারাজ আদর্শটা আরও উজ্জ্বল করিয়া ধরিলেন।

একদিন আমি ও আমার একটি বন্ধু মহারাজের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বেলুড় মঠে যাই। সেখানে গিয়া শুনি তিনি বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে বলরাম-মন্দিরে গিয়াছেন। তখন আমরা বলরাম-মন্দিরে যাই। মহারাজ আমার বন্ধুকে বলেন—"দেখি তোর হাত।" তাহার হাত দেখিয়া বলিলেন—"তোর কামের দিক হইতে কিছু অন্তরায় আছে। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে তাহা কাটিয়া যাইবে।" বাবুরাম মহারাজ আমাকে স্নেহ করিতেন। তিনি মহারাজকে আমার হাতও দেখিতে বলেন। মহারাজ আমার হাত কিন্তু দেখিলেন না। ইহাতে আমার মন খারাপ হইয়া গেল। আমি মনে করিলাম আমার বন্ধুর সাধু হইবার সম্ভাবনা আছে, আমার হয়ত তাহাও নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বেলুড় মঠে ঢুকিতেছি, মাঠের মাঝখানে মহারাজের সেবক আমাকে দেখিয়া বলিল—"মহারাজ বলিতে-

ছিলেন, তুমি সাধু হইবে।" আমার তখন প্রাণে বল আসিল। সময়ে আমার সাধু হওয়া হইল; কিন্তু বন্ধুটিকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইল। সে এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু খুব ঠাকুরের ভক্ত; শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য।

একদিন মহারাজ সদলবলে দুখানি নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। অপূর্বভাবে তিনি ভাবিত। বলিলেন—দক্ষিণেশ্বরে কুকুর হইয়া থাকাও পরম সৌভাগ্য।

শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট যখন গিয়া বসিতাম তখন স্পষ্ট বোধ করিতাম—তাঁহার চারিদিকে যেন একটি charmed circle আছে। আমরা তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। একদিন মহারাজ আমার নিকট এক নূতন ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি বেলুড় মঠে পায়চারি করিতেছিলেন। আমি দেখিলাম এক অমানব দিব্য পুরুষ।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে দীক্ষা দেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ৺পুরী চলিযা যান। আমি মহারাজকে লিখি—আমি সাধু হইতে চাই। মহারাজ অমূল্য মহারাজকে দিয়া লেখান—মনে যদি জোর থাকে, চলিয়া আসুক না।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে আমি ৺পুরীতে মহারাজের নিকট চলিযা যাই ও সঙ্ঘে যোগদান কবি। মহারাজ এই সময় আমাকে দিয়া অটলবাবুর বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা করান। পূজনীয় হরি মহারাজ প্রধান তন্ত্রধারক, নীরদ মহারাজ সহকারী তন্ত্রধারক। কুমারী-পূজাও করাইয়াছিলেন। ইহাতে সাধু হইবার অব্যবহিত পরেই আমার জীবনে এক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা আনিয়া দেন।

ইহার পর শ্রীশ্রীমহারাজ শর্বানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমাকে মান্দ্রাজে পাঠান। মান্দ্রাজে যাইবার পূর্বে মহারাজকে আমি উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি গম্ভীর ভাবে খুব কৃপার সহিত বলেন "Struggle! Struggle! Struggle!"—ইহাই জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া আছে। শ্রীশ্রীমহারাজের কথা এখনও কানে বাজে।

পুরীতে থাকিবার সময়কার দু-একটি কথা মনে হয়। একদিন অটলবাবু শর্বানন্দ স্বামীকে বলেন—"তোমরা কি রকম সাধু? তোমাদের কোন সিদ্ধাই নাই।" তাহা শুনিয়া মহারাজ বলেন—"সিদ্ধাই পাওয়া সহজ। মনের পবিত্রতা লাভ করা শক্ত। মনকে পবিত্র করাই আসল।"

একদিন মহারাজের শরীর খারাপ। কোমরে ব্যথা হইয়াছিল। সেদিন ৺পুরী-মন্দিরে বিশেষ উৎসব। আমরা প্রায় সকলেই—মহারাজের সেবকই মহারাজের সব দেখিবে মনে করিয়া—মন্দিরে উৎসব দেখিয়াই অনেক সময় কাটাইয়া দিই। সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিলে মহারাজ আমাদের স্বার্থপরতার জন্য খুব বকেন। অবশেষে বলেন—"আমি তোদের নিকট হইতে কিছুই চাই না। এক তোদের মঙ্গল চাই। আর তোদের মঙ্গলের জন্যই সব বলি।"

বকুনি খাইয়া রাত্রে আমি মহারাজের সেবা করিবার ভার লই। একদিন রাত্রে মহারাজ গরম বোধ করেন। আমাকে জানালার পাখি খুলিতে বলেন। আমি একে সেবাকার্যে নূতন, তারপর আমার বুদ্ধিরও অভাব। জানালা কিছুক্ষণ পর বন্ধ করিবার দরকার, তাহা মনে হয় নাই। পরদিন মহারাজের শরীর একটু ভার হয়। তাহা শুনিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হই। মহারাজ আমাকে নিজে কোন রকম বকুনি ত দেনই নাই তাছাড়া আরও অন্য সকলকে বলিয়াছিলেন—"ছেলেমানুষ, জানে

না।" ইহাতে অন্য কেহই আমাকে কিছু বলে নাই। আমার এক শিক্ষা হইয়া গেল।

১৯১১ সালের শেষে মান্দ্রাজ যাই। সেখানে পাঁচ বৎসর ছিলাম। ১৯১৬ সালে মান্দ্রাজেই আবার মহারাজকে দর্শন করি।

মান্দ্রাজ মঠের ম্যানেজারের কাজ করিতে আমাকে খুব খাটিতে হইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যানেজারের চেয়ারে আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"তোকে কি এখানে কেরানীগিরি করিবার জন্য পাঠাইয়াছি?" আমাকে খুব বকেন। শর্বানন্দ মহারাজকেও খুব বকেন। বলেন—"ছেলেটাকে পড়াশুনা প্রভৃতি করিবার সুযোগ না দিয়া তাহাকে দিয়া কেরানীগিরি করাইতেছে।"

বিশ্ব মহারাজ তখন মহারাজের সেবক। তিনি আমাকে মহারাজের জন্য ভাল তিল-তেল প্রভৃতি আনিতে বলেন। আমি সন্ধান জানিতাম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাহা পাইতাম তাহা আনিতাম। একদিন ইহা উপলক্ষ্য করিয়া বলেন—"তোকে কি আমি কোথায় ভাল তিল-তেল পাওয়া যায় না যায় তাহার সন্ধান জানিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছি?" সব বকুনি শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপার ও ভালবাসার নিদর্শন জানিয়া, প্রাণে প্রাণে তিনি আমার আপনার ও আমি তাঁহার আপনার জন, ইহা মনে করিয়া আনন্দিতই হইতাম।

এই সময় মহারাজ আমাকে বিশেষ পড়াশুনা ও সাধন-ভজন করিতে ও নিত্য বিষ্ণু-সহস্র-নাম পাঠ করিতে বলেন। তাঁহার কৃপায় মন খুব ভাল অবস্থায় থাকিত ও হৃদয়ে মহারাজের সহিত যোগ ও এক অপূর্ব আনন্দ বোধ করিতাম।

মহারাজ কৃপা করিয়া তাঁহার দলের সঙ্গে আমাকে ৺কন্যাকুমারী লইয়া যান। ইহার পূর্বে আমি বিধিপূর্বক সমগ্র ৺চণ্ডীপাঠ কখনও করি নাই। দেবীর মারামারি-কাটাকাটি ভাল লাগিত না। স্তোত্রগুলি মাত্র পড়িতাম। ইহা শুনিয়া খুব বকেন, আর প্রতি পক্ষে একদিন বিধিপূর্বক ৺চণ্ডীপাঠ করিতে বলেন। তিন বৎসর বিষ্ণু-সহস্র-নাম ও ৺চণ্ডীপাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তিন বৎসরের বেশী পাঠ করিয়াছিলাম।

ব্রহ্মচারী অবস্থায় অহঙ্কারাদি হইবে মনে করিয়া আমি প্রবন্ধাদি লিখিতাম না ও বক্তৃতাদিও দিতাম না। বাহিরের লোকের সঙ্গে ধর্ম-প্রসঙ্গাদিও বিশেষ করিতাম না। ত্রিবাঙ্কুরের হরিপাদ আশ্রমে একদিন আমাকে জোর করিয়া বলেন—"আমাদের নিকট হইতে যে সব শুনিতেছিস ও শিখিতেছিস তাহাই বলবি।"

মান্দ্রাজে একদিন বলেন—"পড়াশুনা করিবার এমন অভ্যাস করবি যাহাতে কোনদিন পড়াশুনা না করিলে খারাপ বোধ হয়। মন উচ্চাবস্থায় না থাকিলে অন্ততঃ পড়াশুনা লইয়া থাকিবে। তাহার নীচে যাইবে না।"

আরেক দিন বলেন—"প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া article লেখ্‌তে।" আমি বলি—"কি লিখিব? কোন ভাব আসে না।" তখন বলেন—"বেশ ভাল করিয়া চিন্তা করিতে শেখ্‌। তখন দেখবি এত ভাব আসিবে যে তাহার চোট সামলানো দায়।" এরপর গুরু-কৃপায় আমার কোন ভাবের অভাব হয় নাই।

ব্যাঙ্গালোরে মহারাজের নিকট থাকিবার সময় একদিন সকালে কয়েকটি physical exercise দেখান ও নিত্য করিতে বলেন। আমি কিছু indoor exercise বরাবরই করিতাম। মহারাজের প্রদর্শিত exercise-গুলি তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া লই।

মহারাজ একাধিকবার আমাকে বলিয়াছিলেন - Physical, intellectual, moral and spiritual সব রকম progress এক সঙ্গে চালানো দরকার।

মান্দ্রাজে আসিবার পর মহারাজ নিজেই আমাকে অনেকবার suggestion দেন—আমাকে সন্ন্যাস দিবেন। সন্ন্যাসের পূর্বে অন্যান্য সাধুরা আমাকে তাঁহার নিকট গিয়া সন্ন্যাসের জন্য প্রার্থনা করিতে বলেন। আমি মূর্খের মত গিয়া তাঁহাকে বলি—"মহারাজ, আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন তবে আমাকে কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দিন।" তাহাতে মহারাজ স্নেহের সঙ্গে বলেন—"সন্ন্যাসের উপযুক্ত একথা কেহই বলিতে পারে না। তবে আমি তোকে সন্ন্যাস দিব।"

সন্ন্যাসের দিন শ্রীশ্রীমহারাজ এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবে vibrate করিতেছেন অনুভব করিলাম। হোম প্রভৃতি হইবার পর যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া আমার ভিতর এক বিরাট সত্তার বোধ আনিয়া দেন। তিনি, আমি, জগৎ যেন এক অনন্ত সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুর যে কি স্বরূপ তাহার আভাস দিলেন। তখন "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"—ইহার সত্যতা খুবই অনুভব করিলাম।

ঐদিন সন্ধ্যা'র পর আমরা অনেকেই মহারাজের নিকট গিয়া বসিয়াছি। শর্বানন্দ মহারাজও সেখানে ছিলেন। মহারাজের মন খুব উচ্চ সুরে বাঁধা। আমি মনে করিয়াছিলাম খুব সাধন-ভজনের কথা বলিবেন, তাহা না বলিয়া বিশেষতঃ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোরা সাধন কি করবি। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব দ্বারে দ্বারে প্রচার কর। তাঁহাদের কাজ কর। দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভগবানের নাম শোনা। ইহাই মহা সাধন।" শর্বানন্দ মহারাজের নাম ধরিয়া বলিলেন—"শর্বানন্দ, শ্রীরামানুজাচার্যের ভাব আজকাল আমার বড ভাল লাগে—সকলকে ভগবানের বাণী শুনানো।"

ঐদিন শ্রীশ্রীমহারাজ আমার ভিতর এক নূতন প্রেরণা আনিয়া দেন। আমার মনটাকে এক নূতন ধারায় চালাইয়া দিলেন। সেই ভাব এখনও চলিতেছে। মান্দ্রাজে এই নূতন প্রেরণার ফলে পড়াশুনা-ধ্যান-পাঠাদিতে বেশী জোর দেই। ক্লাস, বক্তৃতাদিও করিতে আরম্ভ করি। বিশেষভাবে প্রবন্ধাদি লেখা পরে হয়।

মান্দ্রাজের নূতন মঠ-বাড়ী নির্মাণও শ্রীশ্রীমহারাজের এক ঐশী শক্তির বিকাশ। পুরাতন মান্দ্রাজ মঠ-বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মঠ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। পূজনীয় শর্বানন্দ মহারাজ ও আমরা নূতন মঠ-বাড়ী কি করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ভাবিয়াই পাই নাই। জমি পূর্বেই ক্রয় করা ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ আসিয়া বলিলেন—তিনি মঠ-বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিবেন। শর্বানন্দ স্বামীকে টাকা সংগ্রহ ও এমন কি কিছু ধারও করিতে বলিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থাদি আসিয়া গেল, অন্যান্য যোগাযোগও হইল। আট মাসের মধ্যে সামনের 'হল' ছাড়া আর সব বাড়ী তৈয়ার হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমহারাজ ব্যাঙ্গালোর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ও আমাদের সন্ন্যাসের কিছুদিন পর নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ঐ দিন— মঠ-প্রতিষ্ঠার দিন —আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আরতি করিতেছি। শ্রীশ্রীমহারাজ আমার পিছনে একটু দূরে দাঁড়াইয়া। আরতি

করিতে করিতে বোধ করিলাম—যেন এক বিরাট সত্তায় সব পূর্ণ। সব ছবিতে ও শ্রীশ্রীমহারাজের ভিতর ও সকলের ভিতরেই সেই বিরাটের আরতি করিলাম। এখনও আরতি করিতে গেলে এই ভাব আসিয়া যায়। ইহা শ্রীশ্রীমহারাজের বিশেষ কৃপা। ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমরা ভাড়াটিয়া বাড়ীর ছাদে মহারাজের নিকট গিয়া বসিয়াছি। মহারাজ তখন বলিলেন—"আমি ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম—এরা ছেলেমানুষ, কি করিয়া বাড়ী করিবে? আপনি কৃপা করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিন। —তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বাড়ী হইয়া গেল।"

মান্দ্রাজে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতাম। পড়াশুনা-ধ্যানাদির বিশেষ সময় পাইতাম না। আমার জীবনে একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত, তাহা মহারাজ মান্দ্রাজে আসিয়াই বুঝেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—আমি মান্দ্রাজ ছাড়িয়া ব্যাঙ্গালোরে যাই। আমার সেখানে যাইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহারাজ জানিতেন আমার পক্ষে কি ভাল। একদিন বলিলেন—"বোকা, নিজের interest বুঝিস না। মান্দ্রাজে আর তোর থাকিয়া কাজ নাই। তুই ব্যাঙ্গালোরে যা।"

পূর্বে তুলসী মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আমাকে চাহিয়াছিলেন। মহারাজও একরূপ রাজী ছিলেন শুনিয়াছি। যাহা হউক, মহারাজের ইচ্ছায় আমি ১৯১৭-এর গ্রীষ্মে ব্যাঙ্গালোর যাই। সেখানে এক বৎসরের উপর ছিলাম।

মহারাজ ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পুরী চলিয়া যান। আমিও ইহার কিছুদিন পর ব্যাঙ্গালোরে যাই। সেখানে খুব সাধন-ভজন-পড়াশুনা করিতাম। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে রবিবারের ক্লাসও আমি লইতাম। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের শেষভাগে আমার Enteric Fever হয়। শরীরে খুব জ্বালা বোধ করিতাম। হাসপাতালের ward-এ আছি। এই সময় খুব Influenza হইতেছিল। একদিন সকালে একটি বৃদ্ধকে আমার bed-এর পাশের bed-এ আনিয়া রাখিল। বৃদ্ধের Double Pneumonia হইয়াছিল। খুব সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। সন্ধ্যা নাগাদ বৃদ্ধের সব শেষ হইয়া গেল।

আমি বিশেষ যন্ত্রণা বোধ করিতেছি। তখন আমার মন খুব পরিষ্কার। কোনরূপ মৃত্যুভয় নাই। আমার মনে হইতেছিল যন্ত্রণা আরও বেশী হইলে তাহা সহ্য করা মুশকিল। তাহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল। যেই এই কথা আমার মনে উঠিয়াছে তখন শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিলাম।

তিনি বলিলেন—"মরবি কি রে। তোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমার মন এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। চোখ দিয়া খুব জল পড়িতে লাগিল। মৃত্যু-ভয় ত ছিলই না। খুব একটা শান্তি ও শরণাগতির ভাব আসিয়া গেল। অসুখও ভালর দিকে turn লইল।

ব্যাঙ্গালোরে এক বৎসরের উপর থাকিয়া ও এক বৎসর মান্দ্রাজ প্রদেশের একাধিক স্থানে সাধন-ভজনাদি করিয়া ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট ভুবনেশ্বরে যাই। সেখানে তাঁহার পূত সঙ্গে কয়েকদিন থাকিবার সুযোগ পাই। ভুবনেশ্বর মঠ নির্মাণ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে পুরীর অটল মৈত্র মহাশয় তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সহিত আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধ খুব বিষণ্ণ

শোকে যেন মগ্ন। শ্রীশ্রীমহারাজ বরদানন্দ স্বামীকে গান গাহিতে বলিলেন। বরদানন্দ স্বামী—"অভয়ার অভয়পদ কর মন সার"—এই গানটি গাহিলেন। গান শুনিয়া—তাহার অপেক্ষা বেশী শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শনে ও কথাবার্তায়—বৃদ্ধের মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই এই পরিবর্তন দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

ভুবনেশ্বরে কয়েকদিন থাকিবার পর মহারাজ আমাকে অসুস্থ গোকুলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। আমি কলিকাতা হইতে গিয়া কয়েক মাস বেলুড় মঠে বাস করি। এই সময়, ১৯২০ সালের স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে মহারাজ বেলুড়ে আসেন। সকলে আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া বসিতাম। ধ্যান ও স্তোত্রাদি পাঠ হইত।

শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার শেষ দর্শন ৺কাশীতে—১৯২১ সালের প্রারম্ভে, স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে। আমি তখন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট ছিলাম। মহারাজ ৺কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে ও সেবাশ্রমে এক নূতন আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত আনিয়া দেন। এই সময় তিনি আমাকেও খুব আধ্যাত্মিক প্রেরণা দেন। একদিন আমাকে তিনি সাধন-ভজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম—"আমার ভিতরটা যেন খুলিতেছে না। তাই মনে শান্তি পাইতেছি না। আমরা এমন খারাপ সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি যে সেগুলি আধ্যাত্মিকতার অন্তরায় হইয়া আছে।" মহারাজ বলিলেন—"এ রকম ভাবিস না। মহানিশায় জপ কর। পুরশ্চরণ কর। ভিতরটা আপনিই খুলিয়া যাইবে।"

আর একদিন মনে অশান্তি বোধ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছি। তিনি আমাকে আসিতে দেখিয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন। অল্প সময়ে অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন—"আমি যা চাই তা করতে চাস না বলিয়াই তোর মনে অশান্তি হয়।" মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া হৃদয় শান্তিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের ইচ্ছা, আমি মায়াবতী গিয়া 'প্রবুদ্ধ ভারতের' ভার লই। আমাকে তিনি নিজে কিছুই বলেন নাই। পূজনীয় সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ একাধিক বার আমাকে মায়াবতী যাইবার সম্বন্ধে বলেন। আমি বিশেষভাবে নারাজ।

একদিন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট আছি ও তাঁহার সেবার কাজে ব্যাপৃত আছি। সকালে হঠাৎ বোধ করিলাম—আমার ভিতরে কি যেন একটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও প্রাণের ভিতর হইতে কান্না পাইতেছে। চোখ দিয়া খুব জলও পড়িতে লাগিল। চোখের জল মুছি, আবার পড়িতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর একটা খুব শরণাগতির ভাব আসিয়া যাইতেছে দেখিলাম। বুঝিলাম শ্রীশ্রীমহারাজের ইহা একটি লীলা। তিনি কৃপা করিয়া আমার মনের গোঁ ও আরও সব অন্তরায় ভাঙ্গিয়া দূর করিয়া দিতেছেন। সন্ধ্যা নাগাদ আমার মনটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সকালে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তখন তিনি আমাকে বলিলেন—"দেখ্, ওদের সকলের ইচ্ছা তুই মায়াবতী যাস ও প্রবুদ্ধ ভারতের ভার নিস।" ইতিপূর্বেই তিনি আমার গোঁ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি কোন রকম দ্বিধা না করিয়া বলিলাম—"মহারাজ আপনি যদি আদেশ করেন নিশ্চয়ই যাইব।" মহারাজ এই

উত্তর শুনিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন ও আশীর্বাদ করিলেন। এরপর আমার মায়াবতী যাওয়া স্থির হইল। একদিন সকালে মহারাজকে প্রণাম করিয়া সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে তাঁহার নিকট বসি। মহারাজ আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন—"সাধন-ভজন কিরূপ চলিতেছে?" আমি উত্তরে বলি—"অনেক কাজ করিতে হয়। বিশেষ সময় পাই না।" মহারাজ বলিলেন—"কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না, এইরূপ মনে করা ভুল। মনের চঞ্চলতার জন্য ঐরূপ মনে হয়।" এরপর মহারাজের কথার বন্যা খুলিয়া গেল। তিনি খুব ভাবের সহিত বলিলেন—"work and worship একসঙ্গে করিয়া মনকে তৈয়ার করিতে হয়।" এইসব কথা 'Spiritual Teachings'-এর 'Work and Worship' Chapter-এ আছে। ইহা আমাকেই বিশেষ করিয়া বলা।

এই দিন নির্মল মহারাজের সঙ্গে ও সব সাধু ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার এক বিশেষ প্রীতির ভাব স্থাপন করিয়া দেন। বলেন—"নির্মলও যেমন আমার আপনার তুইও তেমনি আমার আপনার, এমনি সকলেই।" যখন ভাবি সকলেই তো মহারাজের আপনার, তখন সকলকে আমারও আপনার বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার নিজের শিষ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সকলকেই আপনার মনে করিতেন ও বলিতেন, সকলেই ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিতে আসিয়াছে। একদিন বিশেষতঃ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"কর্ম ঠাকুর-স্বামীজীর—এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন তো হইবেই না, অধিকন্তু তার through দিয়ে spiritual, moral, intellectual এবং physical সব রকম উন্নতি হবে। তাঁহাদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দে। তাঁদের গোলাম হয়ে যা।"

শ্রীশ্রীমহারাজের এই ও আরও সব উপদেশ জীবনের সম্বল হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে আমার একদিন খুব প্রাণ ভরিয়া কথাবার্তা বলিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার উপর আমার অভিমান হইয়াছিল। মাদ্রাজে ১৯১৬ সালে গিয়াই আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি ফিরিবার সময় আমাকে বাংলাদেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গে না লইয়া গিয়া বাঙ্গালোরে পাঠান। তারপর ১৯১৯ সালের শেষে ভুবনেশ্বরে তাঁহার নিকট আসিলে আমাকে সেখানে বেশীদিন না রাখিয়া বাংলাদেশে পাঠাইয়া দেন। এইসব কারণে আমার অভিমান হওয়ায় মনে অশান্তি বোধ করিতেছিলাম।

আমি কথাবার্তা বলিবার সুযোগ খুঁজিতে-ছিলাম। একদিন এই সুযোগ পাই। শ্রীশ্রীমহারাজের ১৯২১ সালের জন্মতিথিতে ৺কালীপূজা হয়। প্রতিমা ভাসানোর জন্য সন্ধ্যার পূর্বে সকলেই গঙ্গাতীরে গেলে আমি তাঁহার নিকট যাইব স্থির করি। পূর্বে তাঁহাকে কিছুই বলি নাই।

আমি ঐদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী তাঁহার নিকট বসিয়া। পেতাপুরীও আছেন। আমাকে দেখিয়াই মহারাজ ছেলেমানুষের ভাবে পেতাপুরীকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ্‌লি আমি কেমন যোগী?"

শুনিলাম একটু পূর্বেই তিনি পেতাপুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"দেখত, সুরেশ আসিয়াছে কি না।" তিনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন আমি আসিব।

এইদিন অনেক কথাবার্তা হয়। ভুবনেশ্বরে আমাকে মাত্র কয়েকদিন রাখিয়া বেলুড়ে পাঠাইয়া দেন। মহারাজ বলেন—আমার বাংলা দেশে যাইবার ইচ্ছা ছিল ও একটু ঘোরাঘুরি করিবারও ইচ্ছা ছিল, তাহা তিনি জানিতেন। আরও জানিতেন—এভাব অল্প দিনেই কাটিয়া যাইবে। এই ভাব শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে কাটিয়া যায়—সেইজন্য আমাকে বাংলা-দেশে অত তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দেন। মহারাজ কত গভীর ভাব হইতে সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত হই। তিনি মনের সব খেদ দূর করিয়া আমার মনটাকে পরিষ্কার করিয়া দেন। ইহার ফলে শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহাদের সঙ্গে আমার এক নূতন মনের যোগ আনিয়া দেন।

ইহার কয়েকদিন পর তিনি বেলুড়ে চলিয়া যান। ৺কাশীতে আমার তাঁহাকে শেষ দর্শন করা। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার অমানব মূর্তি আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে মাদ্রাজে ও ৺কাশীতে যে আধ্যাত্মিকতার আভাস এবং ধর্ম ও কর্ম জীবনের গতির ধারা দেখাইয়া দেন তাহার জের আজও চলিতেছে। তিনি কৃপা করিয়া সূক্ষ্মভাবে আরও নূতন আলোক ও নূতন প্রেরণা আনিয়া দিতেছেন। যতই দিন যাইতেছে ততই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার মর্ম বুঝিতেছি। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন।

"ভগবান আছেন, ধর্ম আছে—এসব কথার কথা বা morality রক্ষার জন্য নয়। সত্যই তিনি আছেন, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তাঁর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।"

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে মানুষ যদি খেটে চলে যায়, তবে তার সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। তবে কি আর এদিক সেদিক দৌড়ুতে হয়? ভগবানই তার সব অভাব মিটিয়ে দেন, তাকে হাত ধরে ঠিক রাস্তায় নিয়ে যান।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

আজ থেকে দীর্ঘ ১৩০ বছর আগে ভগবান স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের মাঝে আমাদের মত মানুষের সাজে তাঁর এক মহতী ইচ্ছা বাস্তবরূপায়িত করতে, সে ইচ্ছা যে কি, তা ভগবান নিজেই বলে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে ভক্ত অর্জুন সমীপে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

লীলাময়ের লীলাকালে সে লীলা বুঝবার মত পবিত্র আধার হয়তো তখন খুব বেশী ছিল না—লীলাসংবরণের পরই যেন মানুষ হঠাৎ বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আজ মানুষের ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা লয়ে, নানা ছন্দে। ঠাকুরের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমার এই অনাড়ম্বর প্রয়াসও এই *পূজারই একটি রূপ।*

মানুষ যখনই কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তখন সে মনের স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী মানুষের নিয়ম অনুসরণ করে থাকে ; ইংরেজীতে যাকে বলে law of association—সেই নিয়মানুসারেই মানুষ চিন্তাস্রোতে ভেসে চলে। এই অনুষঙ্গের নিয়ম-প্রভাবেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো আমাদের মনে আসে, তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'ধর্ম'। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ধর্মের স্বরূপ কি, বর্তমান জীবন-পটভূমিকায় এই ধর্মের কোন মূল্য আছে কিনা—কালোপযোগী ভেবে বর্তমান নিবন্ধে সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কোন যুক্তিপূর্ণ আলোচনা স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনা-সাপেক্ষ। আমার একথার সমর্থনে স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের মুখ-নিঃসৃত বাণীই তুলে ধরছি। স্বামীজী বলছেন —"যে সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি, সকলই তাঁহার চিন্তারাশির প্রতিধ্বনিমাত্র।" শ্রীমাও একই কথা অন্যভাবে বলছেন—"নরেন হলো ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে নরেনকে দিয়ে এসব লেখাচ্ছেন, বলাচ্ছেন।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজও রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ ঠাকুর হচ্ছেন বেদ, আর স্বামীজী তার ভাষ্য।' বেদাধ্যয়নের সময় যেমন *তার ভাষ্য, টীকা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, ঠিক* তেমনি ঠাকুরকে বুঝতে হলে বা জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে জানা প্রয়োজন।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ অনুধ্যানে ব্রতী হয়ে বর্তমান নিবন্ধের যে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছি, তার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আলোচনা স্বামীজী-প্রদর্শিত পথেই করবো। এ যেন অনেকটা গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মতো। বস্তুতঃ এ সব বিষয়ে আমাদের নতুন কিই বা বলার থাকতে পারে? স্বামীজী স্বয়ং ঠাকুর সম্বন্ধেই বলেছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ, "He was the embodiment

of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the shastras really meant, the whole plan and scope of the old shastras." তিনি আরও বলেছেন —"He had lived in one life the cycle of the national religious existence in India."

প্রথম পর্যায়ের আলোচনা হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিফলিত 'ধর্ম'কে কেন্দ্র করে। ধর্ম কি? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। ধর্মের ইতিহাস হচ্ছে তার সাক্ষী। বিভিন্ন কালের মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের এমন বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন যার ফলে অনেক নৈষ্ঠিক ধর্মজিজ্ঞাসুকে প্রায়শই নানারকম বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ধর্মের এই ইতিহাস-সম্পর্কীয় আলোচনায় নিযুক্ত না হয়ে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি থেকে ধর্মের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারা যায় কিনা সে চেষ্টাই করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করবো যে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রতিবিম্বিত ধর্মের সঙ্গে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত ধর্মবোধের কোন মিল আছে কিনা।

যখন আমরা বলি আগুনের ধর্ম হচ্ছে তার দাহিকাশক্তি (এ বলা বিজ্ঞানসম্মত) তখন আসলে যা বুঝি সেটা হচ্ছে দাহিকাশক্তির জন্যই আগুন, আগুন অন্য কিছু নয়; যার মধ্যে দাহিকাশক্তি নেই, তাকে কোন ভাবেই আগুন নামে অভিহিত করা চলে না। ঠিক এই যুক্তিই জগতের অন্যান্য বস্তুনিচয়ের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। এক কথায় কোন কিছুর ধর্ম হচ্ছে তার মূল বৈশিষ্ট্য যার সামান্যতম অভাবের জন্য সেই 'কোন কিছু' নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে ধর্মভ্রষ্ট হয়। এই ব্যাখ্যা যদি আমরা মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি (যে ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীসভা করতে বাধ্য), তাহলে মানুষের ধর্ম বলতে বুঝবো তার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'মনুষ্যত্ব' যার জন্যে মানুষ মানুষ। যার মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' এই বিশিষ্টতার অভাব আছে, তাকে মানুষ বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একটা কলসের কথা, 'কলস'কে আমরা মানুষ বলি না, কারণ এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই বলে আমরা জানি। মনুষ্যেতর প্রাণী যেমন একটি পাখী—একেও আমরা মানুষ বলি না একই কারণে, অথচ আমাদের মত প্রত্যেককেই আমরা মানুষ বলে থাকি। কিন্তু কেন? সহজ উত্তর হচ্ছে আমরা সবাই যুক্তিসম্মত ভাবে দাবী করি যে আমাদের মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' নামক বিশিষ্টতাটি বর্তমান। যদি কোন ব্যক্তির জীবন বিশ্লেষণ করে একথা প্রমাণিত হয় যে তার মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' নামক গুণের অভাব আছে, তাহলে হাজার মৌলিক দাবী সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিকে 'মানুষ' বলা চলবে না- এ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে মনুষ্যেতর প্রাণীর বা জড়ের সমগোত্রীয় অর্থাৎ 'অ-মানুষ' এই অলংকারেই ভূষিত করতে হবে, অন্ততঃ যুক্তির দিক থেকে তো তাই বলতে হয়। কিন্তু সবাই যে আমরা সবাইকে 'মানুষ' বলি। মনের এই স্বাভাবিক উক্তি কি তবে মিথ্যা? নিশ্চয়ই না। আমরা সত্যলাভের পথে যতই এগিয়ে চলি, 'মনুষ্যত্ব' সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ততই পালটে যায়। তাই বিভিন্ন স্তরের লোকের মাপকাঠিতে 'মানুষ'-এর সংজ্ঞাও পালটে যায়। সেজন্য উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে মানুষের দেহ থাকলেই মানুষ হয় না, মনটিও 'মানুষ'-এর মত চাই। গভীর শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায় নিয়ে খুঁজলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের সকলের

মধ্যেই সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী যাকে 'মনুষ্যত্ব' বলে স্বীকার করে, তা লুক্কায়িত আছে। জগতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহলে এদিক থেকে আমরা বলতে বাধ্য যে আমরা সকলেই মানুষ, কারণ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই মানুষের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি ও তার জয়গান করে গেছে। এই মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রচেষ্টারই অন্য নাম 'ধর্মজীবন', ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা এর যথার্থ তাৎপর্য নিরূপণ করে বলেছেন—মানুষের মনুষ্যত্ব-রূপ ধর্ম হচ্ছে পরম ও চরম সত্য যার অন্য নাম আত্মা বা ব্রহ্ম। এই সত্য হচ্ছে এমন এক নিয়ম যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করা চলে—যার বাইরে দ্বিতীয় কিছু নেই। এখন তাহলে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে সমগ্র জগতের পেছনে যদি একটিমাত্র সত্য থাকে তাহলে মানুষ ব্যতিরেকে অন্যসব যেমন মনুষ্যেতর প্রাণী এবং জড়দ্রব্যও কি সেই সত্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়? আর তাই যদি হয় তাহলে মানুষকে যেজন্য মানুষ বলছি, ইতর প্রাণী ও জড় দ্রব্যকেও ঠিক সেই কারণেই মানুষ বলতে বাধ্য নই কি? অর্থাৎ জগতের সবকিছুই এক—এরকম সিদ্ধান্তই তো শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে? উত্তর—হাঁ। ভারতীয় ঋষিরা এরকম সদর্থক জবাব অনেক আগেই দিয়ে গেছেন,—তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সত্তার দিক থেকে সবই এক; আমরা যখন সত্যসত্যই এই জ্ঞানের অধিকারী হবো তখন নিশ্চিতই মানুষের সঙ্গে জগতের অন্য কোন অংশের এতটুকু পার্থক্য থাকবে না। ভেদজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে তখন। ব্রহ্মবিদের কাছে একজন মানুষ যা, একখণ্ড তৃণও মূলতঃ তাই। তবে আমরা যখন বিভেদের প্রাচীর তুলে জাগতিক বস্তুনিচয়কে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখি তখন সেটা হচ্ছে অব্রহ্মবিদ্ বা অজ্ঞানীর কাজ। আমরা অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা মায়ার মোহজালে পড়ে অভিভূত হয়ে আছি বলেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারছি না—আমরা যেন সর্বদাই রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম করেই চলেছি। কোন এক মঙ্গল-মুহূর্তে যদি কোন প্রভাতী সুরে আমাদের নিদ্রা টুটে, তাহলে সত্য তখন আপন আলোয় আপনি প্রকাশ পাবে।

খুবই আশা ও আনন্দের কথা যে সত্যান্বেষী মানবমন তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চ'লে আজ বিংশশতাব্দীর শুরুতে অদ্বৈতবিদ্যার পথেই পা বাড়িয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের মতে জগতের মূল উপাদান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে, সে অনুসারে বলা হয় 'শক্তিই জগতের মূল সত্তা; এই শক্তিই ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রমুখ পদার্থকণার রূপ নিয়েছে। জগৎ তার বিচিত্র রূপসম্ভার নিয়ে যে ভাবে ধরা দিয়েছে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে, সেটা তার আসল রূপ নয়—চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম প্রভৃতি জাগতিক বস্তু আসলে কতকগুলি বিদ্যুৎতরঙ্গের উদ্দাম নৃত্য-রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।' সত্যসাধক বিজ্ঞানীর এই উক্তি কি অদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদের ক্ষীণ প্রতি-ধ্বনি নয়? এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন এই বিজ্ঞানীরাও বলবেন যে অচেতন বিদ্যুৎতরঙ্গও মূল সত্য নয়—সত্য হচ্ছে পরমচেতনা; অন্ততঃ আমরা আশা করছি যে সত্যপথযাত্রী বিজ্ঞানীর এই অভিযান সার্থক হবে পরমপিতার পবিত্র আলিঙ্গনে।

আমাদের সঙ্গে প্রাণী বা জড়ের পার্থক্য

গুণের দিক থেকে নয়, মাত্রা বা পরিমাণের দিক থেকে। অর্থাৎ সত্যের প্রকাশ মানুষের মাঝে যে পরিমাণে ঘটেছে মনুষ্যেতর প্রাণী বা জড়ের মধ্যে, সেই পরিমাণের প্রকাশ ঘটেনি। ইতরপ্রাণী এবং জড়ের মধ্যেও আবার এই প্রকাশের মাত্রাগত তারতম্য আছে। মানুষ যেমন সত্যোপলব্ধির ফলে জগতের সর্বত্র একের প্রকাশ দেখতে পায়, ইতরপ্রাণীর বা জড়ের বেলায়ও ঠিক একই অভিজ্ঞতা হবে, অবশ্য যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই যে, এদের পক্ষেও সত্যোপলব্ধি সম্ভব। যদি তাই হয় তাহলে মানুষ ইতরপ্রাণী ও জড়ের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য থাকতে পারে না। ধর্মজীবন যাপন করার অর্থই হচ্ছে, যেমন আগে বলেছি, এই সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করা। সাধারণভাবে মানুষের ক্ষেত্রেই সত্যোপলব্ধির প্রশ্ন ওঠে, কারণ ইতরপ্রাণী ও জড়দ্রব্য আত্মসচেতন (সংকীর্ণ অর্থে) নয় বলে, মানুষ এখন পর্যন্ত মনে করে। তাই ধর্মজীবনের কথা আমরা মানুষের প্রসঙ্গেই আলোচনা করে থাকি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই স্বামীজী ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশই হলো ধর্ম'—Religion is the manifestation of the divinity already in man, সাধারণতঃ ধর্ম বলতে আমাদের সংস্কার ভরা মন একমাত্র পূজা-অর্চনা, সন্ধ্যা-আহ্নিক, জপ-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিকেই মনে করে। এগুলো ধর্মের বহিরঙ্গ, এগুলি ধর্মলাভের সহায়ক। পৃথিবীতে সব মানুষ সমান প্রবণতা নিয়ে জন্মায়নি, সব মানুষ তাই সমান স্তরেও বর্তমান নয়। সুতরাং প্রবণতা, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য ধর্মজীবন যাপনের ক্ষেত্রেও সমতা বা ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের বুদ্ধি বলে আমরা যে plane of existence-এ আছি, সেখানে থেকে নিরাকার ধারণা করে সেভাবে ধর্মসাধনা প্রায় অসম্ভব, তাই খুবই যুক্তিসম্মত ভাবে ঐ পরম সত্যকে (আত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর) সাকার ভেবে অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী দেবদেবীর মূর্তি তার ওপর আরোপ করে নানারকম পূজা-পদ্ধতির মাধ্যমে, আমাদের ধর্মসাধনে ব্রতী হতে হয়। সাধনার ফলে যদি আমরা নিজেদের সেই দুর্লভ higher plane of existence-এ নিয়ে যেতে পারি তাহলে সে স্তরে পূর্বস্তর—সাকার ধর্ম-সাধনার স্তর লুপ্ত হবে। সুতরাং সত্যের সাকার ও নিরাকার—দুরকম সাধনই সাধনা—উভয়ের সমন্বয় নিরাকারে। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়েও স্বামীজী বলেছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশই হলো শিক্ষা—Education is the manifestation of the perfection already in man. একটু ভেবে দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে এই পূর্ণতা এবং পূর্বোল্লিখিত 'দেবত্বের' মধ্যে, আসলে কোন পার্থক্য নেই; যতটুকু পার্থক্য আছে সেটা শুধু শব্দের বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে—শব্দস্থিত শক্তি উভয়ক্ষেত্রেই এক। স্বামীজীর মতে তাই আসল ধর্ম ও আসল শিক্ষা একান্ত অভিন্ন। যিনি যথার্থ ধার্মিক তিনিই যথার্থ শিক্ষিত, আর যিনি যথার্থ শিক্ষিত তিনিই যথার্থ ধার্মিক; সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ ধার্মিক ও যথার্থ শিক্ষিত আবার যথার্থ দার্শনিকও—কারণ ভারতীয় দর্শনের কাজ বুদ্ধি দ্বারা সামগ্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের একটা চরম ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করাই নয়, সত্যের উপলব্ধি করা। ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম, শিক্ষা ও দর্শন সম-অর্থব্যঞ্জক।

এখন দেখা যাক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনে এই ধর্মের প্রতিফলন কিরূপ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করলে জানা যায় যে তাঁর জন্মের পেছনে এক অলৌকিক নিয়ম কাজ করেছে,—ইতিহাস পর্যবেক্ষণে বস্তুতঃ ইহা পরিলক্ষিত হয় যে ভগবান যখন যুগপ্রয়োজনে অবতাররূপে আবির্ভূত হন তখন সেই আবির্ভাব দিব্য ঘটনায় বেষ্টিত থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মানুরাগ শৈশব থেকেই দীপ্ত। বালক গদাধরের দেবদেবীর স্তোত্র, পুরাণকাহিনী, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ কীর্তন ভজন প্রভৃতির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, ভাবতন্ময়তা, মুহুর্মুহুঃ সমাধি, শিবধ্যান, ভাবাবেশে নৃত্য, সাধুসঙ্গ—এসব ঘটনা তাঁর ধর্মজীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হওয়ার সময় থেকেই তাঁর সত্যকারের সাধনা শুরু হয়। দক্ষিণেশ্বর হলো শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা যে আসল শিক্ষা নয়, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা যেদিন প্রকাশ করলেন অগ্রজ রামকুমারের কাছে, সেই দিনই যেন তিনি ইঙ্গিত করলেন তাঁর উত্তরজীবনের প্রতি। তিনি বলেছিলেন—"চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাই যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।" এই অকপট উক্তি কি ধর্মশব্দের মূল তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না? তারপর দক্ষিণেশ্বরে চললো ঠাকুরের কঠিন তপস্যা। হিন্দুধর্মের যত রকম শাখা-প্রশাখা আছে যেমন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি, অহিন্দু ধর্ম যেমন খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মপথে এবং সাকার ও নিরাকার এই উভয় মার্গে বিচরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন যে সত্য এক ও অভিন্ন। হিন্দুদের ভগবান, মুসলমানদের আল্লা এবং খৃষ্টানদের গড—সবই এক, শুধু নামের পার্থক্য। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সত্য হচ্ছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ; ভগবানের বিভিন্ন নাম ও জগতের বৈচিত্র্য সবই হচ্ছে নামরূপের খেলা—সচ্চিদানন্দসাগরে ফেন-বুদ্‌বুদ তরঙ্গের লীলা। ফেন, বুদ্‌বুদ ও তরঙ্গ যেমন বাহ্যিক প্রকাশের দিক থেকে ভিন্ন হলেও আসলে সমুদ্রই, ঠিক তেমনি জগতের সব কিছুই এই সত্যের আশ্রয়ী। মানুষ তার বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী সত্যান্বেষণের জন্য বিভিন্ন যাত্রাপথ বেছে নেয়—মূল গন্তব্যস্থল কিন্তু একই। একথা বলতে গিয়ে ঠাকুর একটা সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন—"ছাতের ওপর উঠতে হ'লে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়।" যে ঠাকুর 'মা' 'মা' বলে পাগল, তিনিই আবার অদ্বৈতসাধনাকালে ধ্যানে আবির্ভূতা কালী মায়ের মূর্তিকে জ্ঞান-তরবারি দিয়ে বিনা দ্বিধায় কেটেও ফেলেছেন। এমনি ভাবে বিভিন্ন ধর্মসাধনার ফল ঠাকুর একটি ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কথায় প্রকাশ করেন—'যত মত তত পথ।' লক্ষ্য এক—মতের পার্থক্যের জন্য পথেরও বিভিন্নতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবহুল জীবনে ধর্মের যথার্থ রূপ খুব স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথাকথিত যুক্তিবাদী মন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-অনুধ্যানের ফলে ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে ঠিক একটা স্থির বিশ্বাসে যেন উপনীত হতে পারে না; কারণ ঐ মনের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-পথ রহস্যে ঢাকা। যুক্তিমুখী মন রহস্যবাদ বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না,

সে চায় একটা বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা দিলেন যুক্তিবাদী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন বক্তৃতামালার মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও শিক্ষার যেমন প্রচার করেছেন তা ঠাকুরের এবং প্রাচীন মুনি-ঋষির উপলব্ধ সত্যই, শুধু কতগুলো assertion বা ঘোষণার মধ্য দিয়ে নয়, exposition বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি ইহা করেছেন। এই যুগপ্রয়োজন-সাধনকালে স্বামীজী পূর্বসূরী ঋষিদের মত আবার পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে গেছেন যে সত্য তথাকথিত বুদ্ধি বা reason-এর নাগালের বাইরে। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'। তর্ক দ্বারা সত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতিই সত্যোপলব্ধির একমাত্র উপায়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে নিজ অদ্বৈতসাধনার গুরু তোতাপুরীর কথা ঠাকুর বলছেন—"যেমন অনন্ত সাগর—ঊর্ধ্বে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ সলিল। জল স্থির। কার্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য।" বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন: কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না। ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত। স্বামী বিবেকানন্দও সেই কথাই বলেছেন। নির্বিকল্প সমাধি বা ব্রহ্মানুভূতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্—বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' বুদ্ধি দ্বারা তো আমরা বুঝি যে সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু আমাদের কাছে এ বোধ তো অপ্রতিষ্ঠিত, যতক্ষণ এ বোধের কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের জীবনে মেলে না। সত্যকারের উপলব্ধি যখন হবে তখনই এই অদ্বৈতজ্ঞান পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো বলা চলে, এই অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে তখন জীবন নতুন খাতে বইতে শুরু করবে। তখন 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়'—এই জ্ঞানে জ্ঞানী নিজের সঙ্গে ধূলিকণারও কোন ভেদ খুঁজে পাবে না। [ক্রমশঃ]

"তাঁকে চিন্তা করে, অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ;
—আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও
আনন্দ।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সমালোচনা

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনাঃ শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১৪২ ; মূল্য চার টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বতোমুখী চিন্তাধারায় ইতিহাস-চেতনা একটি প্রধান সুর। আবাল্য তিনি ইতিহাসের অনুরাগী ছাত্র। দেশে এবং দেশান্তরে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ইতিহাসকে নানাভাবে তিনি উপলব্ধি করেছেন। শুধু গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে নয়, স্বামীজী তাঁর সুদীর্ঘ পরিব্রাজক-জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষে দীনতম কৃষকের কুটির থেকে অভিজাত-শ্রেষ্ঠ রাজন্যমণ্ডলীর প্রাসাদ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভারতেতিহাসের মর্মবাণী গ্রহণের যে প্রত্যক্ষ প্রয়াস করেছিলেন, তার তুলনা আধুনিক অধ্যাপক বা গবেষকদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। তাঁর বিশ্বপরিক্রমা মানবেতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে ভারতেতিহাসের যথাযথ মূল্যায়নের যে সুযোগ এনে দিয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ "বর্তমান ভারত" গ্রন্থটি ইতিহাস-দর্শনের গ্রন্থ। স্বামীজীর গুরুভাই এবং বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবক স্বামী সারদানন্দজী 'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—"ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষ-ব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।"

ইতিহাসের অনন্ত কালপ্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে স্বামীজী একদিন উপলব্ধি করেছিলেন—"সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।" (স্বামীজীর পরিকল্পিত ও আংশিক-লিখিত 'India's message to the world' নামক অসমাপ্ত গ্রন্থ থেকে)।

ভারতবর্ষের সুদূর অতীত থেকে সমসাময়িক বর্তমানের উত্থান ও পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেই স্বামীজী বলেছিলেন : "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" যথার্থ ঐতিহাসিক যেমন আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনারাশির অন্তরালে একটি মূলসূত্র আবিষ্কার করেন, স্বামীজীও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জাতির নিজস্ব প্রতিভা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির চিরন্তন ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতের বরেণ্য মনীষী ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন—"হিন্দুদের জাদুকাঠি হল ধর্ম, তাই

পুনঃ পুনঃ বহিরাগত শত্রুর আঘাতে বিপর্যস্ত হলেও হিন্দুজাতি—বিনম্র হিন্দুজাতি—প্রাচীন সভ্যতাগুলির মত পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি। আর এই কারণেই ভারতের ইতিহাস—গঠন- ও পঠন-প্রণালীর দিক থেকে—অন্যান্য দেশের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র। এই জন্যই ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজধানী হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি ভারতের ইতিহাসে যত প্রাধান্য লাভ করেছে তার চেয়েও বড় স্থান দিতে হবে কাশী, মিথিলা, কাঞ্চী, নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্রে।'

স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনায় ভারতীয় সভ্যতার এই মূল সুরটির অনুসন্ধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন "বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা" গ্রন্থটি পরিকল্পনা করেছেন। সম্ভবতঃ বাংলাসাহিত্যে এইটিই তাঁর প্রথম গ্রন্থপ্রয়াস। সেদিক থেকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ গ্রন্থের স্বচ্ছ ও সহজ ভাবভঙ্গী। রবীন্দ্রগদ্যরীতির লাবণ্য এবং বিবেকানন্দের ঋজু বলিষ্ঠ মননভঙ্গীর একত্র সমাহারে আদ্যন্ত সুখপাঠ্য এই ইতিহাস-চেতনার গ্রন্থটি নিঃসংশয়ে বাংলাসাহিত্যে পরম মূল্যবান সংযোজন।

তিনটি পর্বে অধ্যাপক সেন গ্রন্থটিকে ভাগ করেছেন—প্রথম পর্ব: ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্ব, দ্বিতীয় পর্ব [এ পর্বে চারটি অধ্যায়] ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম; দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত—মধ্যযুগ, অষ্টাদশ শতাব্দী; মারাঠা, শিখ। তৃতীয় পর্ব: ঊনবিংশ শতাব্দী—ভারতের জাগরণ। এই সঙ্গে পরিশিষ্টে দুটি মননদীপ্ত প্রবন্ধ সংযোজিত—"মহালগ্ন" এবং "বিবেকানন্দ ও ভারতের মুক্তি"।

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে ইতিহাস-সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই অগ্রগণ্য, যদিচ বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনা অনেক পরিমাণে বঙ্গ-কেন্দ্রিক। সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষকে আরো প্রশস্ততর দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধাবলী প্রকাশের আগেই স্বামীজী ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার রাখী-বন্ধনের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব মহিমা সম্বন্ধে আমাদের যেমন সচেতন করেছেন, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে নবযুগের বৈজ্ঞানিক মনোভাবও আমাদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা যে অনেক পরিমাণে বিবেকানন্দের ভারতচেতনার দ্বারা প্রভাবিত, একথা বলাই বাহুল্য।

অধ্যাপক সেন বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা-আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস-বিশ্লেষণকেও অনেক পরিমাণে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিশেষভাবে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার উপাদান সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত। ভারত-ইতিহাসের মর্মানুসন্ধানে এই দুই মনীষীর চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা অবশ্য এ গ্রন্থে অপেক্ষিত নয়, তবে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের আলোচনার যোগ্য বিষয়।

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র আধুনিক যুগের ভারতবর্ষ। আপাতদৃষ্টিতে এর অর্থ দাঁড়ায় ধর্ম-উদাসীন রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ উদাসীনতা একান্ত অসম্ভব। পুরানো যুগের চার্বাকপন্থা, বিগতপ্রায় সাম্যবাদ অথবা আধুনিক গণতান্ত্রিক মানবতাবাদ এরা সকলেই ধর্মের

বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা স্বামীজী সনাতন-ধর্মের চিরন্তন প্রগতিশীলতা প্রতিপন্ন করে ভারতবর্ষকে একইসঙ্গে প্রাচীনতম ও আধুনিকতম জাতির মাতৃভূমিরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই স্বাধীনতার পরে আপাত-দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য প্রভাব এদেশে হঠাৎ বাড়াবাড়ি শুরু করলেও ভারতাত্মার নিজস্ব সমাধান—ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রই আমাদের মূল আদর্শ। *ধর্ম অর্থে জীবনজিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার* উত্তরও এই ধর্মেই নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বয়ের সাধনা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড়ো উত্তর। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, ধর্মসমন্বয়ের রাষ্ট্র।

সেইজন্যই স্বামীজী বৈদান্তিক মেধা ও ইসলামের সৌভ্রাত্র্যের সমন্বয়ে এক নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজনৈতিক হঠকারিতার ফলে সে ভারতবর্ষের অখণ্ডরূপ আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়'—শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনাই ভারত-ইতিহাসের সে মহা-মিলনের পথ-নির্দেশক।

বিবেকানন্দ-পদাঙ্ক অনুসরণে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সেন বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মুসলমান যুগ ও ইংরেজ যুগ পরিক্রমা করে স্বামীজীর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত ভারতাত্মাকে উপলব্ধির সার্থক প্রয়াস করেছেন। ভারতের ইতিহাস বৈদিক বা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতবাসীমাত্রেই এক অর্থে 'হিন্দু'। হিন্দুত্ব কেবল ধর্মনির্ভর নয়, সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়। তাই হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবল হিন্দু ভারতের কথাই ভাবেন নি, ইতিহাসের অমোঘস্রোতে সর্বজাতি ও ধর্মের মিলনতীর্থ এই ভারতবর্ষই তাঁর আরাধ্যা জননী। ইতিহাসের এই সমগ্রতাকে বিস্মৃত হয়ে কেউ ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে পারে না। তাই উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রচেষ্টা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সমাজে আবদ্ধ রয়ে গেছে, ভারতের গণসত্তা এই বহিরঙ্গ সংস্কারকে অস্বীকার করেই এগিয়ে চলেছে। সংস্কারের যে প্রয়োজন নেই তা নয়, আসলে প্রয়োজন সর্বব্যাপী শিক্ষার দ্বারা অন্তরের আমূল পরিবর্তন। জাতীয় সত্তার মধ্যবিন্দু থেকে নবীন প্রেরণার আবির্ভাবের সেই মহা-প্রয়োজনেই *উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের* প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলিত অভ্যুদয়ে। "উনবিংশ শতাব্দী ভারতের নব-জাগরণ" এবং "মহালগ্ন" প্রবন্ধদুটিতে বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মূল্য ও সমসাময়িক যুগসমস্যা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা লেখক আধুনিক কালের প্রান্ত অবধি পাঠকের চিন্তাধারাকে অগ্রসর করে এনেছেন।

প্রথম পর্বে ও দ্বিতীয় পর্বের প্রথম প্রবন্ধে তিনি *স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের মূলসূত্র-সন্ধানী*। দ্বিতীয় পর্বে নিপুণ তথ্যসমাবেশে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসংস্কৃতির কেন্দ্রপরিবর্তন, হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়প্রয়াস, মুসলমান শাসনের অবসানে মারাঠা-ও শিখ-অভ্যুদয়ের বিফলতা—এ সব কিছুর অন্তরালে ইতিহাসের ঋজুকুটিল গতিপথে ভারতের অধ্যাত্মচেতনার বিচিত্র বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। তৃতীয় পর্বের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা প্রত্যক্ষ জড়িত। আলোচনার ক্ষেত্র আর একটু বিস্তৃত হয়ে স্বদেশী-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে বিশদ ভাবনার অবকাশ এ গ্রন্থে হয়তো ছিল। সামগ্রিকভাবে এ গ্রন্থ বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা প্রসঙ্গে আলোচনার সার্থক সূচনা।

প্রকাশকের যে পরিচ্ছন্ন রুচি ও মহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এই গ্রন্থমুদ্রণে অভিব্যক্ত, তা আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করা চলে, এ গ্রন্থের একটি ইংরেজী সংস্করণ কি আশু প্রকাশিতব্য নয়?

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সারদা মায়ের কথা—স্বামী সোমানন্দ। প্রকাশক—গ্রন্থকার, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রিশড়া (হুগলী)। পৃষ্ঠা ১০০, মূল্য ১.৭৫।

শ্রীশ্রীমায়ের লোকোত্তর জীবনের ঘটনাবলী বিভিন্ন শিরোনামে আলোচ্য পুস্তকে প্রকাশিত। গল্প বলার ভঙ্গীতে লিখিত ভাষায় অনেক স্থলে কল্পনাকে আশ্রয় করা হইয়াছে, তবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের পবিত্র ভাবধারা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। বইটি ছোটদের খুব ভাল লাগিবে।

আলোকের উৎস সন্ধানে—সঞ্জয়। প্রকাশক: শ্রীসঞ্জয়কুমার দাস। মুদ্রাকর: শ্রীসত্যরঞ্জন রায়গুপ্ত, শ্রীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্, জলপাইগুড়ি। পৃষ্ঠা ৩২, মূল্য এক টাকা।

২৫টি কবিতা লইয়া এই কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলি ভাবসমৃদ্ধ। প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। একটি নিদর্শন:—

কত পথ, কত গৃহ সংসার, প্রান্তর নির্জন, আর
মুখরিত নগর নগরী
ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশ্রান্ত,
অবশেষে খেয়াতীরে সায়াহ্নবেলায়
মনে হয়, শুধু বৃত্তপথে যাওয়া ও আসায়
যাপিয়াছে সারা দিনমান;
প্রজ্ঞামার্গে জ্ঞানতীর্থ সকল ঘুরি,
শ্রান্ত রিক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ স্খলিত চরণে
ফিরে আসে শিশু নির্জ্জনে॥

কাব্য-রসিকদের নিকট গ্রন্থটি আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

(১) **রামধনু**, (২) **পুজার ফুল**, (৩) **সোনার কুঞ্জ**, (৪) **মর্মবীণা**, (৫) **পারের খেয়া**, (৬) **মাতৃশঙ্খ ও কৃষ্ণ-মুরলী**—শ্রীশিশিরকুমার দত্ত প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান: রায় ব্রাদার্স বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিসার্স, ১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা: ৮২, ২৮, ২৪, ২০, ১৬, ৫২। মূল্য: ২, .৭৫, .৫, .৭৫, ১.৭৫, ১৲।

কবিতা ও সঙ্গীত প্রাণের জিনিস; অন্তরের ভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসৃত হইয়া লেখনীমুখে ছন্দোবদ্ধরূপে ইহার প্রকাশ। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে কবিতাগুলি রচিত। ভক্তিমূলক গানগুলিতে ভাবের আন্তরিকতা আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা: মুক্ত ভারত, আমার ভারত, বীরদীক্ষা, ন্যায়বজ্র।

স্মারক গ্রন্থ—সর্বাঙ্গী বিকাশ সঙ্ঘ, 'একান্তাশ্রম', কল্লু, হিমালয়, শাখাকেন্দ্র: দত্তাশ্রম, ১৫ কমলেশ, কাঁকরিয়া, আমেদাবাদ ১৭। পৃষ্ঠা ৩৩০।

সর্বাঙ্গী বিকাশ সঙ্ঘের ধর্মভাব বিস্তার-প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই সঙ্ঘের উদ্যোগে যে ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আলোচ্য স্মারক গ্রন্থখানিতে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মেলনে ইংরেজী, হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকথা গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। বঙ্গদেশের বাহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ভাবধারা ও যুগাদর্শ জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে এই গ্রন্থ সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ ও স্বামী ওঙ্কারানন্দজী মহারাজ সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট) এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই ফেব্রুআরি, বুধবার সকালে বেলুড় মঠে ট্রাষ্টিগণের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ (ময়লাপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এলোপ্যাথিক বিভাগে ১,৪৪,২৩৫ ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ২,১৩১ মোট ১,৪৬,৩৬৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। চক্ষুবিভাগে ১৪,৪৯৮, কর্ণ-নাসিকা ও গল রোগের চিকিৎসা-বিভাগে ৯,৮৪০, দন্ত-বিভাগে ৭,১৩৩ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং এক্স-রে বিভাগে ৫৭১ জন রোগীর এক্স রে করা হয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৮৯৮, ১৯,৫৮২ জন রোগীকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং সাধারণ ভাবে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় ৯৮৫টি।

আলোচ্য বর্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে ২,৬২৫টি রুগ্ণ শিশুকে ঔষধমিশ্রিত দুগ্ধ দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুষ্টির অভাবগ্রস্ত ২,৬২৫টি শিশুকে নিয়মিত দুগ্ধ দেওয়া হয়।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য-বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ, ১৯৬৫) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের কার্যধারা নিম্নরূপ : নানাস্থানে ও আশ্রমে মোট ২৪০টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাসে বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা অবলম্বনে আলোচনা করা হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৮টি ছাত্র শিক্ষা লাভ করে।

আশ্রমের ছাত্রাবাসে ২৪ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনা খরচে ও ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৭,৩৩৮, আলোচ্য বর্ষে ১৮৩ খানি পুস্তক সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৫৪টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ৮,৫৩৯ এবং পাঠাগারে পাঠক-সংখ্যা ১৪,৭৫৩। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৫৫,১৫৩ (নূতন ৫,৯৪৬) জন ও ৪০,০০০ (নূতন ৫,৮২৪) জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

বিশাখাপত্তনম্ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত কার্যধারা :

আশ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ও আধ্যাত্মিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাময়িক উৎসবগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। গ্রন্থাগারে ২,৩৪৩ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক আছে, পাঠাগারে ২০টি মাসিক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে, তাহাতে ছবির বই ই বেশী রাখা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫৯টি শিশু শিক্ষা লাভ করে এবং ১৫ জন শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। স্বামীজীর জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে 'বিবেকানন্দ হল' নির্মিত হইয়াছে।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪ - মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগীসহ ২,১০৭ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,৬৪৭ জন আরোগ্য লাভ করে। চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ৮২৪টি অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের ১০৩টি শয্যার মধ্যে গড়ে প্রত্যহ ৫৯টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ২,১৭,৩০২ জন রোগী (পুরাতন ১,৭৩,১৭৬) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগীসহ মোট ৯৯৮ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৯৫।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিত নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮০৯০ ও ১৫,৭১৭। এক্স রে বিভাগে ৬২০টি এক্স রে করা হয় এবং ল্যাবরেটরিতে ৫,৮৮৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২১৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

হরিজনদের জন্য দুইটি কূপ খনন করানো হইয়াছে এবং ১০৫ জন দরিদ্র ছাত্রকে ৩৪২ খানি পাঠ্যপুস্তক কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কনখল সেবাশ্রম হরিদ্বারের নিকটে সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই আশ্রমের ৬৪তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৪—মার্চ, '৬৫) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৪৭টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৩৭০ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,২২৭ জন আরোগ্যলাভ করে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯১,২১৮ (নূতন ২৩,৫৯২), অস্ত্রচিকিৎসা ১,৪৪৯, দন্তচিকিৎসা ১৬২, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা ২,০১৬, ইলেক্ট্রোথেরাপি চিকিৎসা ৪৬০। ল্যাবরেটরিতে ৫,২৭৫টি নমুনা পরীক্ষিত হয়।

গ্রন্থাগারে ৫,২৮৩টি পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৩৮টি সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়।

উৎসব-সংবাদ

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৩ই জানুআরি বৃহস্পতিবার কঠোপনিষদ্‌পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী আলোচনা, পূজানুষ্ঠান ও ভক্তসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১০৪তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়।

১৫ই তারিখ শনিবার বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ওড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় মহান্তি। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ঋদ্ধানন্দ ওড়িয়াভাষায় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। ওড়িয়াতে বক্তৃতা করেন ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ। ইংরেজীতে ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীসত্যবাদী মিশ্র। সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণের পর ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী উপস্থিত

সকলকে সুললিত সংস্কৃতভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ১৩ই জানুআরি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকগণ কর্তৃক এক বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিদ্যার্থি-ভবনের শিক্ষক প্রোফেসার শ্রীরামেশ্বর ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় ছাত্রগণ সঙ্গীত, প্রবন্ধপাঠ, কবিতা-আবৃত্তি, লীলাগীতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে। পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী তত্ত্বানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন, নিজেরা 'মানুষ' হওয়ার চেষ্টা করিলেই সব চাইতে ভাল জনসেবা হইবে।

১৬ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মতিথি স্মরণে স্কুল-সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত দত্ত, প্রিন্সিপাল শ্রীপ্রেমেন্দ্র-মোহন গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ এবং ডাক্তার শ্রীবীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সভাপতি শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাস স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা, বেদান্তপ্রচার, স্বদেশপ্রেম ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বিষয়ে অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া

স্যানফ্র্যান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি: অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, পুরাতন মন্দিরে নারদীয় ভক্তিসূত্র অবলম্বনে ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অক্টোবর, '৬৫ : মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা; নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব, 'তোমরা ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির'; মনঃসংযম ও ধ্যান; অনন্তের যাত্রী; ইন্দ্রিয় ও মনের উন্নয়ন, অন্তরের ভগবৎশক্তি, আধ্যাত্মিক বিকাশ-সাধন, যুক্তি ও ধর্মানুভূতি; ঈশ্বরাস্তিত্ব উপলব্ধির সাধনা।

নভেম্বর, '৬৫ : ধ্যানপরায়ণ জীবনের স্তর, 'প্রভু আমার, সর্বস্ব আমার', আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের আনন্দ, পোপের প্রচার—'অ-খৃষ্টান ধর্মসমূহের সহিত গীর্জার সম্বন্ধ', ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? ছায়া ও কায়া, গুরু ও শিষ্য।

স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র: অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

অক্টোবর, '৬৫ : শাশ্বত ও অশাশ্বত, ধ্যানের স্তর, আধ্যাত্মিক দর্শন, নিজ আত্মার প্রতি সত্যনিষ্ঠ হও; যোগের দ্বারা জীবনের উদ্ভাসন।

নভেম্বর, '৬৫ : বেদান্তের আহ্বান, একাকী কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়, আধ্যাত্মিক জীবনে ভাবালুতা যে আলোক অন্তর উদ্ভাসিত করে; মানুষ—অনন্ত পথের যাত্রী, বর্তমান ভারতের মহীয়সী সাধিকা, জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা; ঈশ্বরপুত্র যীশুখৃষ্ট।

এতদ্ব্যতীত কঠোপনিষদের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে সেবাকার্য

জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে রামকৃষ্ণ মিশন যে সেবাকার্য চালাইতেছে তাহাতে এ পর্যন্ত ৯০১ খানি কম্বল, ১,০৫০টি বালতি, ১,৭৪০টি বয়স্কদের পোশাক (সার্ট, প্যাণ্ট, সোয়েটার, ফতুয়া, গেঞ্জি, জামা ইত্যাদি) এবং ২,৪৭০টি ছোটদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। এই রিলিফ-কার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৪২,০০০৲ টাকা।

প্রচারকার্য

গত ২৩.১.৬৫ হইতে ২০.৬.৬৫ পর্যন্ত স্বামী

সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন :

বিষয়	স্থান
পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী	রামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বাই
শ্রীরামকৃষ্ণ	শিবপুর, হাওড়া
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের যুবসম্প্রদায় ...	বিজয়ওয়াদা
ভারতীয় নারীর আদর্শ .	,,
সনাতন ধর্ম ...	,,
তরুণ ভারতের প্রতি স্বামীজীর বাণী	,,
সনাতন ধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের দান	সিঁথি কলিকাতা
বর্তমানে দেশে যে শিক্ষা প্রয়োজন	রবীন্দ্রসরোবর ,,
কর্মযোগ .	পার্কসার্কাস ,,
স্বামী বিবেকানন্দ (বার্ষিক উৎসব)	বোম্বাই আশ্রম
শ্রীরামকৃষ্ণ (,,)	,,
শ্রীরামকৃষ্ণ ও সনাতন ধর্ম	বারাকপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দুধর্ম	হোটর
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগ	ইছাপুর
কঠোপনিষৎ	,,
ধর্ম	বালগঞ্জ
জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী .	কাটিহার আশ্রম
শ্রীরামকৃষ্ণ	রায়গঞ্জ
স্বামী বিবেকানন্দ	,,
যে ধর্মের আমরা উত্তরাধিকারী	হরিরামপুর
ভারতের নব জাগরণ	মিনার্ভা থিয়েটার
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ	বাঘাযতীন কলোনী
নিষ্কাম ধর্ম	আঁটপুর
শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌম ধর্ম	গড়বেতা
,,	সিক্কু
স্বামী বিবেকানন্দ	,,
শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার বাণী	মেদিনীপুর
শ্রীবুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ	,,
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	,,
শ্রীশ্রীমা	,,
বিশ্বশান্তি ..	বোম্বাই
বর্তমানে যা প্রয়োজন	,,

পরলোকে ই. সি ব্রাউন

দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য মিঃ ব্রাউন গত ৩১. ১২. ৬৫ তারিখ কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগ তিনি বেলুড় মঠের অতিথি-ভবনে কাটাইতেছিলেন। হিন্দুমতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।

মিঃ ব্রাউন আমেরিকান ছিলেন। সানফ্রান্সিসকোতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন লাভ করেন, সে-সময় কর্মব্যপদেশে তিনি কোন সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দিন ক্লাসের পর তিনি স্বামীজীর সহিত করমর্দনও করিয়াছিলেন।

পরে সানফ্রান্সিসকো হিন্দুমন্দিরে বাস করিয়া (আশ্রম হইতেই অফিসে যাইতেন) তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সাহচর্য ও তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "সজ্জন"। শেষ জীবনে মিঃ ব্রাউন এই নামেই নিজেকে পরিচিত করিতে ভালবাসিতেন বিশেষতঃ মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের নিকট।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের দেহত্যাগের কিছু কাল পর মিঃ ব্রাউন বিবাহ করিয়া দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র লাভ করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি পুনরায় সানফ্রান্সিসকো আশ্রমে বাস করিতে শুরু করেন। পরে চাকরিও ছাড়িয়া দিয়া আশ্রমের কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি সানফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সানফ্রান্সিসকো আশ্রমে থাকাকালে ভারত হইতে সেখানে প্রেরিত স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী অশোকানন্দের সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ তিনি পান। ইঁহাদের সকলের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, "My teachers" বলিয়া ইঁহাদের উল্লেখ করিতেন।

গত মহাযুদ্ধে তাঁহার পুত্র মারা যাওয়ায় তিনি ভারতে আসেন। দু-তিন বার যাতায়াতের পর ভারতেই থাকিয়া যান। বাঙ্গালোরে তিন-চার বছর ছিলেন। হোটেলে থাকিয়া আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। শেষ সময় বেলুড় মঠে ছিলেন। সেখান হইতেই চিকিৎসার

জন্য তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান হইয়াছিল।

শেষ ১৫।২০ বৎসর তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের মতই জীবন কাটাইয়াছেন। বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণের খুব ইচ্ছাও ছিল তাঁহার। বাহিরের কোন মঠ হইতে সন্ন্যাস পাওয়া যাইতে পারে, একথা তাঁহাকে জানাইলে বলিয়াছিলেন, "প্রয়োজন নাই, স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপিত বেলুড়মঠরূপ main current হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আমি চাইনা।"

মিঃ ব্রাউন নিরামিষাশী ছিলেন। বাগান করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল গোছালো। কৌতুকপ্রিয় ছিলেন খুব—অনেক মজার গল্প বলিতেন। শেষ পর্যন্ত স্বাবলম্বী ছিলেন, সহজে কাহারো নিকট কোনওরূপ সাহায্য লইতে চাহিতেন না।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস

গত ৩রা জানুআরি হইতে ৯ই জানুআরি (১৯৬৬) পর্যন্ত চণ্ডীগড়ে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিবেশনের মূল সভাপতি অধ্যাপক বি. এন. প্রসাদ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বলেন: উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশযাত্রার যে অত্যধিক আগ্রহ, তাহার প্রতিরোধকল্পে উন্নততর গবেষণাদির জন্য এদেশেই অতি উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি শিক্ষায়তন খোলা অতি আবশ্যক। প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য সেখানে বিদেশ হইতে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের আনিলেই হইবে। যে সব উচ্চতর শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা এদেশেই রহিয়াছে, তাহার জন্য কোনও ছাত্রকে বিদেশে যাইতে দেওয়াই উচিত নয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনার জন্য ১৩টি প্রসিদ্ধ শাখায় অধিবেশন হইয়াছিল। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন বিভাগে সভাপতিত্ব করেন:

অধ্যাপক দুর্গানন্দ সিংহ—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা, অধ্যাপক এস. এম. মুখোপাধ্যায়—রসায়ন, অধ্যাপক জি. পি. শর্মা—প্রাণিবিদ্যা, অধ্যাপক ডব্লিউ. এম. ওয়াডিয়া—পদার্থবিদ্যা, অধ্যাপক আর. এস. মিশ্র—গণিত, ডক্টর এস. পি. রায়-চৌধুরী—কৃষিবিদ্যা, অধ্যাপক অনন্তকুমার সেনগুপ্ত—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা, ডক্টর পি. সি. সেনগুপ্ত—চিকিৎসা, মিঃ জি. এস. রায়—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, ডক্টর বি. কে. আনন্দ—শারীরবৃত্ত, অধ্যাপক এন. এম ভাট—পরিসংখ্যান, অধ্যাপক টি. এস. মহাবলে—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, মিঃ এস. পি. নাউটিয়াল—ভূবিদ্যা ও ভূগোল।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেন সারভিস

জাপানের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিওডোর সংবাদে প্রকাশ, জাপানের ন্যাশনাল রেলওয়ে করপোরেশন টোকিও এবং ওসাকার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেন সারভিস চালু করিয়াছে। দুইখানি সুপার এক্সপ্রেস এই দুইটি শহরের মধ্যে ৫১৫ কিলোমিটার (৩২২ মাইল) পথ তিন ঘণ্টা দশ মিনিটে অতিক্রম করে। ট্রেনদুইটির গতিবেগ ঘণ্টায় গড়ে ১৬২·৮ কিলোমিটার ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে উহারা ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার বেগেও চলিয়া-

ছিল। ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেন ঘণ্টায় ৮২·৫ মাইল বেগে চলে।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকুরিয়া : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২ই জানুআরি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি, শাস্ত্রপাঠ, ভজন প্রভৃতি কার্যসূচী অনুসরণ এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে ফল-মিষ্টি প্রসাদ হাতে হাতে বিতরণ করা হয়। বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবন আলোচনা করেন।

খেপুত (মেদিনীপুর) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই ডিসেম্বর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, প্রসাদবিতরণ, মাতৃসঙ্গীত, মায়ের জীবনকথা আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ-সোসাইটি (২১, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬) : যুগাচার্য স্বামীজীর ভাবধারা রূপায়িত করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় কঠোপনিষৎ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, শিবমহিম্নঃস্তোত্র, গীতা, চণ্ডী, ধর্মপদ, 'কথামৃত', স্বামীজীর 'কলম্বো হইতে আলমোড়া', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি অবলম্বনে কথকতা এবং মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা হইয়াছিল।

সোসাইটি-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৭৭৩ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় সোসাইটিতে একটি দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ৫,৩৪০ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ২,৫১২টি পুস্তক পাঠকগণকে পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে অনেকগুলি পত্রিকা নিয়মিত আসে। সোসাইটির বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৩৫৮।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

কলিকাতায় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোডে নিজস্ব জমিতে সোসাইটির বহু-ঈপ্সিত 'বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির'-এর (Swami Vivekananda Memorial Hall) নির্মাণকার্য চলিতেছে।

পরলোকে ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২১শে ডিসেম্বর তাঁহার চক্রধরপুরস্থ বাসভবনে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরোপকারী, দয়ালু ও ভক্তিমান ধীরেন্দ্রবাবু পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ধর্মীয় ও জনহিতকর যাবতীয় কার্যে তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ
(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব-নির্বাচিত অধ্যক্ষ)

[আনন্দের কথা, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইযাছেন , এ কথা আমরা পূর্বেই জানাইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি লাভের পর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ দশম অধ্যক্ষরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজের তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টিগণ আশা করিয়াছিলেন যে তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ (তখন অসুস্থ) সুস্থ হইবার পর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুআরি তিনি মহাসমাধিতে লীন হওয়ায় তাহা আর কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বর্তমান ট্রাষ্টিগণের মধ্যে সর্বপ্রাচীন শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত ট্রাষ্ট্-ডীড্ অনুসারে অন্তর্বর্তিকালে অধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন।]

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া, ২৪ বৎসর বয়সে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং তদানীন্তন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানগণের বহুজনের সংস্পর্শে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারীও তিনি হইয়াছেন।

দীর্ঘকাল নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবা করিয়াছেন। প্রথমে কিছুকাল মাদ্রাজ মঠে, পরে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কয়েক বৎসর ধরিয়া

দক্ষতার সহিত কার্য করিবার পর তিনি অদ্বৈত আশ্রমের কলিকাতা শাখার কর্মাধ্যক্ষ হন। পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য, এবং ১৯৩৮ খৃঃ সমগ্র সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। বারাণসী সেবাশ্রমের কার্যধারা পুনর্বিন্যাসের জন্য তিনি একবার মিশন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৺কাশীধামে প্রেরিত হন এবং স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের সহযোগিতায় তাহা সুসম্পাদিত করেন। ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের বাংলার দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যের দায়িত্ব সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি সে সেবাব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত—শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ শারীরিক কারণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ পদ হইতে সাময়িক অবসর গ্রহণ করিলে তিনি উক্ত পদাভিষিক্ত হইয়া কার্য করিতে থাকেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্বামী মাধবানন্দজী অধ্যক্ষ হইবার পর স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী পুনরায় সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন, সঙ্ঘাধ্যক্ষ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ সমগ্র গীতার ইংরেজী অনুবাদ—তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম গ্রহণের সুযোগ্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত রাখিয়া স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে তিনি দীর্ঘকাল লোককল্যাণব্রতে ব্রতী রাখুন।

"কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না।"

"মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরি নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।"

"শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা।—তাতে কি হবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

দিব্য বাণী

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥ ১

—শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীচৈতন্য

ধুয়ে মুছে সর্বক্লেদ প্রভাব যাহার করে
হৃদয়দর্পণটিরে শুদ্ধ অমলিন,
ভব-মহাদাবাগ্নির করে নির্বাপণ,
পরম কল্যাণাকর মুক্তি-শ্বেতশতদলে
ঢালে যাহা সুবিমল চন্দ্রের কিরণ,
সর্বত্র বিজয় তার, সদা জয়যুক্ত সেই
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন।

পরাবিদ্যা-বধূটির জীবনস্বরূপ যাহা,
কর্ণপুটে পশিলে যে মধু-বরিষণ
আনন্দের পারাবার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে,
আনে প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদন,
সিনান করায় চির-শান্তিনীরে সর্বজীবে,
চিরজয়ী সেই কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬

ধন জন সর্বজ্ঞত্ব সুন্দরী বনিতা আদি, জগদীশ, কিছুই না চাই—
জন্মে জন্মে, ভগবান, তব পদে সদা মোর অহৈতুকী ভক্তি যেন রয়।
সেদিন আসিবে কবে, তব মধুমাখা নাম নেবা মাত্র দুনয়নে যবে
বহিবে প্রেমাশ্রুধারা, দেহ মোর কণ্টকিত, কণ্ঠ মোর বাষ্পরুদ্ধ হবে!

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রধানতঃ দুটি—একটি জ্ঞানের, অপরটি ভক্তির। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণকে সাধারণতঃ এই দুই থাকে ভাগ করিতেন—শিবঅংশ-সম্ভূত ও বিষ্ণুঅংশ-সম্ভূত। একটি মদনান্তকারী শিবের ভাব—রূপ-রস, বাসনা-কামনা সব কিছুকে প্রথম হইতেই অস্বীকার করিয়া, জ্ঞানাগ্নিতে 'ভস্মাবশেষ' করিয়া সর্বভাবাতীত চরম সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াব ভাব। অপরটি সর্ববিধ পার্থিব রূপ-রসাদির মিথ্যায় গড়া আবরণের ভিতর সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানেরই প্রাণারাম প্রকাশ দেখিয়া অপরূপ ঈশ্বরীয় রূপ-মাধুর্যের দ্বারা সর্ববিধ নীচ বাসনা-কামনাকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়ার ভাব।

শ্রীভগবান যখন নরদেহে আবির্ভূত হন, সে আবির্ভাবে জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশ সমভাবে থাকিলেও যুগপ্রয়োজনে তিনি উহার একটিকেই বাহিরে বিশেষভাবে প্রকাশিত করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্তমান যুগপ্রয়োজনে সর্ববিধ ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ দেখাইয়াছিলেন। যখন যে ভাবের লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, দেখা যাইত তিনি তখন সেইভাবেই ভাবিত হইয়াছেন। ভক্তিপথই অধিকাংশ লোকের পথ, সেজন্য সাধারণভাবে তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবের প্রকাশাধিক্যই দেখা যাইত। এক সময় তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছেন, "তোমায় তো বলেছি যে বিষ্ণুঅংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ঘুরে ফিরে সেই 'মা—মা'।" প্রেমঘনমূর্তি ভগবান শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: জ্ঞান ছিল তাঁর অন্তরের জিনিস, নিজের উপভোগের জন্য; আর ভক্তির প্রকাশ দেখাইতেন সর্বসাধারণের ভিতর ভক্তির আদর্শ স্থাপনের জন্য। বলিয়াছেন, চৈতন্যদেবের তিনটি দশা ছিল, অন্তর্দশায় তিনি অদ্বৈততত্ত্বে লীন হইয়া স্থির হইয়া যাইতেন, অর্ধবাহ্যদশায় ভগবৎপ্রেমে উদ্দাম নৃত্য করিতেন, আর বাহ্য-দশায় তাঁহার নাম গুণগান করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' সংযমের সহিত 'মৃদূনি কুসুমাদপি' প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। শোনা যায়, মদন-লাঞ্ছিত রূপমাধুরী মণ্ডিত, চাচর চিকুর শোভিত অতীব প্রিয়দর্শন এই যুবককে সন্ন্যাসদানের পূর্বে কেশবভারতী তাঁহাব জিহ্বাব উপব কিছু শর্কবা রাখিয়া কিছুক্ষণ পবে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেখিয়া তাঁহাব সংযমের বাঁধ কত উচ্চ, কত দৃঢ় তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, চিনিব সব দানাগুলি উড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল—একটি দানাও ভিজিয়া যায় নাই। সন্ন্যাসীদের সর্ববিধ খুঁটিনাটি নিয়ম যেরূপ কঠোরতার সহিত তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা মেলা ভার। সংযম ও ত্যাগের এই সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল তাহার ভাবাপ্লুত হৃদয়, সেখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল অনবদ্য প্রেম-শতদল।

কালক্রমে আমরা তাঁহার এই ত্যাগের দিকটি ভুলিতে বসিয়াছি। সংযম ব্যতীত কোনও ভগবদ্ভাব হৃদয়ে স্থায়ী হয় না, ভাবের গভীরতা আসা তো দূরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বলিতেন: (ক্যামেরার উদাহরণ দিয়া) কাঁচে যদি কালি (ব্রোমাইড প্রভৃতি) মাখান

থাকে, তবে তাহার উপর ছবি পড়িলে উহা স্থায়ী হয়; কালি মাখান না থাকিলে ছবি পড়ে বটে, কিন্তু বস্তুটি সরাইয়া লইবামাত্র সে ছবিও লুপ্ত হয়। মনরূপ কাঁচের পক্ষে সংযমই ভাবকে স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখিবার কালি। সংযমহীন জীবনে ভজনাদির আধিক্যবশতঃ সাময়িকভাবে হৃদয় উচ্চভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও পরক্ষণে উহা বুদ্বুদের ন্যায় ফাটিয়া গিয়া শূন্যলীন হয়। ইহার আরো একটি গুরুতর বিপদ আছে। সংযমহীন জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী ভজনাদির মাধ্যমে মন উচ্চে উঠিবার পর যখন নামিতে থাকে, তখন কত নীচে যে নামিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। সেজন্য জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ইহাতে লাভ অপেক্ষা লোকসানই অধিক হয়। অভ্যাসসহায়ে স্থায়িভাবে যতটুকু সংযত ও ঈশ্বরীয় চিন্তায় নিবিষ্টমনা হওয়া যায়, তাহার মূল্য সাময়িক উচ্চ ভাবপ্রবণতার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। স্বামী সারদানন্দজী ভাবের বহিঃপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সংযমের বাঁধ যাহার যত উচ্চ, তাহার ভাবধারণের ক্ষমতাও তত বেশী। সংযমের বাঁধ যেখানে নিম্ন সেখানে সামান্য ভাবাবেগেই উহা উপছাইয়া পড়িয়া শরীরে অশ্রু প্রভৃতি বিকার আনয়ন করে। ভাবের বহিঃপ্রকাশই কখনো ভাবের গভীরতার নির্দেশক হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ উপমায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন: ছোট ডোবায় হাতী নামিলে জল তোলপাড় হইয়া যায়, কিন্তু দীঘিতে নামিলে কিছুই হয় না।

ক্বচিৎ কাহারো জীবনে ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ এত বিপুল পরিমাণে ঘটে যে, সংযমের সুউচ্চ প্রাচীরও উহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভাবের বিপুল প্লাবন প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দেহকেও প্লাবিত করে—দেহে অশ্রু-পুলকাদি বিকার দেখা দেয়। ইহার চরমাবস্থা মহাভাব। শ্রীমতী রাধারাণীর এই মহাভাব হইত, বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ভগবান চৈতন্যদেবের দেহেও এই মহাভাবপ্রসূত অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশের কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এই মহাভাব ও তজ্জনিত দৈহিক বিকার বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে।

নদীয়ার চাঁদ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কত শত ভক্তের হৃদয়সাগর উদ্বেলিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের সাকার বিগ্রহের অমিয় পাদস্পর্শে, চিদাকাশে 'পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয়ে', অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, ভক্তির পথই সর্বসাধারণের পথ। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছেন: গৃহের—দেহমনবুদ্ধির—বাহিরে আসিয়া জ্ঞানসূর্যের প্রখর কিরণে দাঁড়াইতে হয়ত সকলে পারে না, কিন্তু ভক্তি-চন্দ্রের—তাঁহার সাকার রূপের—স্নিগ্ধকিরণে তো হৃদয় সুশীতল করা যায়। শ্রীচৈতন্য এই সর্বজনলভ্য সুশীতল অমিয়ধারার নিত্য নির্ঝর-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের ভাবানুসরণকালে আমরা যেন তাঁহার ভাবভক্তির ভিত্তিভূমির কথা ভুলিয়া না যাই, যেন সর্বদা স্মরণ রাখিতে পারি যে, শ্রীভগবানকে সাকার বা নিরাকার যে কোন ভাবেই হউক না কেন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব একমাত্র সংযমাগ্নিদগ্ধ ক্ষিপ্তমালিন্য শুদ্ধ মনবুদ্ধি সহায়েই। ভোগকালিমালিপ্ত মনের নিকট হইতে তিনি বহুদূরে। প্রেমময়ের নিত্যনিবাস নিত্য-ধামে জীবনতরণীকে বাহিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কল্পবান হইয়া একমাত্র দাঁড়টানার দিকেই যেন নিবদ্ধদৃষ্টি না হই আমরা, নোঙরটি তুলিবার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথাও যেন ভাবি।

ছাত্রজীবনে সংযম ও জাতির ভবিষ্যৎ

ছাত্রজীবন জীবনগঠনের সময়, সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ সেবকরূপে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য যথাসাধ্য জ্ঞান ও শক্তিসঞ্চয়ের সময়; অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্রের গতিনিয়ন্ত্রণে অত্যধিক মাত্রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে দেওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। সর্ববিষয়ে সংযমজনিত সঞ্চিত শক্তিতে যে ছাত্রজীবন যত বেশী সমৃদ্ধ হইবে, পরবর্তীকালে কার্যক্ষেত্রে সমাজ ও দেশের সেবায় সে জীবন কাজে লাগিবে তত বেশী, তত অধিক-পরিমাণে ও অধিকতর সীমায় বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ হইবে সে জীবনের সেবাব্রত। ছাত্রজীবনে ভাবপ্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় থাকে, তাহার উচ্ছ্বাসও বহিঃপ্রকাশে সদাউন্মুখ। কিন্তু অধিকতর শক্তিসম্পন্ন উন্নততর জীবন গঠন করিতে হইলে ইহাকে যথাসাধ্য সংযত করিতেই হইবে; তাহার জন্য প্রয়োজনীয় মনের বলও অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে যৌবনের প্রারম্ভে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, পতনোন্মুখ জলধারার বেগ রোধ করিতে পারিলে সেখানে বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়। জল হইতে বাষ্প উঠিয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িলে সে শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়। কিন্তু যখন ঐ শক্তির অসংযত অপচয় রোধ করিয়া উহাকে সুদৃঢ় কক্ষে সঞ্চিত ও যথাযথ প্রণালীতে প্রয়োজন মত চালিত করা হয় (যেমন ষ্টীম ইঞ্জিনে), তখন ঐ সঞ্চিত শক্তি দ্বারা প্রচণ্ড কার্য সাধিত হইতে পারে। তাছাড়া যখন সাময়িক উচ্ছ্বাসবশে মানসিক শক্তি নিয়োজিত হয়, তখন ঝঞ্ঝার মত আসিয়া ক্ষণপরে উহা চলিয়া যায়—পিছনে রাখিয়া যায় অবসাদ ও শূন্যতা। আর যখন—স্থিরবুদ্ধি-চালিত হইয়া সুসংহত শক্তি নিয়োজিত হয়—তাহা হইয়া উঠে দীর্ঘকালব্যাপী কর্মক্ষম ও অপ্রতিরোধ্য, সাময়িক উচ্ছ্বাসবশে অনেকেই দুরূহ কর্মসাধনে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা না থাকিলে অধিকাংশই শ্লথগতি হইয়া যায় অর্ধপথে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য স্থিরসংকল্প হইয়া শেষ পর্যন্ত আগাইয়া যাইবার মানুষ সংখ্যায় খুব বেশী নয়। দেশের পক্ষে সর্বকালেই প্রয়োজন কিন্তু সেইরূপ মানুষেরই, লোককল্যাণকর কোন শুভ সঙ্কল্পে সাময়িকভাবেও প্রভাবিত হওয়া মহৎ কর্ম সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার স্বল্পাংশকেও জীবনে স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখা মহত্তর কর্ম ও অধিকতর কল্যাণপ্রসূ। সংকল্পের সেরূপ দৃঢ়তার জন্য অমিত শক্তির প্রয়োজন এবং তাহা লাভের একমাত্র উপায় শক্তির অপচয় রোধ, সংযমাভ্যাস। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের ও জগতের জন্য কীভাবেই না জীবনের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, আর সে শক্তির বিপুলতাই বা কী! কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন (ক্ষেত্র ভিন্ন হইলেও) ছাত্রাবস্থায় আরম্ভ হয় নাই, ছাত্রজীবন নিয়োজিত ছিল শক্তির বিকাশের সাধনাতেই; কর্মজীবন আরম্ভ করিবার পূর্বে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মানবসেবা এত বিপুলভাবে করিতে পারিয়াছিলেন।

অবশ্য কদাচিৎ এক-আধ বার সাময়িক বিশেষ প্রয়োজন আসিতে পারে। ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন আর সব কাজ ভুলিয়া আগুন নিভাইবার জন্যই সকলকে ছুটিতে হয়, ছুটিয়া আসেও সবাই। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেইরূপ কোন বিশেষ ক্ষণে ছাত্রগণকেও সব কিছু ভুলিয়া এইরূপ অতিপ্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা করিতে ডাকা হইয়াছিল—সেকার্যে তাহাদের অবদানও

অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে যে সব কাজে ছাত্রদের আগাইয়া না আসিলে বা তাহাদের না ডাকিলেও চলে, সে সব কাজেও তাহারা নামিতেছে, তাহাদের আহ্বান করা হইতেছে, তাহাদের শিক্ষা ব্যাহত করিয়া, তাহাদের মনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নমনীয় বেগবান মানসিক প্রবণতার সুযোগ লইয়া হইতেছে। ছোট বড নানা কারণে বারে বারে এরূপ ঘটার ফলে শিক্ষা অতিমাত্রায় বিঘ্নিত হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হওয়ায় ও উগ্র পরিবেশজনিত মানসিক অস্থিরতায যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ করা সহজ হয় না। যত দিন যাইতেছে, দেখিযা অনেক সময় মনে হয়, ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তামাত্র করিবার কেহই যেন নাই; তাহাদের তারুণ্যের দুর্দমনীয় উৎসাহ ও ত্যাগস্বীকাব যন্ত্রমাত্ররূপেই ব্যবহৃত হয়, ছাত্রজীবনে মন অতি নমনীয় ও আদর্শপ্রিয় থাকে, অতি সহজে সেখানে যে কোন ভাবের সাময়িক ছাপ দেওয়া যায। জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে ইহা সমূহ হানিকর—বর্তমানের ছাত্রদের ভবিষ্যৎই জাতিব ভবিষ্যৎ. শিক্ষিত সম্প্রদায়ই জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা।

স্কুলের ছাত্রদের ও স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও কিছু অংশের হয়তো হৃদযাবেগের উর্ধ্বে উঠিয়া পথ নির্ণয়ের জন্য যতখানি প্রয়োজন ততখানি স্থিরতা না আসিতে পারে। কিন্তু শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ, দেশনায়কগণই বা কেন শিক্ষাব্রতের সাবলীল ধারাকে এত বেশী করিয়া ব্যাহত হইতে দেন, তাহাও ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ কল্যাণের চিন্তা কি আজ ব্যাপকভাবে এত অগভীর হইয়া উঠিয়াছে ?

দেশের কল্যাণের জন্য, অন্যায়রোধের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িবার, স্বার্থত্যাগ করিবার, এমনকি জীবনও বিসর্জন দিবার সময় ও সুযোগের অভাব পরে হইবে না। প্রস্তুতি অধিক থাকিলে, সঞ্চয় অধিক হইলে ভবিষ্যতে দেশের কল্যাণ ও অন্যায়প্রতিরোধের জন্য ছাত্রদের কল্যাণসাধনব্রত বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তৃত হইবে। মহত্তর কর্ম ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ আজীবনই আসিবে। জীবনের যে কোন অবস্থায় আন্তরিক ইচ্ছার সহিত পরার্থে কৃত যে কোন কার্য, যে কোন ত্যাগই জীবনের সর্বোত্তম কর্ম নিশ্চয়ই, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে ত্যাগ, যে পরার্থপরতার অভাব উন্নতি-পথযাত্রার প্রতিপদে জাতি আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে, ছাত্রসমাজে প্রচ্ছন্ন তাহার বিপুল ভবিষ্য সম্ভাবনা অদূর-দর্শিতা, অসম্যক্‌নিয়ন্ত্রণ, ও অনবধানতার জন্য (যাহারই হউক না কেন) বিকাশের প্রাক্কালেই অপব্যবহারে বিনষ্ট বা পূর্ণবিকাশের পথে প্রতিহত হইবে কেন ?

ভারতের সীমারেখা

শ্রীঅক্রুবচন্দ্র ধর

ভারতের সীমারেখা কি এঁকেছ তুমি ভৌগোলিক?
আসমুদ্র-হিমাচল, আব্রহ্ম-কাশ্মীর? নহে ঠিক
এ সীমানা, এঁকেছ যে মানচিত্র অসতর্ক হয়ে—
হতে পারে ভূখণ্ডের—সনাতন ভারতের নহে।
এ চিত্রে কোথায় আছে পুণ্যভূমি মহাভারতের
মহারাণী গান্ধারীর পিত্রালয়? ওঙ্কারনাথের
বড়ভূধরের ছবি? সুমাত্রা ও জাভা বোর্ণিও-র
হিন্দুমন্দিরাদি কই, কালজয়ী সভ্যতা হিন্দুর
স্বাক্ষর রেখেছে যেথা? ভরতের ভারতের সীমা
সঙ্কীর্ণ ছিল না এত। দানবীর বলির মহিমা
পাতালে রচিযাছিল সপ্ত মহাপণ্ডিতের সভা,
বিশাল সাম্রাজ্য আর। কিন্নরাদি যক্ষাদি কত বা
সুসভ্য জাতির নেতা কুবেরের অলকাপুরীর
সন্ধান কে কবে আজ?

সেদিনও তো সীমা ভারতের
প্রসারিত হয়েছিল দূরান্তরে প্যাসিফিক পারে
রামকৃষ্ণসাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে শুনালো ধরারে
ভারতআত্মার বাণী হিন্দুসাধু; দক্ষিণাফ্রিকার
লাঞ্ছিত জনের করে সগৌরবে তুলে দিল তার
ন্যায়ার্জিত অধিকার; বিশ্বকবি-প্রতিভা প্রেমের
কিরণে লইল জিনে চিরজয়োদ্ধত পশ্চিমের
অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার হার, বার বার ভারতের জয়
ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বে, সারা বিশ্ব মেনেছে বিস্ময়।

ভোগমত্ত মানবের বিভীষিকাময় ধরণীর
সীমার ওপার হতে আহরিত অমৃতসিন্ধুর
প্রশান্ত প্রাণের বর্ণে ভারত এঁকেছে তার সীমা,
যুগে যুগে বিশ্ব জুড়ে ছড়ায়েছে সে স্নিগ্ধ নীলিমা।
জড়বাদ-দানবের অট্টহাস, ভীম আস্ফালন
জগৎ জুড়িয়া আজ তুলেছে যে মৃত্যুর গর্জন
ভেবেছ কি মাথাবে সে দেবতার
কপালে কালিমা—
ব্যঙ্গভরে মুছে দিয়ে চিরন্তন-জীবন-মহিমা?
হতে তা পারে না কভু—বীর্যবান দেবশিশুদল
জাগিতেছে পুনরায়, হিংস্রতারে করিয়া বিকল
আবার ছড়াবে তারা ভারতের প্রাণের মহিমা
দিকে দিকে প্রসারিয়া মৃত্যুঞ্জয় ভারতের সীমা।

পঞ্চকোশ বিচার

স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ

মানুষের জানিবার ইচ্ছা ও কৌতূহলের অন্ত নাই। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল। বাহিরের সমস্ত পদার্থই তাহার অনুসন্ধিৎসার বিষয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিকট যে বস্তুটি তাহার খোঁজ মানুষ করে না। সে বস্তুটি সে নিজে।

জন্মাবধি মানুষ 'আমি' 'আমি' করে কিন্তু সে 'আমি'টি যে কি তাহার সন্ধান জানে না। নিজকেই ঠিক ঠিক কয়জনে জানে? বেদান্ত আমাদের সেই স্বরূপটি জানাইয়া দেন। সেই স্বস্বরূপ-জ্ঞানলাভ দ্বারাই মানুষের পরমানন্দ-প্রাপ্তি ও দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই স্বরূপটি স্থূলশরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিসমূহ দ্বারা যেন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এই বাহ্য আবরণগুলিতেই সত্যত্ব ও আত্মত্ব বুদ্ধি করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকি এবং সেইজন্য আসল বস্তুটির সন্ধান পাই না। ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যও এই কথাই বলিয়াছেন—

'কোশৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন
সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈরিবাম্বু
বাপীস্থম্॥'

—জলাশয়স্থ শৈবালসমাচ্ছন্ন নির্মল জল যেরূপ স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, সেইরূপ অবিদ্যোৎপন্ন অন্নময়াদি পঞ্চকোশের দ্বারা আবৃত বলিয়া জীবের স্বস্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন না।

'পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরং স্বয়ংজ্যোতিঃ॥'

—বিচারের দ্বারা পঞ্চকোশ অনিত্যবুদ্ধি-পূর্বক পরিত্যক্ত হইলে শুদ্ধ নিত্য আনন্দৈকরস প্রত্যগাত্মা স্বতই প্রকাশিত হন।

বিচারই আত্মজ্ঞানলাভের মুখ্য সাধন। বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বোক্ত পঞ্চকোশবিষয়ক বিচার মুমুক্ষু সাধককে কিরূপে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সহায়তা করে, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

কোশ অর্থ আচ্ছাদক, যেমন অসির খাপ, গুটিপোকার গুটি ইত্যাদি। খাপ যেরূপ অসিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সেইপ্রকার পঞ্চকোশও আত্মার স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে। এইজন্য ইহাদের 'কোশ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—ইহারাই পঞ্চকোশ এবং যথাক্রমে একটি অপরটির অভ্যন্তরে বিদ্যমান।

স্থূল শরীরকেই অন্নময় কোশ বলে। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-সহ পঞ্চপ্রাণ প্রাণময় কোশ নামে কথিত হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ মন মনোময় কোশ নামে অভিহিত। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোশ নামে প্রসিদ্ধ এবং অজ্ঞান বা কারণ শরীরই আনন্দময় কোশ।

অন্নময় কোশই স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোশত্রয় দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত এবং আনন্দময় কোশেই কারণ শরীর অবস্থিত। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই শরীরত্রয় মধ্যেই পঞ্চকোশ বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব শরীরত্রয় বিচার করিলেও পঞ্চকোশেরই বিচার করা হয়। জীবের যথার্থ স্বরূপ এই পঞ্চকোশের দ্বারা আবৃত। বিবেকী সাধক বিচারের দ্বারা পঞ্চকোশাতীত স্বস্বরূপে স্থিত হন। সেই বিচারের বিষয় এখন বলা হইতেছে :—

১। **অন্নময় কোশ :**—শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন এই স্থূল শরীর অন্নের দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্নের অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে অন্নময় কোশ বলা হয়। ত্বক্, চর্ম, মাংস, রুধির, অস্থি, মেদ, মল প্রভৃতির সমষ্টি এই স্থূল দেহ অর্থাৎ অন্নময় কোশ কখনও নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে পারে না। এই শরীর জন্মের পূর্বেও থাকে না এবং মৃত্যুর পরও থাকে না। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ইহা মাত্র অল্পকালস্থায়ী। এই দৃশ্যমান শরীর অনিত্য-স্বভাববিশিষ্ট ও ঘটপটাদির ন্যায় জড়। অতএব বিকারী এবং হস্তপদাদি যুক্ত এই শরীর আত্মা নহে। শরীরের কোন অংশ ভগ্ন হইলেও চেতন শক্তির নাশ হয় না। ঘট নাশ হইলেও যেমন ঘটাকাশ নষ্ট হয় না, তদ্রূপ শরীরের কোন অংশ ছিন্ন হইলেও চেতন শক্তির বিলোপ হয় না। চেতন শক্তির নাশ না হওয়া বশতই আত্মা এসব কাহারও অধীন নন, তিনি এসব হইতে স্বতন্ত্র। স্থূলতা, কৃশতা ইত্যাদি দেহের ধর্ম, যাবতীয় ক্রিয়াদি দেহের; আত্মা এই সকলের দ্রষ্টা এবং স্বতঃসিদ্ধ। মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ এবং অস্থি মাংসাদি সঙ্কুল এই কুৎসিত শরীরে মূর্খেরাই আমি সুন্দর, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বা আমার এই দেহ - এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। বিচারশীল বিবেকী ব্যক্তি কিন্তু স্বস্বরূপ আত্মাকে নিন্দিত এই দেহ হইতে সর্বদা পৃথকরূপেই অবগত হইয়া থাকেন। অজ্ঞব্যক্তির 'আমি দেহ' এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দেহাদি উপাধিযুক্ত জীব-চৈতন্যে 'আমি' এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। আর বিবেক-বিচারবানের 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জলে বা দর্পণে প্রতিবিম্বিত শরীরে, স্বপ্নদৃষ্ট শরীরে এবং মনে মনে কল্পিত শরীরে যেরূপ কাহারও কখনও 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ স্থূল শরীরের প্রতিও 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি না হওয়াই উচিত। দেহাত্মবুদ্ধিই জন্মমরণাদি যাবতীয় দুঃখ-প্রাপ্তির মূল কারণ।

২। **প্রাণময় কোশ :**—এই কোশটি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণবায়ুর সমষ্টি। অন্নময় কোশের অভ্যন্তরে এই প্রাণময় কোশটি অবস্থিত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কার্যে প্রাণময় কোশ নিযুক্ত থাকে। এইজন্য প্রাণময় কোশ ক্রিয়া শক্তিযুক্ত কার্যরূপ হইয়া থাকে। অন্নময় কোশে বলাধান করতঃ ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত করানোই প্রাণময় কোশের স্বভাব ও কার্য। এই কোশটিও আত্মা নয় কারণ প্রাণবায়ুও ঘটের ন্যায় জড়, সর্বদা পরাধীন এবং নিজকে বা অপরকে এবং ভালমন্দ কোন কিছুকেই জানিতে সক্ষম নহে।

৩। **মনোময় কোশ :** পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ মনই মনোময় কোশ। এই কোশটি প্রাণময় কোশের অভ্যন্তরে বিরাজমান। মনোময় কোশ হইতেই 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি ভেদকল্পনার উদয় হয়। নামরূপাদি ভেদকল্পনা সমন্বিত বলবান এই মনোময় কোশ উক্ত প্রাণময় কোশকে পরিপূর্ণ করিয়া নিজে প্রকাশিত হয়। হোমের প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করে, সেইরূপ এই মনোময় কোশও সংসাররূপ ফল প্রদান করে এবং ইহাই সংসারবন্ধনের কারণ। এই মন নষ্ট হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই মন জাগ্রত থাকিলেই জগৎ প্রতীত হইয়া থাকে। মনরূপ অবিদ্যাই সংসারবন্ধনের হেতু। মনের অতিরিক্ত কোন অবিদ্যা নাই। স্বপ্নাবস্থায় কোন বাহ্য পদার্থ থাকে না কিন্তু সেখানে মনই স্ব শক্তি সহায়ে বিচিত্র ভোগ্য পদার্থসমূহ ও

ভোক্তা প্রভৃতি সৃজন করিয়া থাকে। স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থসকলও মনেরই সৃষ্টি। ইহাতে কোন বিশেষতা নাই। জাগ্রৎ ও স্বাপ্ন পদার্থসমূহ সবই মনের বিলাস মাত্র। সুষুপ্তি-কালে মন যখন বিলীন হইয়া যায় তখন আন্তর বা বাহ্য জগতের কোন চিহ্নও থাকে না। ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। অতএব আপাত-রমণীয় অসার এই জগৎ মনেই উদয় হয় ও মনেই বিলীন হয়, ইহা মনেরই একটি কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ ইহার কোন সত্যতাই নাই। বায়ুদ্বারা আনীত মেঘ যেরূপ বায়ুদ্বারাই বিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনদ্বারাই বন্ধন কল্পিত হয় এবং বন্ধননিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষও মনই কল্পনা করিযা থাকে। মনই দেহাদি সর্ববিষয়ে আসক্তি উৎপাদন করতঃ মনুষ্যকে ঐ আসক্তিরূপ বজ্জু সহায়ে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া থাকে। আবার এই মনই উক্ত দেহাদি সর্বপদার্থে বৈরাগ্য উৎপাদন করতঃ ভাগ্যবান কোন মানব-হৃদয়ে মোক্ষলাভের ইচ্ছা ও আত্মজিজ্ঞাসার উদ্রেক করিয়া দেয। মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ বিধায়ক। রজঃ ও তমোগুণযুক্ত মলিন মনই বন্ধনের হেতু এবং রজঃ ও তমোগুণরহিত শুদ্ধ পবিত্র মনই মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। যথার্থ বিবেক-বৈরাগ্যোদয়ে জিজ্ঞাসুর মন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বিচার-সহায়ে তত্ত্বজ্ঞানলাভ-দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। বৈরাগ্যবান সাধক সযত্নে মনকে পরিশুদ্ধ করতঃ করতলস্থ ফলের ন্যায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে মোক্ষলাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

এই মনোময় কোশও আত্মা নহে, কারণ ইহা পরিণামী, আদি ও অন্তবান, দুঃখরূপ এবং দৃশ্য। দ্রষ্টা আত্মা কখনও দৃশ্যরূপ হইতে পারে না। অন্নময় কোশে 'আমি' 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করা এবং ইন্দ্রিয়-সহায়ে বহির্গমনপূর্বক গৃহ-ধনাদিতে অভিমান করা মনোময় কোশের স্বভাব ও কার্য। মনোময় কোশটি ইচ্ছাশক্তিযুক্ত করণরূপ হয়। এই কোশটিও আত্মা হইতে পারে না।

৪। **বিজ্ঞানময় কোশ**:— বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ নামে অভিহিত। মনোময় কোশের অভ্যন্তরে এই কোশটি বিদ্যমান। এই কোশটি জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ও কর্তৃরূপ হয়। বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত ও প্রকৃতির বিকার এবং জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিমান এই বিজ্ঞানময় কোশটিই 'আমি আছি' 'আমি কর্তা' এইরূপ নিরন্তর অভিমান দেহাদ্রিয়াদিতে করিয়া থাকে। এই 'আমি'-অভিমানযুক্ত বিজ্ঞানময় কোশই অনাদি জীব এবং অনাদি সংসারের সর্বব্যবহারের কর্তা। বাসনাতাড়িত এই কোশটিই পাপপুণ্য প্রভৃতি বিবিধ কর্ম করিয়া থাকে এবং তাহার সুখদুঃখাদি ফলভোগী হয়। কর্মফলানুযায়ী এই কোশটিই মনুষ্যাদি নানা শরীরে প্রবেশ করে; স্বর্গনরকাদি নানা লোকে গমনাগমন ইহারই হয়। বিজ্ঞানময় কোশই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি —এই অবস্থাত্রয় অনুভব করিয়া থাকে। আত্মার অত্যন্ত সমীপতাবশতঃ প্রকাশময় হইয়া এই বিজ্ঞানময় দেহাদি সম্বন্ধ প্রযুক্ত 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমান সর্বদা করিয়া থাকে।—এই সমস্তই আত্মার উপাধি। বিজ্ঞান-ময় কোশেরও অভ্যন্তরে সমস্ত ইন্দ্রিয়-প্রাণাদিরও প্রকাশকরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই চৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ আত্মা। উপাধি সহযোগে ভ্রান্তিবশতই এই নির্বিকার আত্মা কর্তা ভোক্তা রূপে প্রতীত হন। ভ্রান্তিবশতই তিনি যেন মিথ্যা বিজ্ঞানময় কোশসহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া যান, এইরূপ মনে হয়।

উপাধিসহ সম্বন্ধবশতই তিনি উপাধিগুণের সহিত তত্তদ্রূপে প্রতিভাত হন। যেমন নির্বিকার অগ্নি লৌহরূপ উপাধির সহিত মিলিত হইয়া লৌহাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। মলিন জল যেরূপ পঙ্কনির্মুক্ত হইয়া নির্মালাকার ধারণ করে, অবিদ্যাদি উপাধি-দোষসমূহও তদ্রূপ বিচার সহায়ে অপসারিত হইলে আত্মা স্বকীয় শুদ্ধরূপে প্রতিভাত হন। কামনা-বাসনার আশ্রয় এই বিজ্ঞানময় কোশটি দেশকালাদি-দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন।

সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময়ের প্রতীতি হয় না। উহা তৎকালে অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়, জাগ্রদবস্থায় কেবল উহা কর্তারূপে অবস্থান করে। অন্তঃকরণরূপে মন ও বুদ্ধি এক ও অভিন্ন হইলেও বিজ্ঞানময় কোশ অন্তরে কর্তা-রূপে পরিণত হয় এবং মনোময় কোশ করণরূপে বিকারপ্রাপ্ত হয়। ইহাই উভয় কোশের বৈলক্ষণ্য। মনোময়ের সহিত বিজ্ঞানময় কর্ম করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও আত্মা অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রহিয়াছে। সুষুপ্তিসময়ে অন্তঃকরণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু তখন অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে আত্মা প্রকাশিত থাকেন। অতএব এই বিজ্ঞানময় কোশটিও আত্মা নহে।

৫। **আনন্দময় কোশঃ**—জীবের কারণ-শরীরই আনন্দময় কোশ নামে খ্যাত। আনন্দ-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত এবং অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সূক্ষ্মা বৃত্তি, তাহাই আনন্দময় কোশ। প্রিয়, হর্ষ, প্রমোদ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ভাব-সমূহকেও আনন্দময় কোশ বলা যাইতে পারে।

এই কোশটি প্রিয়, মোদ, প্রমোদ গুণযুক্ত হইয়া থাকে। কোন অভীষ্ট বস্তু দর্শনে যে আনন্দ তাহাকে 'প্রিয়' বলে। অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তিজনিত আনন্দ 'মোদ' নামে কথিত হয়। অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির অনন্তর তদ্‌ভোগজনিত আনন্দকে 'প্রমোদ' বলে। আনন্দময় কোশেরই এই তিন প্রকার আনন্দবৃত্তি হইয়া থাকে। অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তি হইলেই এই আনন্দময় কোশ প্রকাশিত হয় এবং এই কোশের দ্বারাই জীব আনন্দিত হয়। এই আনন্দময় কোশ বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তরে অবস্থিত। কারণশরীর-রূপী অবিদ্যার মলিন সত্ত্বগুণ প্রিয়-মোদাদি বিশেষ সুখের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশরূপ ধারণ করে—সংক্ষেপে এইরূপও বলা যাইতে পারে।

এই কোশটিও বিকারী, ক্ষণস্থায়ী, অতএব আত্মা নহে। ইহারও প্রকাশকরূপে বিম্বভূত যে চৈতন্য বিদ্যমান, তিনিই প্রত্যগাত্মা (সর্বাভ্যন্তর আত্মা)। অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় কোশ পর্যন্ত সমস্ত পদার্থই দৃশ্য, অনুভবের বিষয়, অতএব মিথ্যা—এই বুদ্ধিতে ত্যাগ করিলে অবশেষ কিছুই রহিল না, যেন সর্বশূন্য হইয়া গেল, এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। যে চৈতন্য দ্বারা পঞ্চ-কোশের ভাব ও অভাব অনুভূত হয়, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যিনি সকলকে প্রকাশ করিতেছেন, যাঁহাকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না—তিনিই স্বপ্রকাশ, পঞ্চ-কোশাতীত, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।

এইরূপ বিচার-সহায়ে যে মুমুক্ষু সাধক পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথকরূপে নিরূপণ করিয়াও সেই আত্মাতেই দৃশ্যসমূহ বিলয়করতঃ আত্মভাবে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত। লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণের বস্তুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ শুদ্ধ স্ফটিক যেমন লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, শুদ্ধ আত্মাও তদ্রূপ আবিদ্যক সম্বন্ধবশতঃ তত্তৎ কোশাকারে প্রতীয়মান হন। উত্তম বিচারই

পঞ্চকোশের সহিত ভ্রান্তিবশতঃ মিলিত আত্মাকে পৃথক করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। পঞ্চকোশের বিচারে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরের বিচারও পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া লইবার উপায়ের নাম বিচার। পূর্বোক্ত বিচার-সহায়ে বিবেকী সাধক হৃদয়ঙ্গম করেন যে, এই কোশপঞ্চকের বাস্তবিক নিজের কোন সত্তা নাই। ইহারা সাক্ষিচৈতন্যের সত্তায় সত্তাবান; সাক্ষিচৈতন্যের আভাসে আভাসিত হইয়া নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। অতএব আমি কখনও পঞ্চকোশযুক্ত বিকারী শরীর হইতে পারি না। আমি কোশসমূহের তথা জাগ্রদাদি অবস্থাসকলের অধিষ্ঠান-দ্রষ্টা-সাক্ষীরূপে সদা বিদ্যমান। শরীরের পরিণামে আমি কখন পরিণাম প্রাপ্ত হই না। তাদাত্ম্য বা ভ্রমবশতঃ আমাতে শরীর ও শরীরের ধর্মসমূহ আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপে সুচিন্তা সুবিচারের দ্বারা সাধকান্তঃকরণবৃত্তি সাক্ষ্যাকারাকারিত হইয়া অবস্থান করে। অন্তঃকরণবৃত্তির স্বভাবই এইরূপ যে, যাহাই বৃত্তির বিষয় হইবে বৃত্তি তাহাই গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ বৃত্তি তদাকারাকারিত হইয়া যাইবে।

যেমন নায়িকার চিন্তায় নায়কের মনোবৃত্তি নায়িকাকারে আকারিত হইয়া যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় গোপীগণের চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণাকারে পরিণত হইয়া যাইত। যেমন কাঁচপোকার চিন্তায় তেলাপোকার চিত্ত কাঁচপোকার আকার ধারণ করে। যেমন সুখ-দুঃখের চিন্তায় মানবান্তঃকরণবৃত্তি সুখদুঃখাকার প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ পঞ্চকোশের চিন্তা-বিচারের দ্বারা সাধকান্তঃকরণবৃত্তি পঞ্চকোশের অধিষ্ঠান-সাক্ষী আকারে আকারিত হইয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানোদয় হয়। ইহাকেই বৃত্তিজ্ঞান বলে। এই বৃত্তিজ্ঞানে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয়, সর্ব কর্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সাধক সদ্য-মুক্তিলাভ করেন।

সাক্ষীর জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই জ্ঞানে সাধকের অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় ও তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। ভগবান শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—

'সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্।
চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্॥'

দেহাশ্রিত বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি সত্য ও আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী এবং চৈতন্যময়, তাঁহাকেই সর্বদা আত্মা বলিয়া চিন্তা কর।

এখানে জীবসাক্ষী পরিচ্ছিন্ন হইলেও ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কেননা ঘটাকাশ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও মহাকাশ হইতে ভিন্ন নয়, মহাকাশরূপই হয়। তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন জীব-সাক্ষীও ব্রহ্মস্বরূপই হন। অতএব সাক্ষীর জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। তথাপি বিচার-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণো-পহিত সাক্ষীচৈতন্যের জ্ঞান যেন একটু পরিচ্ছিন্ন অব্যাপকের মত অবধারিত হয়। সুতরাং এই পরিচ্ছিন্ন সাক্ষীর জ্ঞান এবং অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক ব্রহ্মের জ্ঞান এক অভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপ শঙ্কা হওয়ায় ভগবান শঙ্করাচার্য স্বয়ং পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—

'তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে বিলাপ্য
শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥'

সেই সাক্ষীকেও কল্পনারহিত অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক পরমাত্মাতে (পরব্রহ্মে) লয় করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হও।

শ্রুতি-অনুকূল বিচারের এমনি প্রভাব যে, তাহার সম্মুখে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা সন্দেহ থাকিতে

পারে না। দৃঢ় বিচারের দ্বারাই অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া স্বস্বরূপাববোধ হয়। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—'দিবাকরের প্রকাশ ব্যতীত যেমন জাগতিক পদার্থের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ বিচার বিনা অন্য কোন প্রকার সাধনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।'

উক্তপ্রকার পঞ্চকোশের সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সাধকের অনুভূতি হয় যে, প্রতিটি কোশ অচেতন হইয়াও অহংরূপ চৈতন্যসত্তায় প্রতিভাসিত হইয়া স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই স্বানুভব-প্রভাবেই জ্ঞানী স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন—

'ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্ম চৈবাহমস্মি॥'

আমাতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সকল অবস্থান করে, আমাতেই সমস্ত লয় হইয়া যায়– আমিই হইতেছি সেই ব্রহ্ম।

বিবেকী ব্যক্তি পঞ্চকোশাত্মক ত্রিবিধ শরীরাধিষ্ঠান নিজ স্বরূপানন্দানুভব করিয়া কৃতার্থ হন, মনুষ্যজন্ম সার্থক করেন। নিজ স্বরূপসুখানুভূতির জন্যই এই দুর্লভ মানবদেহধারণ; ইন্দ্রিয়জনিত ভোগসুখের জন্য নহে। যাঁহারা এই দুষ্প্রাপ্য মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপসুখানুভবের জন্য যত্ন চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের জীবন অজাগল স্তনের ন্যায় নিরর্থক। তাঁহারা শুধু মাংসপিণ্ড বহনপূর্বক বৃথাই জীবনধারণ করিয়া থাকেন।

ফাল্গুনে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আবার বসন্ত এলো জীবন-প্রাঙ্গণে
বাতাবির গন্ধ ল'য়ে আতপ্ত পবনে।
কোকিলের কণ্ঠ শুনি সেই পুরাতন।
পুষ্পিত শিমুলে রাঙা সেই তো কানন।
অরণ্য মুখর হোলো কল-কাকলিতে!
'যাই যাই' ধ্বনি শুনি কুন্দের কলিতে।
কাঞ্চনের ঝরা-ফুলে আকীর্ণ ধরণী!
আমিও ঝরিয়া যাবো! তখনো এমনি
নয়ন করিবে তৃপ্ত 'বুগেন ভিলিয়া'!
উতলা দখিনা-বায়ু কাহারে খুঁজিয়া
এমনি ফিরিবে বন হ'তে বনান্তরে।
'চোখ গেল' পাখী কাঁদে আজি দ্বিপ্রহরে!
সেদিনও কাঁদিবে পাখী আজিকে যেমন।
আমি যাই! তুমি থাকো সুন্দর ভুবন!

স্পিতম জরথুষ্ট্র*

জে. কে. ওয়াডিয়া

প্রাগৈতিহাসিক আর্যজাতির কাহিনী ঘন-কুয়াসাচ্ছন্ন। যেটুকু প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আয়াসে এবং প্রাচীন পুরাণাদি হইতে উদ্ধার করা সম্ভব, তাহাও অতি সামান্য এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে। বহু পণ্ডিতের বহু মত। তবুও অভেস্তায় যেটুকু লিপিবদ্ধ আছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অব্-ইয়ন-ওয়েজ বা অবিভক্ত আর্যজাতির বাসভূমি ছিল শীত-প্রধান দেশ। সে দেশের বর্ণনা আছে—বৎসরের নয় মাস শুভ্র তুষারমণ্ডিত শীতকাল, মাত্র তিনমাস গ্রীষ্ম। আর্যগণ পশুচারণ করিতেন এবং এই সকল গৃহপালিত পশুই তাঁহাদের সম্পদরূপে গণ্য হইত। ফলে পশু-চারণের উপযুক্ত ভূমি অন্বেষণে তাঁহারা সতত স্থান পরিবর্তন করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই কালে তাঁহারা একপ্রকার যাযাবর জীবন যাপন করিতেন, জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির খেয়ালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং ক্রমে তাঁহারা প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির উপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

কালে আর্যগোষ্ঠী সংখ্যাবৃদ্ধি ও অন্তর্কলহ ইত্যাদি কারণে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি শাখা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া বর্তমান ইরাণ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে আর্য সমাজে বহু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়। স্পিতম জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বে এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হয়। ততদিনে আর্যগণ সমাজজীবনে অভ্যস্ত হইয়াছেন। জরথুষ্ট্রের কৌলিক নাম স্পিতম।

অভেস্তার পাঁচটি গাথার মধ্যে প্রথম গাথা অহুনবৎ-এর প্রারম্ভে উল্লেখ আছে যে একদা ইরাণ দেশ অনাচার ও ব্যভিচারে পূর্ণ হইয়া উঠিলে পাপভারে জর্জরিতা ধরিত্রী ঈশ্বরের নিকট স্বীয় মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। দুর্নীতিমোচনে এবং ধরিত্রীর দুঃখলাঘবে একমাত্র সক্ষম জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের ইহাই হেতু।

এই দেবমানবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ মত বর্তমান। প্রধান গ্রীক লেখকগণের মতে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল তাঁহাদের (লেখকদের) সমকালের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। কতিপয় পারস্য দেশীয় পণ্ডিত উভয় মতই অগ্রাহ্য করেন। তাহাদের মতে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী।

অভেস্তা-বিশারদ পণ্ডিতগণ 'জরথুষ্ট্র' শব্দের অর্থ 'সোনালী আলো' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান রা-এ। তাঁহার পিতার নাম পৌরুশস্প, মাতার নাম ডগদো। তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধে পৌরাণিক ধর্মাচার্য বা মহাপুরুষের ন্যায় একই প্রকার কাহিনী বর্তমান। যেমন, জন্মমাত্র তাঁহাকে হত্যা করার বহু প্রয়াস বিফল হয়। জন্মাবধিই তাঁহার মধ্যে দৈবীপ্রভা প্রকটিত হয়, অতি শিশু বয়সেই তিনি সম-সাময়িক জ্ঞানবৃদ্ধদিগকে জ্ঞান ও বিদ্যায় পরাজিত করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্তরে ঈশ্বরলাভের স্পৃহা প্রবল হইতে থাকে এবং পরিশেষে তিনি পারস্যদেশের সর্বোচ্চ এলবুর্জ পর্বতে নির্জনবাস

---

* মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, পর্বতোপরি বা ক্যাস্পিয়ান সাগরোপকূলে অবিরাম দশ বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি ঈপ্সিত জ্ঞান লাভ করেন।

জ্ঞানলাভের পর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট জরথুষ্ট্র নানাস্থানে পর্যটন করিয়া ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। প্রথম দশ বৎসর কাল তাঁহার প্রচারকার্য বিশেষ সাফল্য অর্জন করে নাই। এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা নালিশ আনিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করা হইলে শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

দশ বৎসর নিষ্ফল অক্লান্ত প্রচারকার্যের পরে এই দুর্ঘটনাই কিন্তু বিধির আশ্চর্য বিধানে তাঁহার সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তদানীন্তন রাজা বিষ্টাস্পের একটি অতি প্রিয় অশ্ব দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল এবং জরথুষ্ট্রকে সেই অশ্বটিকে নিরাময় করিয়া নিজ শক্তির পরিচয় দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল, এইরূপ শর্ত রহিল যে সফলকাম হইলে তাঁহাকে রাজদরবারে অবাধ প্রচারের অধিকার দেওয়া হইবে। দৈবশক্তিতে অশ্ব ব্যাধিমুক্ত হইল এবং তিনি পুনরায় প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র মেডিওমা প্রথম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে দেশের রানী ও রাজা উভয়েই তাঁহার শিষ্য হন। ইহার পরে অতি অল্প সময়েই সমগ্র ইরাণ দেশ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে। সেই সময়ে ইরাণ দেশ বর্তমান ইরাণ অপেক্ষা অনেক বৃহদাকার ছিল।

তাঁহার নরজীবনের শেষ দিকে ইরাণের বিরুদ্ধে তুরাণ যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইরাণে জরথুষ্ট্র ধর্ম প্রচারিত হইতেছে। এই ধর্ম যাহাতে নিজদেশে প্রবেশ না করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নব ধর্মকে সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তুরাণরাজ এই যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের সময় তুর-বারাতুর নামক একজন তুরাণী অগ্নিমন্দিরে প্রার্থনারত অবস্থায় জরথুষ্ট্রকে নিহত করে।

জরথুষ্ট্রের মতে কিছুই মন্দ নয়; যাহাকে মন্দ বলিয়া মনে করি তাহার ভিতরকার মন্দ অংশটুকু বাদ দিলেই তা ভাল হইয়া যায়। সুতরাং তিনি বহুপ্রচলিত প্রাচীন চিন্তাধারা ও প্রথাগুলির মন্দ দিকটা বর্জন করিয়া ও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করিয়া সেগুলিকে সংরক্ষণ করিয়াছেন! ইরাণে প্রকৃতির উপাসনা প্রচলিত ছিল। বহু দেবতার পূজা ছিল। তিনি কিছুই বর্জন করেন নাই। শুধু প্রকৃতির মাধ্যমে বিশ্বপতি সৃষ্টিকর্তাকে এবং দেবতার মাধ্যমে তাঁহারই বিশেষ প্রকাশকে উপাসনা করিতে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বাণী—স্বয়ম্ভূ ও সর্বজ্ঞ বিশ্বপতি আহুর মাজদাই একমাত্র উপাস্য। জনসাধারণের পূর্বপ্রচলিত সব প্রথা এইরূপে দোষমুক্ত করিয়া তিনি রক্ষা করিয়াছেন। কি প্রকারে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরকে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, অগ্নি, জল ইত্যাদির মাধ্যমে পূজা করা সম্ভব, জনসাধারণকে তিনি তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সাধুব্যক্তির আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে এবং মজদ নামক দেবদূতের মাধ্যমেও কিরূপে আহুর মাজদার উপাসনা করা সম্ভব তাহাও তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাচীন আর্যগণের কাল হইতে ইরাণীদিগের যজ্ঞসূত্র ও শুভ্র অঙ্গাবরণ পরিধানের প্রথাও তিনি বর্জন করেন নাই। জরথুষ্ট্র-ধর্মাবলম্বী পার্শীরা পশমে তৈয়ারী ৭২টি সূত্র সম্বলিত 'কুষ্টি' নামক যজ্ঞোপবীত কোমরে পরিধান করেন; তাঁহাদের পবিত্র শুভ্র অঙ্গাবরণ সদ্রা' নয়টি স্থানে সেলাই দ্বারা প্রস্তুত।

শুভ্রতা মানবজীবনের পবিত্রতার স্মারক এবং নয়টি সেলাই মানব সত্তার আধ্যাত্মিক,

মানসিক ও দৈহিক নয়টি কলেবরের প্রতীক। স্কন্ধের সম্মুখ দিকে যে একটি পকেট থাকে, তাহা পার্শীকে সৎকার্যে পূর্ণ করিতে স্মরণ করাইয়া দেয়। কুষ্টি কোমরে তিনবার জড়াইয়া পরিধান করা হয়, কারণ ইহা মানুষকে সৎ চিন্তা, কর্ম ও বাক্য দ্বারা অসৎ চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ করে। নওজোত বা নবজ্যোতি উৎসবে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে পার্শী-শিশুকে কুষ্টি ও সদ্রা দেওয়া হয়। ইহা জরথুষ্ট্র ধর্মে দীক্ষিত হইবার নিদর্শন।

আহুর মাজদার প্রত্যক্ষ উপাসনা, অর্থাৎ মূর্তি বা প্রতীকের মাধ্যমে উপাসনাও জরথুষ্ট্র সমর্থন করিতেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য দৈবশক্তি-অর্জনের প্রচেষ্টাকে তিনি নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেন এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জনই একমাত্র কাম্য—ইহা জানিয়া সর্বশক্তি সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিতে উপদেশ দিতেন। সাংসারিক লাভালাভ-জ্ঞান বর্জন করিয়া একমাত্র ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মতে কেবলমাত্র মানবাত্মার শুদ্ধির জন্যই সর্বশক্তি অর্জন ও নিয়োগ করা কর্তব্য; এরূপ করিলে তবেই মানব ধাপে ধাপে দেবত্বে উন্নীত হইবে এবং পরিশেষে আহুর মাজদার সহিত মিলিত হইবে। তাঁহার প্রবর্তিত পথে চলিয়া বহু শতাব্দী পর্যন্ত অগণিত জীবন মহান আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋষিতুল্য ইরাণী মহান মাজিগণ তন্মধ্যে গণ্য।

তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য নিকট ও দূরদূরান্ত হইতে বহু জনসমাগম হইত। তাঁহার প্রচারের ধারা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

তিনি বলিয়াছেন : আমি বলিতেছি বলিয়াই আমার কথা গ্রহণ করিও না, নিজের অন্তরে সত্যের অনুসন্ধান কর। অন্তর্নিহিত সত্যের সহিত যাহা মিলিবে, তাহাই গ্রহণ কর। ইহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত বিশ্বাসের দ্বারা কিছু গ্রহণ করা অপেক্ষা তিনি অন্তরের ভাব-বিকাশের এবং স্বকীয় প্রবণতা ও স্বভাব অনুযায়ী বিচারসহকারে আধ্যাত্মিকতা গ্রহণের জন্য প্রয়াস পাইতে উৎসাহ দিতেন।

স্পেণ্টামেন্যু ও এংরেমেন্যু এই যুগ্মশক্তির কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। সৃষ্টিরূপ দিব্য-লীলায় এই উভয় শক্তি প্রধান অংশ গ্রহণ করে। প্রথম গাথায় এই যুগ্মশক্তির কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত আছে যে যখনই এই দুই শক্তির মিলন হইল, জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল তখনই। এই যুগ্মশক্তির অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিন জন্মমৃত্যু-প্রক্রিয়া বর্তমান থাকিবে অথবা যতদিন জন্মমৃত্যুর খেলা চলিবে ততদিন দুই শক্তির ক্রিয়াও অব্যাহত থাকিবে। যেমন শক্তিদ্বয় স্বতন্ত্র জীব সৃষ্টির জন্য দায়ী, তেমনিই জীব শক্তিদ্বয়ের নিরন্তর অস্তিত্বের জন্য দায়ী।

এই দুই শক্তির মধ্যে স্পেণ্টামেন্যুকে উত্তম আখ্যা দেওয়া হয়। এই শক্তি ব্যষ্টি সত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সহিত ও অপর ব্যষ্টি সত্তার সহিত এবং সৃষ্ট সমষ্টি সত্তার সহিত মিলিত হইবার প্রবণতা দেয়। যে সকল সৎকর্ম ও সৎচিন্তা মানবাত্মাকে এই একত্বের দিকে পরিচালিত করে তাহা ইহারই প্রকাশ। এংরেমেন্যুকে সাধারণতঃ মন্দ শক্তি বুঝায়। ইহার প্রচেষ্টা সৃষ্ট জীবকে স্রষ্টা হইতে, ব্যষ্টি জীবাত্মাকে অপর ব্যষ্টি জীবাত্মা হইতে এবং সৃষ্টির সমষ্টি সত্তা হইতে পৃথক রাখা। এই শক্তিই এক পৃথক সত্তার অস্তিত্ব ও চেতনা উদ্বুদ্ধ করে যাহার প্রধান অভিব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান—এ অহংবোধ। ইহা দ্বারা যে সব মন্দ কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা শুধু যে ঈশ্বর, অন্যান্য ব্যষ্টি

সত্তা বা স্বষ্ট সমষ্টি সত্তা হইতে জীবাত্মাকে পৃথক করে তাহাই নহে, জীবাত্মার প্রকৃতিগত ব্যক্তিত্ব-বোধকেও সংরক্ষণ করে। এংরেমেন্যু প্ররোচিত কর্ম ও চিন্তা জীবাত্মা ও সত্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অহংকারের সংরক্ষণ, পোষণ ও বর্ধনের সহায়তা করে। ইহা স্বতঃপ্রতীয়মান যে স্পেণ্টামেন্যু ও এংরেমেন্যু সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরূপ দিব্যাভিনয় বা লীলার যন্ত্র-স্বরূপ। ইহাদের সমবেত প্রচেষ্টা সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টিকর্তা হইতে পৃথক করিযাও তাঁহার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইতে দেয না, আবার জীবকে সৃষ্টিকর্তার মধ্যে লীন হইতেও দেয় না। এইরূপ বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্যেই লীলা চলিতেছে।

সুদূর ও অদূর অতীতে বিদেশী পণ্ডিতেরা যুগ্মশক্তির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্পেণ্টা-মেন্যুতে সৃষ্টিকর্তা আহুর মাজদার রূপ ও এংরেমেন্যুতে শয়তান অহ্রিমনের রূপ আরোপিত হইয়াছে। ইহারা যেন প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বর্তমান। ইরাণের ইতিহাস প্রাচীনতম এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী। এই দীর্ঘকালে ইরাণ বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কখনও ইরাণীরা শক্তিশালী সাম্রাজ্য শাসন করিযাছে, কখনও বা পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করিয়াছে। বিভিন্ন কালে তাহারা বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া স্বকীয় কৃষ্টি দ্বারা অন্য জাতিকে প্রভাবিত করিযাছে, আবার কখনও বা বিজাতীয় ভাবধারা তাহাদের চিন্তারাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাদের চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত ও বিকৃত করিয়াছে। যুগল শক্তিকে ঈশ্বর ও শয়তান—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কল্পনা পরবর্তী যুগে বহু পরে আসিয়াছে। এই চিন্তা বহু পরবর্তী চিন্তা, বিদেশী প্রভাব দ্বারা জরথুষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে প্রবিষ্ট বা আনীত। জরথুষ্ট্র-ধর্মেতিহাসের অতি অন্ধকার যুগে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই বিদেশী চিন্তাটি প্রচলিত প্রথার আসন লাভ করে। উপরোক্ত রূপায়ণ, বিশেষতঃ এংরেমেন্যুতে অহ্রিমন যে আমদানী করা চিন্তা ও প্রথারূপে চলিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; শাস্ত্রে ইহার কোনও ভিত্তি বা অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ গাথায় বা অভেস্তায় 'অহ্রিমন' বলিয়া কোন শব্দই নাই।

জরথুষ্ট্র নিজ অন্তরেই আলোক অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি মাত্র দুইটি বাসনা রাখার অনুমোদন করিয়াছেন।—ঈশ্বরদর্শন এবং দিব্যবাণী প্রচারের জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। তিনি দেশবাসীকে ঈশ্বরপ্রেম, অনুক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তা এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। এই একমাত্র পথ যাহাতে জীবাত্মা ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিতে এবং পরিণামে তাঁহাতে লীন হইতে পারে। তিনি সৃষ্টির সর্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে বলিতেন এবং সকল কর্মই আহুর মাজদাকে উৎসর্গ করিতে বলিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে আহুর মাজদাকে সম্যকরূপে ভালবাসিতে হইলে সকল মানুষ ও প্রাণীকে ভালবাসিতে হইবে; যে অপরকে সুখী করার জন্য কর্ম করে সে নিজেই সুখী হয়; সুখ তাহারই করায়ত্ত, যে শ্রেষ্ঠ সত্যলাভের জন্য সৎপথে জীবন যাপন করে, ইহাই জরথুষ্ট্রের বাণী। তিনি বিশেষ জোরের সহিত হুমাতা (সৎচিন্তা), হুক্তা (সৎবাক্য) ও হুভার্স্তা (সৎকর্ম) অভ্যাস করিতে বলিতেন। দুস্মাতা (কুচিন্তা), দুযুক্তা (কুবাক্য) ও দুযুভার্স্তা (কুকর্ম) পরিত্যাগ করিতে বলিতেন। তিনি ভাল ও মন্দ উভয়ে পরিণামে যে ফল প্রসব করে তাহার কথা বলিয়াছেন এবং মানবকে নিজের পথ বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। তবে ইহাও বলিয়াছেন, যে যেরূপ পথ বাছিয়া

লইবে, তাহার পরিণাম ভোগও তদনুরূপ হইবে নিশ্চয়।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য (ইরাণ) জয় করেন তখন সেখানে গাঞ্জেসাপিগান ও দাজেনাপিস্ত নামক দুইটি প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থাগার বর্তমান ছিল। অন্যান্য গ্রন্থাদির সহিত এখানে একুশখানা নাস্ক গ্রন্থ ছিল, সেগুলি হইতেছে দুই লক্ষ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে বিধৃত জরথুষ্ট্রের বাণী। মাত্র একটি নাস্ক ব্যতীত অপর সবগুলিই বিনষ্ট হইয়াছে। এই নাস্কে গাথা আছে। আলেকজাণ্ডার সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থায় এক প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের জন্য গ্রন্থাগার দুইটি ভস্মীভূত করিতে আদেশ দেন। একটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। অন্যটি হইতে মহামূল্যবান কিছু পুস্তক গ্রীক পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহাদের দেশে লইয়া যান। পারস্যবিজয়ের ফলে ইরাণীরা শুধু যে পরাধীন হয় তাহাই নহে, তাহাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ, বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারও হারায়।

সুদীর্ঘকালব্যাপী গৌরবময় ইরাণের ইতিহাসের শেষ রাজবংশ হইল সাসানীয় বংশ। যখন সাসান প্রদেশের বাবক আদেশীর শেষ পার্থিয়ারাজকে পরাজিত করিয়া ২২৪ খৃষ্টাব্দে এই সাসানীয় রাজবংশের শাসন প্রবর্তিত করে, সেই সময় জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। মহান অভেস্তা সাহিত্যের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়। এই গ্রন্থ অদ্যাবধি খুর্দে অভেস্তা নামে পরিচিত। খুর্দে অর্থ মূল বিষয়ের ভগ্নাংশ। তৎকালীন পারস্য দেশের প্রচলিত পহ্লভি ভাষাতে ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা জেন্দ-অভেস্তা নামে খ্যাত।

জরথুষ্ট্র-বাণী অধিকাংশ বিনষ্ট হইলেও যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা হইতেই প্রকৃত সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে জরথুষ্ট্র এক মহান ধর্মপ্রচারক বলিয়া প্রমাণিত হন। পৃথিবীর এক বিরাট অংশের ইচ্ছাকৃত কঠিন উপেক্ষা সত্ত্বেও একথা স্থিরনিশ্চয়ে বলা যায় যে পরবর্তীকালে পৃথিবীতে যে সকল মহান ধর্মাচার্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জরথুষ্ট্র তাঁহাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। যাহারা তাঁহাকে যথার্থ আন্তরিকতার সহিত অন্বেষণ করিবে, তাহাদের উপর তাঁহার আশীর্বাদ অকৃপণহস্তে বর্ষিত হইবেই। এখনও তাঁহার বাণী ও শিক্ষা ভক্ত ও সত্যান্বেষীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আলোর সন্ধান দিতে সক্ষম।

*　　*　　*

[কালের কঠোর পরিহাসে ও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ইরান দেশে জরথুষ্ট্র ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। জরথুষ্ট্র-ধর্মাবলম্বিগণ বহুশতাব্দী পূর্বে বিধর্মীর অমানুষিক অত্যাচারে ধর্মরক্ষামানসে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে সকল ধর্মাবলম্বীর আশ্রয়দাতা উদার ভারতে প্রবাসী মুষ্টিমেয় পার্শী-নামধেয় নরনারীই জরথুষ্ট্রের প্রধান অনুগামী। বর্তমানে ইহারাই জরথুষ্ট্র ধর্মের অলোকবর্তিকা প্রদীপ্ত রাখিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যে ধর্মে সত্য আছে তাহা অত্যাচারে বিনষ্ট হয় না। জরথুষ্ট্র ধর্ম এই কথার সত্যতার প্রমাণ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

(পূর্বানুবৃত্তি)

নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচ্য হলো বর্তমান জীবন-পটভূমিকায় এই ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করা। বর্তমান জগৎ ও জীবনের দিকে তাকালে আমাদের চোখে যে ছবি ভেসে ওঠে সেটা খুবই মর্মান্তিক। সর্বত্রই হাহাকার ও অশান্তি—সুখও যেন আজ সুখ বলে মনে হয় না—বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেন আশীর্বাদের বদলে অভিশাপই বর্ষণ করে চলেছে, মানুষ আজ একটা বড় রকমের অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে, একটুখানি ভুল বা খামখেয়ালীর ফলে সমগ্র মানবসমাজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এ সবই সত্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে মানুষ এমন বাঁচা বাঁচতে চায় না, মানুষ চায় সুখ, শান্তি ও আনন্দ। তাই তো শুনি দেশে দেশে নন্দিত হচ্ছে শান্তি, মৈত্রী ও সাম্যের বাণী। এতো গেল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা। স্বদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে তাকালেও একই ছবি ভেসে ওঠে। ঘরে বাইরে সঙ্কটের সম্মুখীন। মানুষ কত আয়াস স্বীকার করছে একটুখানি সুখ, একটুখানি আনন্দ, একটু-খানি শান্তি লাভের জন্য; কিন্তু কই, মানুষের সব শ্রম যেন ব্যর্থ হতে চলেছে। যদিও বা কোন সময় আমরা একটা সুখের নীড় বেঁধে থাকি কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই সুখনীড় দুঃখের ঝড়ে কোথায় যে উড়ে যায় তা আমরা টেরও পাই না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, বৌদ্ধিক এমনকি অনুভূতির জগতেও যেন আজ একটা বড়রকমের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সমগ্র দেশ আজ ভেজালে ছেয়ে গেছে। এ ভেজাল তো থাকবেই, কারণ সব ভেজালের মূলে যে ভেজাল সে সম্বন্ধে আমরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে সচেতন নই, সেটা হচ্ছে মানুষে ভেজাল, যাকে অনেক সময় character crisis নামেও অভিহিত করা হয়। মানুষে ভেজাল যেদিন দূর হবে সেদিন অন্য সব ভেজাল আপনা আপনি সবে পড়বে। এ ভেজালের কি কোন ওষুধ নেই? আছে। এতক্ষণ যে ধর্মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা আলোচনা করেছি সেই ধর্মই হচ্ছে মানুষে ভেজাল দূরীকরণের একমাত্র কার্যকরী মহৌষধ। আমরা যদি সংকল্প সহকারে যথার্থ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগতের দিকে তাকাই তাহলে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, নিন্দা, ভয়, হতাশা এসব কিছুই আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারবে না। যথার্থ ধর্ম এবং হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী এবং আমরা জানি পরস্পরবিরোধীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব। উদার ও বলিষ্ঠ ধর্মবোধ আত্মবিস্মৃত জাতিকে আবার আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে—মানুষ আবার জানতে সুরু করবে জগৎজুড়ে নিজের পরিচয়। কবির কথায় সেও হয়তো তখন গেয়ে উঠবে—

> "তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে
> আমার পরিচয়,
> আমার ভুবন তাইতো আজি
> এমন মধুময়।"

আগেই আমরা দেখেছি যথার্থ ধর্ম শেখায়—ভেদ মিথ্যা, অভেদই সত্য। সবই যে আমি। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো আর আমাকে আঘাত করতে পারি না, ভালবাসতে পারি শুধু। যতদিন 'আমি-তুমি-সে' এই ভেদজ্ঞান সচল থাকবে ততদিন আমাকে ভালবাসতে গিয়ে তোমাকে আঘাত হানবোই, আমার কল্যাণ তোমার অকল্যাণ যোগাবেই। আমরা যখন অনেক সময় প্রিয়জনের জন্য বিভিন্ন রকমের ত্যাগ স্বীকার করি, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিই, তখন আমাদের মনে যে ধারণা বলবতী থাকে সেটা হচ্ছে—আমার প্রিয়জন আমা থেকে আলাদা কেউ নয়—আমিই সে, সে-ই আমি। আমাদের উপনিষদেও একথা সুন্দরভাবে ঘোষিত হয়েছে। 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।' 'ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।' পতি বলেই পত্নী পতিকে ভালবাসেন না, পতির মাঝে পত্নী নিজেকে দেখেন বলেই পতিকে ভালবাসেন। ঠিক তেমনি স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন স্ত্রী বলে নয়, স্ত্রীর কায়ায় নিজের ছায়া দেখতে পান বলেই স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন। একথাটাকে আমরা আমাদের সমস্ত প্রিয় বস্তুর বেলাতেই প্রয়োগ করতে পারি। সুতরাং যে মুহূর্তে 'আমি-তুমি-সে' এই তিন মিলে এক হয়ে যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে জগতের সমস্ত কালো আলোয় রূপান্তরিত হবে। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যকারের সাম্য। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মের স্থান যে সর্বোচ্চে, জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান যে ধর্ম, এ বিষয়ে বুদ্ধিমানদের মধ্যে আর দ্বিমত থাকতে পারে না।

নিবন্ধের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে আলোচ্য হলো—এই ধর্মবোধকে প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে রূপদান করা যায়। স্বামীজী যুগপ্রয়োজন উপলব্ধি করে ধর্মের একটি বিশেষ দিককেই মানবজীবনে রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট করে গেছেন। স্বামীজী ধর্মজীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের স্থান স্বীকার করেছেন সত্য কিন্তু বর্তমান জীবনপরিপ্রেক্ষিতে তিনি কর্মযোগের উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এখন Metaphysics-এর চেয়ে Ethics বেশী প্রয়োজনীয়, যদিও একথা সত্য যে এই শাস্ত্রদ্বয় একে অন্যকে প্রভাবিত না করে থাকতে পারে না। করুণাঘন ভগবান বুদ্ধদেবও নৈতিক জীবনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই বলে কোনরকম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যে বুদ্ধদেবের ছিল না তা বলা যায় না, তবে দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। ভগবান বুদ্ধ যা চেয়েছিলেন, সহজ কথায় সেটা হচ্ছে perfect reformation of moral life—নৈতিক জীবনের একটা পূর্ণ সংস্কার। স্বামী বিবেকানন্দও যুগপ্রয়োজন উপলব্ধি করে জীবনের এই দিকটাকেই বড করে দেখেছেন। এর ভেতর দিয়েই সত্যের পথে এগিয়ে যায় মানুষ।

দেশবাসীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে আমাদের মধ্যে রজোগুণের অভাব ভয়ানক—সত্ত্ব তো নেই বললেই চলে, অনেক সময় সত্ত্বের ছদ্মবেশে তমোই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। স্বামীজীর মতে ভারতীয়দের তাই কিছুদিন রজোমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে, ভারতের নিজস্ব সম্পদ আধ্যাত্মিকতা ঠিক মত ফুটিয়ে তুলবার জন্য, আর পাশ্চাত্যের কর্মমুখরতায় মুগ্ধ হয়ে স্বামীজী ওদের সত্ত্বগুণের অধিকারী

হতে বলেছেন। সুতরাং নিজ অভীষ্টসাধনে পাশ্চাত্যকে অধ্যাত্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা ভারতীয় অদ্বৈতবিদ্যা গ্রহণ করতে হবে আর ভারতকে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পাশ্চাত্যের কর্মোন্মাদনা ও জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এমনি করে উভয় ভাবের এক সুন্দর সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব মঙ্গলের পথে চালিত হতে পারে। তবে উভয়েরই এই প্রচেষ্টার ভিত্তি হবে কর্মযোগের আদর্শ। যোগস্থ বা সমত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে, আত্মাভিমান ত্যাগ করে, স্ব স্ব কর্ম নিষ্কামভাবে করাই হচ্ছে কর্মযোগের মূলকথা। এই কর্মযোগের মূলে কিন্তু আবার সেই জ্ঞানযোগ, যেখানে আত্মা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়. তবে এটাও ঠিক যে জ্ঞানযোগের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় অভ্যাস বা কর্মের মাধ্যমে; কারণ সকলকেই প্রকৃতির নিয়ম বা স্বভাববশতঃ কর্ম করে যেতে হয়। 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥' কর্মযোগে অবিচল থাকার জন্য আবার সময় সময় ভক্তিযোগেরও প্রয়োজন হয়, এককথায় এই তিনটি যোগ পারস্পরিক ভিন্নতা তো সূচনা করেই না, উপরন্তু সখ্যতাই প্রকাশ করে, তবে সময়বিশেষে এই তিনের একটি প্রধান থাকে একথা অনস্বীকার্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই কর্মপন্থাটিকে খুব সহজ কথায় বলেছেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা। ঠাকুরের এই উক্তি স্বামী বিবেকানন্দকে ভবিষ্যৎ ভারত তথা বিশ্বের মানুষের জন্য আদর্শ পথ রচনায় সাহায্য করেছিল। স্বামীজীও লোকসংগ্রহের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে উত্তরকালে নিজের জীবনকে জীবসেবার পূত যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন। শিবজ্ঞানে জীব-সেবার অর্থ হলো 'বনের বেদান্তকে ঘরে টেনে' আনা—অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগ। ঠাকুর দ্বৈতবাদীর ভক্তি ও অদ্বৈতবাদীর জ্ঞানের এক পরম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। যোগী ও মুনিঋষিরা অরণ্যের নির্জনতায় যে অদ্বৈতজ্ঞানের সাধনা করে থাকেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরে থেকেও প্রতিদিনের কার্যের ভিতর দিয়ে সকলেই সেই ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এই জ্ঞানে অটুট বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চললে জীবনের প্রতিটি কর্মই ঈশ্বরের উপাসনার স্থান দখল করবে। ঈশ্বর তো বহুরূপী হয়ে আমাদের মাঝেই খেলা করছেন। 'জীবে প্রেম'-এর অর্থই হলো ঈশ্বর-আরাধনা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য লীলাসহচরগণ নিজেদের জীবন দিয়ে এ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই শিবজ্ঞানে জীবসেবাই একমাত্র উপায়, যার সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে প্রতি-ফলিত ধর্মবোধের সুষ্ঠু ও সার্থক বাস্তবরূপায়ণ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করে যান—যার প্রধান ব্রত হলো ভগবান জ্ঞানে জীবের সেবাকে জ্ঞান-ভক্তিলাভের উপায়রূপে গ্রহণ করা।

উপসংহারে একটা কথা বলা খুবই সময়োপ-যোগী মনে করছি। অধুনা আমরা যেভাবে আমাদের চরিত্র রচনা করে চলেছি সেই চরিত্র বিশ্লেষণে যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে তার একটা দিক হলো—আমাদের 'মনমুখ এক' নয়। 'মনমুখ এক' না করা, 'ভাবের ঘরে চুরি' করা—এসব যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে কত আলোচনাই তো হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু কই ক'জন আমরা তাঁদের আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছি, জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি? খুবই আশা ও আনন্দের কথা, এই কিছুদিন আগে

জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন কলিকাতার Asiatic Societyর একটি নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করে ভাষণ প্রসঙ্গে scientific advancement and spiritual decadence এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং knowledge ও wisdom-এর মধ্যে একটা balance বা ভারসাম্য বজায় রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীও একটি ধর্মসম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে যদি আমরা একটা সুস্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করি তাহলে এগুলোর অনেক সুন্দর সমাধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যা বলছিলাম, শুধু চর্চাতেই শেষ করলে চলবে না, আচরণেও তার প্রতিফলন দেখাতে হবে, তবেই তো আলোচনা বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের সার্থকতা আসবে। অনেক সময় হয়তো আমরা চেষ্টা করেও চর্চিত বিষয় জীবনে রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হই; তাতে ক্ষতি নেই। আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ তো অল্পদিনে সম্ভব নয়, তাই শত ব্যর্থতার মাঝেও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে। আলোচনার অব্যবহিত পরেই যদি আমরা সব ভুলে যাই, গতানুগতিকতার জালে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে আলোচনা একরকম ব্যর্থই হবে বলা চলে। তবে নৈষ্ঠিক প্রযত্নের পর যদি ব্যর্থতা আসে, ক্ষতি নেই, তাহলে সর্বদা যেন স্মরণ রাখি, আজকের এই ব্যর্থতা আগামী দিনের সাফল্যেরই সূচক।

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

পঞ্চবটীতে এসেছিলে তুমি
নররূপী ভগবান
ধ্যান-গম্ভীর ওগো ঋত্বিক
গাহি তব জয়গান।
সর্বধর্মসমন্বয়ের সুরে
বীণাখানি তব বলে সুমধুরে
জ্ঞানে ও কর্মে, ত্যাগে ও ধর্মে
হও সবে আগুয়ান
গাহি তব জয়গান।
তুমি এসেছিলে বেদ-বিগ্রহ রূপে
আপনা'রে তাই অশেষ করেছ
বিশ্বপ্রেমের ধূপে—
সমাধি-মগ্ন যুগ-অবতার
তুমিই ব্রহ্ম করুণা অপার
প্রণমি তোমারে নর-নারায়ণ
যুগে যুগে কর ত্রাণ
গাহি তব জয়গান।

রামায়ণী

শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল

রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলেছে দিল্লী অভিমুখে। অন্ধকার তার মায়াজাল বিস্তার করে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, হঠাৎ যেন তন্দ্রাভাবটা কেটে গেল। ঘুম ঘুম ভাবটা ঠিক কাটেনি। কানে এল, —'শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম, কালাত্মকপরমেশ্বর রাম।' কোনও বিশেষ নামের প্রতি আমার তেমন কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবুও কেন যেন এই 'রাম রাম' ধ্বনি আমার মনকে কেমন একটা বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করে তুললো। চোখ মেলে চাইলাম। সূর্যদেব তাঁর সোনার রথে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। অন্ধকার ধীরে ধীরে দূরীভূত হচ্ছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যদেশ বলে হঠাৎ মনে হয় না। বাংলা দেশের পেলব মাটির ছোঁয়াচ এই অঙ্গদেশের মাটিতেও মায়াজাল বুনেছে। ভিন্ন দেশ তো বোধ হচ্ছে না, এ যেন একই মানুষের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন রূপ, একই মানুষ, কোথাও সে শিশু, কোথাও কিশোর, কোথাও পূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভরপুর। এই সব চিন্তার মধ্যেই আবার কানে এল—রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম। কোনও দেহাতী ফকিরের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত এই সংগীত। মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাইরে তাকালাম। সামনে পাহাড়। ধোঁয়াটে আকাশ ট্রেনের ধোঁযায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে সূর্য তার সোনালী আলোর আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই মূর্ত পরিবেশে রামনামের ধ্বনি মনকে বার বার উদ্বেল করে তুললো। কিন্তু আমি তো সে নাম বড় একটা করি না। সূর্যের নির্মল কিরণে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো সেই ভারতবর্ষের মানচিত্র যেখানে গীত হচ্ছে শুধু—রাম রাম, সীতারাম, রাজারাম। এই মধুর ধ্বনিতে অতীতের সব কিছু যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সুদূর অতীতের ঘটনাগুলি একে একে মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো।

রাজা দশরথ। তিনি রাজত্ব করেন, মৃগয়ায় যান, ভুলে অভিশাপ কুড়ান। যিনি চরম অভিশাপ দিচ্ছেন, তিনি তো ভিখারী। রাজা তো তাঁকে বধ করতে পারেন, তা তো করছেন না, তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ছেন। অনুতাপের বিষাদ-সলিলে রাজা ডুবে আছেন। অসহায় হয়ে তপস্বীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছেন। অনুতাপে কিছু ভিক্ষা মিললো। এইখানেই ভারতের ইতিহাসের সূচনা। পরম আনন্দের মধ্যে চরম দুঃখ এসেছে। কেউ কাউকে ছেড়ে পালিয়ে যায় নি। পরস্পরকে টেনে মুক্তির একটা রাস্তা খুঁজছে। ঝড় দেখে দরজা বন্ধ করে নি—বরং তাকে জানিয়েছে আমন্ত্রণ।

তাই বুঝি জন্ম নিলেন সেই অদ্ভুত শিশু ভুবনমোহন রূপগুণ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাঁকে দেবশিশু বলে মেনে নিল। রাজার ছেলে। রাজার ছেলে তো আরও ছিল। দশরথ ছাড়া আরও রাজা ছিলেন। ইতিহাসের পাতা উল্টে চলেছে। রাজর্ষি জনক। রাজা ও ঋষি। সব আছে, অথচ কিছুই নেই। নিজের কোনও কামনা-বাসনা নেই। তাই বিধাতা সীতাদেবীকে পাঠালেন তার ঘর আলো করতে। রাজর্ষির

সার্থক সাধনা। সার্থক তার হলকর্ষণ। হয়ত এ বহুযুগের সাধনার ফল। প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণময় তাই যেন কন্যারূপ নিয়ে রাজার ঘরে এসেছে।

আবার পাতা উল্টালো। রাজা দশরথের আরও তিনটি পুত্রসন্তান। লক্ষ্মণ—অমিত তার বীর্য, অগ্রজের সামান্য ইচ্ছায় সে সব ত্যাগ করতে পারে। হয়ত হারায়, হয়ত নয়। হারানোর ব্যথা তারই বেশী লাগে—যে সামান্য কিছু পেয়ে ব্যাঙের আধুলির মত আটকে রাখে। সে তার বাঁধনে ঘুরপাক খায়, সামনে যেতে পারে না।

ইতিহাসের পাতা উল্টে যাচ্ছে। রাজা দশরথ—বৃদ্ধ দশরথ। বানপ্রস্থের পথযাত্রী বলা যায়। জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়েছে। লোকজনের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। আত্মীয়-গণের ভালবাসাও পেয়েছেন যথেষ্ট। জীবন প্রায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেখানেও সেই হারানো-পাওয়ার খেলা। আনন্দের ভরা জোয়ারে হিংসুটে হাঙরদের আনাগোনা। সত্যধর্ম তার দারুণ পরীক্ষার মানদণ্ড নিয়ে হাজির হয়েছে, মহারিক্ততা এনে দিয়েছে—মহাশূন্যতা নয়, জীবনের মহাপূর্ণতার পথের ইঙ্গিত। সেখানেও প্রেমের টানেই সব চলেছে, ত্যাগের মহামন্ত্র নিয়ে।

রঘুপতি বনে চললেন। সঙ্গে সহধর্মিণী সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ। রাজসুখকে ত্যাগ করে চললেন এক মহা অনিশ্চিতের পথে। প্রেম তো ফুটে ওঠে ত্যাগের মধ্যে। ভোগের মধ্যে সে এনে দেয় নানারূপ জটিলতা। মন স্থির হয়েছে, দুঃখ আজ নেই। ত্যাগ ও প্রেমের জোরে অরণ্যও হয়ে উঠেছে স্বর্গপুরী। কি আনন্দেই দিন কাটছে, কতো মুনি ও দুঃখীজন তাঁদের স্নেহ ও কৃপা পেয়েছে। আনন্দ যদি অনাবিল হত, পৃথিবীর ধারা তাহলে বন্ধ হতো। আনন্দের নিবিড় আস্বাদ হয়ত মানুষ ভুলে যেত। কেননা ছেদই জাগিয়ে দেয় বিগত আনন্দের মহিমময় রূপ। আর জাগিয়ে দেয় হারানোকে পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্যোগই ফুটিয়ে তোলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তার পূর্ণ রূপে। যেমন সূর্যদেব তার প্রথম আলো দিয়ে বিকশিত করেন কমলকে—যে রাতের নিবিড় আঁধারে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল।

লঙ্কার রাজা রাবণ। অমিত তার তেজ—অমিত তার ধনসম্পদ। পাণ্ডিত্যেও তার যথেষ্ট খ্যাতি। কিন্তু এই খ্যাতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে লোভ ও হিংসা—যে তার অগ্নিশিখায় সব কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। বিরাট অরণ্যকে ধ্বংস করবার জন্য আগ্নেয়গিরি লাগে না, সামান্য স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। সেই বেড়ে বেড়ে বিশাল অরণ্যকে গ্রাস করতে পারে।

হিংসা, কাম, লোভ মানুষের অজ্ঞাতসারেই অভিযান চালায়। নইলে বোধ হয় মানুষ অনেক অনর্থ থেকে বাঁচতে পারতো। ছল করে রাবণ হরণ করলো সীতাকে।

সীতা আজ বন্দিনী। রাজর্ষির ঘরে শৈশবের সরলতায় তিনি সবাইকে করেছেন মুগ্ধ, কৈশোরে শ্বশুরালয় রেখেছিলেন আনন্দমুখর করে, অরণ্যেও হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে রচনা করেছিলেন স্বর্গপুরী। আনন্দ, প্রেম, স্নেহ, কোমলতা, —এই তো ছিল সীতার জীবন। আজ বিধাতা তাঁর রুদ্র পরীক্ষা নিয়ে হাজির হয়েছেন। কুসুমের চেয়েও কোমল এক নারীকে আজ রুদ্রের চেয়েও কঠোর—সিংহিনীর চেয়েও তেজস্বিনী হতে হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও প্রাণ দিতে পারে।" কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে—যেখানে আছে নিত্য নতুন পরীক্ষা, যেখানে

পরীক্ষা তার কঠোরতার রূপ নিতাই বদলাচ্ছে, সেখানে যিনি প্রকৃত সংযমের সঙ্গে সাহস দেখাতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর, আদর্শ মহাপুরুষ। এই সংযত সাহসই সীতার পাথেয়। উচ্ছ্বাসের বন্যা এসে তাঁর সংযমের বাঁধকে কখনো চুরমার করে দেয় নি। সে ধীরে ধীরে সব কিছুকে জয় করে নিয়েছে। এই অনবদ্য সৃষ্টিই আজ আমার মনকে অভিভূত করে তুলেছে। তাই বুঝি ভারত-বাসী যুগ যুগ ধরে সীতাকে স্নেহের কন্যারূপে—বধূরূপে—সব শেষে মাতৃত্বের, পবিত্রতার মূর্ত প্রতীকরূপে স্বীকার করে নিয়েছে। নারীর যা কিছু সুন্দর যা কিছু কল্যাণময়, সীতা তার মূর্ত প্রতীক। তার ওপর সীতা নারীত্বের সমস্ত মহিমা নিয়ে সর্বময়ী হয়ে, সকলের সমস্ত সুখ দুঃখকে বরণ করে নিয়ে তাদেরই মধ্যে চিরন্তনী নারী হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন তাই সমস্ত ভারতবাসীর কাছে গঙ্গার মত পূত-সলিলা, কল্যাণময়ী প্রবাহিণী।

হিংসা-লোভ শুধু মানুষের জীবনকে পুড়িয়েই ক্ষান্ত থাকে না, তার আঁচ লাগে অপর জনের উপরেও। রামলক্ষ্মণের সংসার ভাঙবার উপক্রম। তাদের ত্যাগ-প্রেম-সংযম কি এতই তুচ্ছ যে এই সামান্য আগুনের তাপে পুড়ে যাবে। তা গেল না। প্রেমে কি না হয়। বানর পাখী পশু সবাই আজ তাদের দুঃখে দুঃখী। নিজেদের যা কিছু সামান্য সামর্থ্য, তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে রামলক্ষ্মণের সেবায়। সেখানে সকলেই জুটেছে, আর্যঅনার্যের ভেদ নেই, উত্তরদক্ষিণের ছেদ নেই, ধনসম্পদের প্রলোভনও নেই, আছে শুধু প্রেমের টান। সেখানে মানুষ পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সমবেত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে—সর্বস্ব পণ করে।

জয় হলো, রাবণ সবংশে নিহত হলো। মানুষ যখন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সংযমের সঙ্গে কোনও প্রচেষ্টা করেছে, তার জয় হয়েছে। এই ইতিহাস সমগ্র মানবজাতির। আসুরিক শক্তি হয়ত কিছুকালের জন্য চুরমার করে দিতে চেয়েছে সব কিছু। সারা পৃথিবী হয়ত আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। কিন্তু মানুষের ঘরেই এসেছেন এমন কয়েকজন মানুষ, যারা সাহস করে এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। অন্যায়, অত্যাচার পরিশেষে পরাজিত হয়েছে, নইলে পৃথিবীর চাকা যে থেমে যেত। যেমন নদী মজে যায় পাহাড়ে জলের প্রাচুর্য ও তার লাফালাফি তর্জন গর্জন না থাকলে।

১৪ বছর কেটে গেছে। রাম লক্ষ্মণ সীতা আজ অযোধ্যায় এসেছেন। ১৪ বছরের রাজ্যাধিকারও ভরতের মনে জাগাতে পারেনি লোভ। তিনি শুধু ছিলেন অগ্রজের প্রতিভূ। এই ত্যাগ ও নীতিবোধই দিয়েছে তাকে সুদীর্ঘ শান্তি ও লোকপ্রীতি।

রাম আজ রাজা। সংযমীর দুঃখ অনেক। স্বর্ণকার তো সোনাকে বার বার পোড়ায় খাঁটি করবার জন্য, বিধাতাপুরুষ আমাদের দুঃখ-তাপের কঠোর আগুনে পুড়িয়ে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগাবার পথ করে দেন।

রাম রাজা হয়েছেন, শুধু নিজের সুখসুবিধের জন্য নয়। তিনি মানুষের মনোজগতের রাজা। তাঁর কর্তব্য শুধু প্রজাদের ব্যবহারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে কেন। মনো রাজ্যে যার স্থান নেই, তার আসন যে ক্ষণস্থায়ী, তা কে-না জানে। ভেসে উঠলো মূর্তিমতী সাধ্বী সীতার চিত্র। মন প্রথমে সায় দিতে চাইলো না এই মনোরাজ্যের রাজাকে স্বাগত জানাতে। গভীরভাবে একটু চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লাম। দেখলাম রামের মধ্যে

মানবিকতার কি অপরূপ বিকাশ। সেখানে কোনও স্বার্থগন্ধ নেই, আছে অনাবিল প্রেম, তার কাম্য মানুষের কল্যাণ। তার জন্য চরম ত্যাগও তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন।

রামচন্দ্রের এই ত্যাগ বড় করুণ রূপ নিয়ে চোখের উপর ভেসে উঠলো। এ যে চরম ত্যাগ' রাম সীতা দুজনারই। এই শেষ পরীক্ষা তো আনলো তাঁদের দুজনার জীবনে পরিপূর্ণতা। তাঁরা আজ পিতামাতা, পিতামাতা যদি নবাগতকে না বরণ করে নেয়, তা দুঃখ আনে জীবনে আর বাধা সৃষ্টি করে নূতন মানুষের নূতন প্রাণের সন্ধানের। রামসীতা জীবনের ছেদ টেনে নবাগতকে বরণ করলেন।

এতক্ষণে মনের দ্বিধা কেটে গেল। রামসীতা, সীতারাম। তাঁদের শিশু কিশোর যুবা প্রৌঢ়, মাতাপিতা পুত্রকন্যা ভ্রাতা স্বামীস্ত্রী, রাজাপ্রজা, ধর্মবীর কর্মবীর ন্যায়বীর, সর্বজয়ী সর্বত্যাগী রূপ একে একে ভেসে উঠতে লাগলো। দেখতে পেলাম জীবনের সমস্ত বিকাশ তাঁদের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণতা নিয়ে। তাঁরা শাশ্বত মানবমানবী। মানুষের ঘরে জন্ম নিয়ে মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ ও কর্মের মধ্যে করেছেন আত্মার পূর্ণ বিকাশ। এইখানেই হয়েছে মানুষের জয়। ভারতবর্ষ বোধহয় মানুষের অন্তরস্থ চরম সত্যকে দৈনন্দিন জীবনে রূপ দেবার জন্য রামসীতাকে চিরকালের জন্য এত আপন করে নিয়েছে।

"রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণঅবতার, একথা বারোজন ঋষি কেবল জানতো।"

—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

"রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় নারীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা—পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মতো হওয়া।···সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে আজও বর্তমান।"

—**স্বামী বিবেকানন্দ**

বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি ও সুমতি*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

Our age has made an idol of the brain;
The last adored a purer Presence, yet
In Asia like a dove immaculate
He lurks deep-brooding in the
hearts of men.

(Sri Aurobindo *In the Moonlight*)

The simple faith (in science) which upheld the pioneers is decaying at the centre······In our day, those remote from the centres of culture have a reverence for science which its augurs no longer feel ·····Most men of science in the present are very willing to claim for science no more than its due and to concede much of the claims of other conservative forces such as religion

(Bertrand Russell :
Is Science Superstitious)

Apart from religion human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of misery, a bagatelle of transient experience.

(A. N. Whitehead : Science & the Modern World)

মানসচিন্তারে করে উপাসনা যুগ আমাদের ;
পূজিত বিগত যুগ এক শুভ্রতর মহীয়ানে ;
তবু স্বর্গ-বিহঙ্গের ম'ত এশিয়ার গূঢ় প্রাণে
উচ্চে রাজে নিরঞ্জন নিত্যজ্যোতি সে-দেবদেবের।

(শ্রীঅরবিন্দ—"চন্দ্রালোকে" কবিতা)

বিজ্ঞানে যে-সরল শ্রদ্ধা তার পথিকৃৎ-দের উপজীব্য ছিল সে-বিশ্বাসের মূল আজ শুকিয়ে যায় বুঝি। আমাদের যুগে মানস-সংস্কৃতির রাজধানী থেকে যারা দূরে আসীন তারা বিজ্ঞানের নামে যে-ভাবে উজিয়ে ওঠে বিজ্ঞানের উদ্‌গাতারা আর সে-উচ্ছ্বাস বোধ করেন না। আজকের দিনে বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের প্রাপ্য যতটুকু তার বেশি অর্ঘ চান না আর এমন কি, ধর্মবর্গীয় রক্ষণশীল সেকেলে প্রভাবের দাবিদাওয়াকে স্বীকার করতেও তাঁরা নারাজ নন এখন। (বার্টরাণ্ড রাসেল—

"বিজ্ঞান কি কুসংস্কারী' প্রবন্ধ)

ধর্ম বিনা এ-জীবনে লভি হায় আমরা কেবল
থেকে থেকে তুচ্ছ সুখভোগ—
যার চকিত চমকে
চোখে পড়ে আমাদের শুধু রাশি রাশি দুঃখশোক
অবসাদ তৃপ্তিহীন ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা।

(হোয়াইটহেড—
সায়েন্স অ্যাণ্ড দি মডার্ণ ওয়র্লড)

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
বীরবলেষু

আপনার চিঠি পেয়ে কী যে ভালো লাগল। আমাদের সাহিত্যরাগিণীতে আপনি এক সাবলীল ভাষার তান লাগিয়েছেন আপনার বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়—যার ফলে আমাদের ভাব-প্রকাশের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে বৈকি—বিশেষ করে মৌখিক বাংলা ইডিয়মের প্রসাদে। কিন্তু সে যাক। আপনার চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে রকমারি ভাবোদয় হ'ল—ভাবলাম লিখিই না কেন আপনাকে—খোলা চিঠিতে।

---

* ৩৫ বৎসর আগে এ নিবন্ধটি লেখা। অনেক কিছুই জুড়েছি, ছেঁটেছিও বিস্তর। একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ বলা চলে। প্রবন্ধটি সময়োপযোগী মনে হয়। —লেখক

বিশেষ ক'রে গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভাবদীক্ষা লাভের পরে আমার আজকাল আরো বেশি ক'রে মনে হয় যে ওদেশ আজ বুঝবার কিনারায় এসেছে যে, এদেশকে (অর্থাৎ ভারতকে) যদি জয় করতে হয় তবে আমাদের অন্তর্জগৎকে জয় করলেই কাজ হাসিল হবে না, সব আগে চাই আমাদের (পর পর) প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দ-লোকের 'পরে চড়াও হওয়া। তাই ওরা আজ চাইলে ওদের ধর্মে অশ্রদ্ধা ও আত্মিক ইষ্টার্থে (values) সংশয় আমাদের মনে চারিয়ে দিতে।

মহাভারতে একটি চমৎকার কথিকা (parable) আছে। বৃত্রসংহারের পরে তাঁর শিষ্যসামন্তেরা লুকিয়ে সমুদ্রের নিচে সভা করল (কেন না সেখানে বজ্র পৌঁছতে পারবে না)। এরা কালকেয় দৈত্য—প্রচ্ছন্ন ব'লে আরো দুর্ধর্ষ, সর্বনেশে। তারা ঠিক করল যে, সমুদ্র থেকে রোজ নিশুত রাতে উঠে এসে এক এক ক'রে সাধুসন্ত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীদের নির্মূল করলেই সবচেয়ে সহজে সৃষ্টি ডুবে। লক্ষ লক্ষ জীবকে মারতে সময় লাগবে, কিন্তু এই সব ধর্মধারকদের মারলে সৃষ্টিলোপ হতেই হবে, কেন না "লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে"—জগৎকে যোগী-ঋষিদের তপস্যাই রক্ষা করে। কাজেই রক্ষকের নাশ হ'লে রক্ষিতও বিনষ্ট হবে—এ হ'ল দুই আর দুইয়ে চার-এর অব্যর্থ গণিত। তাই তারা রেজলুশন পাশ করল:

যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং
তপস্বিনো ধর্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ।
তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব
তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্॥

অর্থাৎ

ঋষি তপস্বী তত্ত্বদর্শীরাই
ধর্মে ধরাকে ধারণ করেন সবে।
তাঁদের বংশ নির্মূল হ'লে তাই
তপসের নাশে জগতেরো নাশ হবে।

বিজ্ঞানের পিছনে যে-সংশয়দৈত্য গাঢাকা হয়ে ছিল সে ছিল এই (ছদ্মবেশী) কালকেয়, তাই সে চাইল বিজ্ঞানের নামে ধর্মেও সংশয় আনতে। বলল যে, যেহেতু সংশয়ই হ'ল বিজ্ঞানসিদ্ধির সনেদ আর বিজ্ঞানের সিদ্ধিই বিশ্বসমৃদ্ধির মূল, সেহেতু ধর্মকেও নস্যাৎ ক'রে দাও সংশয়-তীরন্দাজিতে।

একথা বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা বললেন আরো এই জন্যে যে, বুদ্ধি যুক্তি ছেড়ে শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে ভজলে যে-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাকে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদেই টলানো যায় না। তাই তাঁরা অভিযান (campaign) সুরু করলেন শ্রদ্ধা বিশ্বাস পূজা ভক্তির বিরুদ্ধে। বললেন: "দেখ অন্ধ বিশ্বাসে তোমাদের সমাজে কত কুসংস্কারের আগাছা ও ভয়ের কাঁটাবন গজিয়ে উঠেছে।" বুদ্ধি দিল যুক্তিবর, আর বিজ্ঞান—ভুক্তি-অভয়। জঙ্গল ওরা অনেকটা সাফ করল বৈ কি। কেবল দুঃখ এই যে, সেই সঙ্গে বিরল আনন্দসহস্রদলও নিশ্চিহ্ন হ'ল। হোক না, মহামনীষী পল ভালেরি বললেন বড় গলা ক'রেই, "Les choses du monde ne m'interessent que sous le rapport de l'intellect. Bacon dirait que cet intellect est un idol. J'y consens, mais je n'en ai trouve de meilleure" অর্থাৎ বুদ্ধি ছাড়া জগতে আর আছে কী ছাই? কাজেই—বুদ্ধির চেয়ে মহত্তর কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না যখন—আর কাকে গড় করতে যাব?

এর উত্তরে যদি আমরা বলি: "কেন? বিশ্বাস শ্রদ্ধা স্বজ্ঞা (intuition) এসব দেবতাও তো আজো বেঁচেবর্তে আছেন—" তাহ'লে ভালেরি-প্রমুখ বুদ্ধিপূজারীরা বলবেন: "ওরা

দেবতা কিসে? বুদ্ধি যুক্তির পদবী—মহাপ্রভু, শ্রদ্ধা বিশ্বাস তো তাঁবেদার—ওরা চায় ছায়ার কাছে হাত পাততে, বিজ্ঞান বিশুদ্ধ আলোর উপাসক, কেন না তার ভর পরীক্ষা নিরীক্ষা ওজন মাপজোপ—এককথায় যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়, গুণে বলা যায়, ডুব দিয়ে তল পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা বিশ্বাসের মন হ'ল ভয়ের দণ্ডবৎ, যা জানি না বুঝি না তার কাছে হাতজোড় করা—এ চলবে না আর। মানুষকে হ'তেই হবে তার নিজের নিয়তির নিয়ন্তা—architect of his destiny, হ'তে হবে বীর, বস্তুবিশ্বকে খাটিয়ে হ'তে হবে ধনী সমৃদ্ধ শৌর্যশালী ..." ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ফলে মানুষ যে অনেকখানি ধনসমৃদ্ধি ও বলবীর্য লাভ করেছে একথা সকলেই মানবেন। অন্ততঃ আজকের দিনে কেউই (মধ্যযুগের পাদ্রীদের সুরে সুর মিলিয়ে) বিজ্ঞানের দানকে নিছক জড়বাদ বলবেন না। আমাদের জগতের বাহ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাড়ে পনের আনাই যে বিজ্ঞানের দান একথা কেউই অস্বীকার করবেন না, করতে পারেন না। আমার বক্তব্য অন্য: আমি শুধু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের লেখা থেকেই কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই দুটি সত্যের প্রতি:

এক, বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ আমরা বিশ্বাস-নিরপেক্ষ ব'লে ধ'রে নিই, বিজ্ঞানের মূলসূত্র না জানার জন্যেই।

দুই, বিজ্ঞানের কীর্তি সিদ্ধ হলেই বলা চলে না যে, ধর্মের কীর্তি আনন্দ বা তার প্রতিষ্ঠার যুগ গত। বলা বাহুল্য, প্রথম উক্তিটি যদি সত্য হয় তবে দ্বিতীয়টির সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে, যেহেতু ধর্মের মূল ভর বিশ্বাসের 'পরেই। তাই আসুন, আজ এই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে (সতেরো ও আঠারো শতকে)* মানুষের মন উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বৈ কি। মানুষ বিজ্ঞানের কীর্তিকলাপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে বলা সুরু করল যে, এ জাজ্বল্যমান আলোর পাশে ধর্মের ধোঁয়াটে ভাব ভক্তি আনন্দকে অবাস্তব ব'লে বরখাস্ত করাই বিজ্ঞ তথা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তখনও রাজ-শক্তি ধার্মিকদের হাতে, চার্চের প্রতিপত্তি কেঁপে উঠলেও টলেনি। কাজেই এ নব অভিযানে—(বিশেষ ক'রে গ্যালিলিও কোপ-নিকসকে সমর্থন ক'রে বলার পরে যে পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমা করছে)—গির্জার পাণ্ডাপুরুতরা রুখে উঠে বললেন যে, যেহেতু এসব প্রচার বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে মানতে চাইছে না সেহেতু দাও এ-কালাপাহাড়দের সাজা। ফলে গ্যালিলিওকে যেতে হ'ল জেলে ও ব্রুনো প্রমুখ বহু শহীদকে দেওয়া হ'ল প্রাণদণ্ড। বৈজ্ঞানিকদের দেগে দেওয়া হ'ল হেরেটিক ব্রাসফীমার ব'লে।

কিন্তু অসহিষ্ণু অত্যাচার উৎপীড়নের ফল হ'ল যা হবার তাই: মানুষ বলল ধর্মের পাণ্ডা-পুরুতকে যে, তাঁদের বাঁধন যতই শক্ত হবে সত্যজিজ্ঞাসুদের বাঁধনও ততই টুটবে—চোখ ফুটবে আরো তাড়াতাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে এল যন্ত্রতান্ত্রিক বিপ্লব (industrial revolution): রেল স্টীমার বিজলিবাতি ছাপাখানা এ-ও-তা—

* বিজ্ঞানের প্রধান কথা—প্রকৃতিকে দেখ, বোঝ, জান। এ বাণীটি প্রথম প্রচার করেন রজার বেকন—ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যাপক হ'য়ে ওঠে সব প্রথম—সপ্তদশ শতাব্দীতে কোপর্নিকসের মৃত্যুর পরেই, গালিলিওর জীবদ্দশায়—যদিও আরিষ্টটেল, আর্কিমিডিস, দাভিন্চি প্রভৃতি নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিলেন। The growth of the Physical Science by Sir James Jeans)

মানুষের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল, তার হৃদয়ের সব ভক্তি ভগবানকে ছেড়ে বরণ করতে ছুটল যুক্তিপন্থী বিজ্ঞানবাদকে। ফলে বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়াল অশিক্ষিতের সম্বল ও দুর্বলের সান্ত্বনা। বুদ্ধিমন্তেরা সবাই ভলটেয়ারের বিখ্যাত Dictionnaire Philosophique-এর সুরে বলা সুরু করলেন: যুক্তিই হ'ল মুক্তির পথ, বিশ্বাস হ'ল যা নেই তার কাছে হাত পাতা, যথা Holy Roman Empire, যে না হোলি, না রোমান, না এম্পায়ার ইত্যাদি ব্যঙ্গবিদ্রূপ। রুসো তাঁর বিশ্ববিশ্রুত Contrat Social-এ মন্ত্র দিলেন: "L' homme est ne´ libre, et partout il est dans les fers" অর্থাৎ মানুষ জন্মায় মুক্ত হ'য়ে, অথচ জগতে সে সর্বত্রই শৃঙ্খলিত হ'য়ে রইল (Contrat Social)। আরো কত মনীষী মনের ওকালতি করতে গিয়ে মন যার নাগাল পায় না তাকে ছোট করতে ছুটলেন বিজ্ঞানের নামে, বলা সুরু করলেন: বিশ্বাসই হ'ল যত নষ্টের গোড়া, কারণ সে দেবতার বরের লোভ দেখিয়ে চায় আমাদের অন্ধ করতে। এর পরে হার্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে বুদ্ধিমন্তদের কোরাসে গান সুরু হ'ল: Science is organised knowledge"—অতঃপর: যা নেই সায়েন্সে তা কোথাও নেই। এককথায়, ভগবানের বেদীতে বিজ্ঞানকে চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুতও বদল হ'ল—বিশ্বাসকে বরখাস্ত ক'রে বাহাল করা হ'ল বুদ্ধিকে, চেতনাকে বলা হ'ল বস্তুর একটা ক্ষণিক ফেনা, বুদ্বুদ। কাজেই বিশ্বাসের ধোঁয়াটে এলাকা ছেড়ে মানুষকে আসতে হুকুম করা হ'ল যুক্তি ও পরীক্ষার স্বচ্ছ আলোক-লোকে। মানুষ ধ'রে নিল—যুক্তির শৃঙ্খলেই মুক্তির নূপুর বেজে উঠবে, না উঠেই পারে না।

বৈজ্ঞানিকদের আত্মপ্রসাদ দ্রুতবেগে বেড়ে উঠছিল শুক্লপক্ষের শশিকলার মতনই—এমন সময়ে হঠাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে হিউম-নামধারী এক দুষ্ট রাহু উদয় হ'য়ে একটি নিদারুণ প্রশ্ন ক'রে বসলেন। বললেন: 'তোমরা বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে গঙ্গাযাত্রা করাতে চাচ্ছ—কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে তোমাদের বিজ্ঞানসাধনার মূলেও লুকিয়ে আছে এক সমান অন্ধ বিশ্বাস যে, প্রকৃতি শৃঙ্খলা (order) মেনে চলেন ও চলবেন চিরদিনই? এটা কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, না বিশ্বাস ক'রেই ধ'রে নেওয়া হয়েছে?' বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে চম্‌কে উঠলেন তাই নয়, থম্‌কে গেলেন, কারণ এ-জেরার উত্তরে কোনো সাফাই-ই গাইতে পারলেন না। রাসেল তো তাঁর Is Science Superstitious প্রবন্ধে প্রকাশ্যেই অশ্রুপাত ক'রে বললেন: "The great scandals in the philosophy of science ever since the time of Hume have been causality and induction We believe in both but Hume made it appear that our belief is a blind faith for which no rational ground can be assigned." ভাবার্থ: বিজ্ঞানের দর্শন বিপন্ন হয়েছে এই জন্যে যে হিউম দেখালেন যে, কার্যকারণসূত্র ও উপপাদন এ-দুই থিওরিই আসলে অন্ধ বিশ্বাসের 'পরে দাঁড়িয়ে। কারণ একথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে বিজ্ঞানের মূল শিকড়ে টান পড়ে, ধর্মকে আর সরাসরি বাতিল করা চলে না, কেন না সে বলতে পারে: "বিজ্ঞানেরও ভর যদি হয় বিশ্বাসের বনেদে তবে ধর্মকে বিশ্বাসভিত্তি ব'লে নামঞ্জুর করলে শুনব কেন?" কিন্তু রাসেল তবু হাল ছাড়েন নি, কান্নাকাটি করার পরেও চোখ মুছে আশা-কুহকিনীকে আঁকড়ে ধ'রে বলছেন: "And yet I cannot help believing that there must be an answer but I am quite

unable to believe that it has been found." অর্থাৎ এ-সমস্যার সমাধান আছেই আছে আমি আজো মনে মনে বিশ্বাস করি, যদিও সে-সমাধান কেউ করতে পেরেছেন ব'লে আমার মনে হয় না।

এ-মহাসমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়েছে রাসেলের প্রিয়তম সতীর্থ তথা বন্ধু হোয়াইটহেড সাহেবকেও। তিনি তাঁর Science and the Modern World নামক বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে সমস্যাটির আলোচনা করেছেন এই ভাবে:

প্রথমতঃ তিনি অকুণ্ঠেই মেনে নিয়েছেন হিউমের উপপত্তি (theory) যে, "There can be no living science unless there is a widespread conviction in the existence of an order of things, and, in particular, of an order of Nature" অর্থাৎ কোনো প্রাণবন্ত বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠতেই পারে না যদি এ-দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাপক না হয় যে, প্রকৃতি দেবী স্বভাবে খামখেয়ালী নন, নিয়ম মেনেই চলাফেরা ক'রে থাকেন। একথার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি দেবীর আইন কানুন মেনে চলাই স্বভাব একথা যদি সত্য না হয় তাহ'লে বলতেই হয়—হোয়াইটহেড সাহেবেরই ভাষায়—যে, "we do not know science to be true," যেহেতু "it may at any moment cease to give us control over the environment for the sake of which we like it." অর্থাৎ ধরুন জল যদি আজ যখন তখন মর্জি মাফিক জমাট হ'য়ে যায় তাহ'লে কী দারুণ অবস্থা হবে বলুন তো? জাহাজ চলবে কার বুক চিরে? কিংবা ধরুন, বাষ্প যদি বলে, "আমি কোনোদিকেই চাপ দেব না—তাহলে ট্রেন বেচারীরা চলবে কেমন ক'রে যাত্রী নিয়ে! কিংবা ধরুন, যদি হাওয়া বলে আমি কোনো স্পন্দনই বইব না, তাহ'লে আমরা কান থেকেও কালা। যদি আলো বলে আমি ছুটব না, তাহ'লে সূর্য থেকেও আমরা হব আঁধারবাসী। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য হবে। মোদ্দা কথাটা এই যে, প্রকৃতি স্বভাবে নিয়ম মেনে চলেন ব'লেই এ-বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হু হু ক'রে চলেছে অগুন্তি গ্রহ তারা নীহারিকা নিয়ে—এ-বিশ্বাস যুক্তিভিত্তি প্রমাণ করতে না পারলে বিজ্ঞানের প্রাণ বাঁচলেও মান থাকে না। তাই তো রাসেলের এত কান্না যে, বিজ্ঞানের প্রধান পুরোহিতদের মধ্যে বিজ্ঞানের আর সে-প্রতিপত্তি নেই যে-প্রতিপত্তি নিয়ে ধুমধাম করছে তার যজমান রুষ জাপানী চীন।* ভারতের নয়া বিজ্ঞানোৎসাহীদেরও রাসেল এই দলে ভর্তি করতে পারতেন।

এর ফল কী হয়েছে—বা হতে যাচ্ছে—সেটা আমরা ভারতবর্ষে অবশ্য আজও ধরতে পারি নি—ধরতে সময় লাগবে। আপনিই তো বলেছেন—ওদেশের yesterday আমাদের to-day-ই হয়ে এসেছে। এর সহ-সিদ্ধান্ত (corollary) : ওদের আজকের কান্নায় আমরা দোয়ার দেব আগামী কাল বা পরশু তরশু। দেখা যাক আমাদের এ-আশঙ্কা অমূলক কি না। History repeats itself—প্রবচনটি প্রায়ই সত্য হয় ব'লেই ভয় হয়। ভয় বলছি, কেন না আমরা অনেক সময়েই ঠেকে শিখলেও কেঁদে শিখতে চাই না যে, বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের বেদীতে বসিয়ে ধর্মকে অপদস্থ করার ফল ভয়াবহ। তাই আমাদের সাবধান করতে আপ্তবাক্যে

---

* "Outlying nations such as the Russians, the Japanese and the young Chinese still welcome science with seventeenth century fervour. But the high begin to weary of the worship to which they are officially dedicated." (Is Science Superstitious...Bertrand Russell)

বারবারই ধর্মের গুণগান করা হয়েছে, যথা মহাভারতে: "ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ"—ধর্মই মানুষকে ধারণ করে, উপনিষদে: "ধর্মং চর, ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্"—ধর্মাচরণ করো, ধর্মভ্রষ্ট হ'লে সর্বনাশ·। ভাগবতে উত্তরা বলছেন কৃষ্ণকে: "নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্"—অর্থাৎ,

যে জগতে আমরাই পরস্পরে হানি মৃত্যুবাণ
সেথা তুমি বিনা দিবে কে অভয়,
কে করিবে ত্রাণ?

আমি কিন্তু ধর্মের গুণকীর্তন করছি এর ফলে তার প্রতিষ্ঠা বাড়বে ব'লে নয়, করছি ছুটি উদ্দেশ্যে: প্রথমতঃ, দেখাতে যে, বিশ্বাসকে অপদস্থ ক'রে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হ'তে পারে না—না ধর্মে, না বিজ্ঞানে, না রাষ্ট্রে, না সমাজে; দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁদের অন্ততঃ মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ধর্মে অশ্রদ্ধার অবশ্যম্ভাবী ফল—মারামারি কাটাকাটি হানাহানি দ্বেষাদ্বেষি। আমার শেষ প্রতিপাদ্যটির প্রমাণ দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নেই, ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে প্রমাণ রক্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। তবে প্রথম প্রতিপাদ্যটি সম্বন্ধে আরো কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই ওদেশের মনীষীদের লেখা থেকে।

যাঁকে স্বয়ং রাসেল একজন যুগপ্রবর্তক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ব'লে মনে করেন ও হোয়াইটহেড "adorable genius" উপাধি দিয়েছেন সেই বিখ্যাত উইলিয়ম জেম্‌স এ-যুগে সবাইকে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ধর্ম সমর্থনে চমকে দিয়েছিলেন তাঁর Varieties of Religious Experience-এর গবেষণায়। এ-বইটিকে এ-যুগে ওদেশের একটি যুগপ্রবর্তক গ্রন্থ ব'লে অভিনন্দিত করা হয়েছে, ধর্মে অবিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকের মনই ভাবতে সুরু করেছে—তাই তো! এ বইটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া অবান্তর হবে, তার প্রয়োজনও নেই। তবে তাঁর এ-প্রখ্যাত বইটির উনশেষ অধ্যায় থেকে একটু উদ্ধৃতি না দিলেই নয়। তিনি বলেছেন যে উপসংহারে তাঁর এই কয়টি প্রত্যয় পর পর সাজাতে চান ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে যা তাঁর মনে হয়েছে বরণীয় ব'লে:

১। এ-দৃশ্য জগৎ আর একটি অলক্ষ্য গভীরতর অধ্যাত্মজগতের অংশমাত্র, আর এই অলক্ষ্য জগৎ থেকেই তার সার্থকতার রস উপচিত হয়।

২। এই উচ্চতর জগতের সঙ্গে মিলন তথা সুষমিত (harmonious) সম্বন্ধ স্থাপন করাই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য।

৩। প্রার্থনা বা সে-জগতের সঙ্গে আন্তর যোগের—তাকে ভগবানই বলো বা ঋতম্‌ই (law) বলো—মাধ্যমে সত্যিকার কাজ সুসম্পন্ন হয়, এবং অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ ব'য়ে এসে মানসিক ও বাস্তব নানা ঘটনা ঘটে এ-দৃশ্য জগতের মধ্যে।

এছাড়া জেম্‌স সাহেব অকুণ্ঠেই স্বীকার করছেন সত্য ব'লে যে,

৪। ধর্ম জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে আসে যেন বরদা হ'য়ে, কবিত্বময় আবেশের রূপ নেয় আমাদের ঐকান্তিকতা ও বীর্যশক্তিকে উস্কে দিয়ে।

৫। ধর্ম আমাদের আশ্বাস দেয় নিরাপত্তার ও শান্তিভাবের এবং সেই সঙ্গে আর সবার সঙ্গে লেনদেনে স্নেহপ্রীতির জোয়ার জাগিয়ে দেয়।

পাছে অনুবাদটির অর্থপরিগ্রহ করতে কেউ বেগ পান এই ভয়ে মূল উদ্ধৃত করছি নিচে:

Summing up in the broadest possible way the characteristics of the religious life, as we have found them, it includes the following beliefs :—

1. That the visible world is part of a more spiritual universe from which it draws its chief significance ,

2. That union or harmonious relation with that higher universe is our true end ;

3 That prayer or inner communion with the spirit thereof—be that spirit 'God' or 'law' - is a process wherein work is really done, and spiritual energy flows in and produces effects, psychological or material, within the phenomenal world.

Religion includes also the following psychological characteristics

4 A new zest which adds itself like a gift to life, and takes the form either of lyrical enchantment or of appeal to earnestness and heroism.

5 An assurance of safety and a temper of peace, and, in relation to others, a preponderance of loving affections.

জেম্‌স সাহেব তাঁর Varieties of Religious Experience-এ আরো অনেক গভীর কথা বলেছেন, কিন্তু সে-সব উদ্ধৃতি দেবার স্থানও এ নয়, তার প্রয়োজনও নেই। আমি তাঁর নাম উল্লেখ করলাম শুধু বলতে যে, তিনি অবিশ্বাসী যুক্তির তরফ থেকে পরীক্ষা করেও ধর্মসম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধায় পৌঁছেছিলেন। অবশ্য তিনি ছিলেন স্বধর্মে মনস্তাত্ত্বিকই বটে তাই ধর্মের নানা অনুভূতিকে অনুভব না ক'রে শুধু বিচারের পথ দিয়ে ঠিক বুঝতে পারেন নি। কেমন করে পারবেন ? যা শুধু উপলব্ধিগম্য—বোধির এলাকায় পড়ে—তাকে বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ ক'রে বুঝতে গেলে গোল বাধেই। একটি দৃষ্টান্ত দেই আমার এ-বক্তব্যটির ভাষ্যরূপে। বিখ্যাত যোগী কবি এ ই ওরফে জর্জ রাসেল তাঁর Candle of Vision স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "খুব কম মনস্তাত্ত্বিকই এদেশে কল্পনায় সমৃদ্ধ। কম্পমান জলে চূর্ণ প্রতিবিম্বই কাঁপতে থাকে। এঁরা হ্রস্বদৃষ্টি তাই যা দেখেন তাতে তাঁদের মনে বিস্ময় জাগে না।" এ ই আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন এ-সব বিচারীদের ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে : "We have no words to express a thousand distinctions clear to the spiritual sense. If I tell of my exaltation to another who has not felt this himself, it is explicable to that person as the joy of perfect health, and he translates into lower terms what is the speech of the gods to men" অর্থাৎ আমাদের অন্তরাত্মার যে-সব স্পষ্ট ও গভীর অনুভূতি হয় তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদগুলির ব্যাখ্যা করবার ভাষা পাব কোথায় ? ধরো, আমি যদি বলি আমার পরমানন্দের কথা এমন কাউকে যার তার সঙ্গে আদৌ পরিচয় হয় নি, তাহ'লে সে তাকে হয়ত বা পূর্ণ স্বাস্থ্যের উল্লাসের সমার্থক মনে করবে। অর্থাৎ, দেবতারা মানুষের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা কন সে-ভাষার সে তর্জমা করবে এক নিম্নতর (মানবিক) পরিভাষায়। কিন্তু তবু জেম্‌স সাহেব মানুষের নানা ধর্মীয় অনুভূতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে অতীন্দ্রিয় নানা অনুভবের মহিমার আভাস পেয়েছিলেন বৈকি যার ফলে তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা এসেছিল ধর্মের দিব্যতত্ত্বে।

(ক্রমশঃ)

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

সকলেই জানেন যে সুদীর্ঘ বারো বছর পরে এবার আবার প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ হয়েছিল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভের সময় যে দুর্ঘটনা হয়েছিল তাতে অনেকে মনে করেছিলেন যে এবারে হয়ত এত বেশী যাত্রীসমাগম হবে না। এ ছাড়া সরকার, রেলকর্তৃপক্ষ এবং কোন কোন ধর্মনেতা কুম্ভস্নানে যাওয়ার কোনও উৎসাহ দেন নাই, তবু আমরা যখন ২০শে জানুআরি গঙ্গার অপর পাড়ে ঝুসিতে মেলাক্ষেত্রে পৌছুলাম তখন অগণিত তাঁবু, পতাকা, অসংখ্য ভজন কীর্তন দল এবং বিরাট জনসমুদ্র দেখে মনে হল বুঝি বা সমস্ত ভারতবর্ষের লোকই সেখানে সমবেত হয়েছে। স্পষ্ট প্রতীয়মান হল ভারতের প্রাণকেন্দ্র কোথায়। এই পুণ্যভূমিতে জন্ম হয়েছে বলে হৃদয় আনন্দে ও গর্বে পূর্ণ হয়ে গেল।

দেওঘর হতে রওনা হয়ে আমরা প্রথমে ৺কাশীতে গেলাম—উদ্দেশ্য বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে পরে কুম্ভে যাব। পূর্বেও কয়েকবার ৺কাশী দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু এইরূপ যাত্রীর ভীড় কখনও দেখি নাই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বহু কুম্ভযাত্রী আমাদেরই মত কুম্ভে যাওযার পূর্বে বিশ্বনাথদর্শনে ৺কাশী হয়ে যাচ্ছেন। কেহ কেহ বললেন, '৺কাশীতে দ্বিতীয় কুম্ভ হচ্ছে।'

বারাণসী জংশন স্টেশন হতে প্রতি আধঘণ্টা অন্তর স্পেশাল ট্রেন ছাড়ছিল, বিশেষ করে ছোট লাইনে। আর প্রতি ৪।৫ মিনিট অন্তর বাসও যাচ্ছিল। এলাহাবাদের দূরত্ব কাশী হতে প্রায় ৯০ মাইল। আমরা ২১শে জানুআরি মৌনীঅমাবস্থার দিনেই কুম্ভস্নান করব ঠিক করেছিলাম। এর আগে ১৪ই জানুআরি মকর-সংক্রান্তিতেও স্নানের যোগ ছিল এবং পরে ২৬শে জানুআরি শ্রীপঞ্চমীতে আর একটি যোগও পড়েছিল। কিন্তু মৌনীঅমাবস্থার স্নানই সব থেকে বিখ্যাত ও ফলপ্রসূ—ইহাই সকলের ধারণা।

কয়েকজন সাধু ও ভক্তসহ আমরা ২০শে তারিখ ভোর ৪॥টায় বারাণসী জংশন স্টেশনে এসে দেখি প্লাটফরমে এলাহাবাদগামী একখানি গাড়ী ছোট লাইনে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু তাতে এত ভীড় যে উঠবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আধঘণ্টা পরে একখানি ট্রেন এলো, উহাও পূর্ব হতেই এত ভর্তি হয়ে গিয়েছিল যে তিলধারণের স্থানও সেখানে ছিল না। দু একজন সঙ্গী কোনও মতে উঠে চলে গেলেন। মনটা একটু দমে গেল—পরের ট্রেনেও উঠতে পারব কিনা। দারাগঞ্জের টিকিট কেটে-ছিলাম—সেখান হতে মেলাক্ষেত্র খুবই কাছে। কলেরা ও বসন্তের টীকা না নিলে এবং তার সার্টিফিকেট না দেখালে টিকিট পাওয়া যাবে না। আমি দেওঘর হতেই টীকা ও সার্টিফিকেট নিয়ে যাওয়াতে কোনও অসুবিধা হয়নি। ২০।২৫ মিনিট পরে গোরখপুর হতে একখানি স্পেশাল ট্রেন এল—৩।৪ ঘণ্টা পূর্বে আসার কথা ছিল। এবার কয়েকজন জোয়ান কুলী আমাদের জানালা দিয়ে গাড়ীর মধ্যে কোনও রকমে ঠেলে ফেলে দিল—সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কুলীকে খুশী করে দিয়ে

মনে মনে বাবা বিশ্বনাথের কাছে বিদায় নিয়ে কুম্ভের কথা স্মরণ করতে করতে রওনা হলাম সকাল ৬॥ টায়। চার ঘণ্টায় এলাহাবাদে পৌছুবার কথা। কোনও কোনও স্টেশন হতে ট্রেন নড়তেই চায় না। এত বগী জুড়েছিল এবং এত যাত্রী তাতে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল ইঞ্জিন বেচারা আর টানতে পারছিল না, তাই মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল। যাই হোক আট ঘণ্টা পরে আমরা ঝুসী স্টেশনে পৌছুলাম—তার পরের স্টেশন দারাগঞ্জ—শুনলাম দারাগঞ্জে ট্রেন থামবে না। কাজেই আমরা সেখানেই নেমে পড়লাম। খাওয়া দাওয়া বিশেষ কিছু আর হয়নি। ৩।৪ জন কুলী নিযুক্ত করে তাদের মাথায় মাল দিয়ে হেঁটে মেলাক্ষেত্র অভিমুখে রওনা হলাম এবং মাঠের ও গ্রামের মধ্য দিয়ে আড়াই মাইল ধূলিধূসরিত রাস্তা অতিক্রম করে বেলা চারটা নাগাদ মেলাক্ষেত্রে পৌছুলাম। এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হতে এক নম্বর পুলের পথের ধারে সাধু ও যাত্রীদের থাকার জন্য কতকগুলি খড়ের ঘর ও তাঁবুর ব্যবস্থা হয়েছিল—সেখানে গিয়ে সকলে উঠলাম। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও মিশন হতে খোলা হয়েছিল। আমাদের মঠের প্রায় ৭০ জন সাধু ও সমসংখ্যক ভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে এসে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুপুরের ডাল ভাত ছিল। ধুলাপায়ে তাহাই অমৃতের ন্যায় খাওয়া গেল। পরে কয়েকজন সাধুকে নিয়ে মেলার শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। যেদিকে দেখি কেবল সাধুর আখড়া—বিভিন্ন বেশধারী সাধু এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী কত দূরদূরান্তর থেকে কত কষ্ট সহ্য করে এসেছে, কিন্তু সকলেরই মুখে এক প্রশান্তি—তারা তীর্থরাজ প্রয়াগে এসেছে এবং পরদিন মৌনীঅমাবস্যার পুণ্যযোগে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমে কুম্ভস্নান করে ও সাধুদর্শন করে জীবন ধন্য করবে। তখন প্রচণ্ড শীত, কিন্তু অদ্ভুত তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস—ঐ দারুণ শীতে কোন আচ্ছাদন না পেয়েও উন্মুক্ত আকাশতলে কাটিয়ে দিল সমস্ত রাত। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের গীত :

> 'গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ
> শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস।'

এদের বিশ্বাস ও ভক্তি দেখলে নাস্তিক আস্তিকে পরিণত হয় এবং সাধারণ লোকও পায় ধর্মজীবনলাভের এক অপূর্ব অনুপ্রেরণা। এবারকার কুম্ভের এক বিশেষ আকর্ষণ "বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদ।" ভারত ও ভারতের বাহির হতে বহু বিশিষ্ট হিন্দু নেতা সমবেত হয়েছেন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার জন্য। আমাদের আস্তানার পাশেই বিখ্যাত সাধু করপাত্রীজীর শিবির—তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন হিন্দীতে—কয়েক সহস্র শ্রোতা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন—তন্মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন গ্রাম হতে। আনন্দময়ী মা, গীতাভারতী প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা-সাধিকার শিবিরও ছিল। এক জায়গায় দেখলাম ১০৮ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ সমস্বরে সমগ্র গীতা পারায়ণ করছেন। এছাড়া নির্বাণী, জুনা, নিরঞ্জনী প্রভৃতি আখড়ার বিরাট তাঁবু পড়েছে। গঙ্গা-যমুনার সুবিস্তীর্ণ বিরাট সমতল তটটি একটি বিরাট শহরে পরিণত হয়েছে। এ শহরের অধিবাসী—প্রায় সকলেই হয় সাধু না হয় ভক্ত এবং সকলেই অস্থায়ী। গঙ্গার অপর পারে সম্রাট আকবর-নির্মিত বিরাট দুর্গ ও এলাহাবাদ শহর। প্রায় ৮টি সেতু করা হয়েছে—গঙ্গা-পারাপারের জন্য। এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর—এই ক্রমে সেতুগুলির নাম। দর্শনাদির পর ফিরে এসে রাত্রে খাওয়ার সময় শিবিরের

সহাধ্যক্ষ মহারাজ জানিয়ে দিলেন যে পরদিন অর্থাৎ ২১শে জানুআরি ভোর সাড়ে চারটায় নির্বাণী আখড়ার প্রথম শোভাযাত্রা বের হবে। সাধুদের সব খালি পায়ে যেতে অনুরোধ জানানো হল। পরদিন ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আমরা ৪॥টা নাগাদ মা গঙ্গাকে স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। সমস্ত মেলাক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকারের বাজনা, ভজন, পাঠ, জয়ধ্বনি ইত্যাদিতে গমগম করছিল। দু-ফার্লং এসেই আমরা মিলিত হলাম নির্বাণী আখড়ার শোভাযাত্রার সঙ্গে। প্রায় আধমাইল লম্বা শোভাযাত্রা—তাতে কেবল সাধুরাই যোগ দিতে পারেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে জটাভস্ম-বিভূষিত প্রায় তিন শত নাগা সন্ন্যাসী। সুসজ্জিত রথোপরি চার পাঁচজন মণ্ডলীশ্বর। সে এক অপূর্ব দৃশ্য—হাজার হাজার সাধু উষাকালে ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছেন তীর্থরাজ প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পুণ্য পূর্ণকুম্ভ স্নানে। অনেকে আবার গাইছেন, "হর হর হর মহাদেব, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে।" দুপাশে কাতারে কাতারে অসংখ্য ভক্ত নরনারী হাত জোড করে অর্ধনিমীলিত নেত্রে সেই দিব্য দৃশ্য দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। ভালভাবে সাধু ও শোভাযাত্রা দর্শনমানসে অনেকে সমস্ত রাত ধরে রাস্তার ধারে বসেছিলেন। সকলের মন আনন্দে ভরপুর —চিত্তে প্রশান্তির ছাপ। খালি পায়ে চলতে অনভ্যস্ত সাধুদের সেই দারুণ শীতে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা বালুর ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ আস্তে আস্তে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। সব কষ্টের লাঘব হল যখন সকলে পৌঁছুলাম গঙ্গাযমুনার পবিত্র সঙ্গমে। তিন নম্বর পুল দিয়ে আমাদের যেতে হল। সঙ্গমের কাছে এসেই প্রথমে মহামণ্ডলীশ্বর স্বামী কৃষ্ণানন্দজী রথ হতে নেমে অবগাহন স্নান করলেন। সাধুদের স্নানের স্থান পূর্ব হতেই সরকার নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন—মোটা দড়ি দিয়ে তা ঘেরা ছিল এবং শত শত পুলিস পাহারায় রত ছিল। মণ্ডলীশ্বরের স্নানের পরেই নাগারা জলে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেই পবিত্র সঙ্গমে ও পবিত্র পূর্ণকুম্ভ যোগে স্নান করতে নামলাম। ভোর ৬-২০তে আমাদের স্নান প্রায় সমাপ্ত হল। অনেকে তাঁদের প্রিয়-জনের নাম করে তাঁদের কল্যাণকামনায় ডুব দিলেন। অনেকে সেই পবিত্র বারি কমণ্ডলুতে বা বোতলে করে ভরে নিলেন। শীত কাটাবার জন্য নাগা সাধুরা কেহ কেহ স্নানান্তে সর্বাঙ্গে বিভূতি লাগিয়ে ডন বৈঠক আরম্ভ করে দিলেন। ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে প্রথম শোভাযাত্রাগামী সকলেরই স্নান হয়ে গেলে তাঁরা ফিরে গেলেন তাঁদের তাঁবুতে, এক নম্বর পুলের রাস্তা দিয়ে। অতঃপর নিরঞ্জনী আখড়া, জুনা আখডা এবং বৈষ্ণব, অবধূত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধুরা একে একে শোভাযাত্রা সহকারে সঙ্গমে স্নান করে চলে গেলেন। তারপর সুরু হল ভক্তদের স্নান। অসংখ্য যাত্রী নৌকা করে সঙ্গমের মাঝখানে গিয়ে স্নান সেরে নিলেন। অবশ্য এই সুবর্ণ-সুযোগে নৌকাওয়ালারা বেশ কিছু আয় করে নিয়েছিল। কোনও কোনও নৌকা দুঘণ্টার জন্য দুতিনশত টাকা পর্যন্ত যাত্রীদের কাছে নিয়েছিল। ঘণ্টা দুই পরে আমরা আবার সঙ্গমে এসে দেখি যে চারিদিকেই বিরাট জনসমুদ্র—পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই কত আগ্রহ ও কত ভক্তি নিয়ে স্নান করছেন। সমস্ত দিন অমাবস্যাতিথি থাকাতে সমস্ত দিনই স্নান চলেছিল।

কুম্ভের ও প্রয়াগের মাহাত্ম্য অনেকের জানা থাকলেও এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম; আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কুম্ভযোগ

অনেকেই জানেন যে চার জায়গায় প্রতি বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ-যোগ হয়। যথা হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে পূর্ণকুম্ভ হয়, তা নিম্নে বলা হচ্ছে।

কুম্ভরাশিগতে জীবে যদ্দিনে মেষগে রবৌ।
হরিদ্বারে কৃতং স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জনম্॥

অর্থাৎ বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্য মেষ-রাশিতে অবস্থানকালে, বসন্তকালে বিষুব সংক্রান্তি দিনে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয় - ঐ সময় স্নান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

বৃষরাশিং গতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥

বৃহস্পতি বৃষরাশিতে এবং সূর্য ও চন্দ্র মকর রাশিতে অবস্থান কালে অমাবস্যা তিথিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ-যোগ হয়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুআরি বৃহস্পতি বৃষরাশিতে প্রবেশ করেছেন এবং ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবেন। ১৪ই জানুআরি সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশপূর্বক ১২ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। সুতরাং ৯ই ও ১৪ই জানুআরিতেও কুম্ভস্নানের যোগ ছিল। কিন্তু ২১শে জানুআরি চন্দ্র মকর রাশিতে ছিলেন—ঐ দিন আবার অমাবস্যা ছিল, সুতরাং ২১শে জানুআরি (৭ই মাঘ) বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির বৃষরাশিতে ও সূর্য-চন্দ্রের মকর রাশিতে অবস্থানকালে অমাবস্যা তিথিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রধান কুম্ভস্নানের যোগ ছিল।

সিংহরাশিং গতে সূর্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
গোদাবর্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥

অর্থাৎ সিংহে বৃহস্পতি ও রবির অবস্থান-কালে শ্রাবণ মাসে গোদাবরীতটে নাসিকে মুক্তিপ্রদ কুম্ভযোগ হয় এবং

মেষরাশিং গতে সূর্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
উজ্জয়িন্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ সর্বসৌখ্যবিবর্ধনঃ॥

সিংহে বৃহস্পতি ও মেষে রবির অবস্থানকালে কার্তিক মাসে উজ্জয়িনীতে পবিত্র ক্ষিপ্রানদীতে (ধারানগরী) সর্বমঙ্গলপ্রদ কুম্ভ স্নান হয়। উজ্জয়িনীর পূর্বে নাম ছিল অবন্তিকা। এছাড়া বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে ও সূর্য মেষরাশিতে অবস্থিত হলে বৈশাখ মাসে হরিদ্বারে এবং বৃহস্পতি বৃশ্চিকে ও সূর্য মকরে স্থিত হলে মাঘ মাসে প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ হয়। কথিত আছে যে প্রাচীন কালে কেবলমাত্র সাধুসন্তরাই কুম্ভস্নানের জন্য একত্র সমবেত হয়ে নানাবিধ ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় আলোচনাদি করতেন। ইদানীং কিন্তু লক্ষ লক্ষ ধর্মপিপাসু নরনারী পুণ্যার্জন-মানসে শত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করেও কুম্ভস্নান করেন।

হরিদ্বার ও প্রয়োগের পূর্ণকুম্ভ-যোগে সর্বাধিক লোক সমাগম হয়।

কুম্ভের ইতিহাস

পুরাণে কুম্ভস্নানের উল্লেখ আছে। দেবতা ও দানবগণ সম্মিলিতভাবে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করলে পুষ্পক রথ, ঐরাবত হস্তী, পারিজাত বৃক্ষ, কামধেনু প্রভৃতি তেরটি অমূল্য রত্ন উত্থিত হয়। সেগুলি আপসে দেবতা ও দানবদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। অবশেষে ধন্বন্তরি সুন্দর সুধাপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে যখন উত্থিত হলেন তখন দেবতা ও দানবদের মধ্যে তার বণ্টন ও অধিকার নিয়ে ঝগড়া লাগল। সুধা-পান করলে দানবরা অমর হয়ে যাবে এবং চিরকাল দেবতাদের উৎপীড়ন করবে—এই ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত কাকের রূপ ধারণ করে

অতর্কিতে সুধাকুম্ভ নিয়ে পলায়ন আরম্ভ করেন। শুক্রাচার্যের উপদেশে দানবরা, বিশেষ করে রাহু ও কেতু জয়ন্তকে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের হাত হতে অমৃতকুম্ভ রক্ষার জন্য জয়ন্ত প্রথমে হরিদ্বারে (ব্রহ্মকুণ্ডে), পরে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে, তারপর নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে কুম্ভ লুকিয়ে রাখেন।

দৈত্যগণ যখনই অমৃতকুম্ভ হস্তগত করার চেষ্টা করছিলেন তখনই সুধা যাতে না পড়ে যায় তজ্জন্য চন্দ্রদেব, কুম্ভটি যাতে না ভেঙ্গে যায় তজ্জন্য ভগবান সূর্য, এবং দৈত্যগণ যাতে নষ্ট করতে না পারে তজ্জন্য সুরগুরু বৃহস্পতি—এই তিন জন বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। সেজন্য পুরাণকারগণ ঐ তিন জনের অবস্থান অনুসারে কুম্ভস্নানের সময় নিরূপণ করেছেন। কুম্ভযোগ সম্বন্ধে নিম্নরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ পাওয়া যায়:

গঙ্গাতীরে প্রয়াগে চ ধারাগোদাবরীতটে।
কলসাখ্যোহি যোগোঽয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি আচার্যগণ বলেছেন যে হরিদ্বারে, প্রয়াগে, ধারানগরীতে (উজ্জয়িনী) ও গোদাবরীতটে (নাসিকে) কুম্ভযোগে স্নান হয়।

কথিত আছে যে প্রতিস্থানে বারোদিন করে জয়ন্তের সঙ্গে দৈত্যদের যুদ্ধ হয়, ঐ সময় দু'চার ফোঁটা সুধা ঐ চারটি পবিত্রস্থানে পতিত হয়। দেবতাদের বারো দিন মানুষের কাছে বারো বছর। তাই বারো বছর অন্তর এই স্নান হয়। সুধামিশ্রিত এই পবিত্র জলে স্নান করলে সকলে অমৃতত্ব লাভ করবেন বা মুক্ত হ'য়ে যাবেন. এই বিশ্বাস নিয়েই রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সাধু-গৃহী সকলেই এসে সমবেত হন। কতশত যুগ ধরে যে এই কুম্ভস্নান চলে আসছে তাহা বলা শক্ত, তবে কয়েক হাজার বছরের কম নয়।

তীর্থরাজ প্রয়াগ

এবার ত্রিবেণী বা তীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ হল; সেজন্য প্রয়াগ সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব। উত্তরপ্রদেশের একটি প্রধান শহর এলাহাবাদ-কেহ কেহ বলেন, এলাহাবাদ নাম দিয়েছিলেন সম্রাট আকবর। ইহার অর্থ আল্লার বাসস্থান। পূর্বে ইহা প্রয়াগ নামেই খ্যাত ছিল। পবিত্র গঙ্গা ও যমুনা এবং গুপ্তা সরস্বতী নদীর সঙ্গম এখানে হয়েছে বলেই ইহার প্রসিদ্ধি এত বেশী। মহাভারত, পুরাণ ও কৃত্যকল্পতরু নামক ধর্মশাস্ত্রে প্রযাগের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধদেবের সময়ে এই প্রয়াগ কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি স্বয়ং এই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। হিন্দুমাত্রেরই ধারণা যে প্রয়াগ অতি পবিত্র তীর্থ—এইস্থানে অনেকে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন, অনেকে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করেন যে প্রয়াগে এলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। অনেকের ধারণা এখানে মৃত্যু হলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক যাত্রী হুয়েন সাঙ্ ও ফা হিয়েন প্রয়াগ দর্শন করেছিলেন। এঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রয়াগের তখনকার দিনের গভীর আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এঁরা লিখেছেন, তখন অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু ছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা হতে সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত এখানে আগমন করতেন ও যথাসাধ্য দানাদি করতেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে প্রয়াগে দান করলে তার ফল হয় শতগুণ। রাজা হর্ষবর্ধন এখানে কয়েক-বার যথাসর্বস্ব, এমন কি নিজের রাজবেশ পর্যন্ত দান করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক কহ্লাণ তাঁর বিখ্যাত রাজতরঙ্গিণী পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে কাশ্মীরের রাজা জয়দীপ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রয়াগে আসেন এবং

৯৯৯৯৯টি অশ্ব দান করেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নাকি বেদোদ্ধার-কল্পে এই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগে বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন, এ কাহিনীর উল্লেখ আছে মহাভারতে। ঋগ্বেদ ও শতপথ-ব্রাহ্মণেও গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রয়াগকে যে তীর্থরাজ বলা হয়েছে তাতে আর আশ্চর্য কি। গঙ্গা ও যমুনার তীরেই যুগ যুগ ধরে ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। আর যেখানে এই বিখ্যাত পবিত্র নদীদ্বয় মিলিত হয়েছেন সে স্থানের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য যে কত বেশী, তা সহজেই অনুমেয়।

এই পবিত্রস্থানে এলে মানুষের মন সহজেই অন্তর্মুখ হতে চায়—এই পবিত্র সঙ্গমে স্নান করলে শরীর মন নিষ্পাপ হয়ে যায়, বিশেষ করে পূর্ণ কুম্ভযোগে প্রয়াগে অবগাহন করতে পারলে পুনর্জন্মের আর ভয় থাকে না; এ স্থানে পরম প্রশান্তিতে মন প্রাণ ভরে ওঠে।

প্রার্থনা

শ্রীমতী শিবানী মৈত্র

অনন্ত মাধুর্যে ভরা ঐ নাম খানি
কত বক্ষমাঝে দিল কত আশা আনি,
কত ব্যথিতের প্রাণ—অমৃতের মত
লভিল পরম শান্তি! যত ব্যথাহত
বঞ্চিত হৃদয়—হায় কি আনন্দধারা
তোমার নামের মাঝে পেয়েছে তাহারা!
তোমার চরণতলে দশদিক হতে
কত নরনারী আসে ভক্তিপ্রেমে মেতে
লভিতে পরম ধন। শঙ্কিত হৃদয়
তব কাছে আসি লভে পরম নির্ভয়।
কত শত দিক হ'তে কত শত জন
তোমার চরণে আসি নিতেছে শরণ।
হে চিরসুন্দর নাথ! দাও মোরে আশা—
তোমার চরণে ঢালি সব ভালবাসা
তব নাম স্মরি যেন হে হৃদয়স্বামী,
এ সংসার হ'তে যবে চলে যাব আমি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(এক)

[বলরামবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীহরি শ্রীচরণ ভরসা। ৺বৃন্দাবনধাম

(২২শে মার্চ, ১৮৯০)

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। আপনার শরীর এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। সুরেশবাবুর পীড়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁহার যাহা মনে আছে তাহাই হইবে। মনুষ্য ভাবিয়া কোন প্রতিকার করিতে পারে না। তথাচ কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। উপস্থিত জলবায়ু এখানকার ভাল নয়, হঠাৎ পরিবর্তন হইয়াছে। এখানে চৌদ্দআনা রকম লোক জ্বরে ভুগিতেছে, কোন ২ মন্দিরে লোক অভাবে কার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আপনাদের মন্দিরের প্রায় সকলে জ্বরে ভুগিতেছে। আমি ৩।৪ দিবস খুব ভুগিয়াছি, অদ্য দুই তিন দিন পথ্য পাইয়াছি মাত্র, শরীর বড় দুর্বল এবং অত্যন্ত অরুচি। সুবোধের জ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল আছে। এবার এখানে একপ্রকার Peculiar জ্বর। সকলের এইরূপ হইতেছে। প্রথমে গা কামড়ান, তারপর কাশি, তারপর খুব জ্বর। পরে ২।৩ দিনের জ্বরে অত্যন্ত দুর্বল। অধিক গরম এখন পড়ে নাই। শেষ রাত্রে একটু ২ শীত হয়। মাতাঠাকুরাণী বোধ হয় চৈত্র মাসে ৺গয়ায় যাইবেন। তিনি কেমন আছেন এবং কোথায় আছেন লিখিবেন। আমার অসংখ্য প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন, বরাহনগরের সকলকে আমার নমস্কার জানাইবেন। ইহা নিবেদন। ইতি—

নিঃ শ্রীরাখাল

(দুই)

[বলরামবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা। ৺বৃন্দাবনধাম

(৩০শে মার্চ, ১৮৯০)

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ

বৃন্দাবনে এখনো জ্বরের প্রাদুর্ভাব খুব। এখন কমে নাই। শ্রীযুত ব্রহ্মচারিজীর জন্য ২।১টি ছোট Enameled বাটী রামচন্দ্র বেনিয়ার মারফৎ পাঠাইয়া দিবেন। কারণ উক্ত ব্রহ্মচারী কতকদিবস হইতে আমাকে লিখিবার জন্য কহিতেছেন। এখানে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ (বহরমপুর edition) পর্যন্ত আছে, বক্রি নাই এবং আসিতেছে না। বক্রি কি এখানে আসিবে না আপনার নিকট আসিতেছে লিখিবেন। কালী ও বাবুরাম এতদিনে কলিকাতায় গিয়াছে কিনা লিখিবেন। ইহা নিবেদন। ইতি তারিখ ১৮ই চৈত্র

নিঃ শ্রীরাখাল

(তিন)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা। Behea

22nd December, 1895

প্রিয় হরিমোহন,

২।৩ দিবস হইল তোমার এক পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। Change-তে তোমার উপকার হইতেছে না জানিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। ওখানকার Climate ত ভাল, তবে কেন তোমার উপকার হইতেছে না? আমার বিবেচনায় আর দিন ২০ দেখা উচিত, কারণ অনেক স্থানে হয়ত প্রথম উপকারবোধ হয় না, পরে থাকিতে ২ উপকার হয়। একলা আছ বলিয়া কোনরূপ মনে চিন্তিত বা উদাস হইও না, সর্বদা মনে প্রফুল্ল অবস্থায় থাকিবে। আমার যে বিপিনবাবুর নিকট হইতে যাওয়া ভার, নচেৎ তোমার নিকট চলিয়া যাইতাম। বিপ্রদাসবাবু তোমার তত্ত্বাবধান কেমন করেন, সকল আমাকে খুলিয়া লিখিবে। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ, বেশ ত, একবার গিয়া দর্শনাদি করিয়া আসিবে। সেখানকারও Climate মন্দ নহে. তবে যৎপরোনাস্তি ঠাণ্ডা ও শীত, এইজন্য একটু বিলম্ব করিয়া যাইলে ভাল হয়। সেখানে আমাদের দুইজন আছেন এবং তথায় থাকিবার স্থান অতি সুন্দর আছে। যত্তপি একাকী মন ওখানে না বসে, তাহা হইলে পত্রপাঠ আমাকে লিখিবে, আমি বৃন্দাবনে পত্র লিখিব ও বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু বোধ হয় Brindaban অপেক্ষা Etowa-র জলবায়ু ভাল, তবে কাহার কোন স্থান suit করে কিছু বলা যায় না। আমার পত্রের জবাব দিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, তাহার কারণ কলিকাতা হইতে যোগেন মহারাজ কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেই সবগুলির জবাব দিতে আমি বড ব্যস্ত ছিলাম। আজ ৪।৫ দিবস হইল তোমায় ডাইল কালী পাঠাইয়া দিয়াছে।

একটি বাবু, নন্দনবাগানে তাহার বাটী, তিনি—Arah-য় তাঁহার আত্মীয় একজন Dy. Collector—তাঁহার নিকট Change করিতে আসিয়াছেন এবং কতকটা উপকারও পাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করেন Etowah-তে কিছু দিন থাকিতে। তিনি একাকী, বয়স ২০।২২ আন্দাজ। ছোকরাটি ভাল, আমাদের সারদা মহারাজের আলাপী। তোমার সঙ্গে একত্রে থাকিবার সুবিধা কি হইতে পারে? তিনি খরচ ইত্যাদি half দিবেন। যেরূপ বিবেচনা কর আমাকে সত্বর লিখিবে। আর যত্তপি বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলেও লিখিও। তথায় বাবুরাম ভায়া ও কালীকৃষ্ণ আছেন। আমার শরীর ২।১ দিন ভাল ও ২।৪ দিন মন্দ, এইরূপ অবস্থায় চলিতেছে। বোধ করি কোন কারণবশতঃ আমাকে কলিকাতায় সত্বর যাইতে হইবে। তুমি আহার ও বেড়ান ইত্যাদি বেশ সাবধানে করিবে। কোনরূপ মনে ভাবনা করিও না। সত্বর পত্র লিখিবে, কারণ আমি তোমার শরীর সুস্থ না থাকায় চিন্তিত আছি। আজও ব্যস্ত, অনেক পত্রের জবাব দিতে হইবে। ইতি—

Sincerely yours

Brahmananda

নৈষা তর্কেণ

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

গঙ্গার ঢেউ ছুলে ছুলে যায়
আকাশের আলো পাখা মেলে তার 'পরে—
রাতের পরশে তিমিরে কি জ্যোছনায়
রূপেব সাগব অপরূপে লীলা কবে!

চোখ মেলে তুমি নাই দেখ যদি তবু—
রাশি বাশি ফুল ফুটিছে প্রহরে প্রহরে—
ঝরা ফুল হেরে খেদ জাগে পাছে কভু
ধরা ভ'রে নিতি কুসুম স্তবক শিহরে!

পাহাড়ে পাথারে আননে কাননে
আলোর নেশায় রূপের নিশান খোলে—
তুমি বচনে ও মনে, নাই নিলে মেনে
তবুও ভুবনে রূপের দেবতা দোলে!

সত্যেব ছায়া আকাশেতে ভাসে
কায়া ধরে, আর কাঁদে হাসে এই ভুবনে—
মানা, না-মানায় কিবা যায় আসে
নদী বয়, ফুল সুবভি ছড়ায় পবনে!

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

অজানা সাগরবুকে পাড়ি

এসময় শ্রীরামকৃষ্ণের মন আধ্যাত্মিক ভাব-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উদ্দামবেগে ছুটে চলেছিল। শুধু মা-কালীর দর্শনলাভ করে তার গতিবেগ থামতে চাইল না, ভগবানকে আরো বহু রূপে দেখতে চাইলেন তিনি। তাঁর অন্তরে যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুন জ্বলছিল, একটিমাত্র ভাবাবলম্বনে ভগবানকে উপলব্ধি করে সে আগুন নিভবে কেন? শৈশবে গ্রামের বাড়িতে তিনি রঘুবীরের পূজা করতেন। ভগবানকে সেই শ্রীরামচন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। পুরাণ-বর্ণিত অযোধ্যাপতি ক্ষত্রিয়রাজ এই রামচন্দ্রকে অসংখ্য হিন্দু নরনারী ঈশ্বরাবতার বলে আজও পূজা করে আসছেন। শ্রীভগবানকে রামরূপে আরাধনার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ামাত্র তাঁর নমনীয় মন রামগতপ্রাণ বানরাধিনায়ক মহাবীরের ধাঁচে পুরোপুরি গড়ে উঠল। এই ভক্তরাজের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিলেন তিনি। তাঁরই মত আহার, আচরণ এমন কি গাছের ডালে লাফিয়ে চলা ইত্যাদিও শুরু করলেন। মুখে সর্বদা 'রঘুবীর' নাম লেগে থাকত। এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সাধনার শেষে শ্রীরামচন্দ্রের অনুপমা সহধর্মিণী, হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু নারীগণ কর্তৃক পূজিতা, সতীত্বের মূর্ত প্রতীক সীতাদেবীর দর্শনলাভে তিনি ধন্য হন।

যে স্থানটিকে এখন পঞ্চবটী বলা হয়, সেখানে তিনি একাকী বসেছিলেন সেদিন। হঠাৎ দেখেন, মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে করুণা-মাখা নয়নে একদৃষ্টে তাঁকে দেখতে দেখতে বাগানের উত্তর দিক থেকে একটি স্ত্রীমূর্তি এগিয়ে আসছে। পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন তিনি; গঙ্গা, গাছপালা ইত্যাদি চারিদিকের সব কিছু জিনিস যেমন দেখছিলেন তেমনি সহজভাবে তাঁকেও দেখলেন। আচরণ ও অপরূপ দৃষ্টিতে অসাধারণ কমনীয়তা ফুটে ওঠা ছাড়া দেবীমূর্তির আর কোন চিহ্নই কিন্তু সে মনোরম মানবী-মূর্তিতে ছিল না। অবাক-বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবছেন, ইনি কে? এমন সময় পাশের গাছ থেকে একটি হনুমান আনন্দে চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ে, স্ত্রীমূর্তিটির কাছে ছুটে গিয়ে পরম ভক্তিভরে তাঁর চরণ-বন্দনা করল। চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন বলে উঠল, ইনি নিশ্চয়ই সীতাদেবী! চিন্তামাত্র সারাদেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল, "মা মা" বলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, সীতাদেবী আরো এগিয়ে এসে তাঁর দেহে প্রবেশ করে তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গেলেন। এই রোমাঞ্চকর অন্তর্ধানের পূর্বে সীতাদেবী তাঁকে বলে যান, "আমার হাসিটি তোমায় দিয়ে গেলাম"।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য এদিকে বন্ধু ও হিতা-কাঙ্ক্ষীদের মনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করছিল। একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল একটানা অধ্যাত্মসাধনায় ও ভাবরাজ্যে বিচরণের ফলে

* লেখকের মূল গ্রন্থ Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance হইতে অনূদিত।

তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ঘুম বিন্দুমাত্র হত না, একরকম না খেয়েই থাকতেন তিনি। স্নায়ুমণ্ডলী যেন পুড়ে যাচ্ছিল। সারা শরীর জ্বলে যেতো এবং কখনো কখনো রোমকূপ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হত। ভাগিনেয় হৃদয় প্রাণ ঢেলে সেবা না করলে এ সময় তাঁর শরীর বোধ হয় থাকত না। তাঁর দেহের এই অবস্থা দেখে মথুরবাবু বিচলিত হলেন, স্নেহোদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে দেখে গভীর উদ্বেগবশে মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি অবিবেচকের মত ভেবে বসলেন যে তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্য একবার ভেঙ্গে দিতে পারলে বোধহয় তাতে কিছু ফল হতে পারে। এই ভেবে টাকা দিয়ে নষ্টচরিত্র রমণীদের নিয়ে এসে কৌশলে তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে লাগিলেন। দুবারের চেষ্টা বিফল হল; শ্রীরামকৃষ্ণের মনে দেহবোধের কোন রেখাপাত করা গেল না। রমণীদের দেখামাত্র বিপদের সম্ভাবনা টের পেয়ে একেবারে দেহবুদ্ধি-বিরহিত হয়ে সরল বালকের মত তিনি ছুটে চলে যেতেন তাঁর হৃদয়পদ্মে নিত্যবিরাজিতা মা-কালীর কোলে, নিরাপদ আশ্রয়ে। দেখেশুনে রাসমণি ও মথুরবাবু বিস্ময়ে হতবাক হলেন। কাজটা বুদ্ধিহীনতাপ্রসূত হলেও তরুণ পূজারীর অকপট হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়েই একাজে নেমেছিলেন তাঁরা। এখন তাঁরা এবং তাঁদের এই পরিকল্পনার কর্মনির্বাহকেরা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝলেন যে এভাবে চেষ্টা করতে যাওয়াটাই বড় বোকামি হয়ে গেছে। এজন্য লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হলেন সবাই। এই অগ্নিপরীক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণকে অক্ষত অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে দেখে তাঁর প্রতি রাণী রাসমণির ও মথুরবাবুর বিশ্বাসের আর কোন কূল-কিনারা রইল না; অকপট, দুর্লভ ঈশ্বর-প্রেমিক বলে স্থিরবিশ্বাসে তাঁরা তাঁকে হৃদয়ে পূজার আসনে বসালেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নীরোগ করার সব প্রচেষ্টা এভাবে বিফল হল দেখে এবং স্থানপরিবর্তনে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হতে পারে ভেবে অবশেষে তাঁরা তাঁকে কিছু-দিনের জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় তিনি কামারপুকুরে নিজ গৃহে ফিরে যান। নতুন পরিবেশের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে এখানেও তাঁর বেগবান মন অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হয়ে চলল। নিশাকালে শ্মশানে গিয়ে তিনি কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হতেন। আত্মীয়েরা ভাবলেন, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর শরীরের এই দুর্বল অবস্থা দেখে, এবং বোধ হয় পাগলও হয়েছেন ভেবে তাঁর জননীর আর উদ্বেগের সীমা রইল না। এর প্রতিকারকল্পে জননী তাঁর সাধ্যমত সব কিছুই করলেন। এমনকি ছেলেকে হয়ত ভূতে পেয়েছে ভেবে একজন ভূতের ওঝা-কেও ডাকালেন। যাই হোক, কয়েক মাস গ্রামে বাস করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হলেন, সহজ মানুষের মত চলতে লাগলেন। শ্মশানে গিয়ে রাত্রে ধ্যান করা অবশ্য বন্ধ হল না, তবে তাঁর অস্থির ভাব চলে গেল, কান্না-কাটিও থামল। তাঁর জীবনযাত্রার এই ধারায় আত্মীয়েরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। তেইশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলেকে সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে দেখে তাঁর জননীর কিন্তু বুক ফেটে যেত। তিনি ভাবলেন, বিবাহ দিলে বোধ হয় ছেলের মন ঘুরতে পারে। কি আশ্চর্য, সরল রামকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন

তৎক্ষণাৎ। তাঁর জননী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর কালবিলম্ব করলেন না, স্থানীয় অঞ্চলে যোগ্যা পাত্রীর সন্ধান করতে লেগে গেলেন। কিন্তু মনের মত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁদের বিফলমনোরথ হতে দেখে ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একদিন বললেন যে, জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁর জন্য পাত্রী "কুটো-বাঁধা" হয়ে আছে। এ কথায় খুব বেশী দাম কেউ দিলেন না। তবু একবার খোঁজ করা হল এবং তাঁর কথামত যথাস্থানে রামচন্দ্রের পাঁচ-ছয় বছরের কন্যা সারদামণির সন্ধানও মিলল। সকলে বিস্মিত হলেন। বিবাহে কোন পক্ষের অমত হল না। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি যথাবিধি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তেইশ বছরের যুবকের সঙ্গে পাঁচ বছরের বালিকার এই অদ্ভুত বিবাহের কথা শুনে আধুনিকেরা বোধ হয় চমকে উঠবেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে এ বিবাহ দুটি আত্মাকে একসূত্রে বেঁধে দেবার ধর্মসম্মত বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে বাল্য-বিবাহে যৌবনোদ্ভেদের পূর্ব পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ থাকে। কাজেই এ বিবাহ পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত বিবাহে বাগ্‌দানের চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন ওঠেই না। তাঁর বিবাহ সবদিক থেকেই দুটি আত্মার আধ্যাত্মিক মিলন মাত্র; আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে সম্পর্কের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক মিলনের ভাবই প্রকট ছিল; দৈহিক সম্পর্কের কোন চিন্তাই এই অতিমানব-দম্পতির দিব্যপ্রেমে আবিলতা মেশাবার সুযোগ কথনো পায় নাই।

বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় দেড় বছর কামারপুকুরে ছিলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আবার মা-কালীর পূজার ভার গ্রহণ করেন।

মা কালী তাঁর জন্য যেন অপেক্ষা করেই ছিলেন—ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত তাঁর ঘাড়ে এসে পড়লেন। আবার তাঁর আধ্যাত্মিক উন্মাদনা দেখা দিল। ক্ষুধিত আত্মার আকুল অন্বেষণ চতুর্গুণ উদ্যমে আবার শুরু হল। মায়ের জন্য করুণ ক্রন্দনে গগন ভরে উঠল আবার, ভাবের আতিশয্যে তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীও বিপর্যস্ত হতে লাগল। অবশ্য ধ্যানকালে বহুবিধ অদ্ভুত উপলব্ধি হওয়ায় স্নিগ্ধতা ও সান্ত্বনায় তাঁর মন ভরে যেত। এই সময় তাঁর দেহবোধ প্রায় থাকত না। মাসের পর মাস শরীরের কোন যত্নই নেন নি তিনি। মাথার চুল বড় হয়ে জট-পাকিয়ে গিয়েছিল। জড়বৎ নিশ্চল হয়ে যখন তিনি ধ্যানে বসতেন, তখন তাঁর দেহকে জড় পদার্থ ভেবে পাখীরা এসে মাথার ওপর বসত, খাদ্যের সন্ধানে ঠোঁট দিয়ে জটা ঠোকরাতো। ধ্যানকালে তিনি কখনো কখনো দেখতেন, তাঁরই অনুরূপ একজন যুবক সন্ন্যাসী তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসে কত কি উপদেশ দিয়ে আবার তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। একবার দেখেন, এক অতি ভীষণ কৃষ্ণকায় পুরুষ তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলেন, এ পাপপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সন্ন্যাসীটিও বেরিয়ে এসে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং ত্রিশূলের আঘাতে তাকে হত্যা করে আবার তাঁর শরীরে এসে প্রবেশ করলেন।

নিজ সরল বিশ্বাসের সন্ধানী আলো ফেলে মনের ভেতর তিনি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াতেন এবং মায়ের ও তাঁর মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করার মত যা কিছু দেখতে পেতেন সেখানে, সবল হস্তে তা সরিয়ে ফেলতেন তৎক্ষণাৎ। এ কাজটির পদ্ধতিও ছিল অভিনব। মন থেকে কাঞ্চনাসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করার জন্য তিনি অদ্ভুত একটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। এক

হাতে কয়েকটি টাকা ও অপর হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে তিনি বিচার করতেন যে, মাটির চেয়ে টাকার শ্রেষ্ঠতা কিছু নাই—'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের পথে সহায়তা করা তো দূরের কথা, টাকা মানুষের মনে অহঙ্কার ও ভোগবাসনা বাড়িয়ে দেয়, কাজেই একমুঠো মাটির মতই তা তুচ্ছ। এই ভাবতে ভাবতে তিনি টাকা ও মাটি একসঙ্গে মিশিয়ে দুই-ই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করতেন। যতক্ষণ না মনে হত কাঞ্চনত্যাগ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বারে বারে এরূপ করে চলতেন তিনি। জাতি-অভিমান এবং 'আমি অপরের চেয়ে বড়' এরূপ ভাবের উদ্দীপক সর্ববিধ অভিমান মন থেকে উৎখাত করার জন্য কিছুদিন তিনি মেথরদের পায়খানা স্বহস্তে পরিষ্কার করেছিলেন, নিজের চুল দিয়ে সেখানকার মেজে মুছে দিতেন। মনের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্ত্রীলোকদের এবং অশুচি বিষয়ী লোকদের সঙ্গ তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন।

তাঁর ইচ্ছাশক্তি এত দুর্দমনীয় ছিল যে, মন থেকে এভাবে একবার যা ত্যাগ করতেন, তাঁর স্নায়ু ও মাংসপেশী পর্যন্ত সে জিনিস আর সহ্য করতে পারত না কখনো—অতি তিক্ত, অতি বেদনাদায়ক বলে বোধ হত তার সংস্পর্শ। এই জন্যই পরবর্তী জীবনে স্ত্রীলোকদের সামান্য স্পর্শেও তাঁর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হত, অপবিত্র লোকের সংস্পর্শ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীকে বিপর্যস্ত করে তুলত এবং টাকা ছুঁলেই হাত যন্ত্রণায় বেঁকে যেত। উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মনের সুরের সঙ্গে তাঁর দেহের সুরও একই পর্দায় বাঁধা ছিল; তাঁর ত্যাগের কঠোর সঙ্কল্পের বিপরীত পথে শরীর যখনই পা বাড়াত, তখনই শাস্তি পেতে হত তাকে।

এ সময়কার কঠোরতার ফলে তাঁর শরীরের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। শরীর যে কীভাবে ভেঙ্গে আসছিল, তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন: "আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীরে ওরূপ হওয়া তো দূরে থাকুক, ওর এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ মা-র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পেয়ে ভুলে থাকতাম তাই রক্ষে, নইলে (নিজ শরীর দেখিয়ে) এই খোলটা থাকা অসম্ভব হত। তখন হতে আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হয়ে গিয়েছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করেও পলক ফেলতে পারতাম না। কতকাল গত হল, তার জ্ঞান থাকত না এবং শরীর বাঁচিয়ে চলতে হবে—একথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়ত তখন সেটার অবস্থা দেখে বিষম ভয় হত, ভাবতাম, পাগল হতে বসেছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখতাম, চোখের পলক তাতেও পড়ে কি না। তাতেও চোখ সমভাবে পলকশূন্য হয়ে থাকত। ভয়ে কেঁদে ফেলতাম এবং মাকে বলতাম—'তোকে ডাকার ও তোর ওপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলতাম, 'তা যা হবার হোক গে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস নি··· আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' এভাবে কাঁদতে কাঁদতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলে মনে হত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনে আশ্বস্ত হতাম।" এই বর্ণনা থেকেই তাঁর সে-সময়কার

শরীর ও মনের অবস্থা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। সত্যই তাঁর শরীরে আর কিছু ছিল না। সারা গা জ্বালা করা, রোমকূপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হওয়া এবং শরীরে কম্পন জাগা—সবই আবার বিপুলতর বেগ নিয়ে দেখা দিল। জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। শুভানুধ্যায়ীরা প্রমাদ গণলেন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আগের মত এবারেও তাতে ফল কিছু হল না।

কর্ণধারহীন অবস্থায় বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে একাকী পাড়ি লাগিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তিময় পরমানন্দ-ধাম খুঁজে বের করেছিলেন। লক্ষ্য-স্থলেই যে পৌঁছেছেন, সে কথা বুঝতেও বিলম্ব হয় নি তাঁর। বারে বারে পাড়ি দিয়ে তিনি এই পরমানন্দধামের ভূমি স্পর্শও করেছিলেন বহুবার। কিন্তু এই উদ্দাম অভিযানের মূল্যরূপে শারীরিক সুস্থতা বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের শ্রমে তাঁর শরীর এতখানি ভেঙ্গে পড়েছিল যে ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের কোন আশা আর ছিল না। প্রচলিত চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া গেল না। চিকিৎসকেরা রোগনির্ণয়ই করতে পারলেন না। এ রোগও বোধ হয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাইরের। সাধারণ লোক বাহ্য লক্ষণ দেখে ভুল বুঝল; ভেবে বসল, তিনি পাগল হয়ে গেছেন, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা এর প্রতিকার-কল্পে যথাসাধ্য মাথা ঘামালেন। পূর্বেই আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কখনো কখনো নিজের মানসিক সুস্থতায় সন্দিহান হয়ে উঠতেন এবং শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন। কি যে হয়েছে, কি করলেই বা তা সারবে, সে বিষয়ে আলোকসম্পাত করে আসন্ন বিপদ থেকে তাঁর শরীরটাকে রক্ষা করতে পারে, এমন কোন লোকই কাছে-ভিতে ছিলেন না।

তীব্র তপস্যা ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার ফলেই তাঁর এই যন্ত্রণার উদ্ভব, সেজন্য কোন ধর্মতত্ত্বপারঙ্গম ব্যক্তির পক্ষেই শুধু এসব লক্ষণ চিনে ও তার যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলা সম্ভবপর ছিল। কোন যোগ্য ধর্মগুরু যদি সেখানে থাকতেন, তাহলে একমাত্র তিনিই তাঁকে এ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন। যথাযোগ্য শিক্ষা দিয়ে, বলিষ্ঠ মুষ্টিতে হাত ধরে যোগশাস্ত্র-নির্দিষ্ট নির্ভুল পথে ভাবরাজ্যে তাঁর বেগবান মনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, এমন একজন গুরুর সান্নিধ্য বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাঁর। এর জন্য বেশীদিন আর অপেক্ষা করতে হল না; এরূপ একজন পথ-প্রদর্শক নিজেই এসে হাজির হলেন। সস্নেহে হাত ধরে তিনি সরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে সাধনসমুদ্রের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অকূল থেকে আর এ সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে অন্যদিকে যে পথ ধরে চলে পূর্বগ সাধকগণ শান্তিধামে পৌঁছেছেন, সেই সুপরিচিত পথ দিয়ে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে চললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। সে অঞ্চলে সাগর অপেক্ষাকৃত শান্ত, ঝড়ঝঞ্ঝার ভয় সে পথে অনেক কম। এই গুরুর আগমনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ব্যাখ্যাকার:— শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক:— ঐ। ১৪১৩সি, বলরাম বসু ঘাট রোড। কলিকাতা ২৫ (ভবানীপুর)। মূল্য ৫৲ টাকা। ১।৶+৬২১+১১ পৃষ্ঠা।

সুলেখক শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষার ধর্মসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী', 'সরল পঞ্চদশী' ইত্যাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পাঠকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। লেখক অদ্বৈত বেদান্তের যথার্থ মর্মজ্ঞ সাধক। উত্তম বিদ্বাগুরুমুখে তিনি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তরহস্য সম্যক্ অবগত, আলোচ্য তাঁহার এই গীতাব্যাখ্যাটিও এই বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। গভীর বিষয়ও অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় ব্যাখ্যাটি অতি অপূর্ব হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার 'পঞ্চদশী' আদি বহু আকর গ্রন্থ হইতে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়াসমূহ সুকৌশলে ব্যাখ্যান মধ্যে সুনিবিষ্ট করিয়া ইহাকে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। বেদান্তসিদ্ধান্ত-রত্নরাজির ইহা একটি মনোহর মালিকা বিশেষ। বহু প্রকরণগ্রন্থ ইহাতে গতার্থ হইয়া যায়। গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া খুব আনন্দ হইল। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই। অনাবশ্যক জটিলতা কোথাও দেখিলাম না, অথচ সব কথাই সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জটিল বিষয়ও সরল করিয়া বর্ণন করিতে সুপটু। ইহা তাঁহার সুদীর্ঘকালীন বেদান্ত-মননের পরিচয়। এই বইখানা পড়িবার পূর্বে পাঠককে 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' ও 'সরল পঞ্চদশী' এই দুইখানি বই পড়িয়া লইতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে এই গীতাব্যাখ্যার মাধুর্য পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ হইবে। সাধক-পাঠক পুস্তকের বহু স্থানে সূক্ষ্ম সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইবেন।

গীতা গৃহস্থ, সন্ন্যাসী সকলেরই উপযোগী গ্রন্থ। ইহার মূল কথা 'ত্যাগ'। সংসারে থাকিয়াও কি করিয়া ইহা করা যায় তাহাও গ্রন্থকার দেখাইবার ত্রুটি করেন নাই। বেদান্ত-বিচার গৃহস্থেরও কল্যাণপ্রদ। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান। ইহাতেও সংক্ষেপে বেদান্তের সাধন-ক্রম ও সিদ্ধান্তসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার আচার্য শংকরকৃত ভাষ্যের অনুবর্তন করিয়াছেন ও মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দ গিরি, শংকরানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের মতও মধ্যে মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্যাখ্যাটিকে যথেষ্ট ভাবসমৃদ্ধ করিয়াছেন।

প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদধ্যায়ের প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ, গ্রন্থশেষে প্রতি অধ্যায়ের বিষয়সূচী ও অধ্যায়-দীপিকা অর্থাৎ অধ্যায়োক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা,—সমগ্র ব্যাখ্যাটিকে ধারাবাহিক ও সুসম্বদ্ধরূপে উপস্থিত করিয়া বড়ই সুখবোধ্য করিয়াছে। অধ্যায়-দীপিকাগুলিও পর পর পড়িয়া গেলে গীতাশাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়ে সুন্দর ধারণা হয়। এটিও ব্যাখ্যাকারের একটি সুন্দর ব্যাখ্যানকৌশল। গ্রন্থপাঠের পূর্বে এই অধ্যায়দীপিকাগুলি পড়িয়া লওয়া ভাল।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রমাদ বিশেষ নজরে পড়িল না।

গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, মননকুশলতা, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি এবং গভীর বেদান্তজ্ঞানের পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্র সুপরিস্ফুট। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থটি বাংলা গীতা-সাহিত্যে গ্রন্থকারের একটি বিশেষ মূল্যবান ও

আদরণীয় অবদান। বাংলা বেদান্ত-সাহিত্যে ইহা উচ্চস্থান দাবী করিবার যোগ্যতা রাখে।

আলোচ্য গ্রন্থের কতকগুলি ব্যাখ্যাস্থল কিছু বিচারণীয় বলিয়া মনে হইল। অবশ্য বেদান্তের আচার্যগণেরও কোন কোন প্রক্রিয়া-বিশেষে অল্পবিস্তর মতভেদ আছে। আর সে সব বিচারেরও অবসর ইহা নহে।

—স্বামী ধীরেশানন্দ।

আত্মানুসন্ধান। শ্রীঅনন্তকুমার দাস। শ্রীমতী কিরণময়ী দাস কর্তৃক ৯০নং শ্রীপল্লী, দেশপ্রিয় নগর, পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৪, মূল্য ১·৫০।

ভারতবর্ষে মাতৃরূপে ঈশ্বরসাধনার পরম্পরা একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, সেটি হল—ঘরে বাইরে ঈশ্বরকে একটি অভিন্ন স্নেহসূত্রে বাঁধা। গৃহে যিনি জননী তিনিই আবার সমগ্র বিশ্বে শক্তিসঞ্চারিণী, অনন্ত বিশ্বের বিধাত্রী যিনি, তিনিই আবার জননীরূপে সান্ত সংসারে আমার নিতান্ত আপনার। ঘরে মাকে যেমন সহজে প্রাণখুলে আমরা ডাকি তেমনি সহজভাবে বিশ্বজননীর স্নেহসান্নিধ্য লাভের জন্য মানুষের ব্যাকুলতা থাকা স্বাভাবিক। 'মা'-ডাকে পুত্রের যেমন আকুলতা, 'মা'র নিজেরও তেমনি আনন্দ। মাতৃরূপে সাধনার আকর্ষণ এই কারণেই বেশী।

'আত্মানুসন্ধান'-এর ভক্তিমান লেখক এই সহজ পথেই 'আত্মা'কে অনুসন্ধান করিয়াছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সেতুটিকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লেখক নন, সাহিত্যরচনা কিংবা ভক্তিমার্গের চর্চা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়: বইটি পাঠ করিতে করিতে মনে হইবে একটি সহজ সরল মানুষ যেন আপন মনে মাতৃনাম কীর্তন করিতেছেন,—এতটুকু তাত্ত্বিক বা তার্কিক কুয়াশা তার মধ্যে নাই।

প্রেম বা ভালবাসা যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিরসনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। মানবজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূরীকরণে এইটিই একমাত্র পথ। আর ভগবানের নাম করিতে করিতেই ভক্তি আসে, সর্বজীবে ভগবানের উপলব্ধি আসে, প্রেমে মনপ্রাণ আপ্লুত হইয়া যায়। ভগবান আমার অন্তরেই আছেন। অন্তরকে জানিলে এবং অন্তরের নির্দেশে সংসারে বিচরণ করিলে পথের অনেক কণ্টক আপনিই দূরে সরিয়া যায়। অমৃতময়ী মা নিজেই তো দিবারাত্রি উতলা—কী করিয়া সন্তানকে সুখী করিবেন, তা'র চলার পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। কাজেই, সংসারী প্রাণ খুলিয়া 'মা'কে ডাকিলে এক অপারশক্তি তাকে উজ্জীবিত করে এবং সংসারে থাকিয়াও তিনি হন সন্ন্যাসী-তুল্য, যাকে এক অনুপম ভাষায় পাঁকাল মাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু পাঁক তাব গায়ে লাগে না। আবার বলিয়াছেন, হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল খাইলে আঠা লাগে না। সেইরূপ ভক্তি-প্রেমে সংসারীর মনও এতখানি উঁচুতে উঠিয়া যায় যে সংসারজীবনের ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা তাঁকে ক্ষুদ্র ও মলিন করিতে পারে না।

এই আদত কথাটিকেই 'আত্মানুসন্ধান'-এর লেখক নিজ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রধানতঃ গদ্যগ্রন্থ হইলেও কতকগুলি কবিতা এবং গানও বইটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুর-সংযুক্ত হইলে এই গানগুলিও সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। বইটি অধ্যয়ন করিলে সংসারী মানুষ নির্মল আনন্দ অনুভব করিবেন, বইটির ব্যাপক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

—মনকুমার সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১০ই ফাল্গুন (২২.২.৬৬) মঙ্গলবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অপরাহ্নে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বন্দনানন্দ ইংরেজীতে ও স্বামী চিদাত্মানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ২২ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২০ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ২৭শে ফেব্রুআরি সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। সারাদিনে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী "সংস্কৃত সেমিনার"

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ঐ উৎসবে দুইদিনব্যাপী 'সংস্কৃত সেমিনার'-এর আশাতীত সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত বৎসরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে অদ্বৈতাশ্রম-আয়োজিত অনুরূপ একটি 'সংস্কৃত সেমিনার' বারাণসী ক্ষেত্রের বিদ্বন্মণ্ডলীর, বিশেষতঃ সংস্কৃত-ভাষানুরাগীদের বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল।

১৩ই জানুআরি তিথিপূজার দিন, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজাহোমাদি, বেদপাঠ, কঠোপনিষৎ পাঠ, স্বামীজীর জীবনী পাঠ ও আলোচনা, সর্বসাধারণে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ, ভজনাদি ও রাত্রে ৺কালীপূজা হয়।

১৫ই ও ১৬ই জানুআরি স্বামীজীর মহাজীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কাশীর বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। বিষয়বস্তু ছিল 'বেদান্তধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্যবিবেকানন্দঃ'। সর্বসমেত ২৫টি রচনা আসিয়াছিল, বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল ২২জন ছাত্রছাত্রী। রচনা ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতে শাস্ত্রী বা আচার্য উপাধিকারী।

বারাণসীর মহারাজা মহামান্য শ্রীমান বিভূতিনারায়ণ সিং বাহাদুর শনিবার ১৫ই জানুআরি অপরাহ্নে উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ২৫ জন রচনাপ্রতিযোগীর প্রত্যেককে পুরস্কার প্রদান করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৯ জন ছাত্রী ছিল। ঐ দিন সভায় পৌরোহিত্য করেন বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি পণ্ডিত শ্রীসূর্যনারায়ণ মণি ত্রিপাঠি মহোদয়।

সভার স্বাগত-ভাষণে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ বলেন, স্বামীজী সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঐ ভাষার বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এই ভাষার মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐক্য ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সন্নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তের বাণী মানবাত্মার অমরত্ব ও ঐক্যের বাণী এবং ইহাতেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ নিহিত।

উপকুলপতি পণ্ডিত ত্রিপাঠী তাঁহার অভিভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শন এবং প্রাত্যহিক জীবনে তাহার প্রয়োগ ভারতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে আশার এক অনির্বাণ আলো আনয়ন করিয়াছে। তিনি ছিলেন, বিশ্বের গণজাগরণের ঋত্বিক। তাঁহার জীবন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলনসেতুস্বরূপ। পাশ্চাত্য ভৌতিক বিজ্ঞান এবং ভারতীয় বেদান্তদর্শনের সম্মিলনই হইবে ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার শাশ্বত আদর্শ।

১৬ই জানুআরি রবিবার অপরাহ্ণ ৪টায় সভার কার্য আরম্ভ হয়। ঐ দিন সভায় পৌরোহিত্য করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি জাষ্টিস্ এন, এইচ, ভগবতী। সংস্কৃত বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা শেষ হইলে উভয় দিনের ফলাফল জানাইয়া তিনি ২২ জন প্রতিযোগীকেই বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তক পারিতোষিকরূপে বিতরণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৩ জন ছাত্রী এবং ২ জন অন্ধ ছাত্র ছিল।

উভয় দিন সভায় বিভিন্ন পণ্ডিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপকগণের কণ্ঠে বেদান্তের উপর স্বামীজীর নব আলোকপাত ভারতের গণজাগরণ এবং বিশ্বে সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের পথ সুগম করিয়াছে—এই কথা সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় —ডিরেক্টর বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, মীমাংসারত্নম্ অধ্যাপক পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, অধ্যাপক ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বি, এইচ, ইউ), পণ্ডিত ভি, এস, রামচন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় (বি, এইচ, ইউ) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির ভাষণে জাষ্টিস্ ভগবতী বলেন, বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী আর্ত, পীড়িত, অশিক্ষিত অবহেলিত ও অস্পৃশ্যদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ জ্ঞানে সেবাধর্মের প্রবর্তন করেন। ইহাই ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তাঁহার প্রদর্শিত পথে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতে ও সমগ্র বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বমানবতা ও মানবাত্মার মহিমা প্রচার করিতেছেন। বেদান্তের এই নবরূপায়ণ মানুষকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম করিয়াছে।

দুই দিনই সভান্তে পণ্ডিত প্রফেসার টি, এস, ভাণ্ডারকার মহোদয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রবিবার ১৬ই জানুআরি মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণ-সেবাও এই উৎসবের অন্যতম কার্যসূচী ছিল। প্রায় আড়াই হাজার দরিদ্রনারায়ণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দুই দিনই সভামণ্ডপ শিক্ষিত ও অনুরাগী শ্রোতৃমণ্ডলী-পূর্ণ ছিল। সভার সমস্ত কার্যই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম (Students' Home)-এর ৪৩তম (১৯৬৪-৬৫) বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন গুরুকুল প্রথায় পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী কলেজ ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে রাখিয়া উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আহার-বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি—ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। পড়াশুনার সঙ্গে তরুণ বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন সদ্‌গুণগুলি বিকাশের জন্য বিদ্যার্থী আশ্রমের নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আংশিক খরচ বা পূর্ণ খরচ বহনকারী নৈতিক শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্রও রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষশেষে সর্বমোট ৯৫ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে ছিল ৬৪ জন, ১৪ জন আংশিক ও ১৭ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

পরীক্ষার ফল সকল বিভাগেই বিশেষ সন্তোষজনক। প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষায় ২৬ জন, ডিগ্রী ফাইন্যাল পরীক্ষায় অনার্স কোর্সে ১০ জন ও পাসকোর্সে ২ জন, এবং এম.এ. পরীক্ষায় ১ জন পরীক্ষা দিয়াছিল। সকলেই পাস করিয়াছে। অনার্স পাইয়াছে ৯ জন—২ জন ফার্ষ্ট ক্লাস ও ৭ জন সেকেণ্ড ক্লাস।

অধিকাংশ ছাত্রের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আশ্রমকে বহন করিতে হয় বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে সহৃদয় জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। খুবই আনন্দের বিষয়, বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রেরাও তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, বর্তমান বৎসরে মোট চাঁদার শতকরা ৩৮ ভাগ প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট হইতে আসিয়াছে।

নিকটবর্তী অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের জন্য আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। সমাজ-সেবার কিছু না কিছু কাজ তাহাদের নিত্য-কর্মের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় আর একটি কাজ বিদ্যার্থীরা করে; সেটি হইতেছে কৃষির উদ্যোগ। প্রায় ৩৫ বিঘার মত জমিতে চাষবাস হইতেছে, ইহাতে তাহাদের শ্রমদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ৩ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স-এ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্তমান বৎসরে ইহার ছাত্রসংখ্যা ৭২০।

বিদ্যার্থী আশ্রমের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবেকানন্দ জয়ন্তী-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় নির্মিত এই দ্বিতল ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই ভবনের একতলায় আছে একটি প্রশস্ত সভাকক্ষ এবং দ্বিতলে লাইব্রেরী ও ফ্রী রীডিং রুমের ব্যবস্থা। লাইব্রেরী ও ফ্রী রীডিং রুমের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পুস্তকাদি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আশা করেন শীঘ্রই তাঁহারা এই বিভাগের কর্মোদ্যোগকে সফল করিয়া তুলিবেন।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠাকালে শয্যাসংখ্যা (bed) ছিল ৩২, বর্তমানে এখানে ২৪০টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কুটির (cottage)। কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে ৩২জন রোগীকে বিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়। সরকারের ও দানশীল জনগণের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়

বর্তমানে যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসায় সর্ববিধ আধুনিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরোগ্য লাভের পর যক্ষ্মা-রোগীদের পুনর্বাসনেরও কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৩৩; তন্মধ্যে ৩১৭ জন রোগী বৎসরের মধ্যে ভর্তি হয় এবং ২১৬ জন পূর্ব বৎসরের। বৎসর-মধ্যে ৩২১ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বৎসরের শেষে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ২১২। ১০৫ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হয়।

কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য একটি জরুরী বিভাগ আছে, সেখানে ৩৫ জনের অন্যান্য চিকিৎসা করা হয়। বাহিরের রোগী বিভাগে ৩৮৮ জন যক্ষ্মা-রোগী ও ৯৩৬ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ ও সাহায্য দেওয়া হয়।

মোট ৮৯ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়, ইহাদের মধ্যে ১০ জন তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯ জন রোগীকে কম খরচে চিকিৎসা করা হয়।

৪০ জন রোগী আরোগ্যলাভের পরে স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পায়। ইহাদের সকলকেই নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম দ্বারা জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হয়।

অবৈতনিক হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ৪,৭৪২ এবং পুরাতন ৬,৯৫২ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মিশন-কেন্দ্র খোলা হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। জানুআরি, ১৯৬০ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ষগুলির কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠবিভাগে নিত্য পূজা, উপাসনা, নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সাময়িক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব প্রতি বৎসর সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ওড়িয়া ভাষায় দশ খণ্ডে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রকাশন ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অবৈতনিক বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ৫,৩০০ পুস্তক রাখা হইয়াছে, পাঠাগারে ৮টি দৈনিক এবং ৪৩টি পত্রিকা লওয়া হয়।

মিশন-শাখা কর্তৃক একটি উচ্চপ্রাথমিক এবং একটি অবৈতনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬২ জন বালক ও ৮৭ জন বালিকা অধ্যয়ন করে। একটি এম. ই. স্কুল খোলা হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসালয়ে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৭,৮৬২।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। এই কেন্দ্রের ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত কর্তৃক ধ্যান ভজন পাঠ ও জনসেবার উদ্দেশ্যে সোসাইটি গঠিত হয়। কয়েক বৎসর নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিবার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমানে রেঙ্গুনের বোটাটঙ প্যাগোডা রোডে (230, Botataung Pagoda Road) সোসাইটির নিজস্ব ভবনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক কর্মধারা অনুসৃত হয়।

সোসাইটি-পরিচালিত বিরাট গ্রন্থাগারে ৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৪৪,৭৪১ খানি গ্রন্থ আছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ৩০,৫৩৭ খানি পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু ও উর্দু ভাষায় পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। ১৬টি দৈনিক এবং ৯৮টি সাময়িক পত্রিকা আলোচ্য বর্ষে নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছে। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৪০০।

৫৮টি সাধারণ সভা, এবং গীতা, উপনিষৎ ও মহাপুরুষবাণী অবলম্বনে ২৭১টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয় এবং শহরের নানাস্থানে ও বাহিরে বক্তৃতাদি দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিন যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। বর্মী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মরণিকা (Memorial volume) প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র—অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে :

অক্টোবর, ১৯৬৫ : একাগ্রতার অভ্যাস, ঈশ্বরের মাতৃভাব, অন্তর্জগতের সংযম, আমাদের মুক্তিদাতা কে? যোগের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ।

নভেম্বর, '৬৫ : শরণাগতি অভ্যাস; ব্রহ্ম ও ব্যক্তি-ঈশ্বর, অশান্ত মনকে কিভাবে শান্ত করা যায়; বাহিরে কর্মচাঞ্চল্য ও অন্তরে প্রশান্তি।

ডিসেম্বর, '৬৫ : 'তত্ত্বমসি', ভগবৎপ্রেম কিরূপে লাভ করা যায়, শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ (শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে), খৃষ্ট ও বর্তমান সময়, হিন্দুধর্মের মর্মবাণী।

এতদ্ব্যতীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', গীতা এবং উপনিষৎ অবলম্বনে কয়েকটি ক্লাসও নিয়মিতভাবে করা হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ, ১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমে নিয়মিত পূজা উপাসনাদি, সাময়িক উৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়টি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পুনরায় খোলা হয়, মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,৯১৫ : গ্রন্থাগারে ৬৫৮ খানি পুস্তক আছে। পাঠাগারের জন্য ১৫টি পত্র পত্রিকা লওয়া হইতেছে। নরেন্দ্রপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় দরিদ্রদিগকে দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্বামীজীর জন্মোৎসব

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদের (কলিকাতা-৬) উদ্যোগে গত ২১শে ও ২২শে জানুআরি মহাবোধি সোসাইটি হলে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৪তম জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী।

সভাপতি মহারাজ জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং পরিষদ কর্তৃক বাংলার মনীষিগণের উপদেশ ও জীবনাদর্শ প্রচারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। সভায় শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, শ্রীহরিপদ ভারতী ও ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য স্বামীজীর বহুমুখী অবদানের বিষয় আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিবসে অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের এক ঘটনার বর্ণনা দেন।

আরিট (মেদিনীপুর): গত ২৬শে জানুআরি বুধবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাসপুর থানার আরিট গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। তদুপলক্ষে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ প্রভাতফেরী, বেলা ৩টায় স্বামী অন্নদানন্দ মহারাজ কর্তৃক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, বিকাল ৪॥টায় জনসভা ও রাত্রিতে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ হয়।

জনসংখ্যার তথ্য

রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষায় প্রকাশ, বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতিমিনিটে ১২৫ জন, প্রতি দিন ১,৮০,০০০ জন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বে প্রতিদিন লোকসংখ্যা ৪০ হাজার করিয়া বাড়িত। আগামী ৩৫ বৎসরে বিশ্বের লোকসংখ্যা ৭০০ কোটিতে দাঁড়াইতে পারে।

ঐ সমীক্ষা অনুসারে সারা বিশ্বের জমি ও লোকসংখ্যার তুলনায় ভারতের জমির পরিমাণ ২ শতাংশ, লোকসংখ্যা ১৫ শতাংশ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ৩০ বৎসর পরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঐ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ। ভারতে জনসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে। প্রতি বৎসর ভারতে জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, তাহা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান। ভারতে বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যাও তাহাই। এই শতাব্দীর শেষে ভারতের জনসংখ্যা ৯০ কোটিতে দাঁড়াইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।

শোকসংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত গত ৭ই জানুআরি (১৯৬৬ খৃঃ) রাঁচিতে সকাল ৮টা ৩৫ মিঃ সময়ে ৮৭ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি শিলং হইতে নবগঠিত বিহারের একাউন্টেন্ট-জেনারেলের রাঁচি অফিসে স্থানান্তরিত হন। ১৯১৩ হইতে এতাবৎকাল প্রধানতঃ তিনিই রাঁচিতে ভক্তগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাদি ও অন্যান্য উৎসবের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত বহু পালা-কীর্তন রাঁচিতে বন্ধুগণ-সমভিব্যাহারে গীত হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় রাঁচিতে শ্রীশ্রীগৌরী মা, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির শুভাগমন মুখ্যতঃ ইন্দুবাবুর উদ্যোগেই হইয়াছিল। অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন তিনি। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ।। শান্তিঃ।।।

দিব্য বাণী

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরাতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ১

—দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্—শঙ্করাচার্য

স্বপ্নের গড়া জগৎ যেমন মনেরই সৃষ্টি, তবু
দেখার সময় মনে হয় যেন বাহিরে তা রহিয়াছে,
(জাগরণে দেখা বিশ্বও তাই, আসলে থাকে তা মনে
মায়ার প্রভাবে মনে হয় যেন বাহিরেই সব আছে।
জ্ঞান-উল্লাসে সদাই যেজন মায়ার প্রভাবাতীত—
জাগ্রতে দেখা বিশ্বও যাঁর কাছে স্বপ্নের মত,)
দেখেন যেজন আপনারি মাঝে মায়া-গড়া বিশ্বেরে—
দর্পণমাঝে প্রতিবিম্বিত মহানগরার সম,
সমাধিতে (যাঁর সেটুকু দেখাও শূন্য-বিলীন হয়)
দেখেন নিজেরে স্বরূপ কেবল অদ্বয়, অনুপম—
প্রণাম জানাই নত হয়ে সেই শ্রীগুরুরূপধারীরে,
(করুণাসাগর, মোহনাশী) সেই দক্ষিণামূর্তিরে।

নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৪

সকল বিদ্যার খনি, ভবরোগ-বৈদ্য যিনি, তাঁরে
প্রণতি জানাই সর্ব-লোক-গুরু দক্ষিণামূর্তিরে।

কথাপ্রসঙ্গে

সনাতন ধর্ম, ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর

ভারতের ধর্ম সনাতন ধর্ম। হাজার হাজার বছর পূর্বে সত্যদ্রষ্টাগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত বেদই এই ধর্মের ভিত্তি। সত্যদ্রষ্টাদের উপলব্ধিতে যে জ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই বেদ, জগৎ ও জীবন যে সত্যগুলি দ্বারা চালিত হয়, তাহাই বেদ।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঋষি জগৎ ও বিশ্বের মূলে যে চরম সত্য রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আকুল আগ্রহ লইয়া ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাহা জানিয়াছিলেনও। যে কোন দিক হইতেই হউক না কেন, এই সত্যকে জানিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ যখন মনে জাগে, তাহার গভীরতা যে কতখানি, তাহা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। এই সত্যলাভে কি লাভ-লোকসান হইবে, এ প্রশ্নও সেখানে উঠে না। ভগবান বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সত্য-দ্রষ্টাদের জীবনে সত্যলাভের জন্য যে আকুল আগ্রহ দেখা যায়, সত্যলাভের জন্য সব কিছু, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিবার যে সুদৃঢ় সঙ্কল্প দেখা যায়, তাহার পরিমাপ করা সাধারণ মনের পক্ষে সত্যই অসম্ভব।

সত্যলাভের জন্য এই সর্বস্ব ত্যাগের পথ, নিবৃত্তি-মার্গ, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যই। সাধারণকে চরম সত্যলাভের পথে চালিত করিতে হইলে অন্য পথে তাহা করা ছাড়া সফলকাম হইবার কোন আশা নাই। সত্য-লাভের জন্য সর্বস্বত্যাগ করার সঙ্কল্প ও শক্তি সর্বসাধারণের মধ্যে থাকে না। কিছুটা ভোগ না করিলে মন সেখানে উচ্চতর মার্গে উঠিতেই চায় না, ত্যাগের শক্তিও সেখানে অল্পস্বল্প সংযমাভ্যাসের মাধ্যমে ধাপে ধাপে আসে। চরম সত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সংযত ভোগের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার পথ, ক্রমমুক্তির পথ, প্রবৃত্তিমার্গই সেখানে প্রশস্ত। সেখানে এই কথা বলিয়াই তাহাদের সত্যলাভের পথে নামাইতে হইবে যে তুমি যাহা চাহিতেছ, আমাদের কথামত চলিলে তাহা আরো অধিক পরিমাণে পাইবে। তাছাড়া, নিয়মিত ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তামসিকতা কাটিয়া যায়, যাহা সত্যলাভের পথে চলিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন। আর, কোন নিয়মপালন—তাহা যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন—মনকে গুছাইয়া আনে, ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া দেয়। ইহাও সত্যলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কাম্যবস্তুলাভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া চলিলেও এ পথ মানুষকে অন্ততঃ জাগ্রত ও শক্তিদৃপ্ত করিয়া তোলে।

বেদের মধ্যে সত্যদ্রষ্টারা তাই দুটি পথেরই সন্ধান দিয়াছেন—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। একটি পথ বিশ্বের মূল সত্যের, বিশুদ্ধ জ্ঞানের; অপরটি হইল বিশ্ব ও জীবন পরিচালক নিয়ম-গুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারাবদ্ধভাবে জীবন পরিচালিত করিয়া ইহজীবনে ও পরজীবনে অধিকতর ও উন্নততর আনন্দ লাভের—যাহা সকল মানুষই খুঁজিয়া বেড়ায় এলোমেলো ভাবে। তবে সেখানেও মূল সত্যকে চোখের সামনে রাখিয়া চলিতে হয়, যাহাতে এক-দিকে ভগবচ্চিন্তাজনিত আনন্দের আস্বাদ-লাভে চরম সত্যের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বাড়ে এবং ভোগের অনিত্যতা ও অসারতার প্রতি

জাগ্রত মনের দৃষ্টি ক্রমনিবদ্ধ হওয়ায় উহার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। জীবনের প্রতিটি কর্মে ভগবানকে স্মরণ করিয়া চলিতে চলিতে মনে তিনি ক্রমশঃ গভীরতর ভাবে বসিয়া যান। বেদে তাই জ্ঞান ও কর্মের সংযোগসেতু রূপেই যেন উপাসনার কথাও রহিয়াছে।

যে কোন বস্তু ও ঘটনা যে সত্য বা নিয়ম দ্বারা চালিত, তাহার জ্ঞান হওয়া মাত্র আমরা তাহাকে নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারি। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ। ব্যবহারিক জীবনে সত্যকে কাজে লাগাইবার সময় সাধারণ মানুষের সে সত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকিলেও চলে, শুধু বিজ্ঞানীদের নির্দেশিত প্রয়োগবিধিটুকু জানিলেই যথেষ্ট। বেদের কর্মকাণ্ড এই প্রয়োগ-বিধি লইয়াই। সেখানে বেদের নির্দেশমত যাগযজ্ঞাদি কর্ম নিখুঁতভাবে করিতে পারিলেই বাঞ্ছিত ফললাভ হইবে। কর্মফলের এই অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করিয়াই বেদের এই অংশ লইয়া গঠিত দর্শন পূর্বমীমাংসায় তাই বলা হইয়াছে, কার্য যথাযথ ভাবে করিলেই ফললাভ হইবে, জৈমিনির সূত্রে তাই কোথাও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা করুণাময় ঈশ্বরের বিশেষ উল্লেখ নাই। এমন কি যজ্ঞাদি কর্মে যে সব দেবতাকে আহুতিদান করিতে হয়, তাঁহাদেরও গুরুত্ব সেখানে কর্মের জন্য প্রয়োজন বলিয়াই। কর্ম ফল প্রসব করে নিজেরই গুণে, দেবতাদের বা অন্য কাহারো কৃপায় নহে। তাই সেখানে ভগবান ও দেবতাদের স্বরূপাদি লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ঈশ্বরকে মূলে না রাখিয়া কর্ম করার ফল কিন্তু বেদের কর্মকাণ্ডের যাহা মূল লক্ষ্য—তাহার বিপরীতই হইবার—ইহলোকে এবং স্বর্গাদি-লোকে ভোগকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ভুল হইবার সম্ভাবনা। বেদে অবশ্য স্পষ্টাক্ষরে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে স্বর্গাদি লোক হইতেও শুভকর্মফলাবসানে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়—জন্মমৃত্যুর হাত হইতে চিরমুক্তি-লাভ ঘটে না। জৈমিনির মীমাংসাসূত্রে আত্মার স্বরূপ বা মুক্তির বিষয়ে কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও পরবর্তীকালে ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট অবশ্য দুঃখের কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় বলিয়াছেন: কাম্য কর্ম না করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম শুধু কর্তব্য হিসাবে সমাধান করিলে এবং সংযত হইয়া চলিতে পারিলে আত্মা তাঁহার 'স্বস্থ' অবস্থা ফিরিয়া পান। এই অবস্থা লাভ করিলে সর্ব দুঃখের অবসান হয়। আত্মার স্বভাবতঃ 'চৈতন্য' নাই—'আমি'-বোধ নাই (দেহমনাদি সংযুক্ত যে চেতনা, লক্ষ্য এখানে তাহাই)—স্বভাবতঃ তিনি সুখ-দুঃখাতীত। ইহা বেদোক্ত চরম সত্যের ইঙ্গিত এবং ভগবান বুদ্ধদেব-প্রচারিত দুঃখের অবসানের, নির্বাণের অনুরূপ—যেখানে বলা হইয়াছে 'আমি'-ও মিথ্যা।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তের সত্যকে—যাহা বেদের সারকথা একেবারে ভুলিয়া শুধু কর্মকাণ্ডের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে, ঈশ্বরকে লক্ষ্যে না রাখিয়া কর্ম করার ফলে কালক্রমে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভগবানলাভ ধর্ম-কর্ম হইতে সরিয়া গিয়াছিল—ভোগই জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আবার, পুরোহিতগণ ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেছিলেন—অব্রাহ্মণের, সাধারণ লোকের নিকট হইতে বেদকে দূরে রাখা হইয়াছিল, পুরোহিতদের কথামত

না চলিলে ধর্ম হইবে না—উপরন্তু পরলোকে ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত হইবার ভয় আছে—সাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করা হইয়াছিল। বেদের সারকথা যে কি, সাধারণের তাহা জানিবার কোন উপায়ই ছিল না। ধর্মের এই গ্লানি দূর করিবার জন্য ঠিক সেই সময় ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম বলিয়া যে আচরণ চলিতেছে, তাহা মানুষকে দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। রাজ্য ত্যাগ করিয়া কঠোর ত্যাগের পথ অবলম্বনে তিনি তাই মানুষের দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের পথ খুঁজিতে সাধনায় ব্রতী হইলেন এবং সাধনান্তে সফলকাম হইয়া ঘোষণা করিলেন সে পথের কথা। খুব চড়া পর্দাতেই সুর তুলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন নাই, বেদকে প্রামাণ্য বলিবারও প্রয়োজন নাই। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা করিয়া চলিলেই হইল। ইহার জন্য কাহাকেও ভয় করিবার বা কাহারো কাছে করুণা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। খুবই চড়া সুর, কিন্তু সে পরিস্থিতিতে ইহারই প্রয়োজন ছিল। সর্বসাধারণের পক্ষে এসব কথা ধারণার বহির্ভূত, বিশেষ করিয়া বেদ ও ঈশ্বর না মানিয়া ধর্মপথে চলা ভারতবাসীর পক্ষে দুষ্কর, তবুও যে ভারত বুদ্ধের বাণী সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—স্বামীজী বলিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়, মানবদুঃখে তাঁহার সমবেদনার অসীমতা। স্বামীজী বলিয়াছেন, "নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy." "তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁর intellect এবং heart—যাহা জগতে আর হইল না।" "সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ" বুদ্ধদেবের হৃদয় হইতেই নিঃসৃত হইয়া, "ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।"

বুদ্ধদেব "বেদেরই সার কথা", বেদান্তোক্ত সত্যই প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ বেদ মানেন নাই। সেজন্য স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে বলিয়াছেন, (হিন্দুধর্মের) "A rebel child"। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে চির চরিত প্রথা হইতে টানিয়া একেবারে বাহিরে না আনিলে লোকের হৃদয় সত্যের কিরণে উদ্ভাসিত করা সম্ভব হইত না—এই জন্যই বুদ্ধদেব এরূপ কঠিন নির্দেশ দিয়াছিলেন। বাঞ্ছিত ফলও তাহাতে ফলিয়াছিল—বুদ্ধের বাণী—বিশুদ্ধ জ্ঞানের বাণী ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দন তুলিয়াছিল।

তবে, চরম সত্যের এত উচ্চ তত্ত্ব—যেখানে 'আমি'ও মিথ্যা, 'ঈশ্বর'ও মিথ্যা—ধারণা করিবার লোক কয়জন? বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এই চরম সত্যের কথা শুনিতে শুনিতে সেখানে 'সংজ্ঞা ন অস্তি'—'আমি' থাকে না—শুনিয়া মৈত্রেয়ী চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্রনাথ) শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন নিজ অমিতবল স্পর্শশক্তিসহায়ে সোজাসুজি এই চরম সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন বহির্জগতের সব কিছুর সঙ্গে তাঁহার 'আমিত্ব'ও 'যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে' দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দও ইহাকে মৃত্যু বলিয়া ভাবিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, 'তুমি আমার একি করলে!' আর ঈশ্বরকেই বা উড়াইয়া দিতে পারে কয়জন? ঈশ্বর যতক্ষণ

কথার কথা মাত্র, ধর্ম যতক্ষণ আলোচনার বিষয় মাত্র, ততক্ষণ আমরা সকলেই পারি—ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিতে না পারাটাই তো আজকাল বুদ্ধিহীনতার, শিক্ষাহীনতার, কুসংস্কারের লক্ষণ। কিন্তু ধর্ম যেখানে যথার্থ ধর্ম—উপলব্ধির বিষয়—সেখানে? সেখানে ঈশ্বর ছাড়া অগ্রসর হইবার লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তোতাপুরী যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অদ্বৈতসাধনায় ব্রতী করিবার সময় মনকে অদ্বয়তত্ত্বে লীন করিতে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও প্রথম চেষ্টার পর বলিয়াছিলেন, 'হইল না'—মন একাগ্র করিবামাত্র পরমানন্দময়ী চিন্ময়ী মা-কালী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইতেছিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না। চলার পথে কাহারো সাহায্য চাই না, আমার সুখ-দুঃখের অংশী রূপে কাহাকেও চাই না—এসব কথা শুনিতে বলিতে খুবই ভাল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এত নির্ভীকতা লইয়া চলিতে পারে কয়জন?

তাই ভারতবাসীরা প্রথমে পরম আগ্রহভরে বুদ্ধের এই বাণী গ্রহণ করিলেও পরে বৌদ্ধধর্মকে ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এই জন্যই, এবং এই জন্যই যে-বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াছিলেন, অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ (মহাযানপন্থীরা—চীন, তিব্বত, মালয়, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা) তাঁহাকেই ঈশ্বর করিয়া তাঁহারই পূজা করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইহা ছাড়া সাধারণ মানুষের গত্যন্তর নাই।

বুদ্ধদেবের তিরোধনের পর কয়েকশত বৎসরের মধ্যেই ভারতে আবার তাই ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্বোচ্চ পর্দায় জীবনের সুর বাঁধিতে না পারিলে ধর্মলাভ হইবে না—এই নির্দেশ সর্বসাধারণকে দিলে, অধিকারী-অনধিকারী নির্বিশেষে সকলকেই সন্ন্যাসীর আদর্শে ধর্ম পালন করিতে বলিলে যাহা না হইয়া পারে না তাহাই হইয়াছিল—ধর্মের নামে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের বিকৃত আকার প্রভৃতি গোপন ভোগে মানুষ লিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, বেদের সার কথা লোকে আবার ভুলিয়াছিল। "(বৌদ্ধধর্মের) অধিকাংশ শক্তিই নেতিমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াতে বৌদ্ধধর্মকে উহার জন্মভূমি হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইতে হইল; আর যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও বৌদ্ধধর্ম যে সকল কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠিল।" "সর্বোপরি বৌদ্ধধর্মের জন্য আর্য, মঙ্গোলীয় ও আদিম প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃতির জাতির যে মিশ্রণ হইল, তাহাতে অজ্ঞাতসারে কতকগুলি বীভৎস বামাচারের সৃষ্টি হইল।"

"প্রধানতঃ এই কারণেই সেই মহান আচার্যের উপদেশাবলীর এই বিকৃত পরিণতিকে শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার সন্ন্যাসীসম্প্রদায় ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হন বেদের সার কথা আবার শুনাইবার জন্য। তিনি বুদ্ধের মত আপসহীন ভাবে বেদের সার কথাগুলি প্রচার করিলেও বেদকে অস্বীকার তো করেনই নাই—বেদকেই প্রামাণ্য বলিয়াছিলেন। সাধনার স্তরবিশেষে ঈশ্বরোপাসনাদির প্রয়োজনও অস্বীকার করেন নাই।

বুদ্ধদেব সাধকজীবনে যাহা অবলম্বন করিতে বলিয়া গিয়াছেন—মধ্যপন্থা—তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি সেই মধ্যপন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যতটুকু যুক্তিতে ধরা যায়, ততটুকুই বলিয়াছেন। অবিদ্যা হইতেই 'আমি'-বোধ (বিজ্ঞান) ও ক্রমে

দুঃখাদি সব কিছুর সৃষ্টি, ইহা বলিয়াছেন। অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল, তাহা বলেন নাই। আবার অজ্ঞানের বিনাশের, আমিত্বের বিনাশের, নির্বাণের পর কি থাকে তাহাও বলেন নাই। বলেন নাই, কারণ তাহা মনবুদ্ধির অতীত, ভাষার অতীত। জ্ঞানকাণ্ডের নাস্তিমূলক দিকটিই তিনি দেখাইয়াছেন, অস্তিমূলক দিকটিতে নীরব। কারণ উহা দেখাইতে গেলে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়—মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশের ইঙ্গিত, যাহারা সেখানে গিয়াছেন তাঁহাদের কথা ছাড়া, অন্য কোথাও হইতে পাওয়া অসম্ভব।

শঙ্করাচার্য বেদান্তোক্ত উভয় দিকই দেখাইয়াছেন। যেখানে 'আমি'ও থাকে না, 'আমি'র অনুভবযোগ্য কিছুই থাকে না—সেখানে যাহা থাকে তাহা হইতেই আমিত্বের ও অন্য সব কিছুর উদ্ভব। 'নেতি' 'নেতি' করিয়া 'আমিত্বে'রও পারে যে অবস্থায় যাওয়া যায়, তাহা 'আমিত্বে'রই মহত্তম রূপ। তাহা আনন্দস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও সৎস্বরূপ। ইহার প্রমাণ ? প্রমাণ একমাত্র সে সত্য যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা, বেদ, এবং নিজের উপলব্ধি। সত্যদ্রষ্টাদের উপলব্ধি বাদ দিয়া শুধু যুক্তি দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু সত্যদ্রষ্টাদের কথায় বিশ্বাস করিতে মনে যত রকম সংশয় উঠিতে পারে, তাহার নিরসনের জন্য তিনি যে যুক্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বিশ্ব ও জীবনের মূলে যে চরমসত্য রহিয়াছে, তাহা লইয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, যুক্তির দিক দিয়া শঙ্করের মত আজিও সেগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

তাছাড়া আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরোপাসনারও স্থান দিয়াছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, যতক্ষণ না চরমসত্য উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণ যেমন 'আমি'-ও থাকে, জগৎও থাকে তেমনি জগৎকর্তা ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্মও থাকেন।

হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতের তপোবনে সে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহারই বিভায় ভারতের সভ্যতা, ভারতের সমাজ সমুজ্জ্বল। ভারতীয় জীবনাদর্শ এই চরম সত্যলাভ; অধিকারীভেদে এই আদর্শ বিভিন্নাকার হইলেও তাহা সবই এই সত্যাভিমুখী, সর্বস্তরের জীবনাদর্শেরই পথপ্রদর্শক এই সত্যের আলোক। চরম সত্যের বিভায় উজ্জ্বল বলিয়াই এত হাজার বছর ধরিয়া বহু ঝড় ঝঞ্ঝা সহিয়াও তাহা নিজস্বতা লইয়া জীবিত আছে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ- ও ধর্ম-জীবনের মালিন্যবশতঃ এই দীপ্তি ঈষৎ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু নির্বাপণের পূর্বে কোন সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাবে উহা সর্বকালেই পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধ ও শঙ্কর সঙ্কটক্ষণে ভারতের নির্বাণোন্মুখ প্রাণশিখাকে যে বিপুল ভাস্বরতা দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। বৈশাখী পূর্ণিমা ও শুক্লা পঞ্চমী তাঁহাদের আবির্ভাবে ধন্য। আজ বিশ্বের সঙ্কটক্ষণে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের করুণায় বিশ্ববাসীর হৃদয় যথার্থ মানবপ্রেমে ও যথার্থ একত্ববোধের আলোকে পূর্ণ হইয়া উঠুক।

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(নিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত)

শ্রীহরিঃ শরণম্ — গড়-মুক্তেশ্বর ২৪।১।'০৮

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ১৬ই তারিখের পত্র হস্তগত হইয়াছে। সমাচার অবগত হইয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীমান অতুলের পত্রও পড়িয়াছি। তাহাকেও উত্তর লিখিব। মধ্যে আমার দাঁতের গোড়া ফুলিয়া গলাবেদনা প্রভৃতিতে কিছু কষ্ট দিয়াছিল। এখন অনেক ভাল আছি। এখানেও অল্প বৃষ্টি হইয়া লোকদের অনেকটা শান্ত করিয়াছে। আনাজের মূল্যও কিছু কমিযাছে শুনিতেছি। দেশে শস্য যে নাই একেবারে এরূপ নহে। কেবল ব্যাপারীরা অর্থলোভে একজোটে ইহার মূল্য বাড়াইতেছে। লোভ বড়ই বিষমবস্তু। দয়াধর্ম সকলই নষ্ট করিয়া দেয়। এই লোভ যে কেবল অর্থেই নিবদ্ধ এমন নহে। নাম যশ মান্য ইত্যাদি ইহার অনেক রূপ আছে। ইহাই যত অনর্থের মূল। ইহার প্রেরণায় মানুষ কর্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া যায়। ইনি যদি একবার আপনার আসন কোথাও জমাইতে পান তবে ইহাকে আর সেখান হইতে তোলে কে ? ক্রমে ইহার নাম হয় প্রেষ্টিজ। প্রেষ্টিজ রক্ষা করিবার জন্য মানুষ করিতে পারে না এমন কাজই নাই। কিন্তু কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। শুভ কর্ম শুভফল ও অশুভ কর্ম অশুভ ফল প্রসব করিবেই। সুতরাং কালে অশুভ কর্মফল একত্রিত হইয়া প্রেষ্টিজাদি যাহা কিছু সমূলে বিনাশ করিয়া দেয়। ইহারই নাম সংসার। ইহাই চক্ষের সম্মুখে নিয়তই ঘটিতেছে। আমরা মায়াবশে কেবল দেখিতে পাইতেছি না। অথবা দেখিয়াও নিজের বেলা সাবধান হইতে ভুলিয়া যাইতেছি। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয়। এই যে সেদিন বঙ্গের ছোটলাট হাইকোর্টের জজদের অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের রায়ে পুলিসের দোষকীর্তন না করেন, কিছু বলিবার থাকিলে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান—ইহাও এই প্রেষ্টিজ রক্ষার প্রয়াস। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ করিয়া কি প্রেস্টিজ থাকে ? সুকর্মের ফলে প্রেষ্টিজ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অভাবেই আবার উৎসন্নও যায়। ইহার অন্যথা হইবার নহে। এইরূপে সকল পাবলিক কার্যের উৎপত্তি স্থিতি নাশ। ধর্মে অর্থাৎ নিঃস্বার্থতায় উৎপত্তি ও স্থিতি এবং তাহার অভাবে নাশ হইবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত দানাদি চিরদিন থাকিবে। কারণ ইহা হৃদয়ের জিনিস। হৃদয় থাকিলে ইহার কার্যও হইতে থাকিবে। এখানে নামযশাদি কোন উত্তেজক কারণ প্রেরক নহে। ইহা স্বতঃপ্রবাহিত করুণাতটিনী। সুতরাং কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের দেশে অর্‌গেনাইজেসন এখনও সফল হইবার সময় আসে নাই। সাধারণ লোক অশিক্ষিত আর শিক্ষিতেরা চরিত্রবিবর্জিত। প্রভুর যেমন ইচ্ছা হইবে। P. B. সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহা তোমার নিকট থাকুক। পরে কিছু বলিবার হয় বলিব। আমি এখন কিছুদিন এইখানেই থাকিব বোধ হয়। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

ধম্মপদ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

যো চ পু'ব্ব পমজ্জিত্বা
পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি
সো ইমম্ লোকম্ পভাসেতি
অব্‌ভা মুত্তো ব চন্দিমা। ৩২।
যস্‌স পাপম্ কতম্ কম্মম্
কুসলেন পিথীযতী
সো ইমম্ লোকম্ পভাসেতি
অব্‌ভা মুত্তো ব চন্দিমা। ৩৩।
অন্ধভূতো অযম্ লোকো
তন্নুকেত্‌থ বিপস্‌সতি
সকুণো জালমুত্তো ব
অপ্পো সগ্‌গায গচ্ছতি। ৩৪ ॥ ধম্মপদ ॥

প্রথমে যে অবিবেকী প্রমত্ত—সে যদি পশ্চাতে
ধীব স্থিতপ্রজ্ঞ হয—তাহলে সে মেঘমুক্ত চাঁদের মতন
আলো দেয পৃথিবীকে। এবং যাব পাপকর্ম কুশলধর্মের
কল্যাণে আবৃত তারও মুক্ত সত্তা স্নিগ্ধ চন্দ্রমাতে
প্রতীকা পবিব্যাপ্ত— সে তখন আলোর চাবণ। ৩২।৩৩ ॥

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এ জগতে মুষ্টিমেয় কযেকটি লোকের
প্রজ্ঞান বযেছে যারা প্রমুক্ত প্রকৃত দৃষ্টির
অধিকারী। জালমুক্ত পাখীর মতন
অতি স্বল্পলোক যারা পেতে পারে স্বর্গেব শরাব। ৩৪ ॥

ভগবৎপ্রসঙ্গ*

স্বামী মাধবানন্দ

এক

(বেলুড় মঠ।
শনিবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)

মা কালীই এবার ঠাকুর হয়ে এসেছেন।

শুধু আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকলেই হবে। আমরা এক পা এগোলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন। তিনি দয়াময়। তিনিই কৃপা করে দর্শন দেন। সাংসারিক বিপদ আপদ সুখদুঃখ কিছু থাকবেই। ওদিকে না তাকিয়ে ইষ্টকে ডেকে যেতে হবে। বেশী বলার কিছু নাই। তিনি আমাদের মাতৃভাষায়, বাঙলা ভাষায় কত সহজ করে ধর্মের কথা বলেছেন; কথামৃতে তা রয়েছে।

তাঁকে আপনার বোধ করবে। তিনি বাপ-মার চেয়েও আপনার। তাঁরই কিছু ভালবাসা আমরা সংসারে দেখতে পাই। সংসারের মধ্যে তাঁকে আপন করে নিতে হবে। তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। উতলা হবার কিছু নাই। দেখা দেবেনই দেবেন।

(বেলুড় মঠ।
রবিবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬২)

প্রাণের যোগ হচ্ছে সব চেয়ে বড় জিনিস। জাগতিক বিষয়ের জন্যই সবাই ছোটে কিন্তু ভগবানলাভের জন্য কজন চেষ্টা করে? আমরা বিশ্বাস করি, ঠাকুরই সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি মানুষরূপে এসেছেন। আমাদের সামান্য ডাকও শোনেন।

একদিন না একদিন দেখা দেবেনই। শশী মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, এ যুগে ঠাকুরকে যে স্মরণ করবে, তার কোন ভয় নাই। ঠাকুরের উপদেশ 'কথামৃত'তে পাবে। সংক্ষেপে খুব সরল করে বলা আছে। 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'মায়ের কথা' এসব পড়বে। মা ও ঠাকুরের কথা আলাদা নয়। প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তবে দেখা পাওয়া বা তাঁর ডাক শুনতে পাওয়া—আমরা তৈরী নই বলে পাই না। দিনে নক্ষত্র দেখতে না পেলেও নক্ষত্র থাকে, তেমনি তাঁর সাড়া না পেলেও তিনি আছেন, আমাদের ডাক শোনেন। ঠাকুর এসে এ যুগে ধর্মজীবন খুব সহজ করে দিয়েছেন। জলহাওয়ার মত সহজ। কিন্তু তা অনুভব করতে হবে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তা দেখাতে হবে। সেইটিই হবে test.

(বেলুড় মঠ।
সোমবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)

আমরা কতটা মনপ্রাণ দিয়ে ডাকছি—তার উপর সব নির্ভর করছে। ছোট ছেলে যখন কাঁদে, মা তখন ভাতের হাঁড়ি ফেলেও চলে আসেন। তিনি আমাদের বাপমায়ের মত। যা করবে আন্তরিকতার সঙ্গে করবে। খুব বেশী যে করতেই হবে তার কোন মানে নাই। কিন্তু খুব ধৈর্য চাই। সাক্ষাৎ শিব এবং কালী ঠাকুরের রূপ ধরে এসেছেন। তিনিই আবার সর্বদেবদেবীস্বরূপ, স্বামীজী বলেছেন।

যার যা প্রাপ্য তিনি তাকে তা দেবেন। ঋণী থাকবেন না, বুঝলে? তোমাদের দুঃখ

* প্রথমাংশ প্রসঙ্গের অনুলিখন, দ্বিতীয়াংশ লিখিত পত্র হইতে সংকলিত।

দারিদ্র্য অভাব অভিযোগ কিছু কিছু থাকবেই, কিন্তু স্মরণ মনন করতে ছেড় না।

(বেলুড় মঠ।
মঙ্গলবার, ২রা অক্টোবর, ১৯৬২)

ঠাকুরের মুখ দিয়ে যেসব কথা বেরিয়েছে, অপূর্ব জিনিস। তাঁর আশীর্বাদ ঐ সব কথার মধ্যে দিয়ে আসছে। ধর্মজীবনের আসল কথা ওতে বুঝতে পারবে। ভগবান দেখেন আমাদের আন্তরিকতা। স্বামী, স্ত্রী, বাপ, মা—সেই ভগবান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর কাছে ছোট ছেলেমেয়ের মত আবদার করে ডাকবে। তাঁর কাছে জোর করবে, শুধু প্রার্থনা নয়। ধর্মজীবন একদিকে খুব সোজা, সহজলভ্য। আবার খুব শক্ত যেন তিনি বহুদূরে। চাই শুধু আন্তরিকতা। আমাদের ডাক ঠিক ঠিক ভেতর থেকে হলে তিনি সাড়া দেবেন। তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি ধরেন না। ছোট ছেলে যখন খেলনা নিয়ে ভুলে থাকে, মা তখন আসেন না। কিন্তু খেলনা ছেড়ে যখন কাঁদতে থাকে, মা তখন ছুটে আসেন। আমাদেরও সেইরকম এই জাগতিক বিষয়ের লালসা ছেড়ে সেই ভগবানকেই চাইতে হবে। পুবদিকে যত এগিয়ে যাবে, পশ্চিম তত পিছনে পড়বে। সংসারের আসক্তি কমবে।

ধ্যানজপ করতে করতে তোমাদের সদ্বুদ্ধি জেগে উঠবে। জপ খুব সোজা। ধ্যান সকলের হয় না। কিন্তু জপ সকলেই করতে পারে। কিন্তু প্রাণ থেকে হওয়া চাই। নাম ও নামী অভেদ। ভগবান কৃপা করে এই নামের মধ্যে তাঁর সব শক্তি দিয়েছেন। তাই ঠাকুর বলেছেন, 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। ঠাকুর এ যুগের জগদ্গুরু। আসল ধর্মের পথ দেখাবার জন্য তিনি এসেছেন।...

(বেলুড় মঠ।
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬২)

সাধনভজন করলে সুফল ফলবেই ফলবে। তবে দেরী হলে ব্যস্ত হবার কিছু নাই; ভগবানকে কি ভাবে ডাকতে হয় ঠাকুর তা দেখিয়ে গেলেন। 'কথামৃত'তে দেখতে পাবে। তিনি কৃপা করে মানুষের শরীর ধারণ করে এসেছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে।

ফলের দিকে বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজন নাই। বীজ পুঁতলে গাছ হবেই। ফসল ফলবেই। অবিদ্যা নাশ হয়ে পরম জ্ঞান লাভ হবে। তার জন্য খাটতে হবে; আর চাই আন্তরিকতা। ভয় পাবার কিছু নাই। তিনি আমাদের আপনার হতেও আপনার। মন কি সহজে শুদ্ধ হয়? ছিপে মাছ ধরা দেখেছ না? মাছ খেলানর মত। খানিকটা তিনি যেন আমাদের ছেড়ে দিয়ে দেখেন। তারপর টান দেবেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই। খুব ডেকে যাও। অসংখ্য তাঁর রূপ। সেই চিন্তা করাই হচ্ছে আসল। এই নিয়ে বিবাদ করবার কিছু নাই। তাঁকে ভালবাসতে হবে। আপন বোধ করে নিতে হবে। প্রার্থনা করে যাবে--ভেতরের সব দুর্বলতা মলিনতা দূর করার জন্য আর তাঁর নিজের স্বরূপ দেখাবার জন্য। যে তাঁকে ঠিক ঠিক স্মরণ করবে, সে তাঁর দর্শন পাবেই।

(বেলুড় মঠ।
বুধবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৬২)

ব্যাকুলতার সঙ্গে আন্তরিক ভাবে ভগবানকে ডাকতে হয়। (তাঁকে ডাকার সময়) যদি কিছুটা ভুলও হয়, আন্তরিকতা থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। ঠাকুর বলেছেন না, ছোট ছেলে অনেক সময় বাবা বা মাকে ঠিকভাবে

উচ্চারণ করে ডাকতে পারে না। তাবলে কি তাঁরা দোষ ধরেন? কিম্বা ভুল ডাকলেও সাড়া দেন না?

ভগবান একজন। তাঁর নাম ও রূপ বিভিন্ন হলেও ঠাকুরকে চিন্তা করলে সুবিধাই হবে। স্বামীজী বলেছেন, তিনি সর্বদেবদেবী-স্বরূপ। বিশ্বাস রেখ নিজের উপরে, মন্ত্রের উপরে। ভগবান দেখা দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। একটু সাধনভজন করলে তিনি নিজে এগিয়ে আসেন।

জলে ডোবা লোকের মত ব্যাকুলতা প্রয়োজন।

সংসারের সব কাজ কর্তব্য বুদ্ধিতে করবে, বড় লোকের বাড়ীর দাসীর মত। কিন্তু মনের সব অংশ সংসারে খরচ করে দিও না। কিছু অংশ ভগবানের দিকে দিও। তাতে লোকসান নাই। সংসারে এসেছি অল্প দিনের জন্য।

ঠাকুর সূক্ষ্মশরীরে এখনও রয়েছেন।

(বেলুড় মঠ।
সোমবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬২)

প্রশ্ন: মহারাজ, মন স্থির কেমন করে করা যায়? নানারকম কাজকর্ম করতে হয়। সন্ধ্যায় ধ্যান করতে বসলেই সেই সব চিন্তা আসে।

উত্তর: মনকে বলতে হবে, তুই এখন কিছুক্ষণ চুপ করে ব'স্। এখন বিরক্ত করিস না। আর ভগবানকে বলা, তুমি তোমার দিকে মনকে একটু টেনে নাও। এই অভ্যাস করে যেতে হয়। তাছাড়া ঠিক ঠিক ধ্যান কজনের হয়? মা-ও বলতেন, ধ্যান কি সহজে হয়? খুব ভাগ্যবান যারা, সে অতি অল্প, তাদেরই হয়। ভগবান ওতেই খুশী হন এই দেখে যে, সে চেষ্টা করছে। কাজেই অভ্যাস ছাড়তে নাই। আর জোর করলে মন অনেক সময় rebel (বিদ্রোহ) করে। এ ছাড়া Royal Road (রাজপথ) তো কিছু নাই।

দুই

(পত্রের মাধ্যমে)

(১)

প্রশ্ন: মন বড় চঞ্চল। উপায় কি?

উত্তর: অনেকেরই মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। তবে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে উহা বশে আসে। মন চঞ্চল হইলেও তুমি জপ ধ্যান করিতে ছাড়িও না। ভগবানের প্রতি একটু ভালবাসা হইলে তখন মন কতকটা শান্ত হইবে। এখন Struggle (খুব উত্তম নিয়ে চেষ্টা) করিয়াই চল। (বেলুড় মঠ, ১০ই আগষ্ট, ১৯৬৪)

(২)

প্রশ্ন: মন স্থির কিছুতেই হয় না।

উত্তর: মন স্থির কি অত শীঘ্র হয়? আন্তরিক চেষ্টা করিয়া যাও, যথাসময়ে ঠাকুরের কৃপায় সফল হইবে। মন স্থির হউক বা না হউক তুমি নিয়মিত জপধ্যানে বসিতে ছাড়িবে না। মন যত বার বাহিরে চলিয়া যাইবে, ততবারই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার জপধ্যানে লাগাইবে। আসল কথা কেবল হায় হায় না করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে অভ্যাস কর। তাঁহাকেই কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইও। জপ এবং যতটুকু পার ধ্যান করিবার চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই হইবে। (বেলুড মঠ, ৭ই আগষ্ট, ১৯৬২)

(৩)

সাধকজীবনে অগ্রসর হইতে হইলে ভগবৎকৃপাই প্রধান অবলম্বন। এখন তো তোমার গুরু * ইষ্টপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রাণের সহিত ঠাকুরকেই সব জানাও। তিনি পরম প্রেমময়, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান তো বটেনই। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার উচ্চ আদর্শ এই জীবনেই প্রতিফলিত হউক। তোমার পত্র হইতে আন্তরিকতা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই আন্তরিক ডাক তিনি খুব শুনেন। গুরুও যে কৃপা করেন—সে সময় বুঝিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে পারিলে তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন। তুমি আদৌ হতাশ হইও না। বরং যেমন ডাকিতেছ তেমন ডাকিয়া যাও। রবিবাবুর একটি কবিতাংশ মনে পড়িতেছে—

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
এনেছ তোমারই দুয়ারে।

(বেলুড় মঠ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪)

* স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

স্বরূপ

শ্রীমদন চৌধুরী

তোমরাই বল ভগবান শুধু বুদ্ধ,
শুনেছ, কেবল বুদ্ধ-আত্মা শুদ্ধ।
অথচ, আছেন সবাকার হৃদি মাঝে
শুদ্ধ আত্মা—একথা কি জানা আছে ?

জ্ঞানের আলোকে চিনেছে যে সেই 'আমি'
দুঃখের আঁচে পুড়িয়া দিবস-যামি
তার মনে হয়—আবার জন্ম নিই,
হৃদয় আমার সবাকারে সঁপে দিই।

আজো দেখি 'জরা' লাঠি ভর দিয়ে চলে,
রোগার্তপ্রাণ ভাসে চক্ষের জলে,
শোক-উচ্ছ্বাস শবযাত্রার কালে,
সন্ন্যাসী যান চন্দন প'রে ভালে।

মানুষজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম জেনো—
প্রতি আত্মায় বুদ্ধের লীলা মেনো।
অমৃত-পুত্র তোমরা সকলে শুদ্ধ
গভীরে পৌঁছে দেখিবে সবাই বুদ্ধ।

চারি আর্যসত্য

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বুদ্ধদেব অনুত্তর ভিষক্।

তিনি বৈদ্যরাজ, মানুষের ভব-ব্যাধি নিরাকরণের জন্য তাঁর আবির্ভাব। যেখানে ব্যাধি, সেখানেই তার হেতু আছে—আরোগ্যলাভের আশা আছে এবং ভেষজ আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই নিদানতত্ত্বকে বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই তুলনায় আপনার অনুপম শিক্ষা আর্যসত্য গড়ে তুলেছিলেন।

এই চারি আর্যসত্য বুদ্ধধর্মের কেন্দ্রে রয়েছে—এরই ভিত্তির উপর বুদ্ধবাণীর মর্মরপ্রাসাদ রচিত হয়েছে। সারবান এই ধর্মদেশনাকে বুদ্ধভক্তেরা অলৌকিক, অপূর্ব এবং অতুলনীয় বলেছেন।

অনেকে তর্ক করেন যে এই পরিকল্পনা বুদ্ধদেবের নিজস্ব নয়। তাঁরা বলেন অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতে কিংবা দীর্ঘ নিকায়ের সঙ্গীতি-সূত্রে এই চারি সত্যের উল্লেখ নেই। বুদ্ধদেব তাঁর অন্তিমকালে বোধিসত্ত্বীয় ধর্ম বলেছিলেন, সেই সাঁইত্রিশটির মধ্যে চারি আর্য-সূত্র স্থান পায়নি। তাই সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু তথাপি বৌদ্ধেরা বরাবরই এই তত্ত্বকে যে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছেন—তা থেকে এই পরিকল্পনাকে বুদ্ধের দান বলেই স্বীকার করা সমীচীন।

সারনাথে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন—সেখানেই চারি সত্যের প্রথম সন্ধান মেলে। বুদ্ধদেব বলেন, তিনি মধ্যমার্গ আবিষ্কার করেছেন—এই পথ এনে দেয় জীবনে কল্যাণময় সত্যদৃষ্টি, যার ফলে মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান মেলে, জাগ্রত হয় পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞা। আসে একান্ত নিবিড় শান্তি, সম্বোধির প্রকাশে হৃদয় প্রফুল্ল হয় এবং মানুষ তার ঈপ্সিত নির্বাণ লাভ করে। নির্বাণকে বুদ্ধদেব নাস্তিত্ব হিসাবে দেখেন নি—দেখেছেন পরম সুখ রূপে—অশোক, বিরজ, ক্ষেমঙ্কর এবং উপশম।

এই কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব চারি সত্যের কথা উত্থাপন করেন। প্রথম আর্যসত্য দুঃখ। জন্মও দুঃখ, জরাও দুঃখ। ব্যাধি জর্জর করে, মরণও দুঃখের প্রবাহে মানুষকে কাতর করে। জীবনে প্রতি মুহূর্তে অপ্রিয়ের সহিত সংযোগে আসে লাঞ্ছনা। প্রিয়ের সহিত বিপ্রয়োগে আনে একান্ত ব্যথা ও বেদনা। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। শেষের কথাটির ব্যাখার প্রয়োজন। পরে সেটা করা হবে।

দ্বিতীয় আর্যসত্য দুঃখের উৎপত্তি। কেন দুঃখ পুনঃপুনঃ মানুষকে আক্রমণ করে। বিনা কারণে সংসারে কিছুই ঘটে না—দুঃখের তাই কারণ আছে। তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু—তৃষ্ণার ফলে মানুষ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে—তৃষ্ণা ভোগানন্দে বর্ধিত হয়—এখন এখানে, তখন সেখানে কামনার চরিতার্থতা সন্ধান করে। তৃষ্ণা তিন রকম—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা। সুখ ও ভোগের আশায় মানুষ উদ্বেল হয়ে ওঠে—মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের বাসনা করে এবং বর্তমান জন্মে ভোগানন্দের পিছনে ধাবিত হয়।

দুঃখ আছে বলে কিন্তু নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তৃষ্ণাক্ষয়ই দুঃখক্ষয়। তৃতীয় আর্য সত্য তাই দুঃখনিরোধের কথা। যে তৃষ্ণা মানুষকে জন্মজন্মান্তর ক্লেশ দিচ্ছে, তার সম্পূর্ণ

বিলুপ্তি চাই, তৃষ্ণাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে—তৃষ্ণাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হবে—তৃষ্ণা থেকে অপ্রবৃত্ত হয়ে তৃষ্ণা থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

আর চতুর্থ আর্যসত্য দুঃখনিরোধমার্গ—যে পথ সাধনার পথ, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি সেই বিবর্ধনের অষ্ট সোপান। বুদ্ধ তর্ক ও জল্পনাকে ঘৃণা করতেন, তিনি বলতেন ধর্মজীবনে অগ্রগতি আসে সাধনায়, আসে তপস্যায়। তপস্যায় অভ্যাসহীন ব্যক্তিকে তিনি আদৌ আমল দিতেন না। Sir Charles Elliot তাই তাঁর বিখ্যাত Hinduism and Buddhism নামক গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন :—"It is clear, therefore, that the Buddha regarded practice as the foundation of his system. He wished to create a temper and a habit of life. Men acquiescence in dogma, such as a Christian creed, is not sufficient as a basis of religion and test of membership" বুদ্ধ বেশ দর্পের সঙ্গে বলতেন—সমুদ্রের যেমন একটি আস্বাদ আছে, সে হল লবণাক্ত আস্বাদ—আমার ধর্ম ও বিনয় তেমনই এক রস, সে হল বিমুক্তির আনন্দ।

অষ্টাঙ্গ মার্গের কথাগুলিকে অনেকের নিকট অতিসাধারণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মূলতঃ তা নয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি যে কার্যপন্থা আবিষ্কার করলেন, তা সত্যই নূতন, বিস্ময়কর এবং অতুলনীয়। বুদ্ধের শিক্ষায় ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস নেই—রয়েছে মুক্তির দৃঢ়তা। দুঃখের আদিম কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান—বুদ্ধ এই বিশ্বজগৎকে পর্যালোচনা করে পরম সত্যকে প্রজ্ঞাচক্ষুতে অবলোকন করতে পেরেছিলেন।

অষ্টাঙ্গ মার্গে হিজিবিজি কিছু নেই; আছে যে পথে মুক্তি আসে তারই নির্দেশ—অতি সরল, অতি সুন্দর ভাষায়। এ যেন এক নবীন বিশ্ব-চেতন মুক্তি-কেতন। এখানে ক্রিয়া-কলাপের কথা নেই, জগৎকর্তার কথা নেই, কৃপা বা শরণাগতির কথা নেই।

নৈতিক বীর্যত্বে বলীয়ান বুদ্ধ মানুষকে শক্ত হয়ে, সমর্থ হয়ে, আত্মনির্ভর হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মনমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৬।৫

বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা আপনিই আপনাকে উদ্ধার করবে সংসারের মোহগর্ত থেকে বেরিয়ে যোগারূঢ় হবে, কারণ মনই আত্মার বন্ধু। মনকে বিষয়াসক্ত করবে না—শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী। সংসারমুক্তির প্রতিকূল বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু—সেই মনই মানুষকে অধোগামী করে, বন্ধনের মাঝে ডোবায়। ধর্মপদে এই উপদেশই হুবহু দেওয়া হয়েছে।

আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ সাধক হৃদয় ও মনের পরিবর্তনই সুখের কারণ জেনে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করবেন—কারণ সৎকাজেই শুদ্ধ ও সুন্দর মনের জাগরণ হয় এবং পরিশেষে সমাধির আনন্দের মাঝেই জীবনের অভিব্যক্তি সার্থকতা লাভ করে।

আত্মানুশীলনের প্রথম ধাপেই সম্যক্ দৃষ্টি—এটি কোনও দার্শনিক তত্ত্ববিচার নয়—চতুরার্য-সত্যের বোধ ও অধিগমকে বুদ্ধ সম্যক্ দৃষ্টি বলেছেন—সাথে সাথে কর্মফল এবং অনাত্মার স্বীকৃতিও আছে। সম্যক্ দৃষ্টিকে সংক্ষেপে বৌদ্ধদেশনার মৌলিক পরিচয় বলা যেতে পারে।

সম্যক্ সংকল্প হল বিলাস ও ভোগবাসনার পরিত্যাগ—কাউকে দ্বেষ করব না, কাউকে

হিংসা করব না, কারও কোনও ক্ষতি করব না—এই দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করাই সত্য সংকল্প।

সম্যক্ বাক্ হল মিথ্যাকে, অনৃতকে পরিহার। কারও নিন্দায় লিপ্ত হবে না—কঠোর পরুষ বাক্য ব্যবহার করবে না—অলস এবং অনর্থক জল্পনা করবে না।

সম্যক্ কর্মান্ত হল প্রাণিহত্যা না করা, চুরি না করা এবং নৈতিক স্খলনের নিবারণ।

সম্যক্ আজীব হল জীবিকার বিশুদ্ধতা। সংসারে থাকতে হলে জীবিকা চাই, কিন্তু বুদ্ধদেব বলতেন, সেই সব কাজ করবে না, যে কাজে তোমার চিত্তের অবনতি ঘটে। অন্যায় আচরণে জীবন ধারণ করবে না—অন্নবস্ত্র আহরণ কর পবিত্র ও পুণ্য কর্মে। সেই হল পাপাচরণ, যাতে অন্যের ক্লেশ এবং বিপদ ঘটে, বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সব জীবিকা গ্রহণে বারণ আছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কসাইয়ের কাজ করবে না, হোটেলরক্ষক বা মদ্যবিক্রেতার কাজ করবে না, বিষ বিক্রয় করবে না ইত্যাদি।

সম্যক্ ব্যায়াম মানস উৎকর্ষের প্রয়াস—অধ্যাত্ম অনুশীলনের প্রযত্ন। মনে যাতে অশুভ চিন্তা না জাগে, তার প্রচেষ্টা করতে হবে। যদি জেগে গিয়ে থাকে তাকে দূর করতে হবে-মনে শুভ চিন্তা, কল্যাণকর ক্ষেমঙ্কর ইচ্ছার উদ্ভব ঘটাতে হবে—যাতে সৎ, শুভ, কল্যাণ এবং ক্ষেমের আবির্ভাব ঘটে যাতে তারা প্রবৃদ্ধ হয়, পূর্ণতা লাভ করে-তার জন্য একান্ত অধ্যবসায় করতে হবে।

সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি বিশেষভাবে বৌদ্ধ সাধনার পরিচায়ক—মানসবিকাশের, আত্মোৎকর্ষের উপায়। কেহ কেহ বলতে পারেন এখানে বুদ্ধ শিষ্যের অন্তরে নিগড় বেঁধেছেন—তাকে মুক্তির স্বাধীনতা দেন নি। কিন্তু তা ঠিক নয়, বৌদ্ধ সাধকের ভয়ের কিছু নেই। শুভ এবং অশুভের পরিচয় নিয়ে শুভ চিন্তার বৃদ্ধি করতে হবে, অশুভ চিন্তার বিনাশ করতে হবে। যা সৎ তাকে প্রতিপালন করতে হবে, যা অসৎ তাকে ক্ষয় করতে হবে। মানুষের যা কিছু সুন্দর ও শোভন, প্রবৃত্তি রয়েছে, তাকে লালন পালন করে তাকে পূর্ণ প্রবৃদ্ধ ও সর্বায়ত করতে হবে।

সম্যক্ স্মৃতি কি? যখন ভিক্ষু নিজ কায়কে পরীক্ষা করে কায়ে আসক্তিহীন হয়ে, বীর্যশীল, প্রজ্ঞাতৎপর এবং স্মৃতিযুক্ত হয়ে লোভ ও বিষাদে আর আক্রান্ত হয় না, তখনই যে স্মৃতির অনুশীলন করে।

এইভাবে যখন সে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নিয়ে স্মৃতিশীল হয়, তখনই তার সম্যক্ স্মৃতি অনুশাসন পালন করা হয়। বৌদ্ধেরা এই বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেন। ধর্মপদে আছে:—

> অত্তা হি অত্তনো নাথ কো হি নাথো
> পরো সিয়া।
> অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি
> দুল্লভং ॥ ১৬০

আত্মাই আত্মার নাথ, আত্মা ছাড়া অন্য কে নাথ হতে পারে? যার আত্মা দমিত, সে দুর্লভ প্রভুর আশ্রয় পেয়েছে।

সম্যক্ স্মৃতির অভ্যাসে আত্মজ্ঞান লাভের পর পরিপূর্ণ আত্মসংযম আসে। তখন কিছুই অমনোযোগের সহিত সম্পন্ন হয় না, কিছুই যন্ত্রের মত উদাসীনতায় করা হয় না। তখন ইচ্ছামূলক ও সংকল্পজাত সমস্ত কাজই সংযত হয়- শুধু তাই নয়, যে সব কাজ মন গ্রহীতার

মত নিরাসক্ত ভাবে গ্রহণ করে, সেগুলিও শান্ত ও সংযত হয়।

বুদ্ধ অনাত্মবাদী—এই কথা সকলেই বলেন। কিন্তু সে অনাত্মবাদ আত্মবাদের নামান্তর—যা আত্মা নয়, অনাত্মবাদে কেবল তাদের দেখানো হয়েছে—কিন্তু বুদ্ধ কোথাও আত্মাকে অস্বীকার করেন নি- কেবল তার অনির্বচনীয় অনুভূতিকে বাগ্‌জাল-বদ্ধ করতে চান নি—যা করা যায় না। আত্মাই যে মানুষের পরিচালক বন্ধু একথা বুদ্ধদেব বাবংবার বলেছেন।

শেষ এবং অষ্টম সোপান হল সমাধি। মনকে একাগ্র করতে পারলে সমাধি আসবে। মন চঞ্চল—সর্বদাই অস্থির হয়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে, তাকে সংযত করে ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের ফলে আবার সেই তুরীয় আনন্দ—সেই পরম সাম্যাবস্থা—যাকে সঠিকভাবে কথায় প্রকাশ করা যায় না—সেই সমাধিতে সিদ্ধিলাভ করলে প্রজ্ঞাচক্ষু খুলবে।

দীর্ঘ নিকায়ের শ্রামণ্যফলসূত্র নামক সূত্রে বুদ্ধদেব সমাধির আনন্দের চমৎকার বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধির আলোকে সাধকের সর্ব-শরীর আলোকিত হয়, পরম শান্তিতে তিনি পূর্ণ হন।

চারিটি ধ্যানের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে নির্বাণ লাভ করেন। চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে শমিত করেন। তিনি তখন যথাযথরূপে জানতে পারেন,—ইহা দুঃখ ইহা দুঃখসমুদয়, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধ-মার্গ। তিনি 'ইহা আসব', ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধমার্গ—যথাযথরূপে জানতে পারেন—এই ভাবে জেনে ও উপলব্ধি করে তাঁর চিত্ত কামাসব থেকে মুক্ত হয়, ভবাসব থেকে মুক্ত হয়, অবিদ্যাসব থেকে মুক্ত হয়।

বিমুক্ত চিত্তে "বিমুক্ত হয়েছি" এই বোধ পরিস্ফুট হয়—এই জ্ঞানের উদয় হয় জন্মক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, যাহা করণীয় করা হয়েছে। পুনর্জন্ম আর নেই—এই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেন।

চতুরার্যসত্যের একান্ত লক্ষ্য নির্বাণ। নির্বাণের নিরতিশয় সুখ এবং অনির্বচনীয় শান্তি এই জীবনেই পাওয়া যায়। পাবার পর নিস্পৃহ উদাসীনের মত বৈরাগ্যসাধনই তার কাম্য নয়. এই জগতের সুখদুঃখের মাঝেই শান্তধী হয়ে কল্যাণকর্মে আপনাকে নিয়োগ করতে হবে—নির্বাণলাভের পর বুদ্ধদেব নিজে যেমন কর্মসুন্দর জীবন যাপন করেছিলেন, সাধককে তেমনই অজস্র, সহস্রবিধ কর্মে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজতে হবে। নির্বাণে লোভ, মোহ এবং দ্বেষের আগুন নির্বাপিত হয়ে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন এবং বিমুক্তি-সুখে উল্লসিত হন।

চতুরার্যসত্যের ভাস্করচ্ছটায় যাঁদের প্রাণ উজ্জীবিত হয়েছে, যাঁরা অষ্টাঙ্গিক মার্গের পথে অনবরত চলেছেন, তাঁদের বলা যায় যাত্রী। যাত্রী যাবে অজানা দূর দেশে—বার্তায় বার্তায় সে এসে গন্তব্য পথে পৌঁছেছে—তারপর শনৈঃ শনৈঃ যাত্রা সুরু করেছে। যতই চলছে, ততই তার শ্রুত পথের নিদর্শন চোখে পড়ছে—তখন সে দৃঢনিশ্চয় হয়ে বহু দূরের ঈপ্সিত লক্ষ্যের উদ্দেশে ধাবমান হয়। এ আর্যপথে চলাও অনেকটা তাই।

মহাপণ্ডিত Grimm তাঁর The Doctrine of the Buddha গ্রন্থে পথের আটটি বিষয়বস্তুর আলোচনা শেষ করে বলেছেন—"If we look it over once more, we see that its eight members are not joined together like

beads on a string, but coalesce into an organic unity. The way of deliverance consists in a constant effort after continued concentration of the mind, for the purpose of incessant objective meditation of all our thoughts, words and actions, as also of our whole conduct of life in general, by following the directions given by the Buddha in right recollectedness in order to win right view, in the form of holy wisdom."

মার্গ—অষ্টধা মার্গ—সে সুতায় গাঁথা মালার পুঁতি নয়—সে একটি সজীব সংহতি। মুক্তির একমাত্র পথ—অনবরত মনকে একাগ্র করে ধ্যান—আমাদের যা কিছু চিন্তা, যা কিছু কথা. যা কিছু কাজ, সব নিয়েই ধ্যান করতে হবে—বুদ্ধ সম্যক্ স্মৃতি সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়েছেন—সে সকল অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সত্যদৃষ্টি লাভ করতে হবে। সত্যদৃষ্টি জাগ্রত হলে পুণ্য পবিত্র প্রজ্ঞার উদ্ভব হবে।

এই চারিটি আর্যসত্য জানলে বুদ্ধদেব নিজের সম্বন্ধে ধর্মচক্র-প্রবর্তন সূত্রে যা বলেছেন, সাধকেরও সেইরূপ অনুভূতি হয়। ইহা দুঃখ আর্যসত্য, ইহা দুঃখের হেতু আর্যসত্য, দুঃখ-নিরোধ সত্য, ইহা দুঃখনিরোধের মার্গ—এই আর্য সত্য অনুভূত হলে অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে সাধকের চোখ খোলে। তখন তিনি উপলব্ধি করেন আমার চক্ষু উৎপন্ন হল, জ্ঞান উৎপন্ন হল, বিদ্যা উৎপন্ন হল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হল, আলোক উৎপন্ন হল।

সংক্ষেপে বুদ্ধানুশাসনের মর্ম হল, বুদ্ধ সাধনায় উপলব্ধি করেছিলেন অবিদ্যাই সমস্ত দুঃখের মূল। অজ্ঞানের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে জীব নিজের চারিপাশে এক পৃথক্ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। অনাদি কালেই এই যাত্রা সুরু—অবিদ্যা থেকে জাগে নামরূপ—নামরূপের ফলে ষড়ায়তন। তখন জাগে স্পর্শ—স্পর্শের ফলে সুখ দুঃখ, প্রীতি ও বিদ্বেষ। তৃষ্ণার তাড়নায় জন্মজন্মান্তর ধরে চলেছে এই খেলা।

এই পীড়াকর খেলা বন্ধ করতে হবে—তার জন্য জানা চাই কোন পথে এবং কোন কারণে আমরা বাঁধা পড়ি।

সব্বম্ দুঃখম্ ছন্দমূলকম্ ছন্দনিদানম্ ছন্দো হি মূলম্ দুঃখস্য। সব দুঃখের মূল ইচ্ছা—ইচ্ছা থেকে জাত। ইচ্ছাই দুঃখের কারণ। অবিদ্যা-কে নাশ করতে চাই বিদ্যা—যখন সমাধিতে সম্বোধি জাগল, কেবল তখনই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানের তমিস্রা বিদূরিত হল।

অতএব আমরা যেন বৈদ্যরাজ বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করি। হাতুড়ে চিকিৎসকের শরণ না নিয়ে বুদ্ধের শরণ লই, তাহলে আমরা একেবারে নিরাময় হয়ে যাব। অনন্তকালপ্রবৃত্ত এই সংক্লেশ তখন সমাপ্ত হবে, ক্ষীণাসব হয়ে তখন আমরা বুদ্ধের সাথে সাথে বলতে পারব:—"এক সময়ে ছিল তৃষ্ণা—সে ছিল অশুভ—সে আর নেই—এই-ই ভাল। এক সময় ঘৃণা ছিল—সেও ছিল অশুভ—সে আর এখন নেই, এক সময় মোহ ছিল—সে ছিল অশুভ—সে আর নেই।

লোভ, দ্বেষ ও মোহ অন্তর্হিত হয়ে এসেছে পরমা তৃপ্তি—এসেছে অপূর্ব শান্তি।" সেই প্রজ্ঞার আলোক জাগ্রত হোক—আমরা যেন বলতে পারি:—

এতম্ যো পরমম্ জ্ঞানম্ এতম্ সুখমনুত্তরম্ অশোকম্ বিরজম্ ক্ষেমম্। এসেছে পরম জ্ঞান—এসেছে অনুত্তর সুখ—শোক নেই—ধূলি নেই—মলিনতা নেই—এসেছে ক্ষেমঙ্কর পরমা শান্তি।

বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি ও সুমতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তাঁর[১] শিষ্য হোয়াইটহেডের মধ্যে এ-শ্রদ্ধার অনেকখানি সংক্রমিত হয়েছিল। তাই ধর্মকে তিনি শুধু মানুষের "one type of fundamental experience" নাম দিয়েই ডিশমিশ করেন নি, ধর্মের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর অন্তরে তার দীপ্তির কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল যার প্রসাদে তিনি বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও কবির পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর নানা মিসটিক সমর্থনে। এক একটি ভাবোচ্ছ্বাস এত দীপ্যমান হযে উঠেছে এ-কবিত্বের আলোয় যে, তাঁর লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না, উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও :—

"Religion is the vision of something which stands beyond, behind and within the passing flux of immediate things ; something which is real and yet waiting to be realised ; something which is a remote possibility and yet the greatest of present facts ; something that gives meaning to all that passes and yet eludes apprehension , something whose possession is the final good and yet is beyond all reach , something which is the ultimate ideal and the hopeless quest." (Science & the Modern World—Religion and Science অধ্যায়)

অর্থাৎ

ধর্ম কী ?—যা কিছু চলচঞ্চল তাহার অন্তরালে বিরাজে সে নিত্য তত্ত্ব তারি মহাস্বপ্ন ; যাহা কিছু ধ্রুব স্থির তবু আজো হয় নাই প্রমূর্ত বাস্তবে , দূরতম সম্ভাবনা, অথচ সে-সত্য মহত্তম ; যাকিছু স্ফুরৎরঙ্গ চিরজীবী হয়ে তার রঙে নয় অধিগম্য তবু ; উপলব্ধি সে-চিরন্তনের জীবনের শ্রেষ্ঠ বর অভয়, অথচ কেহ তারে পারে নি ধরিতে কভু ; সাধনার শেষ সিদ্ধি, তবু পূর্ণিমা-মিলন তার দুরাশা পার্থিব সাধনায়।

শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেছেন যে ধর্ম আনে পূজার প্রেরণা যা বারবার স্তিমিত হ'লেও প্রতিবারই ফিরে আসে সমৃদ্ধতর আবেগের রূপে। ব'লে শেষে লিখছেন যে, কেবল ধর্মের এই ঋষিদৃষ্টি ও অজেয় বিকাশের দৃশ্যই আমাদের মনকে ভরসার ভিত্তি দেয় (The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion is our one ground for optimism.)

কয়েক বৎসর হ'ল হ্যাভেলক এলিস সাহেব একটি কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক বই লিখেছেন : "The Dance of Life", ভাষায় পাণ্ডিত্যে সারবত্তায় বইটি এযুগের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এমন কি, বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই সাড়া তুলেছে।

রাসেল প্রমুখ ধর্মবিমুখ বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের স্বতোবিরোধ স্বয়ংসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন, এলিস নেন নি। তিনি বলেছেন ধর্মের প্রণোদনার (impulse) সঙ্গে কোনো মূলগত বিরোধই থাকতে পারে না। তাঁর মতে, এ-বিরোধের উদ্ভব হয়েছে শুধু এইজন্য যে, বৈজ্ঞানিকেরা চান ধর্মপ্রবৃত্তিকে (atrophy ক'রে) মেরে ফেলে শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিগুলিকে অতিপুষ্ট ক'রে তুলতে আর

১ উইলিয়ম জেমস্-এর।

ধার্মিকেরা চান যুক্তিকে বাতিল ক'রে নিছক বিশ্বাস ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে ঘর করতে। এর ফলে শেষটায় হয় কি, যখন বিজ্ঞানসর্বস্ব অধার্মিককে ধর্মসর্বস্ব অবৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড় করানো যায় তখন মনে হয় তারা যেন পৃথিবীর দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন পরস্পরের অবোধ্য ভাষায়। কিন্তু—এলিস টুকছেন—এজন্যে দায়ী না ধর্ম না বিজ্ঞান, দায়ী কেবল আমাদের একদেশদর্শিতা।

শুধু এলিসই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানজগতের নিউটন আইনষ্টাইনও বলছেন: "সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি জাগায় কে? সৃষ্টির রহস্য। শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস এই অনুভূতিই বলব। যে-মানুষ এ-অনুভবে সারা দিতে অক্ষম, যে সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয় না সে জীবন্মৃত, অন্ধ। জীবনের রহস্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভয়ের সম্ভ্রম জড়িয়ে থাকলেও এই অন্তর্দৃষ্টিই ধর্মেরও উৎস। যা আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য তাও যে সত্যি আছে, তারই প্রকাশ যে হয় মহত্তম প্রজ্ঞায় ও দীপ্ত সৌন্দর্যে…এই জ্ঞান ও অনুভূতিই যথার্থ ধর্মভাবের মূলে। এই ভাবে—এবং কেবল এই ভাবেই—আমি ধর্মাত্মাদের সগোত্র ব'লে মনে করি নিজেকে।"*

এলিস ও আইনষ্টাইনের কথাই ঠিক—বৈজ্ঞানিকদের মূল প্রণোদনার বিরুদ্ধে তাই কিছুই বলবার নেই শুধু এইটুকু ছাড়া যে, বৈজ্ঞানিকেরা যখন স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে ধর্মকে যাচাই করতে আসেন তাঁদের ল্যাবরেটরিতে ধার্মিককে তলব ক'রে তখনই গোল বাধে। এক ফরাসী মনীষী এই প্রবণতা সম্বন্ধে বড় চমৎকার ব্যঙ্গ করেছেন:

"Et disons le en passant: c'est un des spectacles les plus bouffons et les plus affligeants qui soient que de voir certaines mains grossières toucher à les âmes des saints. Après tant de mésaventures pitoy-ables, il devrait être entendu désormais que la sainteté n'est pas du ressort de science. Il n'y a de science positive que de ce qui se compte ou de ce qui se mesure. Or on ne compte pas, on ne mesure pas *l'âme des saints, ni d'ailleurs,* aucune âme.

(ভাবার্থ: একটা ভারি হসনীয় ব্যাপার সুরু হয়েছে সম্প্রতি: কয়েকটা চাষাড়ে হাত এসে মহাত্মাদের আত্মাকে পরীক্ষা করতে উঠে প'ড়ে লেগেছে। এসব হাতুড়েদের নিত্যনিয়তই পদস্খলন হচ্ছে, অথচ তবু তারা বুঝবে না কিছুতেই যে, মহাত্মাদের মাহাত্ম্য বিজ্ঞানের চৌহদ্দির বাইরে। যথার্থ বিজ্ঞান হ'তে পারে কেবল সেই সব বস্তুর যাদের গোনা যায়, মাপা চলে। কিন্তু মহাত্মাদের আত্মাকে—বা কোনো আত্মাকেই—না যায় গোনা না চলে মাপা।)

এখানে, মনে রাখবেন, আমি ভেক ভণ্ডের কথা বলছি না। সংসারে জাল জুয়াচুরি ভেল বুজরুকি সর্বত্রই ছিল আবহমানকাল—হয়ত থাকবেও চিরদিন, কে জানে? তবে মেকি মালের দেখা কোথায় না মেলে বলুন তো? বিজ্ঞান শিল্প সমাজসেবা বাণিজ্য রাজনীতি কোথায় ভেজাল নেই? তাই শুধু ধর্মের এলাকায়ই অধার্মিকদের ধর্মের মুখোষ প'রে দাপাদাপি করতে দেখে তাকে বরখাস্ত করলে চলবে কেন?

কিন্তু যতই বলি না কেন যে, বৈজ্ঞানিকদের

* I BELIEVE (George Allen & Unwin) ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ধর্মের বিচারক বাহাল করলে ধর্ম অপদস্থ হবে না, অপ্রতিভ হবে অনভিজ্ঞ বিচারকেরাই. বিজ্ঞানের প্রতিপত্তিতে ভাঁটা পড়লেও আবার থেকে থেকে নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনে নব উৎসাহের বান ডাকে যার ফলে মানুষ ভেবে বসে যে, বিজ্ঞান সবজান্তা। তখন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদকে ধর্মের বিচারে চীফ জাষ্টিস পদবী দেওয়া হয় আর সব ভেস্তে যায়—পরম কাজী ভুল রায় দিয়ে গণ্ডগোল বাধান পদে পদেই। কিন্তু যেহেতু বৈজ্ঞানিকদের হাতেই আমাদের জীবনমরণ (আণবিক বোমার হুমকির পরে অন্ততঃ মরণ তো বটেই) সেহেতু ধার্মিকদের গোঁড়ামিকে গোঁড়ামি ব'লে সনাক্ত করতে পারলেও বৈজ্ঞানিকদের গাজোয়ারি হাকিমিকে ডগ্‌মাটিস্‌ম্‌ ব'লে চিনতে আমরা এত বেগ পাই, ভাবি ভুল ক'রে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই বুঝি আশ্চর্য রকমের খোলা মন—open to conviction.

ভুল বলছি এই জন্যে যে, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে খানিকটা মন খোলা রাখতে পারলেও অন্য কোনো গবেষণার আওতায় আসতে না আসতে বেঁকে বসেন। বিখ্যাত মনস্বী কনান ডয়ল তাঁর The Edge of the Unknown গ্রন্থে লিখেছেন যে, ফ্যারাডে ও টিণ্ডাল ভৌতিক এলাকায় আসতে না আসতে আগে থাকতেই ধরে নিতেন "এ হ'তে পারে ও হ'তে পারে না" তারপর পরীক্ষা করতে ঝুঁকতেন কেবল এই সর্তে যে তাঁদের পরীক্ষার আগে মনগড়া সম্ভব-অসম্ভবের সূত্রটি সবাইকেই মেনে নিতে হবে (১২ অধ্যায়)।

কেম্ব্রিজের লাইব্রেরি থেকে আমি বিখ্যাত রাসায়নিক স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স-এর নানা ভৌতিক পরীক্ষার বিবরণ (papers) পড়তাম সাগ্রহে। তিনি হোম নামে এক আশ্চর্য মিডিয়ামকে বার বার দেখেছিলেন শূন্যে উঠতে। তাঁর ল্যাবরেটরিতে ectoplasm এর ঘন হ'য়ে শ্রীমতী কেটি কিং-এর দর্শন পাওয়ার কথাও লিপিবদ্ধ করেছিলেন—তার ফটোও নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে কথাবার্তাও কয়েছিলেন। অতঃপর তিনি রয়াল সোসাইটিকে লেখেন প্রফেসর শারপি ও স্টোককে প্রতিনিধি পাঠাতে—এসব পরীক্ষা চাক্ষুষ ক'রে রায় দিতে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকযুগলের মন এতই খোলা ছিল যে তাঁরা পিঠ পিঠ লিখে পাঠান যে এসব ভুতুড়ে লীলা নিয়ে চর্চা করা সময় নষ্ট। কনান ডয়ল লিখছেন যে, হোমকে স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স অন্ততঃ পঞ্চাশ বার শূন্যে উঠতে দেখেছিলেন। কিন্তু কে শোনে? অন্ততঃ রয়াল সোসাইটির খোলামন বৈজ্ঞানিকেরা যে কান দিতে পারেন না একথা জানিয়ে তাঁরা গভীর গর্ব অনুভব করলেন। একেও কি বলবেন না বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি—যে বলে আমার বুদ্ধি যার নাগাল পায় না সে নাস্তি?

এরকম বৈজ্ঞানিক গোঁয়ার্তমির আরো অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারি কনান ডয়ল, স্যর অলিভার লজ, স্যর উইলিয়ম ব্যারেট প্রভৃতি গবেষকদের বই থেকে—(তাঁরা কত যে উপহাস সহ্য করেছেন "ভূত আছে" এ-রায় দেওয়ার জন্যে।)—কিন্তু আজকের দিনে সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি তথা প্যারাসাইকলজির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে বৈজ্ঞানিকদেরও চড়া অসহিষ্ণু সুর একটু খাদে নেমে এসেছে ব'লে আর দৃষ্টান্ত জড়ো করার প্রয়োজন দেখি না। কেন না এযুগে অসহিষ্ণু বৈজ্ঞানিকেরাও ধর্ম অঘটন ভগবান প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে অঙ্গীকার না করলেও আর তেমন সঘনে অস্বীকার করেন না। রাসেলের পরম বন্ধু বিখ্যাত মনীষী লোয়েস

ডিকিন্সন এমন কথাও লিখতে ভয় পান নি : "Nothing that is important can be proved by reason." এক সময়ে বুদ্ধিসর্বস্ব বিজ্ঞানকে বুদ্ধির নাগালের বাইরে সব কিছুকেই নাস্তি ব'লে চলতে হয়েছিল অতীন্দ্রিয়বাদকে উপহাস করাটা খানিকটা সে-সময়ের যুগধর্ম ছিল ব'লে। কিন্তু কোনো আন্দোলন মনোভাব বা বিশেষ সাধনার সাময়িক উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা চলে যে, সে-সাময়িক প্রয়োজনের সময় উত্তীর্ণ হবার পরে সে-আন্দোলনকে মহত্তর ও পূর্ণতর বিকাশের মধ্যে সার্থকতা খুঁজতেই হয়। এরই নাম বিবর্তন—evolution :

বিজ্ঞানের আজ সেই অবস্থা। একটা পূর্ণতর পরিণতির, সমৃদ্ধতর সুষমার (হার্মনির) অঙ্কে মহত্তর সার্থকতা খোঁজার তার সময় এসেছে। তাই তার বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে-সত্য আছে তাকে মানুষ এতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে এলেও এ-সত্য যে আংশিকমাত্র একথাও বিজ্ঞানকে মানতে হবে—ছাড়তে হবে তার বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি ও একদেশদর্শিতা। এ-সুষমার পথও মাঝপথে কাটা হয়েছে বৈ কি। মানুষ যুগে যুগে এক একটি পথে একটানা চ'লে যখন শেষে চোরা গলিতে পৌঁছিয়ে দেখে যে সে-সে পথে আর এগুনো অসম্ভব তখন তাকে ফিরে এসে এমন পথের খোঁজ করতে হয় যে তাকে আরো এগিয়ে দিতে পারে। বস্তুতান্ত্রিকতা আমাদের অনেক কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করছে, কল্পিত ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছে, অসহায় অদৃষ্টবাদ ছেড়ে স্বাবলম্বনের দীক্ষা দিয়ে মানবিক আত্মসম্ভ্রম বাড়িয়েছে—সবই সত্য। কিন্তু ঐ সঙ্গে এনেছে নাস্তিক অহঙ্কার যে বলে যে আমি সব পারি সব বুঝি। এ অহঙ্কার অবশ্য সত্যিকার ভাবুকদের মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, কিন্তু বিজ্ঞানের নাস্তিক দর্শন বহু ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও হ্রস্বদৃষ্টি বিজ্ঞানোৎসাহী বস্তুতান্ত্রিককে আত্মশ্লাঘার খোরাক জুগিয়েছে যার ফলে সে যেন দুর্যোধনের মতন দাম্ভিক সুরেই বলা সুরু করেছে যে, ধর্ম হ'ল মনের আফিং এবং যে-বৈজ্ঞানিক এ-জগতে সুদুর্লভ মান পেল তার দোসর আর কে আছে ? "মানঃ প্রাপ্তঃ সুদুর্লভঃ—কো নু স্বস্ততরো ময়া।"

দর্শনের দিক দিয়ে একথার ভাষ্য করা যায় এই ভাবে যে, বিজ্ঞানের বহির্মুখী দৃষ্টি বাহ্যজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাদি খুঁটিয়ে দেখে পরমাণুর মধ্যেও বিপুল শক্তির পরিচয় পেয়ে বুঝতে শিখেছে যে, জড়বাদ ব'লে এ-জগতে কিছুই নেই। সবই এক মহাশক্তির খেলা প্রতি পরমাণুর বুকেই চলেছে এক আশ্চর্য অভাবনীয় শৃঙ্খলার নৃত্য যার কিছুটা বুদ্ধি ধরতে পারে বটে কিন্তু সে-আভাসের মধ্যে দিয়েই সে দেখতে পায় যে, মহাবিশ্বশক্তির সৃষ্টিলীলার এক অতি সামান্য ভগ্নাংশই তার গোচরে এসেছে। তাই সে বলে মহামতি নিউটনের বিনয়ী সুরে "আমি একটি শিশু মাত্র যে সমুদ্রের তীরে খেলতে খেলতে গড়পড়তা উপল বা ঝিনুক পেরিয়ে খবর দিল এমন উপলের যা আর একটু বেশি মসৃণ, এমন ঝিনুকের যা আর একটু বেশি সুন্দর—কিন্তু সত্যের মহাসিন্ধু আমার সামনে অনাবিষ্কৃতই র'য়ে গেল।"

আজকের দিনে ক্ষুদ্রবুদ্ধি গোঁড়া বিজ্ঞানোৎসাহীরা বিজ্ঞানবুদ্ধিকে সর্বার্থসাধিকা ব'লে শঙ্খধ্বনি করলেও চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকেরা সবাই ক্রমশঃ বিজ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন। তাই তাঁরা বিজ্ঞানের পাণ্ডাদের সুরে সুর

মিলিয়ে বলেন না—"কো হ্ন স্বস্ততরো ময়া" (আমার মতন কে আছে?) তাঁরা বলেন আইনষ্টাইনের মতন বিনয়ী সুরে যে, সৃষ্টি-লীলার অচিন্তনীয় মানচিত্রের অলক্ষ্য নীহারিকার গতিবিধির অভাবনীয় বেগ ও শৃঙ্খলার দৃশ্যে "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়, ক্ষুদ্র দৃষ্টি অভিভূত হয়।" এডিংটন জীন ক্যারেল মিলিকান প্রমুখ মনীষীরা তাই বলেন না আর যে, বুদ্ধি যার তল পায় না সে নাস্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথিকা মনে পড়ে। এক পথিক বাড়ী ফিরে এসে তার বন্ধুকে বলে: "আমি কাল আসতে আসতে দেখলাম অমুক বাড়ীটা হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেল।" বন্ধু বললেন: "দাঁড়াও হে খবরের কাগজটা দেখি।" ব'লে দেখে বললেন: "ধেৎ। সব বাজে কথা। খবরের কাগজে তো লেখে নি বাড়ী পড়ার কথা।" পথিকবন্ধু বললেন: "সে কি হে। আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলাম।" উত্তরে বন্ধু অম্লানবদনে বললেন: "ও চোখের ভুল। খবরের কাগজে যখন লেখে নি তখন বাড়ী পড়তেই পারে না।" বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এই ভুলই করেছিলেন, বলেছিলেন: "মুনি ঋষি যোগী যতিদের দল যে-ভগবানকে দেখেছেন বলছেন তাঁর কোনো খোঁজ যখন আমার বৈজ্ঞানিক বকযন্ত্রে মিলছে না তখন বলবই বলব যে ও-দর্শন তাঁদের চোখের ভুল, স্বকপোল-কল্পিত। ভলটেয়ার বেকন হার্বার্ট স্পেসার প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের ভুল হয়েছিল এইখানেই: যে, বিজ্ঞান ও বুদ্ধি প্রকৃতির নানা শক্তির যে চমৎকার ছক কেটেছে তার বাইরে আর কিছুকেই মানা চলে না, বুদ্ধি যে-ছক কাটতে অক্ষম সে-ছক নামঞ্জুর।

কিন্তু এ-নিশ্চয়োক্তির নিশ্চয়তা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এল যখন ক্রমশঃ তাঁরা বিনয়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে সৃষ্টিলীলার দুরবগাহ মহিমার কিছু আভাস পেলেন। এডিংটন বিজ্ঞানের এই change of front ওরফে নবদৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস এত চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর "Nature of the Physical World"-এ, যে বইটিকে য়ুরোপে অনেক বিশেষজ্ঞই অ্যালেক্সিস ক্যারেলের Man the Unknown নামক যুগপ্রবর্তক গবেষণার পাঙ্‌ক্তেয় করেছেন। ক্যারেলের বইটি মানুষের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গবেষণা। এডিংটনের বইটি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক আলোচনা। একটি অন্তর্মুখী, অন্যটি বহির্মুখী। কিন্তু মজা এই যে, শেষে উভয়েই এসে পৌঁছেছেন একই সিদ্ধান্তে যে, জীবন তথা বিশ্ব এতই আশ্চর্য ও অগাধ যে, বুদ্ধি দিয়ে কেউই তল পেতে পারে না এ-যুগল রহস্যের। এই রহস্যের (mystery) কথা ভেবেই আইনষ্টাইন ও শ্বাইৎজারের মতন মহা-মনীষীও বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছিলেন। আইনষ্টাইন স্তবগান করেছিলেন religious reverence-এর, শ্বাইৎজার reverence for life-এর। জীন্সও তাঁর Mysterious Universe-এও সৃষ্টির আকাশতত্ত্ব ও বেগতত্ত্বের খবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে মানুষের ধর্ম-ভাবকে মান দিয়েছেন। এরই নাম বিজ্ঞানের সুমতি।

এ-সুমতির কিছু খবর দিতে প্রথম এডিংটনের বইটি থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিই দেখাতে—কেন ও কীভাবে বিজ্ঞান তার জবরদখলের অনেকখানি ভূমিই ছেড়ে দিয়েছে ধর্মকে। যদিও বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে সে বলেছিল যে ধর্মকে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দেবে না কিছুতেই।

প্রথমে এডিংটন দেখাচ্ছেন যে, বৈজ্ঞানিক

বিশ্লেষণী যুক্তি—যাকে এক সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একমাত্র আরোহী ব'লে গণ্য করা হ'ত এবং বলা হ'ত যে, এ-বিচারী যুক্তি যাকে বাহাল করতে নারাজ সে নামঞ্জুর, কেন না যুক্তি ছাড়া অন্য কোনো পথে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান মিলতেই পারে না, সে-যুক্তির সাধ্য সীমাবদ্ধ। এডিংটন বলছেন: জ্ঞান দ্বিবিধ: symbolic অর্থাৎ প্রতীকসম্বন্ধীয় ও intimate অর্থাৎ অন্তরঙ্গ। ব'লে সূত্র দিচ্ছেন যে, যুক্তির এলাকা হ'ল প্রথমটি, কারণ দ্বিতীয়টিকে পরীক্ষা করতে এলেই দেখা যায় যে সে বিশ্লেষণের অতীত।* তাঁর ভাষ্য এই যে, ধরো বাতাস চলেছে জলের বুকে। ইকোয়েশন (সমীকরণ) ক'ষে দেখতে পাই ঘণ্টায় দুমাইল চললে বায়ু তরঙ্গ তুলতে পারে। জেনে মনে হ'ল: বাঃ জানা গেল কিসে কী হয়। কিন্তু তারপর একটি কবিতায় পড়লাম হাওয়া উঠতেই জলে হাসির কাকলি ধ্বনিত হ'ল,† মনেও ছোঁয়াচ লাগল এ-আনন্দের। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে (লিখছেন এডিংটন): এ-হাসি তো কল্পনা, তবে এতে আনন্দ এও তো মায়া। বটে, কিন্তু এ-আনন্দ কল্পনা সব জড়িয়ে আর একটি জগৎ গ'ড়ে ওঠে যা প্রাণবন্ত, যা গণিতের ধার ধারে না। কিম্বা ধরো রসিকতা, (বলছেন তিনি) বুদ্ধি দিয়ে নানারকম রসিকতার বিশ্লেষণ ক'রে তার অনেক কিছুই জানা যায় কিন্তু সে-রসিকতায় হেসে কেন মন প্রফুল্ল হয়, কেন মনে হয়—ভাগ্যে মানুষ হাসতে পারে—এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায়, রসবোধ আর তথ্যজ্ঞান, গোনাগুন্তি আর পূজা-অর্চা এ-দুই একেবারে আলাদা চেতনার ছন্দ: একটা অন্তরঙ্গ অনুভূতি, অন্যটা প্রতীকের জ্ঞান। অপিচ: "We all know that there are regions of the human spirit untrammelled by the world of physics In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art in a yearning towards God, the soul grows upward and finds the fulfilment of something implanted in its nature The sanction of this development is within us, a striving born with our consciousness or an inner Light proceeding from a greater power than ours····· We are meant to fulfil something by our lives. There are faculties with which we are endowed, or which we ought to attain, which must find a status and an outlet in the solution."

(এর ভাবার্থ: পদার্থবিজ্ঞানের বাইরেও নানা জগৎ আছে। সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে নানা ভাবোদয়, শিল্পের মধুর ব্যঞ্জনা, ভগবানের জন্যে ব্যাকুলতা—এ সব কিছুর মধ্যে দিয়েই আমাদের অন্তরাত্মা এমন কোনো গভীর প্রাপ্তির আভাস পায় যার আকাঙ্ক্ষার বীজও আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। এই যে বিকাশ—এর অনুমোদনও আমাদের অন্তরেই নিহিত, যে আমাদের চেতনার সহজাত, কিম্বা বলা যেতে পারে—এর উৎস এমন কোনো আলো যার জনয়িতা আমাদের মানবিক শক্তির চেয়ে কোনো মহত্তর শক্তি ···আমরা আমাদের জীবনের তীর্থযাত্রায় কোনো-না-কোনো পরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে চাই

---

* Nature of the Physical World, ১২ অধ্যায় (Science and Mysticism) দ্রষ্টব্য।

† এডিংটন উদ্ধৃত করেছেন একটি কবিতা.

There are waters blown by changing winds
to laughter
And lit by the rich skies, all day. And after,
Frost, with a gesture, stays the waves
that dance
And wandering loveliness. He leaves a white
Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining peace, under the night.

কৃতকৃত্য হ'তে। আমাদের মধ্যে নানান্ বৃত্তি আছে—আমাদের কর্তব্য সে সব বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলা—যারা চায় এক উজ্জ্বল আত্মমর্যাদায় আসীন হ'য়ে আমাদের এগিয়ে দিতে কোনো পরম সমাধানের দিকে।)

কাজেই এডিংটন বলছেন—অমুক জ্ঞান বাস্তব (real) আর অমুক জ্ঞান কল্পনা (unreal) এ ধরনের বিচার করতে গেলে পাকে পড়তে হবেই হবে। কারণ বিজ্ঞানের কারবার প্রতীকজ্ঞান নিয়ে: "To understand the phenomena of the physical world it is necessary to know the equations which the symbols obey but not the nature of that which is symbolised"

কাজেই, তিনি বলছেন: "এই বিজ্ঞানের জগৎ (যার নাম দিয়েছেন তিনি pointer readings-এর সমষ্টি) বাস্তব হ'লেও আন্তর জগৎ এর চেয়ে কিছু কম বাস্তব নয়।" কেমন? তিনি উপমা দিচ্ছেন রামধনুর। বিজ্ঞান বলে রামধনু হ'ল ঈথারের স্পন্দন যার তরঙ্গ ·০০০০৪০ সেন্টিমিটার থেকে ·০০০০৭২ সেন্টিমিটার লম্বা—স্পেকট্রস্কোপের এই অকাট্য বাণী। কিন্তু আমরা তো স্পেকট্রস্কোপ নই, কাজেই আমরা বলতে পারি বৈকি যে, রামধনুকে এইভাবে দেখাটাও জগতের একটা বিধান, যেমন বিধান তার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মেপে রামধনুর বর্ণতথ্য জানা। অন্য ভাষায় বলছেন সাহেব—"ধর্মের বিশিষ্ট বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের তথ্য বা পদ্ধতি দিয়ে প্রমাণ করার কথা আমি ভাবতেই পারি না ("I repudiate the idea of proving the distinctive beliefs of religion either from the data of physical science or by the methods of physical science.")!

আমাদের দেশে একটা অভিযোগ ঘড়ি ঘড়ি শোনা যায় ধর্মের বিরুদ্ধে: যে, ধর্মের অনুভব উপলব্ধি দেখা শোনা ধরা ছোঁওয়া সবই ছায়াভ, ধোঁয়াটে। "মিসটিক" বিশেষণটি চলতি প্রয়োগে প্রায়ই misty-র সগোত্র ব'লে ধরা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ঠিক উল্টো, যেহেতু বিজ্ঞান হ'ল আলো ভরা, স্পষ্ট, অতিপ্রত্যক্ষ—যেখানে না কি ঝাপসা কিছুই নেই। কিন্তু হাল আমলে—বলছেন সাহেব—বিজ্ঞানের এই একটা সুমতি মতন হয়েছে যে, আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিদের আমরা ছি ছি করি না তাদের অস্পষ্টতার জন্যে কারণ "We have travelled far from the standpoint which identifies the real with the concrete"—অর্থাৎ সেদিন আর নেই যেদিন আমরা বলতাম যে বাস্তব মানেই যা অতিপ্রত্যক্ষ, ধরা ছোঁওয়া যায়। বলি না কেন? কারণ বললে সব আগে গঙ্গাযাত্রা করাতে হয় ইলেকট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি অদৃশ্য বৈদ্যুতিক ছোটাছুটিদের যাদের সম্বন্ধে হদিশ দেওয়া যায় কোনো মডেল এঁকে বা ছক কেটে নয়—কয়েকটি সমীকরণ (equation) পেশ ক'রে।

এডিংটনের লেখা অনেকস্থলেই দুরবগাহ হ'লেও তাঁর রসিকতার আমেজে মন খুশী হয় প্রায়ই তাঁর নানা মন্তব্যে। যথা, যেখানে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সংকটের কথা বর্ণনা করছেন:

When Dr. Johnson felt himself getting tied up in argument over Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter and that everything in the universe is merely ideal, he answered, striking his foot against a large stone till he rebounded from it: "I refute it thus." Just what that action assured him of is not very obvious, but apparently he found it comforting. And today the matter-of-

fact scientist feels the same impulse to recoil from these flights of thought back to something kickable, although he ought to be aware by this time that what Rutherford has left us of the large stone is scarcely worth kicking

(Chapter 12 · Science & Mysticism, pp 326-7)

আরো অনেক সুচিন্তিত ভাবোদ্দীপক কথা বলেছেন সাহেব তাঁর এই চমৎকার বইটিতে যার আলোয় বিজ্ঞানের অনেক ধর্মবিমুখ যুক্তি তথা উক্তিকে নাকচ করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে মনে হয় ধর্মের কিছু অনুভবও হয়েছিল নইলে ধর্মের নানা প্রতীতির সম্বন্ধে তিনি এমন গভীর কথা বলতে পারতেন না যে, ধর্মের নানা অনুভূতি মাপজোপের এলাকার বাইরে হ'লেও সে-সব জড়িয়েই তবে আমাদের ইন্দ্রিয়জগৎ গ'ড়ে উঠেছে বুদ্ধি দিয়ে যার সংশোধন করেন বৈজ্ঞানিকেরা। সেই সংশোধনের একটি—এডিংটনের মতে—এই স্বীকার যে ধর্মের নেত্র জগৎকে যে ভাবে রূপান্তরিত ক'রে দেখে তাকে বলা চলে "মানবপ্রকৃতির দিব্যভাবের কীর্তি—the achievement of a divine element in man's nature" (১২ অধ্যায়)।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বগীতি

শ্রীঅনন্তনাথ মুখোপাধ্যায়

মনের মাঝারে যত সুর বাজে
  সবই যে তোমার লাগি—
হে রামকৃষ্ণ, চরণে তোমার
  এই বোধটুকু মাগি !

বাহির বিশ্বে যাহা কিছু শুনি
  সেও তব সুর, সেও তব বাণী—
এইটুকু যেন বুঝিবারে পারি,
  মায়া-ঘুম হতে জাগি।

ভিতরে বাহিরে কোথা কোন ঠাঁই
তুমি ছাড়া আর কোন সুর নাই ;
দেহ মন প্রাণ সেই সুরে যেন
  হয় সদা অনুরাগী।

মহাপরিনির্বাণের বাণী

ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্য

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, হিন্দু ধর্ম তো কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করে নাই। তদুত্তরে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'প্রাচ্যের প্রতি বুদ্ধ যেমন এক বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্যের প্রতিও আমার এক বাণী আছে।' বুদ্ধের কোন্ বিশেষ বাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত উল্লেখ নাই, আবার নিজের প্রচারিত কোন বিশেষ ধর্মমতও তিনি এখানে উল্লেখ করেন নাই। তবে উপরোক্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, বুদ্ধোত্তর যুগে প্রাচ্যে তাঁহার মতাবলম্বীর ব্যাপক প্রসার স্বামী বিবেকানন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

মহানির্বাণের প্রস্তুতিপর্বে বুদ্ধের নিকট হইতে আমরা কয়েকটি সারগর্ভ বাণী শুনিতে পাই। বৈশালী রমণীয় স্থান, রমণীয় তার চৈত্যসমূহ। এই মনোহর পরিবেশে অন্তকালের তিন মাস পূর্বে সমগ্র ভিক্ষু শিষ্যমণ্ডলীর এক সমাবেশে বোধিসূর্য বুদ্ধের বাণী ঘোষিত হইয়াছিল—

'যে জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি, জগতের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া, সর্ব প্রাণীর হিত ও উপকারের জন্য উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া কার্যে পরিণত কর, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত কর, দেশ-দেশান্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন কর।'[১]

একদা পাঁচশত বৌদ্ধভিক্ষুর উদ্দেশ্যে যে প্রচারমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, কালক্রমে উহা রাজাপ্রজানির্বিশেষে নরনারীর হৃদয় জয় করিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডের এক প্রধান ধর্মে পরিণত হইল।

যে জ্ঞানলব্ধ সত্য প্রচার করিবার ভার বুদ্ধ শিষ্যদের হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন উহার স্বরূপ কি? কোন্ পথ অবলম্বনেই বা উহাতে পৌছান যায়?

ভগবান তথাগত ভিক্ষু শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, 'চারি সত্যের সম্যক্ জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার ও তোমাদের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইতেছে। ঐ চারি সত্য কি কি? আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির সম্যক্ জ্ঞান। ঐ আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি সম্যক্রূপে জ্ঞাত ও উপলব্ধ হইলে ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনর্জন্মের মূল বিনষ্ট হয়। তখন আর জন্মান্তর নাই।'

শাস্তা ভণ্ডগ্রামে আরও বলিলেন, 'অনুত্তর শীল সমাধি প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি যশস্বী গৌতম কর্তৃক উপলব্ধ। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ উহা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। দুঃখান্তকারী, চক্ষুষ্মান শাস্তা শান্ত।'[২]

বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি সাধনপথের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সাধনাবস্থায় দুই চরম সীমা অবশ্য বর্জনীয়। কাম্যবস্তুর অনর্থরূপ ভোগ ও দেহনির্যাতন উভয়ই সমভাবে হেয়। উহাদের কোনটাই মানুষকে যথার্থ বোধি আনিয়া দিতে পারে না। এই দুই অন্ত পরিত্যাগ করিয়া যিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন তিনিই সম্বোধি নির্বাণ লাভ করেন।

১ দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮, অনুবাদক ভিক্ষু শীলভদ্র

২ ঐ— পৃঃ ১১০

এই মার্গ সনাতন ও উহা আর্য অষ্টাঙ্গিক নামে খ্যাত। যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

সম্যক্ দৃষ্টি অর্থে দুঃখের উৎপত্তি, নিরোধ ও তদুপায়ের জ্ঞান। কামনা বিদ্বেষ ও হিংসা বর্জনই সম্যক্ সঙ্কল্প। মিথ্যা, পিশুন ও পরুষ ও বৃথা বাক্যালাপ হইতে বিরতিই সম্যক্ বাক্। হিংসা ব্যভিচার ও অদত্ত বস্তুর গ্রহণ হইতে বিরত থাকাই সম্যক্ কর্মান্ত। ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকানির্বাহই সম্যক্ আজীব। মনে পাপ ও অকুশল ভাব উদয় না হইতে দেওয়া, মন বিশুদ্ধ করা, নব নব কুশল ভাবের আনয়ন ও ঐ ভাবের স্থায়িত্ব, বৃদ্ধি ও পূর্ণতা করার চেষ্টাই সম্যক্ ব্যায়াম। দেহ ও মনের যাবতীয় কার্য-কলাপ বিষয়ে সর্বদা স্মৃতিমান থাকাই সম্যক্ স্মৃতি। কাম ও অকুশল কর্ম ত্যাগ করিয়া বিতর্ক ও বিচার অতিক্রমপূর্বক প্রীতির অতীত হইয়া সুখ-দুঃখ রহিত, উপেক্ষা ও স্মৃতিরূপ পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই সম্যক্ সমাধি।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ গোতম কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া শ্রুত আছে। কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নাই। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে এই পথকে পুরাণ সনাতন ও পূর্ব পূর্ব বুদ্ধ কর্তৃক অনুসারী পথ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন বনানীর অভ্যন্তরে অগ্রগমনকালে বহুকালের পুরাণ, জনগণের দ্বারা পূর্বে ব্যবহৃত এক অতি প্রাচীন পথ কাহারও নয়নগোচর হইল। অনন্তর সেই পথ অনুসরণান্তে এক প্রাচীন নগর তথা আরাম, উপবন, পুষ্করিণী সম্বলিত বিরাট রাজপ্রাসাদেরও অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইল। পরে রাজা বা রাজমন্ত্রীর নিকট ব্যক্ত হইল যে গহন অরণ্যের মধ্যে অতীতে বহুজনদ্বারা অধ্যুষিত বিভিন্ন প্রমোদব্যবস্থায় পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদযুক্ত এক অতি প্রাচীন নগরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মহাজন—আপনি সেই জীর্ণ নগর সংস্কারপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করুন। তচ্ছ্রবণান্তে রাজা বা রাজমন্ত্রী নগররক্ষায় যত্নপর হইলেন। ধীরে ধীরে উহা বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা বর্ধিত, সমৃদ্ধ ও জনগণের কলনিনাদে পরিপূর্ণ হইল।

গোতম বলিয়াছেন, সেইরূপ আমিও প্রাচীন কালের সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ কর্তৃক অনুসারী এক অতি প্রাচীন পথ, প্রাচীন মার্গ আবিষ্কার করিয়াছি।

পরিনির্বাণের প্রস্তুতিপর্বে নিজ উপলব্ধ জন্মমৃত্যু-ক্ষয়কারী অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাহাতে তাঁহার শিষ্য ও ভিক্ষুগণ কর্তৃক আয়ত্ত হয় ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে তৎ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় সেইদিকে গোতমের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তথাগতের বাণী পর্যালোচনা করিলে আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে তিনি ভিক্ষু ও গৃহস্থ উপাসকবৃন্দের জন্য পৃথক পৃথক আচারবিধির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এহ ধারণা প্রায় সর্বজনবিদিত যে তথাগত গৃহস্থ উপাসক নির্বিশেষে সকল নরনারীকে শ্রমণত্ব গ্রহণপূর্বক নির্বাণলাভের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। গোতমের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উহার সত্যতা কতখানি তাহা আলোচনার বিষয়। একবার আনন্দ তথাগতের দেহ সম্বন্ধে কর্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষুমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আনন্দ—তোমরা তথাগতের শরীরপূজায় ব্যাপৃত হইও না। সদর্থে প্রযুক্ত হও, সদর্থের অনুসরণ কর, সদর্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সঙ্কল্প হও।'[৩]

---

৩ দীঘনিকায়, পৃঃ ১২৯

উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মানুষপূজায় রত হউক ইহা তথাগত কিছুতেই চান নাই। কুশিনারায় গমনপথে বুদ্ধ যখন শালতরুর নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তখন অকালে পুষ্পসকল পড়িয়া তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিল। পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া প্রকৃতি যখন তথাগতকে সংবর্ধনা করিতে ব্যস্ত তখনও বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'আনন্দ, কেবলমাত্র এইরূপ ঘটনা দ্বারা তথাগতকে যথার্থরূপে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা করা হয় না। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী ধর্মনিষ্ঠ নর বা নারী, উপদেশাবলী অনুসারে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যসমূহকে অবিরত পালন করেন, তাঁহারাই যথার্থরূপে তথাগতকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্ঘ্য দান করেন। অতএব আনন্দ, অবিচ্ছিন্নভাবে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্য পালনে রত হও, উপদেশাবলীর অনুসরণ কর। এইরূপ করিলে তোমরা বুদ্ধের যথার্থ সম্মান করিবে।[৪]

মানুষকে সদর্থে উদ্বুদ্ধ করিয়া গোতম কুশিনারায় আগমন করিয়াছেন। মহাপ্রস্থানের যাত্রার শেষ অঙ্ক উপস্থিত। যে জ্ঞানারুণের উদয়ে বোধিদ্রুমতল ঊষার প্রথম ক্ষণে নব প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিল উহা শত শত হৃদয়দীপ প্রজ্বলিত করিয়া অস্তাচলে গমনের আয়োজনে ব্যস্ত। যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া তিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন উহার সিদ্ধি হইয়াছে। গোতম জীবনের দুঃখকষ্ট কি তাহা জানিয়াছেন, দুঃখোৎপত্তির নিবৃত্তি কিসে হয় তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার স্থূলদেহ শীঘ্রই মর্ত্যধাম হইতে বিদায় লইবে কিন্তু মানুষকে প্রেরণা দিবার, তাহাদের শুভ পথে চালিত করিবার জন্য থাকিয়া যাইবে শাস্তার বাণী—তথাগতের নির্দেশ। বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, 'আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়াছি ও ঘোষণা করিয়াছি, আমার দেহান্তে তাহাই তোমাদের শাস্তা।' যে ভিক্ষু শিষ্যবৃন্দ তাঁহার বাণী যথাযথ উপলব্ধিপূর্বক দেশ হইতে দেশান্তরে প্রচার করিবেন, ধর্মের শাশ্বত মূলমন্ত্র নরনারীর সম্মুখে প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদের জন্য তিনি এক বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। কুশিনারা গ্রামে পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি ভিক্ষুমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলিয়া গিয়াছেন, 'ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, ধ্বংসই সর্বপ্রকার মিশ্র পদার্থের ধর্ম। যত্নসহকারে নিজের মুক্তির মার্গ পরিষ্কৃত কর।' নিজের মুক্তি করায়ত্ত না করিলে তাহার দ্বারা ধর্মপ্রচার কি করিয়া সম্ভব? আর প্রচারকার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ না করিলে বুদ্ধের আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই অনিত্য সংসারে ভিক্ষু শিষ্যগণ যাহাতে নিজ ধর্মজীবনের উৎকর্ষ আনয়ন করিয়া সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক স্রোতকে বুদ্ধ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিয়া মানুষকে শান্তির পথ দেখাইতে পারেন, উহার জন্য গোতম ভিক্ষু শিষ্যদের উপর এক মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

আর সর্বসাধারণ গৃহস্থ, উপাসক, উপাসিকা-বৃন্দ, যাহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্যই তিনি ভিক্ষুদের নিজ হাতে গড়িয়াছেন, তাহাদের প্রতি কি বুদ্ধের কোন বাণী নাই? দৈনন্দিন কর্মময় জীবনের ফাঁকে মানুষ যাহাতে ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারে, পরম কারুণিক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার সেবা-পূজার দ্বারা এক ধর্মোন্নত জীবন গঠনে ব্রতী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কি বুদ্ধের কোন অবদান নাই? সাধারণ মানুষকে তিনি সে পথেরও সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

---

৪ দীঘনিকায়, পৃঃ ১২৬

বুদ্ধের সময়ে হিন্দুধর্মে যে সব ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলন ছিল, যেমন যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, দেবতার আরাধনা ইত্যাদি, উহারা অভ্যুদয়াদি ও মানসিক শান্তি আনয়ন করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্মের ভিত্তি এমন কিছু সুদৃঢ় ছিল না যাহাতে মানুষ নূতন ধর্মমত উপেক্ষা করিতে পারে। বস্তুতঃ মানুষ যেমন চিরকাল নূতনত্বের নিকট মাথা নোয়াইয়াছে তেমনি বুদ্ধের সদ্য-উপলব্ধ বাণীর নিকটও তখনকার মানব মাথা নত করিল। ক্রিয়াকাণ্ডের নতি-স্বীকারের কারণহিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের কথাই উল্লেখযোগ্য—'বৌদ্ধগণ যে সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমক্ষে যে সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের বিস্তার এইগুলির দরুণ যতটা হইয়াছিল, বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ বা চরিত্রগুণে ততটা হয় নাই। বড় বড় মন্দির, জাঁকজমক-পূর্ণ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সহিত সংগ্রামে গৃহস্থদের ব্যক্তিগত যজ্ঞকুণ্ডসমূহ দাঁড়াইতে পারিল না।'

গোতম বলিয়াছেন, 'ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও গৃহ-পতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন। তাঁহারা তথাগতের শরীরপূজা করিবেন।'[৫] এই তথাগত-শরীরপূজার নব রূপায়ণ মানুষকে আকৃষ্ট করিল। সাধকদের ধ্যানে প্রস্ফুটিত হইল বৌদ্ধ দেবদেবীর স্বরূপ, তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন দেবতার ঐশী শক্তি। অন্তর্যামী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বাহ্য পূজার, মানবীয় সেবার। বৌদ্ধ ধর্মেতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ধর্মস্থাপনার্থ বুদ্ধাবতারের আবির্ভাব সকলে বিশ্বাস করিল, অষ্টাঙ্গিক মার্গে পূর্ণ আস্থা আনয়নপূর্বক সঙ্ঘকেই ধর্মপ্রচারের একমাত্র যন্ত্র বলিয়া জানিল। বুদ্ধ তাহাদের নিকট সাধকাগ্রণী জ্ঞানী তাপসই নন উপরন্তু পরম শুভকর, লোকহিতকর ইষ্টদেবতা। যাঁহারা বুদ্ধের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মূর্তিপূজায় ব্রতী হইলেন সেই গৃহস্থ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দই বুদ্ধপূজার পথিকৃৎ।

তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় দিকে দিকে মস্তক উত্তোলিত করিয়া দাঁড়াইল কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির, পার্শ্বে চৈত্যসমূহ। মন্দির উৎসর্গীকৃত হইল দেবতার উদ্দেশ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইল মর্মর-মূর্তি। উপাসকবৃন্দ ভক্তি-অর্ঘ্য ঢালিয়া দেবতার তুষ্টিবিধান করিলেন। বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, শিল্প বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার লাভ করিল। ভিক্ষু প্রচারকবৃন্দ বুদ্ধের বার্তা ঘরে ঘরে পৌছিয়া দিলেন।

তথাগতের অমর বাণী বিফল হয় নাই। কুশিনারায় মহাপ্রস্থানের প্রস্তুতিপর্বে মানবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ভিক্ষু ও পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে যে বাণী একদা ঘোষিত হইয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই বাণীর পরি-পূর্ণতার সাক্ষ্য আজিও বহন করিয়া চলিয়াছে।

---

৫ দীঘনিকায়

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(১) যান্ত্রিক শক্তি

বিজ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে মানুষের কৌতূহল ও সুষ্ঠুভাবে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করবার আগ্রহ থেকে। প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে, রাত্রির অন্ধকার মিলিয়ে যায়, প্রকৃতির চেহারা মানুষের চোখে ধরা পড়ে, মানুষ তাপ অনুভব করে। সূর্যের এই অশেষ গুণ দেখে মানুষ সূর্যকে মনে করত একজন দেবতা যাঁর করুণাই আলো ও তাপ হয়ে পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ সম্ভব করেছে। পরে আবিষ্কৃত হল আগুন—সূর্য যখন ডুবে যায় তখন এই আগুন থেকেই পাওয়া যায় আলো ও তাপ—তাই সূর্যের মত আগুনকেও বলা হয়েছে আর একজন দেবতা। কালক্রমে মানুষের কৌতূহল জেগেছে—এই দেবতাদ্বজনের প্রকৃত স্বরূপ কি? সূর্য কেন রোজ সকালে ওঠে? সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে আলো পাওয়া যায়, আগুন থেকে যে তাপ পাওয়া যায় সেই আলো এবং তাপই বা কি? প্রকৃতিতে যত রকমের ঘটনা ঘটে তার সব কিছুতেই মানুষের কৌতূহল—কেন এই সব ঘটনা ঘটে? ঘটনাগুলির যোগসূত্র কি? কোন্ মূল নিয়ম সব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে? এই মূল নিয়মটি জানাই বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য।

জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘর চাই, বস্ত্র চাই। শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য খাদ্য চাই। সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করা চাই। পরস্পরের আদানপ্রদান করা চাই। প্রতিকূল অন্য মানবগোষ্ঠী বা জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা চাই। এই সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য সভ্যতার আদিমযুগে নিজের কায়িক ক্ষমতার উপরেই মানুষ নির্ভর করত। পরবর্তীকালে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করা হল নানারকমের যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করে অল্পায়াসে সব কাজ করা সম্ভব হয়। যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন ধরনের কাজের যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ভাবলে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই মানুষকে কোন ভারী জিনিসকে হয় পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয় বা এক উচ্চতা থেকে অন্য উচ্চতায় তুলতে হয়। দুটি ক্ষেত্রেই হাতের পেশীকে সঙ্কুচিত করে বলপ্রয়োগ করতে হয়। তাই বলপ্রয়োগে কোন জিনিসের কি পরিবর্তন হয় এ নিয়েই প্রথমে বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু হয়। বলের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে বলবিদ্যা (Mechanics)। বলবিদ্যার অগ্রগতি থেকেই একভাবে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে।

বলবিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি হল স্থৈতিক বলবিদ্যা (Statics), দ্বিতীয়টি হল গতিজনক বলবিদ্যা (Dynamics)। বলবিদ্যার গোড়ার কথা হল বলের স্বরূপ। কোন বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করলে বস্তুটির কি পরিবর্তন হয় তা থেকে বল কি বোঝা যেতে পারে। বলপ্রয়োগে বস্তুর গুণাগুণের ওপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হতে

পারে। বস্তুটি পরিবর্তনীয় হলে বলপ্রয়োগে বস্তুটির আকারের পরিবর্তন হয়। যেমন একটি ইটের টুকরোয় হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিলে টুকরোটি গুঁড়ো হয়ে যায় বা একতাল কাদামাটিতে চাপ দিলে তালটির চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে বস্তুর পরিবর্তন বলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ঠিকই কিন্তু তা বস্তুটির এমন সব গুণের দ্বারা নির্ণীত যার সহজ পরিমাপ করা যায় না। তাই পরিবর্তনীয় পদার্থের ওপরে বলের প্রভাব থেকে বলের সহজ সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

অপরিবর্তনীয় (Rigid) পদার্থে বলের প্রভাবে যে পরিবর্তন হয় তা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। দুরকমের পরিবর্তন হতে পারে। বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে বা গতিবেগের পরিবর্তন হতে পারে। ধরা যাক পৃথিবীর ওপরে কোন ভারী জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটিকে যদি দড়ি দিয়ে কপিকলে টাঙিয়ে দিয়ে দড়িটির খোলা দিকে বলপ্রয়োগ করা হয় তাহলে জিনিসটি ওপরে উঠে যায় বা জিনিসটির অবস্থানের পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে জিনিসটির ওপরে দুটি বল কাজ করে। মাধ্যাকর্ষণের বল জিনিসটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানে এবং দড়িটির খোলা দিকে যে বলপ্রয়োগ করা হয় তা কপিকলের মাধ্যমে জিনিসটিকে ওপরের দিকে টানে। যদি এই বলদুটি সমান হয় তাহলে জিনিসটি স্থির থাকে কেননা এরা পরস্পরের বিপরীতে কাজ করে। যদি একটি বল অপরটির চেয়ে বেশী হয় তাহলে যেদিকে বলের পরিমাণ বেশী সেইদিকে জিনিসটি স্থানান্তরিত হয়। স্থৈতিক বলবিদ্যায় কোন বস্তুর উপরে বিভিন্ন দিকে বলপ্রয়োগ করলে বস্তুটির কিভাবে অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে তারই পর্যালোচনা করা হয়।

একটি জিনিসের উপরে একাধিক বলপ্রয়োগের ফলে যদি জিনিসটির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় ও জিনিসটি স্থানান্তরিত হয় তাহলেই বলা হয় কাজ করা হয়েছে। এই কাজের পরিমাপ নির্দিষ্ট হয়েছে মোট বল ও স্থানান্তরণের দূরত্বের গুণফল। আগে যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এমনিভাবেই কাজ করা হয়। সব জিনিসই সাম্যাবস্থায় কোন বলের প্রভাবে থাকে, তাই কাজ করতে গেলে আমাদের বাহুবল প্রয়োগ করে এই সাম্যাবস্থাকে ব্যাহত করতে হয়। যে বলের প্রভাবে জিনিসটি সাম্যাবস্থায় আছে বাহুবলকে তার সমান করতে হয়। কাজের প্রয়োজনে এমন অবস্থা হতে পারে যে আমাদের বাহুবল সাম্যাবস্থাকে পরিবর্তন করার উপযুক্ত নয়। স্থৈতিক বলবিদ্যার পর্যালোচনা থেকে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে, যার দ্বারা এসব ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কপিকল, লিভার (Lever), গাড়ী ইত্যাদি। এদের দ্বারাই মানুষের সীমিত বাহুবল ব্যবহার করেও পিরামিড, বিরাট সব অট্টালিকা ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি পৃথিবীকেই তুলে ফেলার কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেও কাজ কিন্তু মানুষই করে এবং সব সময়েই কাজের পরিমাণ হল বাহুবল এবং যতটা দূর অবধি হাতটা সরান হয় তারই গুণফল। দেখা যাচ্ছে বস্তুর ওপরে বলপ্রয়োগের একটি ফল হল বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন ও কাজ করা। কিন্তু কাজ পরিমাপের কোন নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নেই বলে—বস্তুতে যেভাবে বলপ্রয়োগ করলে শুধুমাত্র বস্তুটি স্থানান্তরিত হয় তা থেকে বলের গুণগত সংজ্ঞা দেওয়া গেলেও পরিমাণগত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

বলপ্রয়োগে বস্তুর দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন হল গতিবেগের পরিবর্তন। ধনুক দিয়ে যখন তীর ছোড়া হয় তখন ধনুকের সাহায্যে ধাক্কা দিকে তীরটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ধাক্কা দেওয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা যায় ক্ষণস্থায়ী বল (Impulse) প্রয়োগ। যেসব বলের প্রভাবে কোন বস্তু স্থিতাবস্থায় থাকে তাদের কোন একটি বাড়িয়ে দিলে ঠিক তীরের মতই বস্তুটি গতিশীল হয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই নিউটন প্রথমে বলের সংজ্ঞা দেন। গতির প্রথম সূত্রে তিনি বলেন যে বলপ্রয়োগে বস্তুর গতির পরিবর্তন হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে স্থৈতিক বলবিদ্যায় যখন কোন বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তখনও বলের একটি অসম অবস্থা আসে এবং বস্তুটি গতিশীল হয়। কিন্তু ধরা হয় যে এই গতিবেগ শূন্যের কাছাকাছি যেমনটা হয় যখন আস্তে আস্তে কপিকল ব্যবহার করে কোন ভারী জিনিসকে উঁচুতে তোলা হয়। সাধারণভাবে সব অবস্থায়ই বস্তুর উপরে বলপ্রয়োগ করলে, স্থির বস্তু গতিশীল হয়, গতিশীল বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন হয়। নিউটন গতির দ্বিতীয় সূত্রে বলেন যে বলপ্রয়োগে গতিশীল বস্তুর গতিবেগের যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনের হার বলের সমানুপাতিক। অনুপাতের ধ্রুবকটির নাম দেওয়া হয় ভর। ভর কোন জায়গায় বস্তুর ভারের সমানুপাতিক, তাই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে বলের পরিমাণগত সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কেননা বস্তুর ভর এবং গতিবেগের পরিবর্তনের হার বা ত্বরণ সহজেই মাপা যায়।

বলপ্রয়োগে বস্তুর গতির যে পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন গতিশীল বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাই হ'ল গতিজনক বলবিদ্যার বিষয়বস্তু। গতিশীল বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, দুটি গতিশীল বস্তুর সংঘাত হলে বস্তুদুটির গতিবেগ পরিবর্তিত হয়। এধরনের সংঘাতের সহজ উদাহরণ হল দুটি বিলিয়ার্ড বলের সংঘাত। দেখা যায় সংঘাতের পূর্বের বস্তুদুটির গতিবেগ ও ভরের গুণফলের সমষ্টি সংঘাতের পরবর্তী ভর ও গতিবেগের গুণফলের সমষ্টির সমান। ভর ও গতিবেগের গুণফলের নাম দেওয়া হয়েছে ভরবেগ (Momentum)। কাজেই বলা যেতে পারে সংঘাতের সময়ে ভরবেগের যোগফল ধ্রুব থাকে। এই সূত্রকে বলা হয় ভরবেগের ধ্রুবতার নিয়ম। সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তুর ভরবেগ অপরিবর্তনীয়—শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা সংঘাতেই ভরবেগ পরিবর্তিত হতে পারে। নিউটনের গতির সূত্রদুটিকে অন্যভাবে বলা যায় বলপ্রয়োগে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হয় এবং ভরবেগের পরিবর্তনের হার বলের পরিমাণের সমান।

কোন বস্তুর ওপর বলপ্রয়োগ করে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে যেমন কাজ পাওয়া যায় তেমনি বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটিয়েও কাজ পাওয়া যায়। বায়ুচালিত যন্ত্রে বায়ুর প্রবাহ এসে ধাক্কা দেয় এবং যন্ত্রপাতির চাকা ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণমান চাকা দিয়ে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে জল তোলা হয়, গম ভাঙ্গা হয় বা অন্যান্য কাজ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বায়ুপ্রবাহ ধাক্কা দিয়ে যখন চাকাটিকে ঘোরায় তখন বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ হ্রাস পায় বা বায়ুর কণাগুলির ভরবেগ কমে যায়। এইভাবে বায়ুর ভরবেগের পরিবর্তন হয় বলেই বায়ুচালিত যন্ত্রে কাজ হয়। পালতোলা

জাহাজ যখন চলে তখনও বায়ুপ্রবাহই পালে ধাক্কা দিয়ে জলের আকর্ষণী বলের বিপরীতে জাহাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কাজ হয়। এক্ষেত্রেও বায়ুপ্রবাহ পালে লাগলে বায়ুর ভরবেগের পরিবর্তন হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার যন্ত্রেও গতিশীল জলধারা এসে যন্ত্রের টারবাইনে (Turbine) ধাক্কা দিয়ে টারবাইন ঘোরায় এবং জলধারার গতিবেগের পরিবর্তন হয় বলেই বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের চাকা ঘোরে। কাজেই দেখা যায় গতিশীল পদার্থ থেকে কাজ হলে গতিশীল পদার্থের ভরবেগ কমে যায়। বায়ুচালিত যন্ত্রে, পালতোলা জাহাজে বা জলবিদ্যুৎ-যন্ত্রে বায়ুপ্রবাহ বা জলধারা যখন ধাক্কা দেয় তখন এদের মধ্যে ভরবেগের বিনিময় হয়। যন্ত্রগুলি বায়ুপ্রবাহ বা জলধারা থেকে ভরবেগ আহরণ করেই কাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বায়ুপ্রবাহ বা জলধারায় কাজ করবার ক্ষমতা সঞ্চিত থাকে—এই ক্ষমতাই যন্ত্রগুলিতে সঞ্চারিত হয়। গ্যালিলিও এই তথ্যটি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, যখন কাজ পাওয়া যায় তখন কাজ করার ক্ষমতা কমে। এই কাজ করার ক্ষমতার নাম দেওয়া হয়েছিল Vis Viva বা জীবনী-শক্তি; পরবর্তীকালে একেই বলা হয়েছে শক্তি।

কোন বস্তু গতিশীল হলে বস্তুর নিজস্ব সত্তার সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত হয়, যার নাম হল শক্তি। বায়ুপ্রবাহের এই শক্তি আছে, জলধারার শক্তি আছে আবার কেউ যদি কোন জিনিস ছুড়ে দেয় তাহলে সেই ছুড়ে দেওয়া জিনিসেরও শক্তি হয়। প্রথমে বস্তুর ভর ও গতিবেগের বর্গের গুণফলকেই শক্তির পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। নিউ-টনের গতির সূত্র থেকে পরে হিসাব করে দেখা যায়, শক্তির পরিমাণ বস্তুর ভর ও গতিবেগের বর্গের গুণফলের অর্ধেকের সমান।

গতিজনিত বলবিদ্যার আলোচনা থেকেই এভাবে বিজ্ঞানে শক্তির কথা আসে। গতিবেগ থেকে বস্তুর যে শক্তি আসে, তাকে বলা হয় গতিজনিত শক্তি (Kinetic Energy) বা সাধারণভাবে যান্ত্রিক শক্তি, কেননা এই শক্তি ব্যবহার করেই বিভিন্ন যন্ত্রে কাজ হয়। আগে বলা হয়েছে যে কোন বস্তুর ওপরে যদি এমন-ভাবে বল প্রয়োগ করা হয় যাতে বস্তুটির শুধুমাত্র অবস্থানেরই পরিবর্তন হবে গতিবেগের পরিবর্তন হবে না, তাহলে অবস্থানের পরিবর্তন করে কাজ করা হবে। এভাবে কাজ করলে যে কাজ করে তার শক্তি ব্যয়িত হয়—অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যয়িত শক্তি আবার স্থানান্তরিত বস্তুকে আশ্রয় করে। যেমন ধরা যাক কপিকল দিয়ে কোন ভারী জিনিসকে ওপরে তোলা হল। এবারে যদি কপিকলের দড়ির অন্যদিকে আর একটি ভারী বস্তু বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এই দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথমটি থেকে কম ভারী হলে ওপরে উঠে যাবে, প্রথমটি নেমে আসবে। দ্বিতীয় বস্তুটি তুলতে গিয়ে যে কাজ করা হল এবং শক্তি ব্যয়িত হল, স্পষ্টতই সে শক্তি প্রথম বস্তুটি থেকেই এসেছে। সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, প্রথম বস্তুটিকে যখন উপরে তোলা হয়েছিল তখনই বস্তুটির কাজ করবার ক্ষমতা জন্মেছিল বা বস্তুটিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি জন্মে সেই শক্তির নাম হল অবস্থান-জনিত শক্তি (Potential Energy). অবস্থানজনিত শক্তিও যান্ত্রিক শক্তি, কেননা অবস্থানজনিত শক্তিকে সহজেই গতিজনিত শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং যন্ত্র চালানো যায়। এমনি অবস্থানজনিত শক্তি ব্যবহার

করেই স্প্রীংএর বা ভার-ঝোলানো ঘড়ি চলে ; আবার জলবিদ্যুৎ-শক্তিরও মূল উৎস উচ্চস্থানে সঞ্চিত জলের অবস্থানজনিত শক্তি।

শক্তিকে ভাবা যেতে পারে প্রকৃতির একটি বিশেষ প্রকাশ যা যান্ত্রিক শক্তি রূপে বস্তুকে আশ্রয় করে। সাম্যাবস্থায় বা স্থির অবস্থায় বস্তুর কোন শক্তি থাকে না, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হলে বা গতিশীল হলে বস্তুতে শক্তি যুক্ত হয়। শক্তি বস্তুতে যুক্ত হলেই আমাদের অনুভবে আসে বস্তুর গতি বা পরিবর্তিত অবস্থান রূপে।

যান্ত্রিক শক্তি থেকে আলাদা আরও বিভিন্ন রূপে শক্তি প্রকাশিত হতে পারে। কপিকলের উদাহরণে বস্তুটিকে স্থানান্তরিত করায় যে কাজ করা হল তার শক্তি বস্তুতেই আশ্রয় নেয়। কিন্তু বস্তুর অবস্থানের অন্য ধরনের পরিবর্তন হতে পারে যাতে ব্যয়িত শক্তি বস্তুকে আশ্রয় করে না। যেমন ধরা যাক পৃথিবীপৃষ্ঠে রেখে কোন জিনিসকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে এক্ষেত্রেও ভার তোলার মত কাজ করা হয়। কিন্তু সরান বস্তুটি থেকে আর কোন কাজ পাওয়া যায় না। মনে হতে পারে, যে কাজ করা হল তার জন্য ব্যয়িত শক্তি হারিয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা যায় যখন জিনিসটিকে ঠেলে নেওয়া হয় তখন জিনিসটির যে তল পৃথিবী-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকে সেই তলটির এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায় বা তাপসৃষ্টি হয়। ঘর্ষণের সময়ে এই যে তাপ সৃষ্ট হয় তা আরও সহজে বোঝা যায় যখন কোন ধাতব অস্ত্রকে পাথরে ঘষে ধারালো করা হয়। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, বস্তুটিকে ঠেলে নেওয়ার সময়ে যে শক্তি ব্যয়িত হল সেই শক্তিই তাপ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারণা যে সত্য, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে কাজ করা হলে কোন কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়, আবার এমন যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে যার দ্বারা তাপকেও যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে—যেমন হয় বাষ্পচালিত, তৈল-চালিত বা পারমাণবিক যন্ত্রে। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তাপ ও যান্ত্রিক শক্তি মূলতঃ এক—এরা শক্তিরই দুই ধরনের প্রকাশ। যান্ত্রিক শক্তি বস্তুর গতিবেগ ও অবস্থানের পরিবর্তন রূপে দেখা যায় ; কিন্তু তাপশক্তি বস্তুকে আশ্রয় করলে বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থা হয় যা আমাদের ত্বকে তাপের অনুভূতি আনে। কাল-ক্রমে প্রমাণিত হয়েছে, আমরা যাকে শব্দ বলে অনুভব করি তাও বস্তুর এক বিশেষ ধরনের গতিজনিত শক্তি। আলো, বেতারতরঙ্গ, বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তি—এসবই শক্তির বিভিন্ন রূপ।

নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার জন্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার থেকে যে বলবিদ্যার সূচনা হয়েছিল তা থেকে মানুষ শক্তিকে জানতে পারে। শক্তি যান্ত্রিক শক্তিরূপেই মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে সহজে ধরা দিয়েছিল। আলো, তাপ এদের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে করা হত। মানুষ ভাবত আলো, তাপ এরা প্রকৃতির বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় সত্তা—বিভিন্ন দেবতার বাহ্য রূপ। এদের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ সিদ্ধান্ত করেছে, এ সবই হল শক্তির বিভিন্ন রূপ। প্রকৃতির যা কিছু প্রকাশ তার মূল বিষয় দুটি—একটি বস্তু এবং অন্যটি শক্তি। শক্তি প্রকাশ পায় আলো, তাপ, শব্দ, বেতারতরঙ্গ হয়ে ; আবার বস্তুও এই শক্তিকে গ্রহণ ক'রে নিজেকে উদ্ভাসিত করে—নিজেকে চেতন জীবের অনুভূতিতে আনে।

জীবনশিল্প ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী তথাগতানন্দ

"আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিত-কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়ার যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাইরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতোটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনের আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।"

(সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ)

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান আমরা জানি, আমরা অনেকেই কিন্তু আমাদের মানসিক ভূগোলে এই 'পুণ্যভূমির' স্থান সম্পর্কে অবহিত নই। স্বামীজী বলেছেন, ভারত "ধর্ম ও দর্শনের দেশ।" তাঁর মতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব "আধ্যাত্মিকতায় ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশে।"

স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ ; প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয় না, জগতের মধ্যে সে কোন ঐক্য খুঁজে পায় না। শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলেছেন, আমরা এক অখণ্ড আনন্দময় সত্তারই খণ্ডরূপ, এই সর্বব্যাপী আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

অগ্নি, বায়ু, জল-স্থল সর্বত্র সেই চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট। তাঁকেই ঋষি বার বার প্রণাম করেন। বিশ্বপ্রকৃতি চৈতন্য-নিরপেক্ষ স্থূল পদার্থ-পুঞ্জ নয়। এক আনন্দময় সত্তা 'সর্ব-মাবৃত্য তিষ্ঠতি'—সব কিছু জুড়ে বিদ্যমান, জাগতিক মোহপাশ ও স্থূল দেহাভিমান ত্যাগ করেই তাঁর স্পর্শ পাই। এই মিলনই আমাদের কাম্য। এই অনন্ত জীবনেই আমাদের গতি, সম্পদ, আশ্রয় ও আনন্দ।

প্রাজ্ঞব্যক্তি সাধনার দ্বারা বিরোধ ও বেসুরকে বশ করেন। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে ঐক্য দেখেন। এইটাই আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির ফলশ্রুতি। সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যই সব হয়েছেন। তিনিই আবার রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। তিনিই একমাত্র প্রেয়—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ। ব্যক্তিমনের সঙ্গে বিশ্বমনের এই যে সংযোগ, ধ্যানালোকে অমূর্তের সঙ্গে মিলনে যে আনন্দ—সুখম্ আত্যন্তিকং—তাহাই আমরা কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে পেতে উন্মুখ হয়ে থাকি। এই ঐক্য-বোধেই আমাদের পূর্ণতা আসে।

শিল্পের মধ্য দিয়ে আমরা অসীমের মধ্যে হারিয়ে যাবার সাধনা করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বা সীমাবদ্ধতার অহঙ্কার আছে, তার বিলোপ ব্যতীত আমরা ঐক্যের সন্ধান পাই না, শিল্পসাধনার লক্ষ্য এই ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হতে মুক্তির চেষ্টা। ঐক্যবোধের মধ্য দিয়েই আমাদের পূর্ণতা আসে। শিল্পীর জীবন ধন্য হয় যখন সে অসীমের এই হাতছানিকে প্রত্যক্ষ করে।

শিল্প মানে 'সত্যের সুন্দর অভিব্যক্তি।' ভগবান হলেন 'সত্যস্য সত্যম্।' তিনিই সুন্দরতম সৌন্দর্য। "ভগবানের অভিব্যক্তি শিল্পের পরাকাষ্ঠা।" এবং শ্রীঅরবিন্দের কথায় "শিল্প আবার অন্তঃপুরুষের জন্য, আত্মার জন্য—সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে, তার ভিতর দিয়ে

অন্তঃপুরুষ, আত্মা যা গড়তে চায় সে সকলের প্রকাশের জন্য।" সৌন্দর্যের জন্য, ঐক্যের জন্য বা প্রেমের জন্য আমাদের যে আকুতি তার পরিসমাপ্তি সেই আত্মায়। তিনিই 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ।' সেই ভূমাকে অনুভবে আনার অর্থ হল অহং-লোপের পথের কাঁটা দূর করা। এই অনুভূতি দেয় একটা পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দ, যা ভূমা, যা অসীম, তা আমাদের অন্তরাত্মারই পরম স্বরূপ। অহং-বিস্মৃতি না হলে মগ্নতা আসে না, অহং-বিস্মৃত শিল্পীর ভাবদৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্য, গন্ধ, গানে বা মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-বেদনা, আশা-নিরাশায় ভূমা বিরাটরূপে অপরূপ হয়ে দেখা দেন। এইরূপ যিনি দেখেন—উপলব্ধির পরম মুহূর্তে মানব-চেতনায় কোন আলম্বনকে আশ্রয় করে শিল্পের মাধ্যমে এই অসীম সুপ্রকট হয়ে ওঠে। এই রূপায়ণই শিল্প-সৃষ্টি। জীবন ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে নিবিড় যোগ এইখানেই।

সব শিল্পসৃষ্টিকেই অন্তরাত্মার বিকাশ হিসাবে দেখা প্রাচ্যস্বভাব। সত্যকার শিল্পসৃষ্টি হয় মানবের নিগূঢ় মর্মলোকে। অনুভূতির দ্বারা মানব-প্রাণ ভূমার সহিত, অসীমতার সহিত তন্ময়তা লাভ করে. তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। অনুভূতি মানব-প্রাণকে নিখিল-প্রাণের মধ্যে মুক্তি দেয়, এই সর্বব্যাপিত্ব যে তার অন্তরাত্মার সত্যস্বরূপ, ইহা সে প্রত্যক্ষ করে। এই ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শনই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এর জন্য চাই অতন্দ্র সাধনা, অসীমের ধ্যানেই ব্যক্তিত্বের বা সীমার অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়। আত্মবিলয় বিনা শিল্পী হওয়ার আর অন্য পন্থা নাই। মনীষী কাণ্ট শিল্পকে "an object of disinterested satisfaction" অর্থাৎ নিঃস্বার্থ তৃপ্তিদায়ক বলেছেন। কারণ শিল্পটি বা আনন্দের অবলম্বন ও উদ্দীপকটি যেন আমাদের অহংবোধকে বিলুপ্ত করে আত্মবিস্মৃতির পথে নিয়ে যায়। Impersonality or detachment সত্ত্বগুণের আধিক্যে আসে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। "শিল্পঅর্থে প্রকৃতপক্ষে শীল ও প্রসাদগুণ যাতে আছে তাকেই শিল্প বলে। শিল্প মনে সাত্ত্বিক প্রসাদগুণ আনবে।

প্রসীদন্তে মনাংস ত্ত তে···

অর্থাৎ মনকে প্রসন্ন করলে তাকে প্রসাদ বলে।" (অসিত হালদার)

শিল্প বা সাহিত্য ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নয়—বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব (ego) থেকে আত্মার মুক্তি, জীবচৈতন্যের সহিত বিশ্বচৈতন্যের মিলন। সাহিত্যে বা শিল্পে আমরা এই দুর্লভ আত্মীয়তাই খুঁজি। শিল্পী অহংকারের দেওয়াল টপকিয়েই ভূমার সহিত, বিরাটের সহিত আত্মীয়তা করতে পারে, এর জন্যই দুশ্চর সাধনা, চোখের জলে সমস্ত অহংকার ঘুচাবার সাধনা। এই অনুশীলন বা আত্ম-কর্ষণের ফলে শিল্পী এবং শিল্প-রস-পিপাসু—যাকে সহৃদয় বলে—কাব্য নাট্য-চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের মাধ্যমে যে রসানুভূতি লাভ করে তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের ফল, অতিরিক্ত কিছুই নয়। রসগঙ্গাধর বলেছেন, "ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।" এই কাব্যানন্দকে অভিনব গুপ্ত বলেছেন, "পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ" এবং বিশ্বনাথ বলেছেন, "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।" পূর্ণ ব্রহ্মাস্বাদ নয়। অধ্যাপক হিরিয়ানা এ দুটিকে তত্ত্বতঃ সমগোত্রীয় বলে স্বীকার করেও বলেছেন জীবনর্চচার উপর উভয়ের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সমান নয়। (Macgregor প্রণীত Aesthetic Experience in Religion) সাধক শিল্পীর বা সহৃদয়ের আনন্দ লৌকিক আনন্দ নয়, ব্রহ্মানন্দও নয়। তা আমাদের চিত্তকে সুখদুঃখের জগতের অনেক ঊর্ধ্বে

এক অলৌকিক জগতে নিয়ে গিয়ে মুক্তির আনন্দ দেয়। একেই আমরা ভাবজগৎ বলি। একেই লক্ষ্য করে ধ্যানী কবি Wordsworth বলেছেন,

"The gleam,
The light that never was on sea or land,
The Consecration, and the
poet's dream."

জগৎ ও জীবনের প্রতিস্তরে তার বাস্তব সত্তাতিরিক্ত একটি ভাব-সত্তা আছে। রসিক ভাবুকের দৃষ্টিতেই সেই ভাবসত্তা প্রকাশ পায়।

সাধারণ শিল্পীদের জীবনবোধের ব্যাপকতা ও গভীরতা নেই। তাদের জীবন-দর্শন সীমিত। তারা কোন গভীর প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, জীবন-চর্চা তারা করে না। অধিকাংশই ছন্নছাড়া ব্যক্তি। "Every artist is as bohemian as the deuce inside. (Thomas Mann)। এদের সৃষ্টি আত্মসিদ্ধির জন্য নয়—আত্মপ্রকাশের জন্য। এতে অহং-এরই প্রকাশ বেশী। এদের চিন্তা, ভাবনা ও কল্পনায় প্রভাবে এদের ব্যক্তিজীবন পরিবর্তিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' বলেছেন, "অনুভব মানেই হওয়া," তিনি বলেছেন, "বাইরের সত্তার অভিঘাতে সেই সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টি-লীলায় উদ্বেল হয়।" "টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে যতো বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবন-চরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র।" (চারিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ)

কথাশিল্পী সমরসেট মমের "The great novelists and their novels" বই থেকে প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীদের জীবনের যে পরিচয় পাই তা মোটেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। কয়েকজন ছাড়া আর সকলেরই জীবন কুৎসিত। এরা শুধুমাত্র কথাশিল্পী, বুদ্ধির চর্চা করে পাঠককে আনন্দ দেয়। জীবনের মান উন্নত করার তাগিদ এদের নেই। প্রতিভা আছে কিন্তু *জীবন নেই।* সেজন্যই আজ পাঠকসমাজ কোন সার্থক জীবন যাপনের প্রেরণা পাচ্ছে না। রাশি রাশি বই লেখা হচ্ছে, পাঠকরাও গোগ্রাসে গিলছে কিন্তু কোন উন্নতি হচ্ছে না। লেখকদের জীবন-দর্শন অত্যন্ত স্থূল। শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা, মানুষের কল্যাণ এবং উন্নতির ঊর্ধ্বগতি কোনটাতেই তাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই। প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা emotional belief, যাকে Eliot বলেছেন 'wisdom', আজ কথাশিল্পীদের মধ্যে নেই। "The whole of modern literature is corrupted by what I call secularism, that it is simply unaware of, simply cannot understand the meaning of, the primacy of the Supernatural over the natural life, of something which I assume to be our primary concern."

(Religion & Literature, T. S. Eliot)

আর এক শ্রেণীর শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি আছেন যাঁরা রূপে, রঙে, রেখায়, সুরে—শিল্পভাবনা ও শিল্পকামনাকে দেহায়িত না করে নিষ্ঠাবান শিল্পীর সাধনা দিয়ে জীবনকেই সহস্রদল পদ্মের মতো ফুটিয়ে তুলতে চান। এঁরাই জীবন-শিল্পী। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার জন্য এঁরা জীবনটাকে ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। সাধনার দ্বারা তাঁরা ভূমাকে, বৃহৎকে, অসীমকে পান। পঞ্চ-কোষের আবরণ সরিয়ে মেঘমুক্ত সূর্যের মত স্বপ্রকাশ আত্মা জীবকে লোকোত্তর আনন্দলোকে নিয়ে যায়। এ হ'ল রামপ্রসাদের ভাষায় মানবজীবন আবাদ করে সোনা ফলানো। সৌন্দর্যের এলাকায় শিল্প-সৃষ্টি কিন্তু সত্যের এলাকায় মানুষের কর্ম-জীবন। এঁরা জীবনসাধনার দ্বারা শিল্প-

সত্যকে জীবন-সত্যে পরিণত করার দুরূহ সাধনায় মগ্ন। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চারিত্র-পূজায়' বলেছেন, এঁরা 'মহাত্মা'। এঁদের জীবনের স্বর্গীয় দীপ্তি মানুষকে আকর্ষণ করে, প্রেরণা দিয়ে মহত্ত্বের পথে নিয়ে যায়। মাহাত্ম্যের সঙ্গে প্রতিভার এখানেই প্রভেদ। প্রতিভার এই কল্যাণশক্তি নেই, প্রতিভার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলনে তা সম্ভব। 'ভক্তিভরে শেক্‌স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্‌স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎ পরিমাণেও সরল হইয়া আসে।' (চারিত্রপূজা।)

সাধারণ শিল্পীদের কাছে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের চপল-চাতুর্য, তর্ক-বুদ্ধির চিন্তা-বিলাসই কাম্য, এদের শুধু বুদ্ধির কালচার। সাধক-শিল্পীদের লক্ষ্য ভূমানন্দ। তাঁদের আত্মার কালচার। ভগবান সত্য, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের উৎস। সত্যকে, শিবকে ও সুন্দরকে জীবন-শিল্পীরা পেতে চান তপস্যার দ্বারা। এঁদের জীবন-চর্চার নিষ্ঠা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এঁরা সাধু, মহাত্মা। মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন: 'Association is the highest art'। তিনি সন্ন্যাসকেই জীবনের সবচেয়ে বড় শিল্প বলেছেন। শিল্প মানে সরল সুষমা।

সত্যের সাধক বলে সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ স্বামীজীকে বুদ্ধিজীবীরা জীবন-শিল্পী বলতে পারেন। স্বামীজীর সমস্ত বাণীর মূলে আছে মানুষের সুপ্ত আত্মার জাগরণের অভিপ্রায়। মানুষকে মান-হুঁস করা, জীববোধ ঘুচিয়ে তাকে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করা, তার body-consciousness দূর করে তার মধ্যে soul-consciousness জাগরণ করাই তাঁর লক্ষ্য। এই আত্মচেতনা বা অধ্যাত্ম-চেতনার জন্যই সমস্ত কর্ম-প্রবর্তন। সভ্যতার দ্বারা সুসংস্কৃত জীবন লাভ করে জগৎ-সত্যের মধ্য দিয়ে আত্ম-সত্যের এবং আত্ম সত্যের মধ্য দিয়ে জগৎ-সত্যের অনুভূতি লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। এ না হলে মহতী বিনষ্টিঃ। তাই তাঁর গোড়ার কথা হল: 'Man-making is my mission'. তাঁর চোখে মানুষের মধ্যে রয়েছেন শিব—যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।

মানুষের ইতিহাস মানবাত্মার মুক্তি অভি-যানের বেদনাতুর ইতিহাস। Croce-র মতে ইতিহাস—'Story of liberty'। Toynbee দেখছেন ইতিহাসের মধ্যদিয়ে মানুষের ক্রম-অভিব্যক্তি,—evolution of soul এবং তাও ঐশী ইচ্ছার পরিপূরণের জন্য।

'মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করেছে অসীমের দিকে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে।···মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি নিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' (মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ।)

শ্রীঅরবিন্দ অসীমের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার এই প্রেরণাকে বলেছেন: 'The passionate aspiration of man upward to the Divine'. (Life-Divine, Vol. I.).

ইতিহাসের এই অভিপ্রায় ভারতের জীবন-দর্শনে স্পষ্ট ছাপ রেখে চলছে। স্বামীজীর মতে ভারত চলেছে with her own majestic step,...to fulfil the glorious destiny,... to regenerate man-the-brute to man-the-God'. তাই তিনি বলেছেন, 'Freedom, freedom is the song of my soul'. 'দেহ, মন এবং জীবাত্মার সামগ্রিক বন্ধন-মুক্তি বা স্বাধীনতাই উপনিষদের মূল মন্ত্র।'

ইতিহাসের গতির পশ্চাতে রয়েছে খাঁটি

মানুষ। তাঁদেরই সবল বাহু ও উর্বর মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে ইতিহাসের জয়যাত্রা। সভ্যতার অগ্রগতির চাকা ঘোরাচ্ছে কার্লাইলের Hero, এমার্সনের Representative Man ও শ্রীঅরবিন্দের Superman Toynbee-র Selective minority বা elites. জনসাধারণ প্রেরণা পায় এঁদের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে। ঐতিহাসিক স্বামীজী বলেছেন: "অর্থ, পাণ্ডিত্য, বাক্‌চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই বিশেষ মূল্য নাই। পবিত্রতা, খাঁটি জীবন এবং প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সমুদয় কার্য সম্পন্ন করে।" (পত্রাবলী—১ম, ৪৫৮ পৃঃ) তাই তিনি সৈন্য, বোমা বা অন্যান্য কোন জিনিস চাননি। চেয়েছিলেন, "নচিকেতার মত··শ্রদ্ধাবান ১০।১২টি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।"

তিনি ছিলেন সত্যিকারের জীবন-শিল্পী এবং এই শিল্পের উদ্‌গাতা। সমস্ত উন্নতির মূলে ব্যক্তি-চরিত্রের উৎকর্ষ। মানুষের সুপ্ত আত্ম-শক্তি জাগরণের দিকেই তাঁর লক্ষ্য। জড়শক্তি অপেক্ষা চৈতন্য-শক্তির উপর তাঁর ছিল বিরাট আস্থা। "কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে এই পারে—এই বিশ্বাস থেকে যেন সরে যেও না।"—এই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, মানুষকে তার জীবনের জন্য গৌরব বোধ করতে বলেছেন তিনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ বাণী এই: 'Sacredness of human personality'—জীবনের আধ্যাত্মিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্মদৃষ্টিকেই রবীন্দ্রনাথ একটি 'মহৎ-বাণী' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁর (স্বামীজীর) বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে।'

Be and make এই তাঁর বাণী, তাই আমাদের প্রার্থনা শুধু অপাবৃণু, অপাবৃণু; আমাদের পঞ্চ-কোষের আবরণ উন্মোচনের প্রার্থনা। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্'-কে মানুষী চেতনায় প্রকাশ করার প্রার্থনা। প্রতি বস্তুতে, প্রতি ভাবে যে ব্রহ্ম চিরবিরাজিত তাঁকে ব্যক্তি-চেতনার কাছে বাইরের স্থূল আবরণ যতটা সম্ভব সরিয়ে আনন্দ-স্বরূপে প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ। জীবন শিল্পীও সাধনার দ্বারা—সত্য, ত্যাগ ও ধর্মনিষ্ঠার দ্বারা—বৃহত্তর জীবনের আনন্দ অনুভব করেন। প্রাত্যহিক জীবনের কাজে, কর্মে, চিন্তায়, ভাবনায় গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকে প্রকাশ করার সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা। আমাদের হৃৎপদ্মকে ফোটানোর জন্য, আত্মানং বিদ্ধির সাধনার জন্য আমাদের সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা। পথ ক্ষুরস্য ধারা। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মন ও মুখ এক করা'র সাধনাহ জীবন-শিল্পীর সাধনা।

যে সব পূতচরিত্রের সংস্পর্শে এলেই আমরা পাই আত্ম-সংবিৎ-উদ্ভাসিত মুক্তিপথের ইঙ্গিত, তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের 'মহাত্মা', Carlyle-এর 'Inspired text'। সমরসেট মম অকুণ্ঠ ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জীবন-শিল্পীকে: 'The pictures they paint, the music they compose, the books they write and the lives they lead of all these the richest in beauty is the beautiful life. That is the perfect work of art'. (S. Maugham, Painted Veil.)

নাভি-তীর্থ (মণিপুর)

শ্রীমতী শিবানী দত্ত

এ রাজ্যের শান্ত পাহাড়গুলি মানুষের সঙ্গে কথা কয়ে যায়; পাহাড়ের গায়ে মেশানো গাছগুলি আমাদের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, পাহাড়ের অচল শিখরে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে চলার স্রোত। এ দেশের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে সত্য-সুন্দরের স্পর্শ। এ যে রুদ্রেশ্বরের দেশ। একদিন নটরাজের ডমরু-ধ্বনিতে জেগে উঠেছিল এদেশ।

***

আমাদের যাত্রা শুরু হলো ফাল্গুন শেষের গোধূলির আলো-ছায়ায়। গাড়ী ছুটে চলেছে আপন গতিতে। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে জ্বলে উঠলো দিনান্তের চিতা। আর তারই আলোয় নিজ নিজ শিরস্ত্রাণ রাঙ্গিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাতটি পাহাড। ততক্ষণে সভ্যতার বাতিও জ্বলে উঠলো। আমরা ক্রমশঃ এগিয়েই চলেছি, আমাদের গন্তব্যের পথে। আদি জননীকে দেখবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা মাথা কুটে মরছে আমাদের চিন্তার দুয়ারে। কেমন সে স্তব্ধ জলরাশি, কত শক্তিশালী, যার গর্ভে জন্মেছে সাত পাহাড়ের দেশ, যার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে দেবতা আর দৈববাণী। ক্রমেই আমরা এগিয়ে চলেছি পাহাড আর খাদের মধ্যবর্তী চিকণ রাস্তার ওপর দিয়ে, যার গৈরিক দেহ এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে পাহাড়েরই পদপ্রান্তে গাঁয়ের দিকে। ক্রমে চারদিক ঘিরে নেমে এলো সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের সাথে সাথে স্তিমিত হয়ে গেল অরণ্যের মন্ত্রপাঠ, দেখতে দেখতে রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে জ্বলে উঠলো বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ প্রদীপ।

পেছনে জনপদকে রেখে আমরা এসে পৌঁছলাম স্তব্ধ জলরাশির পাশে অচল শৈল-শিখরে। দূর থেকে দেখলাম মাটির মাথায় শোভা পাচ্ছে গাঢ় নীল তারকাখচিত চাঁদোয়া। শুক্লপক্ষের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে নীল জল-রাশির ওপর। একে ঘিরে রচিত হয়েছে কত পুরাণ-কাহিনী, তার প্রমাণ অবশ্য ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না।

সে কাহিনী বসন্তকালের—মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসবাসিনী কোন নূতন স্থানে বাস করতে চাইলেন। মহাদেব বেরিয়ে পড়লেন স্থান খুঁজতে, খুঁজে পেলেন না মনোমত স্থান। এমন সময় নারদের আবির্ভাব ঘটলো মর্তে, মহেশের পদপ্রান্তে; তাঁরই কাছে মহাদেব জানলেন এই প্রদেশের কথা। নারদকে সাথে নিয়ে মহাদেব এলেন উত্তরাপথে, দেখলেন দেশটি—সাতটি পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে একে অন্যকে অতিক্রম করে। তাদের পায়ে মাথা কুটে মরছে বিশাল নীলাম্বুরাশি। মুক্তি চাইছে তারা সাগরের সঙ্গে মিশবার জন্য। মৌন পাহাড়ের বুকে সে বার্তা বুঝি পৌঁছায় না। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, একটুকুও সমতল ভূমি চোখে পড়ে না। সাত পাহাড় সেজে উঠেছে বসন্তের ডাকে। পাহাড়ের জলরাশির বুকে খেলে বেড়াচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ নীলকমল। জায়গাটি বিশ্বম্ভরের খুবই পছন্দ হলো, আপন ত্রিশূলাগ্র দিয়ে সমস্ত জলকে সঙ্কুচিত করলেন এই সরোবরটির বুকে—যার বর্তমান নাম লোকতাক্ হ্রদ। অফুরন্ত জল-রাশির চঞ্চলতার শেষ হলো, স্তব্ধ হয়ে গেল তা চিরদিনের জন্য, ত্রিশূলাগ্র বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বিরাট মালভূমি। নাম হলো

মণিপুর। উমা মহেশ্বর অধিষ্ঠিত হলেন সেখানে। মহেশ্বরের নৃত্যে মণিপুরের আকাশ বাতাস হয়ে উঠলো সঙ্গীতময়। তাইতো এদেশবাসী সবার কণ্ঠে গান। আজও প্রতি বৎসর শিবপর্বতে উৎসব হয়ে থাকে। বৈশাখের মেঘ এসে শিব-শিবানীকে জানিয়ে গেল ফিরে যাবার আহ্বান। ফিরে যাবার কালে মহেশ্বর অনন্তনাগকে দিয়ে গেলেন ষোলশো প্রমিলাসহ এ রাজ্যটি। তাই এর আর এক নাম "প্রমিলা-রাজ্য।" এই অনন্তনাগ "পাখাংবাই" হলেন মৈতাই-পুরাণের আদি পিতা। মৈতাইরা তাঁরই বংশধর। কথিত আছে এ হ্রদের জল দিয়ে শিবপূজো করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়; তাই মৈতাইরা বহু দূর দূরান্ত থেকে এ জল নিয়ে যায়, যেমন আমরা নিয়ে যাই গঙ্গাজল।

*

রাত্রি হয়ে যাওয়ায় আমরা আগের দিন লোকতাকের কাছেই একটি পাহাড়ী ডাকবাংলোয় উঠেছিলাম। ডাকবাংলোটি নাতিউচ্চ টিলার ওপর। ভোর বেলা আবার যাত্রা শুরু হলো। কথা রইলো রৌদ্রের তেজ বাড়ার আগে ফিরে আসব। কারো মুখেই কথা নেই, পাহাড়ী প্রভাত আমাদের তারই মতো নির্বাক করে তুলেছে। উচ্চে দেখা গেল শৈলচূড়া মোটেই সূক্ষ্ম নয়, একেবারে থাঁদা আর তারই ঢলে প্রকৃতি বসেছে পণ্যসম্ভার ফলফুল সাজিয়ে। প্রকৃতির খেলা দেখে অবাক হতে হয়। পাহাড়ের গায়ে ফুটে আছে শ্বেতবর্ণ উথাম্বাল (গাছ-পদ্ম)। কত নাম না জানা পাখির গান, কত বনফুলের সমারোহ। নেমে এলাম ফেলে যাওয়া পথে। ফিরে আসার সময় চোখে পড়লো একদল মেয়ে চলেছে, মাথায় তাদের তিনটে থেকে পাঁচটা পূর্ণকুম্ভ, অথচ অবলীলাক্রমে তারা প্রায় ছুটে চলেছে বাড়ীর পথে। অদ্ভুত এদেশের লোকের স্বাস্থ্য। এদের অনেকেই হিন্দু; তবে চার্চের দুয়ারেও ভিড; দেখলে মনে হয় চার্চের ভক্তের সংখ্যাই বেশী। হিন্দু পর্বতবাসীরা প্রায় সবাই রুদ্রেশ্বরের পূজারী। পর্বত বিজয় করে যখন ফিরে এলাম বাংলোর দিকে তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বাংলোয় ঢোকার মুখেই চোখে পড়লো একটি 'গোরস্থান'; সামনে রাখা হয়েছে প্রকাণ্ড একটি মহিষের শিং, মধু অর্থাৎ মদ্য, একটুকরো লাল রেশমী কাপড়, আরো কত কি। পরে শুনলাম শিংটি হলো কৃতজ্ঞতা আর সম্মানের নিদর্শন, যত বড় হয় ততই ভালো। মদ্য তো দিতেই হয়। আর লাল রেশমী কাপড়টি মুক্তির জয়কেতন। এসব নাকি আত্মার শান্তির জন্য। মৃত্যুকে ওরা আনন্দ ব'লে ধরে নেয় কারণ মৃত ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট জরা থেকে মুক্তি পেলো। বরং জন্ম হলেই তারা দুঃখিত হয়। তাচ্ছিল্য আর দুঃখ প্রকাশ করতে তারা বাধ্য নবজাতকের মঙ্গলের জন্যই, কারণ সে দুঃখের পৃথিবীতে এলো। কিন্তু এই প্রথার মর্ম আজো অজানা রইলো—নবজাতকের প্রতি তাচ্ছিল্য কেন? নতুনকে বরণ করাই যেখানে মানুষের প্রাণধর্ম, সেখানে এ আচরণ অদ্ভুত। জীবনমৃত্যু সম্পর্কে এদের এই অদ্ভুত আচরণের কথা জেনে জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে বিচার করে দেখবার অবসর আর পেলাম না। চলে এলাম হ্রদের পথে।

*

দূর থেকে চোখে পড়লো জলের রেখা কিন্তু প্রথম বুঝতে পারিনি। সাদা একটি রেখা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছিলো না। আঁকাবাঁকা

পাহাড়ী পথ। চারিদিকে দেবদারু গাছ। শুনেছি আরো কিছু এগিয়ে গেলে পাইনের বন চোখে পড়ে। এখানে মাটি শ্যামল। তারই বুক চিরে যে গৈরিক নতুন পথটি তৈরী হয়েছে, আমাদের গাড়িটি ছুটে চলেছে সেই পথে। গোধূলি থাকতেই গিয়ে পৌছলাম পাহাড়ের উপর টুরিষ্ট হাউসে। এখানে দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো গ্রামগুলি চোখে পড়ে। চারিদিকে শুধু জল আর জল ; হ্রদ যে এত বড় হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। পাহাড়ের আরাম কেদারা। তার পাশ ঘেঁসে ছুটে চলেছে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা। গাঢ় নীল জলের বুকে ভাসছে সাদা হাঁসের পাল, দূরে জলের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে বক এবং অন্যান্য পাখি। জলের মধ্যে ছোট ছোট বালুর চরে বাসা বেঁধেছে এদেশের মুলিয়া শ্রেণীর লোকেরা; যারা এ হ্রদের গাইড। এদের ঘরগুলি যেন জীবন্ত ছবি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে শান্ত উদার জলরাশি। অসীম স্তব্ধতার বুকে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলছে উত্তাল বাতাস। কবে কোন্ যুগে তারা মুক্তি চেয়েছিল, সাগর-সঙ্গমে যেতে চেয়েছিল ; আজ তারা কত শান্ত, কত স্তব্ধ। ধীরে ধীরে নীল জল কালো হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিল আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি যুগান্তের পারে। যেখানে মানুষের পদশব্দ পৌছায় না। নতুন করে উপলব্ধি করলাম নীরবতাই মানুষকে অন্তর্মুখী করে।

সেখানেই রাত কাটিয়ে নেমে এলাম পাহাড়ের পাদপ্রান্তে। ভোরের আলোছায়ায় অনন্ত নীল পবিত্র জলকে ছুঁয়ে নিজেকে পবিত্র করলাম। কিছু হলুদ আর গৈরিক মাটি, আর একরকম ছোট ছোট দুধের মতন সাদা পাথর কুড়িয়ে নিলাম। মনে মনে একটি প্রণাম জানিয়ে এলাম এত সুন্দর পৃথিবীর পায়ে।

এবার সমতল যাত্রাপথ। এবার দেখবো ঐতিহাসিক ভূমিকে। জায়গাটির নাম "মৈরাং"। উঁচু-নীচু পথ ভেঙ্গে যেতে চোখে পড়ে নানা ধরনের মন্দিরের চূড়া। আরো কিছু এগিয়ে পুরো মন্দিরগুলিই চোখে পড়লো, নেমে কয়েকটিকে দর্শনও করলাম। মৈতাইদের পরিচ্ছন্নতা দেখবার জিনিস। ঝক্ ঝক্ করছে প্রতিটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ। দেবতা দর্শন করলাম; রাধাকৃষ্ণের মূর্তিই বেশী, অবশ্য সাথে আরো অনেক দেবতা আছেন, যাঁদের সবার নাম আমার অজানা। আমরা প্রণামী দিলে ওরা আমাদের একটি কলাপাতার থালায় করে প্রসাদ হিসাবে কিছু ফুল, ক'টুকরো পদ্মের মৃণাল আর একটি আরতির সলতে দিল। বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে।

মন্দিরস্থাপত্যে আমার জ্ঞান বিশেষ নেই। সরল স্থাপত্যের বুকে যদি কোন নিখুঁত শিল্প লুকিয়ে থাকে, তা আমার চোখকে ফাঁকিই দেবে। মন্দিরগুলি দু-চালি আর চার-চালি। অন্দরমহলে রাধামাধব জিউ, নিত্যানন্দ। গোবিন্দজীর মূর্তিই বেশি। অবশ্য প্রত্যেক মন্দিরেই সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে আছে রুদ্রেশ্বরের আসন। মূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে সুন্দর। প্রত্যেক পল্লী আর ব্রাহ্মণবাড়ীতেই আছে দেবমন্দির, অন্ততঃ ধ্বজাশোভিত একটি খড়ের চালাঘর। এগিয়ে গিয়ে পেলাম সত্যকার শিল্পকে। যার সাথে মিশে আছে এ প্রান্তের নাম আর মৈতাই-ইতিহাসের একটি অধ্যায়—সে হলো মৈরাং-থৈবীর মূর্তি। এর পেছনে আছে একটি কাহিনী। একই গল্পের দুই রূপ, অর্থাৎ গল্পের আরম্ভ এক কিন্তু উপসংহারটি কিছু অদল বদল। থৈবী ছিলেন মৈরাং রাজার কন্যা। চিত্রাঙ্গদার বংশের মেয়ে। থৈবী ছিলেন অসিযুদ্ধে অপরাজেয়। তিনি

পণ করেছিলেন, যে তাঁকে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই তিনি বরমাল্য অর্পণ করবেন। তাঁকে পরাজিত কেউ করতে পারেনি, কিন্তু সেনাপতির পুত্র খাম্বাকে তিনি মনে মনে বরণ করেছিলেন ব'লে তার কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করলেন। রাজাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শেষে বিবাহ দিতে হল। কিন্তু উৎসব-মুখর প্রাঙ্গণেই নাকি কোন দেবতার অভিশাপে এই দম্পতির দেহ প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

সেখান থেকে আমরা এগিয়ে গেলাম আরো কিছুদূর। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘাসের ওপর শেষ বেলার রোদ চিকচিক করছে। মনে হলো কিছু আগে এদিকে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখানে এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা উপস্থিত হলাম গত মহাযুদ্ধের একটি নিদর্শনের পাশে—যা জাতির কাছে তীর্থবিশেষ। একটা বিরাট ঢালু টিবি, তারই ওপর তৈরী হচ্ছে আই. এন্. এ. মেমোরিয়াল। নেতাজী এখানেই তুলেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম বিজয়কেতন। শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে দেখছি, এমন সময় মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক বুনো হাঁস। তারা ঘরে ফিরছে। তাদের পাখার শব্দে চমকে উঠলাম, মনে হলো কেউ যেন আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল—

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

*

তার কিছুক্ষণ পরেই আমরা বাজার ঘুরে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম অন্য পথে, সে রাস্তা হলো বিষণপুরের পথ। সেখানে দুদিন থাকা হলো। প্রথম দিন সকাল বেলা ঘুরতে বেরুলাম। বাজারের কাছে গাড়ী থামলে গাড়ীতে বসে বসেই চারিদিক দেখছি। চোখে পড়লো বাঁ-পাশের একটি পাহাড় থেকে দলে দলে মেয়েরা নেমে আসছে, সকলেরই পরনে 'উড়াই'রং 'ফানেক' আর সাদা 'ইনাফি'; মিছিলটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। একজনকে জিজ্ঞেস করে শুনলাম আজ "চম্পকচতুর্দশী"। আজ তারা নিজেরাও চাঁপাগুচ্ছে সাজবে, ঠাকুরকেও সাজাবে। আমারও ইচ্ছে হলো শিবের মাথায় একটু জল দিয়ে আসার। পাহাড়ের ওপর দুগ্ধধবল মন্দিরটি যেন আকর্ষণ করছে। এই মন্দিরকেও ঘিরে আছে একটি লোকগাথা। একজন ব্রাহ্মণকন্যা এখানে শিবের পূজারী ছিল। তার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে চম্পকচতুর্দশীর দিন ভূতনাথ রুদ্রেশ্বর তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি নিয়েই এখানে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। সেই থেকে আজও এইদিন বিশেষ পুজো হয় এখানে। মন্দিরে পৌঁছে দেখলাম বড় একটি তাম্রপাত্রে চাঁপা-ছিটানো জল রাখা আছে শিবের মাথায় দেবার জন্য, সাথে আছে একটি কলাপাতার চামচ।

শিবলিঙ্গের সামনে জ্বলছে সারি সারি ঘিয়ের প্রদীপ। লক্ষ্য করার জিনিস, মন্দিরটির কোন ভিত নেই, পাহাড়ের গায়ে উঠেছেন লিঙ্গ আর তার চার পাশ থেকে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। পূজা সেরে মনের মধ্যে এক নিবিড় আনন্দ নিয়ে নেমে এলাম গ্রামের ভিতর। কি সুন্দর গ্রামটি! আশে পাশে এতটুকু নোংরা নেই। দেখলেই বোঝা যায় এটা 'মৈতাই-লাইকাই', বিরাট বিরাট সব বাড়ী। প্রায় প্রতিটি বাড়ীই আপাদমস্তক নীল সাদা কিংবা গৈরিক মাটিতে সুনিপুণভাবে নিকানো। প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি সবজি বাগান, তুলসী-গাছ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে।

দেখলাম বাসনপত্র সব পিতলের। মণিপুরী বাড়ীতে আজও চিনামাটি আর এনামেলের সাম্রাজ্য বিস্তার হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে একটি বাড়ীতে পৌঁছলাম, এখানেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে এসে আবার সবার সাথে মিলিত হলাম। বিকেল বেলা সবাই মিলে রওনা হলাম গ্রামের কেনাবেচা দেখতে। বিকিকিনি সবই করে মেয়েরা, এসব ব্যাপারে পুরুষেরা গৌণ। মাথায় বোঝা, পিঠে ছেলে নিয়ে কেমন চলে এরা, সেটা দেখবার মত বৈকি। আজকাল অবশ্য পুরুষেরা মুখ্য হয়ে উঠছে। বাড়ী ফিরে এলাম। এমন গ্রাম দেখে সত্যই আনন্দ হয়। গরীব কি নেই? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কে একবেলা খাচ্ছে আর কে চারবেলা খাচ্ছে তা তাদের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই; যে একটাকার দিনমজুরী করছে সেও যখন দেবমন্দিরে যাবে তার গায়ে থাকবে একটি ধবধবে চাদর, পরনে থাকবে ততোধিক শুভ্র ধুতি। তাদের প্রতি জিনিসটি সত্যিই দেখবার মতো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি পোষাক তাদের সবারই থাকবে। হয়তো সে ভিক্ষা করে খেতে পারে, কিন্তু ময়লা হয়ে রাস্তায় বেরুবে না। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, তাদের জাতিবিচার আমাদের মতো প্রবল নয়। সঙ্গীত এবং নৃত্যশিল্প এদের জাতীয় সত্তা, এদের প্রায় সবাই কিছু গান গাইতে নাচতে এবং ছবি আঁকতে জানে। বাড়ী এসে দেখলাম•যানবাহন দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য। চললাম। পথে দেখলাম, একটি বাড়ীর উঠানে বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ উৎসব পালন করা হচ্ছে। মেয়েদের 'অতিথি আহ্বান' নৃত্য এবং শিশুদেব' গোষ্ঠলীলা' খুব ভালো লাগলো।

পরদিনই আমরা সেখান থেকে চলে এসে-ছিলাম। এবার ঘরে ফেরার পালা। এ-উপ নগরের ছবি চিরদিন মনের পটে আঁকা থাকবে। পাহাড়ের বুক চিরে তৈরী হয়েছে রাঙ্গা মাটির পথ, কৃষি-অফিস, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, আরো অনেক কিছু। এ দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অগণ্য। ফেরার পথে আরেকটি দিন থামলাম আরেকটি গ্রামে। এই গ্রামটিতে বাস আদি মৈতাইদের, অর্থাৎ এখনো যাদের ধর্ম সম্পূর্ণ আদিম, যদিও জীবনটা নয়। তারা ঘোর শৈব। পূজা করে ভৈরব আর সূর্যদেবতার। নিজেদের "সেনামাহী' বলে পরিচয় দেয়। এরা এখনো আদিম প্রথায় পূজা করে থাকে। তাছাড়া এই সম্প্রদায়ের সাধুদের সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এখানে এসেই প্রথম শুনলাম সূর্য-মন্দিরের কথা। শুনলাম নতুন পুরাণকাহিনী। এদের পুরাণে আছে, মৈতাইদের আদি লোক-গুরুর নাম হলো গুরু শিদাবা। গুরু শিদাবা হলেন সূর্যের পিতামহ আর পাথাংবা হলেন সূর্যের পিতা এবং মা হলেন দেবী সেনামেহী। এ গ্রামের অধিবাসীরা সেই সেনামেহী দেবীর সাধক। সেনামেহীকে আবার দেবীভৈরবীও বলে। পথে ক'জন সেনামাহী সাধুর দর্শন পেলাম কিন্তু আলাপ করতে সাহস হলো না। তাদের রুদ্র সজ্জা দেখলেই কেমন যেন ভয় করে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার, এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের গায়ের রং কালো, চেহারা বেশ উন্নত। সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকের হাতে আছে সিঁদুর-মাখানো এক একটি বড় শঙ্খ, শুনেছি শঙ্খধ্বনি দিয়েই তারা একে অন্যকে আহ্বান করে।

*

আবার এসে পদার্পণ করলাম শহরের পথে, যাত্রা আর ফেরা একই জায়গায় এসে শেষ হলো। আকাশে তারা আর মাটিতে জোনাকী। ক্রমান্বয়ে তারা জ্বলছে আর নিবছে, ভারি ভালো লাগলো আকাশ-মাটির এই খেলা।

পথের সন্ধানে

ব্রহ্মচারী প্রসূন

মন রে কৃষিকাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা ॥
—রামপ্রসাদ

বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের জটিলতা সরল করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই মানবধর্মেরও নববিন্যাস সাধিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। ধর্মবিজ্ঞানের অনুশীলন মানুষকে করতেই হবে কারণ তাতে সে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঁচার মত বাঁচতে শিখবে, পাবে জীবনধারণের উপযোগী প্রকৃতজ্ঞান। চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে আদর্শ পন্থা অবলম্বন করতে শিখবে সে, শিখবে আদর্শ আত্মবিন্যাস বা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ। আদর্শ আচরণবিধি শিখবে সে, শিখবে আদর্শ সমাজ গঠনের ধারা। আর জানবে সমস্ত জিনিসের অন্তর্নিহিত চরম ও পরম সত্যকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জগতের অন্যান্য সকল অবতার মহাপুরুষগণই বলে গেছেন, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। জীবনযাত্রীর ক্ষমতা ও জীবনের শ্রেণীভেদে পথও বিভিন্ন এই ঈশ্বরলাভের। জীবনের যে কোনও স্তর হতেই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরাভিমুখে যাত্রা করতে পারে যদি তার পাথেয় হয় আত্মবিকাশের সাধনা। মানুষের অন্তরেই যে অবস্থান করছেন সেই ঈশ্বর, সেই অন্তরাত্মা। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষ প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে সেই ধর্মের জন্য যে ধর্ম পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে আনবে সেই সহযোগিতা যার বলে বলীয়ান হয়ে তারা পরাভূত করবে মানবতার সকল সাধারণ শত্রুদের, দারিদ্র্য অত্যাচার ও যুদ্ধ—সকল রোগকে।

আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষের কর্তব্য তাই যুগের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব অবদান সৃষ্টি করা,—রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিদ্বেষের পরিবর্তে শান্তি, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ আনয়ন করা, জাতিগত বিবাদ দূর ক'রে সাম্য আনয়ন করা, সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা, সম্বল ও শিক্ষা আনয়ন করা। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য এ ধরনের সার্বজনীন প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধ ও শঙ্করের বাণীর সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাই স্বামী বিবেকানন্দ, যুগেরই প্রয়োজনে। তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে আমরা সেই আহ্বানই শুনি যা বুদ্ধদেবের নৈতিক আদর্শবাদ ও শঙ্করাচার্যের আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের এক সুষম মিলন ঘটিয়েছে। মানুষের নৈতিক জীবন অবশ্যই আধ্যাত্মিক সচেতনতার প্রকাশ, এ দু'টি জিনিস ভিন্ন থাকলে পূর্ণাঙ্গ হয় না।

বর্তমান বিশ্বের মানবমনের প্রধান উপাদান যুক্তি। বর্তমান বিশ্বের বিন্যাস পুরোপুরি যুক্তি-সংক্রান্ত। আধুনিক যুক্তিবাদী মন ধর্মের মাধ্যমে তাই চাইবে পরম সত্যকে—বহুর মাঝে ঐক্যের অনুভূতিকে। ঈশ্বরকে তারা চাইবে সম্বন্ধসূত্ররূপে যেখানে সমস্ত বস্তুজগৎ প্রবেশ করছে, অবস্থান করছে এবং সার্থকতা লাভ করছে। জীবনকে তারা দেখতে চাইবে কর্মে পরিণত ধর্ম হিসেবে।

বিজ্ঞানী মনের ধর্মজিজ্ঞাসা তাই সদা জাগ্রত। বিজ্ঞানী মন চায় এমন সত্য যা প্রয়োগ করা যাবে জীবনের প্রতি পদে পদে। মানবব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ আনয়ন করার

প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন বিজ্ঞানী মনের, প্রয়োজন সেই মহান শক্তির সূত্রাবলী নির্ণয় ক'রে সকল মানবসন্তানদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার। প্রকৃতির প্রথম নিয়মের বিবর্ধনই ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে আত্মসংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানব-আবেগের সেই অভিব্যক্তি যার দ্বারা মানুষ চায় পার্থিব প্রতিকূল প্রভাবের বিরুদ্ধে তার অন্তরের প্রধান উদ্দেশ্যকে বজায় রাখতে। ধর্ম তাই মানুষের জীবনসত্তার প্রধান ও অচ্ছেদ্য অংশ।

বিভিন্ন ধর্মের ভাবের আদানপ্রদান ক্রমশঃ জ্ঞানের পরিধিকে বর্ধিত করবে এবং অজ্ঞানতা, তা যতটুকুই থাক, দূর করবে,—এ আশা মানুষ স্বভাবতই করে। বিজ্ঞানের যুগে ভবিষ্যতের ধর্ম কি হবে মানুষের, এ কথা ভাবলেই মনে আসে যে, ধর্ম ক্রমশঃ নিজের সংজ্ঞা নিজেই দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপরই প্রধান জোর পড়ছে বর্তমানের ধর্মব্যাখ্যায়। আধুনিক মানুষ তার কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে সাধারণভাবে প্রচলিত ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গতি খুঁজে না পেলেও ধর্মাসক্তি ত্যাগ করতে তো পারছে না।

আত্মসংরক্ষণের এবং স্বচ্ছন্দ জীবনবাসনার প্রেরণায় যদি ধর্মের প্রয়োজনবোধ আসে তা হ'লে মানুষ ও তার পরিবেশের সমন্বয়ের প্রচেষ্টার সঙ্গে তা ক্রমশঃ জড়িত হবে এবং সামাজিক নিরীক্ষারও প্রেরণা জোগাবে। বর্তমানে জীবনের পরিসর অনেক বেড়েছে। বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন ও ন্যায়নীতি প্রভৃতি হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ। মানুষের মন স্বভাবতই চাইছে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে, নতুন ক'রে সংশ্লেষণ করতে। তাই মানুষের প্রচণ্ড কর্মপ্রগতির প্রভাবে ভবিষ্যতের নব ধর্মের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, যা সুরু হয়ে গেছে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুণ্য আবির্ভাবের সঙ্গে। ব্যক্তিজীবনে ধর্মের অবস্থান কোথায়, ধর্মের প্রভাব কি এবং ধর্মের অনুধাবনে মানুষের শক্তি কেমন ক'রে বৃদ্ধি পায়,—এ সব জিনিস মানুষ যখন প্রকৃতই জানতে পারবে তখন মানুষের জীবন নিঃসন্দেহে আরও মধুর হবে।

মানবজীবনে মনন যেমন, কর্মও সে রকম তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আত্মচেতনা ও কর্ম এ দু'টি মিলেই গঠন করে প্রকৃত মানব-সংস্কৃতি। সমস্ত জগৎ এক চিরন্তনী গতির মধ্যে অবস্থান করছে। মানুষ এর একটি একক। বিজ্ঞানী মন বস্তুজগৎকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ ক'রে শেষে বুঝতে পারে যে, সকল বস্তুরই উৎস এক মহান শক্তি যার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়। মানবাত্মা ও বস্তু-জগতের এই যোগসূত্রের আদি ও অন্ত নেই। মানুষের কর্মের মধ্যে শুধু যে বৃথা কষ্টই আছে, তা বলা যায় না। কর্মের মধ্য দিয়েও মানুষ পরম শান্তি লাভ করতে পারে। মানুষের প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই মানুষ ক্রমশঃ নৈতিক জীবনোপযোগী কর্মময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ কথা ধ'রে লওয়া চলে। তাই এ সম্ভাবনার কথাও উদয় হয় যে, মানুষ উত্তরোত্তর বিভিন্ন ধর্মসূত্রে জ্ঞাত ঐশ্বরিক শক্তি ও সত্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। মানুষের লক্ষ্য প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া। আর এটাই মনে হয় মানবাত্মার মুক্তির লক্ষণ। এ বিষয়ে মানবাত্মা নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণকারী, অন্য কোনও নিয়মকানুনের প্রয়োজন নেই। তাই কর্ম হবে তার উপাসনা। কারণ সে সমাজের জন্য কাজ করবে, সমাজকল্যাণের চেষ্টা করবে নিজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই। সে বুঝবে নিজের কল্যাণের জন্য যা করা

প্রয়োজন সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যও তা-ই প্রয়োজন।

সে ধর্ম তাই হবে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান, কেবলমাত্র সমাজের একটি বিলাস বা ফ্যাশনের উপাদান নয়। সে ধর্ম হচ্ছে মানবের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন, মানবাত্মার অন্তরের সম্পদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যদি মনে করা যায় যে, এই মানবরূপে ঈশ্বরদর্শন কেবলমাত্র আদর্শ বা ধারণা তা হলেও স্বীকার করতেই হবে যে বিজ্ঞান ও রাজনীতিপ্রধান বর্তমানের এই চলমান বিশ্বের কর্মপ্রণালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য সূত্র এই ধর্মবিজ্ঞান।

আমরা চাইব সেই ভবিষ্যতের দিকে যখন প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের প্রয়োজন আর থাকবে না, যখন মানবসমাজ সেই স্তরে উন্নীত হবে যেখানে দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক সত্য তার কাছে সদা জাগ্রত থাকবে। এই কর্মমাধ্যমে ধর্ম অশুভ ভাবকে পরাজিত করবে, এর পূজা ও ধ্যানপদ্ধতি হবে প্রয়োগধর্মী সেই প্রকার কর্ম ও বিশ্বাস যা স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত কিন্তু মানবীয় ধারায় সার্থকরূপে মহিমান্বিত। আধুনিক বিজ্ঞান অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই ধর্মকে।

বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আমরা দেখছি কত বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের এক বিরাট সমাবেশ। তার সমন্বয় সাধিত হ'তে পারে একমাত্র ধর্মের বৈজ্ঞানিক পুনরীক্ষণের দ্বারা। বিশ্বের আধুনিক ঋষি বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আলোকে বেদান্তের অবদান থাকবে এই পুনরীক্ষণের মধ্যে। হিন্দুমতে একত্বই সত্য, বহুত্ব মিথ্যা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এই এক নিত্য বস্তুই একই মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত।

ভবিষ্যতের ধর্ম হবে গতিশীল জগতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান। এ ধর্ম মানুষকে শক্তি দেবে, অন্তরাত্মাকে করবে বিকশিত, জগৎকে করবে প্রকৃতপক্ষে সুখসম্পদের ক্ষেত্র, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে দেবে বাস্তবরূপ। এক বিশ্বের আদর্শ হবে এর মূলসূত্র। এ ধর্ম নিজ প্রভাবে বিশ্ব রাজনীতির মধ্যে আনয়ন করবে মানবিকতা-বোধ। গতিশীল জগৎ এখন যে পর্যায়ে তাতে মানুষের ধর্মেরও যে নববিকাশ হবে,—এ ধারণাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত। বর্তমানের বিজ্ঞানী মন চাইবে, ধর্ম তার মানসিক জগতে আনবে বিশ্বাস ও ধারণার ক্ষেত্রে দেবে বোধগম্য ও বুদ্ধিদীপ্ত এক অর্থ। কারণ ধর্মই মানুষের আবেগ ও ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে। বর্তমানের মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম হোক তার সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয়যন্ত্র, ধর্ম করুক প্রত্যেকটি মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনাত্মক জীবনের অধিকারী। বর্তমানের মানুষের ধারণায় ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব অভিন্ন হতে পারে না। বর্তমানের বিশ্লেষণকারী মানবসত্তা সর্বাগ্রে স্থান দেবে সেই ধর্মকে যে ধর্ম তাকে উন্নত মস্তকে দাঁড়াতে শেখাবে এবং উন্নত শ্রেণীর কার্যে প্রেরণা দেবে।

উপনিষদের অমৃতবাণীর মধ্যে এই বিজ্ঞানী মনের আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর মিলে যায়। নিত্য অনুষ্ঠিত সত্য, তপ, সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য দ্বারাই এই আত্মা লভ্য। আত্মাই অনুভবনীয়, শ্রবণীয়, বিচার্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। আত্মাকে জানলেই সব জানা হল, কারণ আত্মাই সব। ধীমান ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই

আত্মার বিষয় জেনে প্রজ্ঞা অবলম্বন করবেন। উপনিষদের মূল বক্তব্য—স্বরূপতঃ আমরা সকলেই ব্রহ্ম।

স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম মানুষের অন্তরের অপরিহার্য অঙ্গ···জীবনমাত্রই অন্তর্জীবনের বিবর্তন।···ধর্মবিজ্ঞান মানবাত্মার বিশ্লেষণ-মূলক। উপলব্ধিই ধর্ম।· আমরা চাই কর্মে পরিণত ধর্ম।···ধর্ম এমন একটি ভাব, যাহা পশুকে মানুষে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।···বেদান্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই প্রচার করে।···বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদান্ত শেখায় যে, সত্য জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।···সময় আসিতেছে যখন মহান মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।"

প্রার্থনা

শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়

'মানুষই দেবতা' এ মহা বারতা
ঘোষিলে কে তুমি বীর,
বিবেকানন্দ, অগ্নিসাধক,
(তব) চরণে নোয়াই শির।
ধ্যানেতে তোমার হ'ল দরশন
নরের হৃদয়ে জাগে নারায়ণ,
বজ্রনিনাদে ঘোষিলে সে বাণী,
ভাঙ্গিলে মোহপ্রাচীর॥

রুদ্র, তোমার বেজেছে বিষাণ
নরদেবতার ওঠে জয়গান—
বিশ্ব জুড়িয়া জাগিছে মানুষ
উন্নত করি শির!
জাগিছে, তবুও তারা পথহারা
ছুটিছে আঁধারে পাগলের পারা—
দীপ্ত সূর্য! রশ্মি তোমার
ঘুচাক ঘোর তিমির॥

সমালোচনা

থাপখোলা তলোয়ার: সুমনি মিত্র। বিবেক-ভারতী, ৫৭, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃঃ ৪৭৯, মূল্য আট টাকা।

তাঁর 'নরেন' সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, 'খাপ-খোলা তলোয়ার'। সুমনি মিত্র তাঁর তিন খণ্ডে পরিকল্পিত বিবেকানন্দ-জীবনভাষ্যের প্রথম খণ্ড 'সপ্তর্ষির ঋষি' গ্রন্থে স্বামীজীর জীবনের মূল পর্বটি বিশ্লেষণ করে সুধীসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়করূপে স্বামীজীর সংগ্রামী-সত্তার অন্তরঙ্গ রূপায়ণ, সেদিক থেকে 'খাপ-খোলা তলোয়ার' নামটি সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বিবেকানন্দ-ভাবধারায় প্রদীপ্ত লেখকের ভাষাও এ গ্রন্থে যেমন শাণিত, তেমনি বহুবিস্তৃত মনন ও অধ্যয়নে সুসমৃদ্ধ। পূর্ববর্তী গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও পাদটীকায় লেখকের সুপরিণত চিন্তার ঐশ্বর্য পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। গ্রন্থের আদ্যন্ত তাঁরই স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রনিদর্শনগুলি লেখকের ভক্তিসমুজ্জ্বল অনুভবজগতের লাবণ্যে এক অখণ্ড ভাবতাৎপর্যের সৃষ্টি করেছে।

'খাপখোলা তলোয়ারে'র আটটি অধ্যায়ের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃতীয় অধ্যায়: স্বামীজীর যুক্তিবাদ, চতুর্থ অধ্যায়: সংগ্রামী সন্ন্যাসী, পঞ্চম অধ্যায়: নর-নারায়ণ-বাদ। রুচিভেদে অন্যান্য অধ্যায়ের প্রতিও পাঠকদের অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবে লেখকের বক্তব্য সবচেয়ে সুবিশ্লেষিত ও সুসংহত ঐ তিনটি অধ্যায়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থের শেষদিকে অনেক পরিমাণে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সারদাদেবীর কথাও এসেছে। এ সব-কিছুই লেখক তাঁর বিচিত্র কথনকৌশলে একই সঙ্গে একান্ত ঘরোয়া অথচ রীতিমতো বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। বইটি পড়তে পড়তে অনেক সময়ই মনে হয়েছে, কবিতার বাহ্য আবরণটুকু ত্যাগ করে সম্পূর্ণ প্রবন্ধকাররূপে দেখা দিলেই লেখক হয়তো পাঠকসমাজে বেশী স্বীকৃতি পেতেন। কিন্তু সব আভিধানিক সংজ্ঞার বাইরে নতুন সাহিত্যকৃতির মূল্যও কিছু কম নয়। এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ বেশী।

বিবেকানন্দ-মননের অন্যতম অপরিহার্য এই গ্রন্থটি প্রকাশে যিনি এবং যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁরা সকলেই জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। বিপুল-কায় অন্তঃসারহীন তথাকথিত "উপন্যাস" রচনার ভীড়ে তাঁরা অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করেছেন যে, কেবল পৃষ্ঠা ও মূল্যের অঙ্কে সাহিত্যের মূল্যবিচার হয় না—একথা মনে রাখবার মতো সুস্থবুদ্ধি কিছু লোক এখনও এদেশে আছেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চয়ন। শ্রীপ্রমথভূষণ রায়চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস ঘোষ, ৭৪এ, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা ২০। পৃষ্ঠা ১৬২; মূল্য ৫৲।

গ্রন্থখানির অবতরণিকায় শ্রীমধুসূদন বেদান্ত-শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "দর্শনশাস্ত্র অতীব দুরবগাহ তথাপি শাস্ত্রব্যসনী ৯২বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় অতিশয় ধৈর্য ও উৎসাহকারে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, ষড়দর্শন-রূপ তীব্র কণ্টকাকীর্ণ মহামহীরুহে আরোহণ করিয়া যাহা চয়ন করিয়া 'সূত্রে মণিগণা ইব' নিজের প্রাঞ্জল ভাষায় 'চয়ন'-গ্রন্থে উপন্যস্ত করিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করিলে এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হয়। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

Shri Ramakrishna Souvenir — 1966. Institute of Social Education and Recreation, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24 Parganas. Pp. 146.

আলোচ্য স্মরণিকাটি নানা দিক হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে : বিশিষ্ট লেখকগণের সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী, উৎকৃষ্ট কাগজে শোভন মুদ্রণ, সুন্দর চিত্রের সন্নিবেশ।

"Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur" প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আশ্রমটির ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট। "Institute of Social Education and Recreation, Ramakrishna Mission Ashrama" সচিত্র প্রবন্ধটিতে সমাজশিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

Our Traditional Values and National Culture—The Call of the Gita by Dr Kailashnath Katju, Need for Spiritual and Moral Teachings in Educational Institutions by Sj. Saraswathi Gourishankar, Bengal in the Nineteenth Century by Hiranmay Banerjee, Sankara and Ramanuja by Swami Adidevananda The Secret of Tapas by Dr. K. M Munshi—প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা: ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮১।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের রূপ লইবার পর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর যে সংবিধানটি মঞ্জুর হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি আদি রাষ্ট্রের দুইতৃতীয়াংশ দুই বৎসর ধরিয়া যাহাকে স্বীকৃতি দান করে এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হইয়া যাহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, এই সচিত্র পত্রিকাটিতে পৃথিবীর সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম লিখিত সেই সংবিধানের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান রূপ সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। কংগ্রেসের কর্ম-পদ্ধতি, আইন-প্রণয়ন-রীতি প্রভৃতি বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য বিবরণও পত্রিকাটিতে পাওয়া যাইবে।

Common Words—(A simple English-Bengali Dictionary for boys and girls)—Compiled by Sures C. Das, M. A General Printers & Publishers P. Ltd. Calcutta 13 Pp 200, Price Rs 2/-.

পাঁচ হাজার প্রচলিত ইংরেজী শব্দের এই অভিধান-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকখানি কাছে রাখিলে বিশেষ লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। অভিধানখানির বৈশিষ্ট্য : নির্বাচিত ইংরেজী শব্দের সহজ বাংলা অর্থ, প্রত্যেক শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ, কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যামূলক অর্থ। স্থলবিশেষে অর্থবোধ সুস্পষ্ট করিবার জন্য চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অভিধানটি যে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহা প্রমাণ করে।

বাণী ও প্রার্থনা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)। পরমশরণানন্দ-সঙ্কলিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ আশ্রম, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা ১৭৮; মূল্য ২৲।

প্রার্থনা ও স্তোত্রাদি, প্রার্থনা-সঙ্গীত ও বিবিধ প্রসঙ্গ—এই তিনটি স্তবকে ব্যাপ্ত সংকলনগুলিতে সংকলয়িতার উত্তম রুচিবোধের পরিচয় বিদ্যমান। দ্বিতীয় সংস্করণটি আরও জনপ্রিয়তা লাভ করিবে, মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়।

'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদা দেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বিদ্যালয়-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২৮১ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। তামিল ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীগণকে জাতীয় ভাষা (Malay) এবং ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৪,৯৫৯ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ৩৮৫ খানি নূতন বই সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৫২টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫৫টি ছাত্র ছিল। ছাত্রাবাসটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা-ভজনাদি ও খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষ হইতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে ১৫টি বক্তৃতা দেন।

আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে ফেব্রুআরি যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে পূজার্চনা, ভজন, অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। তৎপর সান্ধ্য আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা-সভায় পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ত, বিদ্যুৎ ও জলসেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মং শু প্রু চৌধুরী ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্বের সংঘাতবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচারী সুকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ধর্মমতের ব্যাখ্যা করেন। প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল মোত্তালিব ভূঁইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সমবেত উপাসনা ও কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় এক হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ১৫ই ফাল্গুন অপরাহ্নে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

ও পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। এডভোকেট জনাব মীর্জা গোলাম হাফেজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও স্বহস্তে উপযুক্ত ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁহার ভাষণে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের জনহিতকর কার্যের সুখ্যাতি করেন এবং এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া স্কুলের উন্নতি কামনা করেন। ব্রহ্মচারী সুকুমার 'প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষা' এই আদর্শানুসারে এখানে শিক্ষাদানের যে চেষ্টা করা হয় তাহা ব্যক্ত করেন এবং স্কুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। বিদ্যালয়টি প্রথমে প্রাইমারী স্কুল ছিল, পরে উহা মধ্য ইংরেজী স্কুল হয়, বর্তমানে উহা জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিনশত।

শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ২২শে ফেব্রুআরি মঙ্গলবার হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়দিনব্যাপী সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২২শে ফেব্রুআরি ভোর ৫টা হইতে মঙ্গলারতি, কীর্তন ও ভজনাদি হয়। তারপর বিশেষ পূজা, অঞ্জলিপ্রদান ও হোম হয়। ঐদিনই সকালে আশ্রমের বিদ্যার্থিবৃন্দ কর্তৃক 'লীলাগীতি' গীত হয়। ইহার পর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ ও সন্ধ্যায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিদ্যার্থিগণ কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, গান ও বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে।

২৩শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে আগত রামায়ণগায়ক শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন। রামায়ণগানের অব্যবহিত পরেই শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কীর্তন গান করেন। এই অনুষ্ঠানটি খুবই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরদিনও সন্ধ্যায় কীর্তন ও রামায়ণ গান হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন।

২৫শে ফেব্রুআরি 'মহিলাদিবস'-রূপে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। এই দিন সকালে শিলচর সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের শিশুশিল্পী-আয়োজিত 'গোষ্ঠলীলা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। শিশু-শিল্পিবৃন্দের অভিনয় দর্শকগণকে চমৎকৃত করে। সন্ধ্যায় কীর্তন ও রামায়ণগানের পর ঐ দিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৬শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ। সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী দেবানন্দজী, শ্রীঅনিলচন্দ্র দাস ও শ্রীকুলেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। সভায় বক্তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দ বর্তমান সমস্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ ভাষণ দেন। সভার পর শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন।

২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার সমস্তদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন। তারপর স্বামী দেবানন্দ মহারাজ 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে স্থানীয় গায়ক শ্রীননীগোপাল গোস্বামী কর্তৃক পদাবলী কীর্তন গীত হয়। মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ ভাষণ দেন। ভাষণের পর শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভজনসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে নয়দিনব্যাপী শুভ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ২২শে ফেব্রুআরি শুক্লাদ্বিতীয়ায় ঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ও আরতির পর সন্ধ্যায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত 'কথামৃত'-পারায়ণ এবং ২৩শে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ-কথকতা করেন। ২৬, ২৭, ২৮শে ফেব্রুআরি ও ২রা মার্চ সন্ধ্যায় বেতারশিল্পী শ্রীভূপেন চক্রবর্তী ভজনকীর্তন পরিবেশন করেন। ২৭শে ফেব্রুআরি সারাদিনব্যাপী 'নরনারায়ণ'-সেবায় প্রায় ৪,০০০ লোক বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন রূপায়ণে সকলেরই সহযোগিতার আহ্বান জানান। খড়্গপুর ইন্স্টিটুট অব টেকনলজীর অধ্যাপক শ্রীবি. এম. চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। ২রা মার্চ স্বামী অজজানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ধর্মের আলোকে আমাদের সংকীর্ণতা দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলাশাসক শ্রীগ্রেগরী গোমেশ সভাপতির ভাষণ দেন।

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি আশ্রমে গত ২০শে ফেব্রুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৩১তম জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রসাদবিতরণ কিঞ্চিৎ তারতম্য করার প্রয়োজন বিধায় ফল-মিষ্টাদি প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে হয়।

২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুআরি সাধারণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২৬ তারিখ সন্ধ্যারতির পরে জনসাধারণের জন্য সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাজা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী আদিনাথানন্দ সোসাইটির অগ্রগতির বার্ষিক ও সামগ্রিক ধারাবিবরণী পাঠ করিবার পর স্থানীয় কলেজের প্রফেসর শ্রীসত্যচরণ ওঝা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তাৎপর্য এবং তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধ্যানের উপকারিতা সুললিত ও সহজবোধ্য হিন্দীতে উপস্থাপিত করিবার পরে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়। ভাষণগুলি সবই সুচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সাধারণ সভার পরে শ্রীসুধীর চৌধুরী রামায়ণগান পরিবেশন করেন।

২৭শে ফেব্রুআরি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কল্পতরু-ঘটনাবলী পুঁথি অবলম্বনে গীতিসম্বলিত কথকতায় পরিবেশন করেন। গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীহরিপদ কর। তৎপরে রামায়ণ গান হয়। জনসাধারণ এই উভয় শিল্পী দ্বারা পরিবেশিত বিষয়বস্তু অতিশয় উপভোগ্য গণ্য করেন এবং আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন।

এই বৎসর দরিদ্রনারায়ণ-সেবাতে খাদ্য-পরিস্থিতি অনুযায়ী বসাইয়া সেবার সুযোগ ঘটে নাই, পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া ফলমিষ্টাদি বিতরণ করা হয়। হাসপাতালে রোগীদিগকে ফল বিতরণ করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা-সফর

গত নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুআরি মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গৌহাটী রামকৃষ্ণ আশ্রম, পাণ্ডু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কালাপাহাড়—গৌহাটী, রেলওয়ে কলোনী—গৌহাটী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গড়বেতা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—মেদিনীপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—

তমলুক, গোপ-মহিলা কলেজ—মেদিনীপুর, চিঁচড়া, মাতৃমন্দির—জয়রামবাটী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—কামারপুকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—কোয়ালপাড়া, সুভাষ হাইস্কুল—গরগড়িয়া, সায়েঙ্গা, শ্যামাপদ উচ্চ বিদ্যালয়—বিক্রমপুর, রায়পুর হাইস্কুল, বনমালী বিদ্যামন্দির—তপ্তদামদী, মণ্ডলগুলি, মণিপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কাঁথি, পারুলিয়া হাইস্কুল, বিজয়কৃষ্ণ জাগৃহি বাণীপীঠ—ম'রিশদা, নেতাজী মিলন সঙ্ঘ—কুমীরদা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—বনমালী চট্টা, জীবনকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—নাচিন্দা, বলাগেড়িয়া, আদর্শ বিদ্যাপীঠ—খেজুরী, গুরুপ্রসাদ বালিকা বিদ্যানিকেতন—কুঞ্জপুর, চতুর্ভুজচক প্রাথমিক বিদ্যালয়—ষাটকুমারী, খেজুরী, রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—থানিপুর, আজুয়া, বেলদা ইত্যাদি স্থানে 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'যুগধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী', 'শিক্ষা ও ছাত্রজীবন' ইত্যাদি সম্বন্ধে মোট ৪২টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৮টি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়াছে।

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা অতি দুঃখিত চিত্তে সঙ্ঘের দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি:

স্বামী সিদ্ধানন্দ

গত ১০ই মার্চ বেলা ১০টা ১০ মিনিটের সময় বারাণসী সেবাশ্রমে স্বামী সিদ্ধানন্দ ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত অক্টোবর (১৯৬৫) মাসে আমাশয় ও প্রসটেট গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধিজনিত উপসর্গে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকগণ তাঁহার ক্যান্সার হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, অবশেষে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী সিদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর কথোপকথন লিখিয়া রাখেন, পরে ইহা 'সৎকথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

স্বামী সিদ্ধানন্দ জীবনের অধিকাংশ কাল ৺কাশীধামে অতিবাহিত করেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ।। শান্তিঃ।।।

স্বামী জ্ঞানানন্দ

গত ১৮ই মার্চ বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় স্বামী জ্ঞানানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ৭৪ বৎসর বয়সে সহসা মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণের ফলে (cerebral stroke) দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কাশীতে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ কিছু দিন কাটাইয়া গত ৮ই মার্চ তিনি কনখলে গিয়াছিলেন। ১৮ই মার্চ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁহার স্ট্রোক হয়, বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। এই সময়ে তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করিতে দেখা যায়, তিনি তাঁহাদের ফটো-অ্যালবাম বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় নীলধারার গঙ্গাবক্ষে তাঁহার দেহ সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কিছুকাল শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আমেদাবাদ শ্রীবিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১২.২.৬৬ শনিবার বৈকালে স্থানীয় অখণ্ডানন্দ হলে শ্রীবিবেকানন্দ পাঠ-চক্রের বার্ষিক মহোৎসব এবং বেদান্তকেশরী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের ১০৪ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পাঠচক্রের বার্ষিক বিবরণী পঠিত হয়। প্রবচনে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক প্রকাশ গর্জর, অধ্যাপক বদ্রিনারায়ণ অলোক ও অধ্যাপক ফিরোজ দাবর। বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সারগর্ভ ভাষণ দেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (মণিনগর) গত ২২.২.৬৬ মঙ্গলবার প্রতিপালিত হয়। ভোর হইতে ঊষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও নবচণ্ডী পাঠ হয়। বৈকালে ৫-৩০ হইতে ৯-৩০ পর্যন্ত শ্রীবিবেকানন্দ-পাঠচক্র দ্বারা অনুসৃত কার্যক্রমের মধ্যে মুখ্য ছিল বেদমন্ত্র আবৃত্তি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, শ্রীশ্রীমার উপদেশ পাঠ, স্বামিশিষ্য-সংবাদ পাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ পাঠ, নামধুন, আরতি, ভজন, কীর্তন। ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনুরূপ কার্যসূচী দ্বারা গত ১৪.১২.৬৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১১৩তম জন্মজয়ন্তী এবং গত ১৩.১.৬৬ স্বামী বিবেকানন্দজীর ১০৪তম জন্মজয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল।

বরাহনগর পিপল্‌স্ লাইব্রেরীর নিজস্ব ভবনে গত ১৩ই ফেব্রুআরি স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ ভক্ত, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন ও ভবনাথের কয়েকটি স্মারক চিহ্ন সম্বলিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে লাইব্রেরী-ভবনের সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীদেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতি স্বামী নির্বাণানন্দজী ও স্বামী নির্জরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবনাথ সম্বন্ধে হৃদয়-গ্রাহী আলোচনা করেন। লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅসিতবরণ মুখোপাধ্যায় কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

ভবনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা' ও 'দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী' (সম্ভবতঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) একত্র হইয়া 'বরাহনগর পিপল্‌স্ লাইব্রেরী' নামে পরিচিত হয়। ভবনাথ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'-র একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে এই বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, রামায়ণকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দ মহারাজ।

আশ্রমস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত বৎসর ২৬,৬৫১ জন রোগীকে বিনামূল্যে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ করা হয়।

ভাজিয়া সারদা সঙ্ঘ: গত ৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার হইতে তিনদিনব্যাপী এক উৎসবে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত তেলো-

ভেলোর মাঠসংলগ্ন 'ডাকাতে কালী'র প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ধর্মসভা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সভাপতিত্ব করেন ও সুপরিচিত কবি বিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'মালশ্রী'র সভ্যবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত গীতিবিচিত্রা 'পরমা প্রকৃতি মা সারদা' ও 'মহিষ-মর্দিনী' এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায় (বেতারশিল্পী) ও সঙ্ঘসম্পাদক শ্রীকুমার সরকার এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা ও পরিশ্রমে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কার্যবিবরণী

গোয়ালিয়র (এম পি.) রামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদ্দেশে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি ধর্মশালায় ধর্মালোচনা, ভজন ও জনসেবামূলক কার্য শুরু করেন। ইহার পর জহর নগরে একটি ভবনে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়, বর্তমানে আশ্রম এখানেই অবস্থিত। গত পাঁচ বৎসরে সাপ্তাহিক গীতা-ক্লাস, নিয়মিত 'কথামৃত' আলোচনা, একাদশীতে রামনামসঙ্কীর্তন এবং সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমের কর্মপ্রসারের জন্য নিজস্ব জমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্টেক্লোস্কোন

দুইজন সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ পনের বৎসর গবেষণা করিয়া 'স্টেক্লোস্কোন'-জাতীয় নকল কাচের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই নকল কাচ এতই মজবুত যে ইস্পাতের মতো শক্তি বহন করে, সামান্য আঘাতে ভাঙিয়া যায় না। এই বিচিত্র পদার্থটি কাচের অংশের সহিত কৃত্রিম আলকাতরা মিশ্রিত করিয়া সৃষ্ট।

যাত্রীবাহী গাড়ি, স্নানের জল রাখিবার চৌবাচ্চা, জাহাজের বিভিন্ন হালকা পার্টস, মোটর গাড়ি, ঘরের আসবাবপত্র, সুটকেশ—এই সব এই নকল কাচ 'স্টেক্লোস্কোন' হইতে প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন। প্লাস্টিক শিল্পের ন্যায় 'স্টেক্লোস্কোন'-শিল্পটিও জগতের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস।

ভ্রম-সংশোধন

১৩৭২, ফাল্গুন সংখ্যা, ৫৭ পৃষ্ঠা, ২য় লাইন: '১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার' স্থলে '১২ই মাঘ বুধবার' পড়িবেন। ৮ম লাইন: '১৪ই মাঘ' স্থলে '১৩ই মাঘ' পড়িবেন। ৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫শ লাইন: '২৫শে মাঘ' স্থলে '২৪শে মাঘ' পড়িবেন।

১৩৭২, চৈত্র সংখ্যা, ১১৪ পৃষ্ঠা, ১১শ লাইন: 'মাধবানন্দজী অধ্যক্ষ হইবার পর' স্থলে 'মাধবানন্দজীর পর' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ১।৩।৩-৪ ॥

কঠোপনিষদ্

দেহ-রথে রথী আত্মা, ইন্দ্রিয় তাহার অশ্ব, মন বল্গা, বুদ্ধি সে সারথি,
বিষয় তাহার পথ—সে পথেতে অশ্বগণ নিয়ে চলে রথ সহ রথী।
(দেহেন্দ্রিয়মন ছাড়া বিষয়সম্ভোগ নাহি হয় কদাচন)
দেহেন্দ্রিয়মন সহ সংযুক্ত আত্মাই ভোক্তা—কহে জ্ঞানিগণ।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ১।৩।৫ ॥

চঞ্চল মানস যার, নহে সমাহিত,
সে-মনের সহ যুক্ত বুদ্ধি যার অবিবেকী হয়,
(দুর্বল) সারথি-হস্তে দুষ্ট অশ্ব সম
ইন্দ্রিয়েরে বশে রাখা সাধ্য তার নয়।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ১।৩।৮ ॥

বিবেকী যাহার বুদ্ধি, সংযত মানস যার, পবিত্র যাহার দেহ-মন,
(হেলায় চালায়ে রথ যাইতে সে পারে দিব্যধামে)
লভে সে পরম পদ, লভিলে যা পুনর্জন্ম হয় না কখন।

কথাপ্রসঙ্গে

দেশসেবকের আদর্শ

মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তাঁহার জীবনাদর্শের যে বিশেষ দিকটির প্রতি দেশ-সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা হইল ত্যাগ অবলম্বনে সেবা। ইহাই চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত স্বাধীনতা-লাভের জন্য যে সংগ্রাম বিপুলতর বেগে চলিয়াছিল তাহার বীর যোদ্ধাদের জীবন ছিল এই আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ ভিত্তিভূমি হইতে বহু দেশসেবকের জীবনাদর্শ সরিয়া আসিতে সুরু করে স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই। বহুজনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈসাদৃশ্য প্রকট হইবার পর মহাত্মা গান্ধী যতদিন জীবিত ছিলেন প্রার্থনাসভায় প্রায় প্রতিদিনই তিনি স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামের দিনের আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া উহাতে দেশসেবক-গণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর এবিষয়ে সজাগ করাইয়া দিবারও লোক যেন ক্রমে বিরল হইয়া গেল। এই ত্যাগের আদর্শ ক্রমবিলুপ্ত হওয়ায় তাহার বিষময় ফল আজ ফলিতেছে—সর্বত্রই আজ জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অসন্তোষ আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। হৃদয়ের সহিত সংস্পর্শহীন বুদ্ধিমাত্র অবলম্বনে হয়ত কোনরূপে শাসনযন্ত্রকে অবিকল রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু ইহা জনগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। কেহ আমার প্রতি দরদী কি না, তাহা বুঝিবার জন্য কোন সুচিন্তিত সুবিন্যস্ত বক্তৃতা শুনিবার প্রয়োজন হয় না, আচরণ দেখিয়া সকলে স্বতই তাহা বুঝিতে পারে, আবার বুদ্ধিজ ভাষার আবরণ সত্যকে কখন ঢাকিয়া রাখিতেও পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মস্তিষ্কের ভাষা সকলে বুঝিতে পারে না কিন্তু হৃদয়ের ভাষা তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান পর্যন্ত সকলেই বোঝে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশাত্মবোধের প্রথম ব্যাপক প্রসারের সহায়কগণ, মহাত্মাজী, নেতাজী প্রভৃতি দেশের জনগণের সকলেরই হৃদয়ে যে গভীর শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের উচ্চপদ বা ক্ষমতার জন্য নহে—ত্যাগনিষ্ঠ চরিত্রেরই জন্য, ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধিজ ভুলভ্রান্তির প্রাচুর্যও হৃদয়কর্তৃক অধিকৃত শ্রদ্ধার এই আসনকে টলাইতে পারে নাই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন দেশের কল্যাণসাধনের পথের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন মহামতি গোখ্‌লে যে বিষয়টির প্রতি জোর দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া—জনসেবকদের জীবন ত্যাগপূত হওয়া এবং জনসেবার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা অনুস্যূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের নির্বাচন জাতি- বা সম্প্রদায়-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা চরিত্র- ও যোগ্যতা-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন, এরূপ না হওয়ার জন্যই দেশে বর্তমান বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে।

সেবাযজ্ঞে অগণিত দেশপ্রেমিকের ত্যাগ ও সেবার বিমল ভাবমণ্ডিত জীবনাহুতি প্রদানের ফলস্বরূপ যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, বহিরাগত দুইটি দুর্যোগের ক্ষণে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে দেশের সর্বত্রব্যাপী জনসাধারণের

হৃদয় হইতে উৎসারিত (সাময়িক হইলেও ঐকান্তিক) স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগ ও সেবার সুদৃঢ় সংকল্প। জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার এবং উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য দেশসেবকগণের, বিশেষ করিয়া নেতাগণের জীবনকে ত্যাগনিষ্ঠসেবা-ভিত্তিক করার প্রয়োজন যে অনিবার্য, বর্তমান পরিস্থিতি তাহা আমাদের সকলেরই নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

পাশ্চাত্যে মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর ভারতীয় চিরন্তন ভাবধারা প্রচারের দ্বারা ভারতকে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে বসাইয়া এবং তাহার ফলে ভারতীয়তার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই 'কলম্বো হইতে আলমোড়া' পর্যন্ত যখন পূর্ণ ত্যাগ, অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও সেবার সর্বোচ্চ ভাবমণ্ডিত জীবনোদ্ভূত বিপুল শক্তিময় বাণীর বিদ্যুৎস্পর্শে মৃতপ্রায় জাতিকে জাগরিত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ভারতকে উন্নতির পথে গতিবেগসম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটি মূল সূত্র তিনি দিয়া গিয়াছেন, যাহা ভারতের কল্যাণের জন্য সর্বকালেই প্রয়োজ্য। তাহার মধ্যে একটি হইল—দেশসেবক হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। কথাগুলি আমরা বহুবার শুনিয়াছি, তথাপি বর্তমান সময়ে ইহা আর একবার অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, স্বদেশহিতৈষী হইতে হইলে তিনটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। "প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদের কতটুকু সহায়তা করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়-দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে।" দেশের জনগণের দুঃখদুর্দশার চিন্তা আমাদের হৃদয়কে কি তোলপাড় করিয়া তোলে?—"এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার মাত্র প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছ।"

দ্বিতীয় সোপান হইল জনগণের দুর্দশা নিবারণের কার্যকর পন্থা আবিষ্কার—"মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশার প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পন্থা আবিষ্কার করিয়াছ কি? মানুষদের গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পার কি?"

তৃতীয় সোপান হইল কার্যসাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে সর্বস্বত্যাগ করিবার ও সর্ববাধা চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবার অটুট সংকল্প—"তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ

তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পারো? নিজপথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারো? তোমাদের কি এরূপ দৃঢ়তা আছে?"

"যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তোমরা অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারো। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।··তোমরা যদি পর্বতের গুহায় গিয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বতপ্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইবে। অকপটতা, সাধু উদ্দেশ্য ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।"

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা

স্বাধীনতালাভের পর হইতে আমাদের দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে বর্তমানে মাঝে মাঝে উহা ভয়াবহ ও লজ্জাকর রূপ ধারণ করিতেছে। যাহারা দুদিন পরে দেশসেবার বিভিন্ন বিভাগে, দেশের শৃঙ্খলারক্ষার কাজেও আত্মনিয়োগ করিবে, শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহাদের এই-জাতীয় আচরণ মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

জীবনের কোন কোন দিকে কিশোর ও যুবমনের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ঢেউ বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উঠিতেছে; কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করিবার যে মনোবৃত্তি এদেশে একদল ছাত্রের মধ্যে দেখা যাইতেছে, তাহা আর কোথাও এভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে কিনা, জানি না।

শৃঙ্খলা ছাড়া কোন মহৎ জীবন গঠিত হইতে পারে না, কোন সংগঠন বা সঙ্ঘবদ্ধ বড় কাজ চলিতে পারে না, দেশ উন্নত হইতে পারে না। নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য ইহার প্রয়োজনের অনিবার্যতা স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগা প্রয়োজন, যেমন খেলার সময় রেফারীর নির্দেশ বা কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে মনে একথা ওঠে না যে, বাধ্য হইয়া কিছু করিতেছি। স্বতঃস্ফূর্ত সে বোধের জন্য আমাদের হয়ত আরো কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। সুদীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া বাধ্য হইয়া ভয়ে নিয়ম মানিয়া চলার ফলে স্বাধীনতালাভের পর এখনো আমাদের মনে বোধ হয় এভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—নিয়ম মানিয়া চলিতে গেলেই আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত লাগিবে।

তাছাড়া ইহার জন্য যে মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এখনো শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান পাইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন ও প্রসারের ব্যবস্থাই রহিয়াছে, তাহার উন্নতির জন্যই চিন্তা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু মনের উৎকর্ষসাধনের, ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের কোন ব্যবস্থাই এখনো হইল না। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ অপেক্ষাও মনের উৎকর্ষসাধনের উপরই জোর দিয়াছেন বেশী, কতকগুলি সচ্চিন্তার ছাপ মনে পুনঃ পুনঃ দেওয়া ও কতকগুলি নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে ইহা করা যায়। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি পথের নির্দেশও দিয়া গিয়াছেন। তাহার কোনটিই যথাযথরূপে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় নাই। যত শীঘ্র উহার প্রবর্তন করা যায়, ততই মঙ্গল। জীবননিয়ন্ত্রণে মানসিক প্রবণতার প্রভাব বুদ্ধির প্রভাব অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা রোধের জন্য একটি কাজ ছাত্রগণই করিতে পারে। দেখা যায়, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। এই অল্প কয়েকজনই গণ্ডগোল বাধাইয়া তোলে; ইহাদের প্রেরণাও নিজস্ব অথবা বাহিরের উত্তেজনা প্রসূত, তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। অধিকাংশ ছাত্রই এরূপ বিশৃঙ্খলার পক্ষপাতী নহে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগৃহে যে কয়টি লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ইহা প্রকট। কিছু ছাত্র ঘটনাস্থলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, দু-একটি ছাত্র-সংগঠন ইহার তীব্র প্রতিবাদ এবং ইহা নিবারণে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করিয়াছে। ইহা খুবই আনন্দ ও আশার কথা। ইহা হইতেই মনে হয়, শুভচিন্তাশীল সদ্ভাবাপন্ন ছাত্রগণ, যাঁহারা বুঝেন যে শিক্ষাব্যবস্থাকে এভাবে বিপর্যস্ত করিলে ছাত্রদেরই ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেই ইহা অতি সহজে নিবারিত হইবে।

অন্যায় বলিয়া যাহা বোঝা যাইতেছে, তাহা হইতে শুধু বিরত থাকিলেই চলে না, তাহার প্রতিরোধে সক্রিয় না হইলে স্বল্পসংখ্যক অন্যায়কারীদেরই প্রকারান্তরে সমর্থন করা হয়। অতি পুরাতন বৈদিক স্তোত্রেও তাই দেখা যায়, তেজ, বীর্য, ওজঃ (সংযমজনিত শক্তি) প্রভৃতি প্রার্থনার সঙ্গে এই প্রার্থনাও করা হইতেছে—"মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি" —তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধস্বরূপ, তুমি আমাকে অন্যায়দ্রোহী কর। আশিষ্ট, দৃঢ়-সংকল্পবান, সংযত ছাত্রের অভাব স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী প্রমুখ সিংহসদৃশ মহা-মানবের জন্মভূমিতে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি ছাত্রসংঘটন করেন, যাহার শাখা প্রতি স্কুল-কলেজেই থাকিবে, এবং যাহার কাজ হইবে মাঝে মাঝে ছাত্রজীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকগুলি আলোচনা করা, অর্থকরী বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে যথার্থ 'মানুষ' হওয়া যায় তাহার আলোচনা করা, এবং ছাত্রসমাজে অন্যায় বলিয়া যাহা মনে হইবে তাহার প্রতিরোধে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, তাহা হইলে অতি সহজে ছাত্রসমাজ হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত হইবে এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলকর জীবনের দ্বারও উন্মুক্ত হইবে। অল্প কয়েকজন অকপট চরিত্রবান ছাত্র অগ্রণী হইলেই ইহা সহজে সংসাধিত হইবে। সংখ্যায় কিছু যায় আসে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"চরিত্রই বাধাবিঘ্ন-স্বরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।" "বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরে যাহা করিতে পারে না—মুষ্টিমেয় কয়েকটি অকপট সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে।"

দেশের এই দুর্দিনে 'মানুষে'র একান্ত অভাব। দোষ কাহার তাহা শুধু প্রচার করিয়া লাভ নাই—ইহার প্রতিকারে বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে। ছাত্রগণকেই 'মানুষ' হইয়া ভবিষ্যতে নিজেদের চেষ্টাতেই দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এক সময় যেমন স্কুলে-কলেজে, গ্রামে-গ্রামে সর্বত্র ছাত্রসমাজে বহু বাধা সত্ত্বেও সংযমের দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ 'মানুষ' হইবার ব্যাপক প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, এবং সে প্রয়াস সাফল্যও আনিয়াছিল, সেই দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন এখন আসিয়াছে। দেশমাতৃকার সেবারূপে, নরনারায়ণের সেবারূপে গ্রহণ করিয়া যাহারা ইহাতে অগ্রণী হইবে, মানবকল্যাণে অবতীর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ তাঁহাদের শিরে শতধারে বর্ষিত হইবে, "তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"

বুদ্ধদেব স্মরণে

স্বামী আদিনাথানন্দ

যখন অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরসর্বস্ব, নিষ্প্রাণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস কলুষিত, পরলোকে সুখলাভের উদ্দেশ্যে অবাধ পশুবলি ধর্মার্জনের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে বিবেচিত, যজ্ঞবেদীমূলে প্রাণিবধ অনুপাতে ধর্মলাভ সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত, পুরোহিতকুলের অপকৌশলে ভারতের ব্রাহ্মণেতর আপামর জনসাধারণ অজ্ঞান ও কুসংস্কারপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, বিদ্যাচর্চায় বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার, ক্ষত্রিয় রাজকুলের সহায়তায় ধর্মধ্বজী পুরোহিতকুলের প্রচণ্ড বিধিনিষেধের নাগপাশে সমাজজীবন পঙ্গু, যূপকাষ্ঠ ও বধ্যভূমি হইতে উত্থিত অগণিত অসহায় নিরীহ প্রাণীর সকরুণ মর্মভেদী আর্তনাদে ও হাহাকারে পবিত্র সনাতন ধর্মের একটি বিকৃত রূপ প্রকাশিত, তখন বিধির বিধানে, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই অঙ্গীকার পালনার্থ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনুপমহৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি সমন্বিত গৌতম বুদ্ধ – ভারতের ত্রাণকর্তা ও 'এশিয়ার আলো'—ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একটি রাজবংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া। তাঁহার লোকোত্তর দিব্য জীবন ও সহজ সরল প্রাণস্পর্শী উদার বাণীর প্রভাব সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়াছিল। গ্রীস দেশে সক্রেটিস (Socrates) ও চৈনিক কনফুছে (Confucius) তাঁহার সমসাময়িক। উক্ত তিন জন লোকনায়কই যে মতবাদ প্রচার করিতেন তাহাতে নৈতিক আদর্শবাদ (Ethical idealism) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপার্থিব বিষয় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার পরিহার করিয়া, ইহজীবন ও সমাজজীবন যাহাতে উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তাহার নির্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এমন এক আধ্যাত্মিক ভাবপ্লাবন প্রাচ্য ভূখণ্ডে উত্থিত হয় যে, সেই সময় হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে ও ভারতেতর দেশসকলে উহা বিস্তৃতি লাভ করে, বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাসে এক 'স্বর্ণযুগে'র সূচনা হয়।

বুদ্ধদেবের বাণী 'মৈত্রীভাবনার বাণী', যাহাকে অন্য কথায় বলা হয় 'ব্রহ্মবিহার।' মাতা প্রাণ দিয়া যেমন সর্বক্ষণ পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ অপরিমেয় প্রেমভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে। চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অহিংস ও নির্বিরোধ করিয়া উহাতে ঊর্ধ্ব অধঃ সর্বদিকে, সমগ্র জগতের প্রতি অপরিমিত দয়াভাব জাগ্রত করিতে হইবে। ইহাই গীতার 'ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

(গী ৫ম অঃ ১৯)

তিনি যে-ধর্ম প্রবর্তন করিলেন তাহার মূলকথা – অষ্টশীল অভ্যাস, সমাধি ও করুণা। এই তিনটি স্তর কার্যকারণ-সম্বন্ধে বিধৃত। একটির যথাযথ অভ্যাসে দ্বিতীয় অবস্থা লাভ হইবে এবং উহা হইতে তৃতীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটিবে। একটিকে বাদ দিলে অপরটি লাভ করা যাইবে না।

এদেশে ও পাশ্চাত্যে 'ধর্ম' সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণা বর্তমান, শ্রীবুদ্ধের 'ধর্ম' তাহা হইতে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস, আপ্তবাক্য বা কোনও প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থে (Book of Revelation) বিশ্বাস, অনুশাসনমূলক বহু আইনকানুন মানিয়া চলা, পৌরোহিত্যে আস্থা স্থাপন এবং কোনও গুরুস্থানীয় ব্যক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ। ভগবান তথাগত এই প্রকার ধর্মের বিরোধিতা করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাই তাঁহার ধর্মকে হিন্দু ধর্মের 'বিদ্রোহী সন্তান' (A rebel child) আখ্যা দিয়াছেন। বুদ্ধদেব ধর্মের সনাতন লক্ষ্যের উপরই জোর দিয়াছেন, তৎকালীন পৌরোহিত্য-শাসিত সমাজের জনগণকে নৈতিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কারণ পুরোহিতকুল ছিলেন স্বার্থান্ধ, স্বীয় অভ্যুদয়কামী এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অত্যন্ত গোঁড়া ও ব্যভিচারী, সর্বসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের কোনও চেষ্টাই তাঁহাদের ছিল না— কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান সাধন করাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন।

ভগবান তথাগত যুগপ্রয়োজনে বেদের 'কর্মকাণ্ড' পরিত্যাগ করিয়া 'জ্ঞানকাণ্ড' প্রচার করিয়া ধর্ম ও সমাজকে এক উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বেদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হইয়াও মানবমন উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে পারে এবং পরিশেষে মোক্ষলাভও করিতে পারে—প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস, স্বার্থত্যাগ ও জীবনবিশ্লেষণ।

মানবমনের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সমূলে বিনাশ করিয়া তৃষ্ণাশূন্য পরম প্রশান্তির একটি অবস্থা লাভ করাই ধর্মের লক্ষ্য। পশুবলিদানে বা পুরোহিতকুলের সন্তুষ্টিবিধানেই সেই অবস্থাপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে না। অথবা কেবল 'হে ঈশ্বর!' 'হে ঈশ্বর!' করিলেও সাহায্য নামিয়া আসিবে না। আত্মশক্তি-বলে নিজেকে উচ্চতর পবিত্র অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে। গীতায় বহু শ্লোকে এইভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেবের শিক্ষাপ্রণালী ছিল এইরূপ—সর্বপ্রথম অষ্টশীল অভ্যাস দ্বারা হৃদয় ও বুদ্ধি পবিত্র করিতে হইবে। ইহা সাধিত হইলেই জগৎ জীবন ও জীবের স্বরূপ প্রজ্ঞা-সহায়ে উপলব্ধি হইবে। এই প্রজ্ঞা বা বোধ লাভই অষ্টশীল অভ্যাসের চরম ফল। ভগবান তথাগত স্বীয় জীবনে ইহা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষমূলক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব-প্রচারিত অষ্টশীল বলিতে বুঝায়— সাধুদৃষ্টি, সাধুসঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্ব্যবহার, সৎপথে জীবিকার্জন, সৎচেষ্টা, সৎচিন্তা ও সাধুধ্যানে চিত্ত সমাহিত করা। ইহার সম্যক্ সাধনে চিত্তের নির্মল অবস্থা লাভ হয়। উক্ত শীল অভ্যাসের ফলে চিত্ত কামনাশূন্য হইলেই জীবের 'অহং-বোধ' নাশ হইবে—ইহাকেই তিনি বলিলেন নির্বাণলাভ অথবা বোধিলাভ। এই নির্বাণ একটি প্রশান্তিময় আনন্দময় অবস্থা, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—সুতরাং শূন্যস্বরূপ বলা হয়। বস্তুতঃ ইহাই জীবের স্বরূপাস্থিতি, কারণ নির্বাণলাভের পর জীবত্ব ঘুচিয়া যায়— শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে—ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। জীবত্বের অবসানে চিত্তে জাগিয়া উঠে 'অপার করুণা'। তখন তিনি 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'—এই ভাব লইয়া জগতে বিচরণ করেন। মহাযানী বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে 'বোধিসত্ত্ব' অবস্থা বলা হয়। হীনযানপন্থীগণ এই অবস্থা বোধগম্য করিতে সক্ষম নন, কারণ তাঁহারা শূন্যস্বরূপ হইতে চান—সব লয় করিয়া দিয়া। জাতকের মূল শিক্ষা এই যে, 'আত্মত্যাগ'-বলে বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ হয়।

বুদ্ধদেব বলিতেন—জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তারলাভই প্রকৃত জীবনসমস্যা, কারণ জীবন দুঃখময়। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা কি বস্তু—এই জাতীয় সমস্যা তর্কদ্বারা মীমাংসা করিবার চেষ্টা বৃথা। হৃদয় ও বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হইলে এই সকল তাত্ত্বিক সমস্যা মানুষ নিজেই সমাধান করিতে পারিবে; নির্মল বোধের উদয় হইলে ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন অজ্ঞান থাকিবে না। মনে হয় সেইজন্য 'ঈশ্বর কি আছেন?'—এই প্রশ্ন করিলে ভগবান তথাগত মৌন থাকিতেন, ঈশ্বরতত্ত্ব ভাষায় বুঝান যায় না, কারণ উহা 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয়। যুক্তির অবতারণা করিলেই যুক্তিজাল বৃদ্ধি পাইবে—সমস্যার কোন সমাধান তাহাতে হইবে না।

তিনি কার্যকারণবাদ অনুসরণ করিয়া জন্মান্তরবাদ প্রচার করিলেন। সকল কর্মই ফলপ্রসূ, এবং কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীবসত্তা বহুবার জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়। অষ্টশীল অভ্যাসের দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে এই 'পুনরাবর্তন' বন্ধ হইয়া যায়।

তাঁহার মতে অজ্ঞান হইতে কামনা, কামনা হইতে সদসৎ কর্ম ও কর্মফল এবং তাহা হইতে জীবনমৃত্যুপ্রবাহের উদ্ভব। কামনানাশে দুঃখনাশ ও দুঃখনাশে পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়। ইহা ইহজীবনেই লাভ করা সম্ভব। ইহা উপনিষদুক্ত মতবাদের সম্পূর্ণ অনুগামী।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দরিদ্র জনগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত—এই সহানুভূতি মনুষ্য ব্যতীত অপর সকল প্রাণীর প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, "আমি দরিদ্রের জন্য, জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি। আমি প্রচলিত ভাষায় উপদেশ দিব।" যেকালে আসমুদ্রহিমাচল সংস্কৃত ভাষাকে 'দেবভাষা' বলা হইত এবং একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল, কথ্যভাষাকে অজ্ঞ ও মূর্খের ভাষা জ্ঞান করা হইত, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে বা গ্রন্থাদি উক্ত ভাষায় প্রণয়ন না করিলে অবহেলিত ও পণ্ডিতসমাজে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত সেই কালে শাক্যমুনির এইরূপ সঙ্কল্প কিরূপ মহান ত্যাগ ও বিশাল হৃদয়ের নিদর্শন তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ভগবান বুদ্ধদেব মানবিকতাবাদের (Humanism) প্রথম প্রচারক। তবে ইহা কিন্তু জড়বাদমূলক নহে। কারণ তিনি জীবসত্তার জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকার করিতেন।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব একটি কাজও, একটি চিন্তাও নিজের জন্য করেন নাই, সকলই পরার্থে করিয়াছেন। স্বামীজী কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতার শেষভাগে শ্রীবুদ্ধকেই আদর্শ কর্মযোগী বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছেন। তিনি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল কোন ভেদই রাখেন নাই, বলিয়াছেন, সকলেই স্ব স্ব অভিনিবেশ- ও পুরুষকার-বলে নির্বাণের পথের সন্ধান করিয়া লইতে সক্ষম। এই মহতী আশ্বাসবাণী পদদলিত অবহেলিত জনগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহারা নবীন উদ্যম লাভ করিয়াছিলেন এবং দলে দলে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের উচ্চ হৃদয় লইয়া সমুন্নত চরিত্র গঠন করুক, ব্রাহ্মণগণের অপূর্ব ধীশক্তি ও দার্শনিক চিন্তার সহিত বুদ্ধদেবের লোকোত্তর মহান হৃদয় ও অসাধারণ লোককল্যাণ-চিকীর্ষা সংযুক্ত হইলে আদর্শ চরিত্র গঠিত হইবে।

শ্রীবুদ্ধের জীবন ও বাণী অনুধ্যান করিয়া আমরা সত্যই ধন্য। বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য ভগবান বুদ্ধদেবের সাম্যবাদ, জন্মান্তরবাদ উদার সহনশীলতা এবং 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্' প্রভৃতি শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবভূমি হইতে উন্নীত হইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু'

স্বামী ধীরেশানন্দ

ভাবুক বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :—

'আমি সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' —ইহা ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতার খেদোক্তি নহে, ইহা যে সংসারে সকল প্রাণীরই চিরন্তন মর্মভেদী ক্রন্দন, হতাশার হাহাকার ধ্বনি! মানুষ কত আশায় বুক বাঁধিয়া অশেষ কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করে, ঘর বাঁধে, পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় এবং মনে করে যে অতঃপর সকলকে লইয়া নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে পরম শান্তিতে, মহাসুখে দিনাতিপাত করিবে। কিন্তু অলক্ষ্যে তাহার অদৃষ্টদেব হাসেন। অদৃষ্টের অলংঘনীয় নিয়মে, নিষ্ঠুর দৈবের রূঢ়, নির্মম কশাঘাতে মানুষের এই সুখস্বপ্ন একদিন যেন তাসের ঘরের ন্যায় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার বড় সাধের সাজানো বাগান যেন অকস্মাৎ শুকাইয়া যায়। তখন তাহার অশান্ত, শোকমুহ্যমান চিত্তে কেবল নৈরাশ্যের করুণ সুরটিই বাজিতে থাকে, জীবন দুর্বিষহ দুঃখময় বলিয়া মনে হয়। স্বামীজী বলিতেন—'দুঃখের মুকুট মাথায় পড়িয়া সংসারে সুখ আসিয়া মানুষের নিকট উপস্থিত হয়।' ইহা রূঢ় বাস্তব। সুখ ও দুঃখ মানুষের নিত্য-সহচর।

দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সকলেই নিজের অনুকূল বস্তুটি কামনা করে এবং স্বার্থবিরোধী পদার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সুখপ্রদ হইলে কোন বস্তুকে সে গ্রাহ্য মনে করে এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ দুঃখপ্রদ পদার্থকে সে ত্যাজ্য বলিয়া জানে।

মানুষ কি চায় না, অর্থাৎ কোন্‌টি তাহার ত্যাজ্য ইহাই প্রথম বিচার করা যাউক। এ কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবে যে দুঃখ কেহ চায় না। কিন্তু দুঃখ জিনিসটা কি? দুঃখ বলিয়া জগতে কোন পদার্থ আছে কি? মনে হইবে, কেন, সর্প ব্যাঘ্র আদি পদার্থ কত দুঃখপ্রদ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে। সর্প তাহার নিকট কত প্রিয়! কত যত্নে সে উহাদের প্রতিপালন করে! শুনিতে পাওয়া যায়, স্নেহাস্পদ কন্যার বিবাহকালে সর্বাপেক্ষা ভাল অর্থাৎ বিষধর সর্পটি, খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জনের জন্য সে জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করে। সার্কাসওয়ালা ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে। ব্যাঘ্র তাহার উপার্জনের সাধন, তাই ব্যাঘ্র তাহার নিকট প্রীতির বস্তু। ব্যাঘ্রীর নিকটও ব্যাঘ্র কত প্রিয়! সর্পব্যাঘ্রাদি কোন কিছুই একান্ত দুঃখপ্রদ নহে। সর্বথা হেয় বা ত্যাজ্য এরূপ কোন পদার্থই জগতে পাওয়া যায় না। আমাদের নিকট যাহা অতি ঘৃণিত, তাহাও কোন কোন জীবের ভোজ্যরূপে প্রিয়।

এভাবে যদি ইহাও বিচার করা যায় যে জগতে সকলে কি চায়, তাহা হইলে সকলে একবাক্যে বলিবে সুখ চাই, আনন্দ চাই! ধনী-ভিখারী-নির্বিশেষে সকলেই সুখ বা আনন্দ চায়। জগতে সকলেই সুখের পশ্চাতে ধাবমান। কিন্তু এই সুখ জিনিসটি কি? সুখ বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? লোকে মনে করে, কেন স্ত্রী, পুত্র, ধন, বাহন, অন্ন—এই সবেতেই তো সুখ। কিন্তু স্ত্রী যদি সদা সুখরূপই হইত তবে সে-স্ত্রী কোন বিগর্হিত কর্ম করিলে লোকে তাহাকে ত্যাগ করে কেন? পুত্র যদি নিয়ত

সুখপ্রদই হইত তবে অযোগ্য, অবাধ্য ও নিন্দিত-কর্মকারী পুত্রের মুখদর্শনও লোকে করিতে চাহে না কেন? ধনেই যদি সুখ থাকিত তবে অশেষ-ঐশ্বর্যপালিত হইয়াও লোকে দুঃখী কেন? এইরূপে দেখা যায় যে, কোন পদার্থই একান্ত-ভাবে সুখপ্রদ বা সুখরূপ নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বাহিরে সুখদুঃখ বলিয়া যদি কোন পদার্থই জগতে না থাকে, তবে লোকে যে সুখদুঃখ অনুভব করে তাহা কি?—ইহার উত্তরে বলা যায়, সুখদুঃখের অনুভব হয় মনে। অতএব, উহা মনেরই। সুখদুঃখ বলিয়া কোন জিনিস বাহিরে নাই। উহা মনের একটি ভাবনামাত্র। একই বস্তু মনে বিভিন্ন ভাবনা আনিতে পারে। বন্ধুসহ আমি কোথাও যাইতেছি। সম্মুখে একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া আমি 'মা' 'মা' বলিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলাম। বন্ধুর নিকট তিনি সাধারণ একজন মহিলা ছাড়া আর কিছুই নন। অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে 'ভগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিল। কেউ বা তাঁহাকে 'কন্যা'রূপে বা অন্য কোনরূপে দেখিল। এখন এই নারীটি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। 'মা', 'ভগিনী', ইত্যাদি বাহিরে কিছুই নাই, এগুলি সবই বিভিন্ন ব্যক্তির মনোময়ী কল্পনা। বাহিরে কেবল একটি স্থূল দেহমাত্র বিদ্যমান। তাহাকেই স্ব স্ব ভাবনানুযায়ী কেহ মাতৃরূপে, কেহ বা ভগিনীরূপে, কেহ বা কন্যারূপে দর্শন করিতেছে। তেমনি সুখদুঃখ বলিয়াও কোন পদার্থই জগতে নাই। বাহিরে বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং যে পদার্থ যখন আমার অনুকূল বলিয়া মনে হয় তখনই সেটি আমার সুখপ্রদ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। সেই পদার্থই পরমুহূর্তে বা কালান্তরে প্রতিকূল মনে হইলে দুঃখপ্রদ বলিয়া ভান হয়। বিষয় কিন্তু নির্বিকার। বিষয়ের প্রতি স্বরচিত অনুকূলতা-বা প্রতিকূলতা-বুদ্ধিই আমার সুখদুঃখ অনুভবের কারণ।

কিন্তু সুখ বা দুঃখ যখন আমরা অনুভব করি, সে অনুভবও তো স্থায়ী হয় না। সুখ অনুভব করিতেছি কিন্তু চিত্ত অন্য ব্যাপারে যখনই লিপ্ত হইল তখনই সে সুখানুভবও বিলুপ্ত হইল। তদ্রূপ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে যখনই চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হইল দুঃখও তখনই অদৃশ্য হইল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অনুভবকালেই কেবল সুখদুঃখ বিদ্যমান। ঐ অনুভবের পূর্বে বা পরেও তাহা নাই। অসহ্য দেহব্যথায় কাতর ব্যক্তিও যখন মূর্ছিত বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে তখন আর তাহার সে দুঃখবোধ থাকে না। কিন্তু পুনঃ জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতে থাকে। পুত্রশোকাতুরা মাতাও গভীর নিদ্রাকালে পরমসুখে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন কোন শোক, কোন দুঃখবোধও তাহার থাকে না। দুঃখবোধ করিবার করণ মনটিও তখন নাই। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রতে মন উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই শোক, দুঃখবোধ ফিরিয়া আসে। সুতরাং সুখদুঃখ মনঃসমকালীন। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় মন আছে তখনই সেই অবস্থায় সুখদুঃখ আছে, আর যখন মন নাই তখন সুখদুঃখও নাই। অনুভব বা জ্ঞানকালেই সুখদুঃখের বিদ্যমানতা বা সত্তা। অনুভবের পূর্বেও ইহা নাই এবং পরেও ইহা থাকে না। ইহাকেই বেদান্তে বলে 'জ্ঞাত সত্তা' বা 'জ্ঞানসমকালীন সত্তা' বা 'প্রাতিভাসিক সত্তা'। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি কেবল একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, সুতরাং উহা মিথ্যা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ স্বপ্নকে লওয়া যাউক। স্বপ্নে কত কি বিচিত্র সৃষ্টি, কত

অভিনব পদার্থই না মন কল্পনা করিয়া থাকে! কিন্তু ঐ সকল পদার্থ বস্তুতঃ কিছুই নাই। মনের কল্পনাকালেই উহাদের স্থিতি। স্বপ্নদর্শনের পূর্বেও ঐ পদার্থসমূহ ছিল না এবং স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও উহাদের আর দেখা যায় না। কেবল স্বপ্নানুভবকালেই ঐ সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ও সেগুলিকে বাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। জাগ্রতে ফিরিয়া আসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট-পদার্থের আর কোন বাস্তব সত্তাই অনুভূত হয় না।

সেইরূপ যখন স্বপ্নানুভব হয় তখন জাগ্রৎ পদার্থও আর থাকে না এবং উহার অনুভবও হয় না। স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রৎ অবস্থায় মন উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রৎ সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে। পুনরায় মন স্বাপ্নসৃষ্টি কল্পনা করিতে থাকিলে এই বিশাল জাগ্রৎপ্রপঞ্চ আর থাকে না। সুষুপ্তি-অবস্থায় যখন মন বিলীন হয় তখন পূর্বোক্ত উভয় সৃষ্টি এবং তদনুভবও আর ভান হয় না। এইরূপে দেখা গেল যে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই মনঃসমকালীন বা অনুভবসমকালীন। অতএব এই উভয় অবস্থা এবং অবস্থাগত পদার্থসমূহও জ্ঞাতসত্তা অর্থাৎ প্রাতিভাসিক, শুধু একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা।

কিন্তু 'আমি' থাকি। এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল তিন অবস্থায় 'আমি' সতত বিদ্যমান। অবস্থাগুলি পরস্পর পৃথক, এক অবস্থায় অন্য অবস্থা থাকে না, কিন্তু 'আমি' এই সর্বাবস্থাগুলির মধ্যে একভাবে 'অনুগত' হইয়া আছি। অতএব জাগ্রদাদি অবস্থা ও তাহার সুখদুঃখাদি ধর্ম হইতে 'আমি' পৃথক্, ইহাই স্পষ্ট অনুভব হয়।

সুষুপ্তিতে মহা আনন্দ, মহা সুখ সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সংখ্যাতীত মানঅভিমান, আশানৈরাশ্য, ভাল-মন্দ, সুখদুঃখ নিরন্তর অনুভব করিয়া জীব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে ও একটু সুষুপ্তিসুখের জন্য লালায়িত হয়। কষ্টলব্ধ প্রভূত ধনের বিনিময়েও সে একটু সুষুপ্তিসুখ লাভার্থ ব্যাকুল হয় ও সেজন্য কত চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে! সুষুপ্তিতে এত আনন্দ আসে কোথা হইতে? সুষুপ্তিতে কোন দুঃখ থাকে না; তাহার কারণ দুঃখের নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই সব কিছুই সেখানে নাই। সেখানে থাকি কেবল একা 'আমি'। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইল যে যখন আমাতে একমাত্র 'আমি' থাকি তখনই সুখ। অর্থাৎ সুখ আমারই স্বরূপ। জগতের কোন সুখই সুষুপ্তি-সুখতুল্য নহে। মন বুদ্ধি আদি আগন্তুক উপাধিগুলি আসিয়া হাজির হইলেই যত দুঃখদ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন 'আমি' তাহাদের সহিত জড়িত হইয়া নিজেকে সুখী-দুঃখী, কর্তা-ভোক্তা মনে করিয়া সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকি।

শংকা হইতে পারে যে, সংসারেও তো লোকে সুখ ভোগ করে। হাঁ, করে, কিন্তু তাহা কতটুকু? দেখিতে দেখিতে উহা যেন কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায় এবং পরিণামে দুঃখই দিয়া থাকে। সাংসারিক সুখ যেন বিষসংপৃক্ত মিষ্টান্ন। মানুষের চিত্ত বিষয়-ভোগলালসায় সদা চঞ্চল, তাই সে দুঃখী। চাঞ্চল্যই দুঃখ। প্রভূত আয়াসে প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তিতে চিত্ত যখন ক্ষণিক শান্ত হয় তখন সেই শান্তচিত্তে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাই বিষয়ানন্দ বা বিষয়সুখ। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, আনন্দ বিষয়ে নাই। শান্ত চিত্তে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহা আমার স্বস্বরূপভূত আনন্দেরই অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। চঞ্চল জলের উপরিভাগে যেমন চন্দ্রবিম্ব সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হয় না, স্থির জলই সম্যক্ প্রতিবিম্বধারণে সমর্থ, ইহাও তদ্রূপ।

কিন্তু এই বিষয়ানন্দও নিন্দিত, বিনাশী ও দুঃখরূপ বিষয়সহচারী বলিয়া বিনাশী ও সর্বথা ত্যাজ্য। শুদ্ধদর্পণতলে প্রতিবিম্বিত মুখমণ্ডলই সকলের প্রিয় হইয়া থাকে, অশুচিপদার্থপূর্ণ ভাণ্ডে বা সুরাপাত্রে প্রতিবিম্ব-দর্শনে কেহ রুচি প্রকাশ করে না, বিষয়ানন্দও তদ্রূপ। বিষয়ানন্দও স্বরূপানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। ঐ স্বরূপানন্দেরই অধিক প্রকাশ হয় সুষুপ্তিতে। কিন্তু উহাও অজ্ঞান-ব্যবহিত বলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপটির পূর্ণ অভিব্যক্তি তখনও হয় না। কিন্তু যেটুকু হয় তাহাতেই সর্বজীব পরিতুষ্ট, এবং উহার তুলনা জগতে পাওয়া যায় না। জাগতিক কোন আনন্দই সুষুপ্তির আনন্দসহ তুলিত হইতে পারে না, ইহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ। আবার, বিচারজনিত জ্ঞানসহ মন যখন স্বস্বরূপে স্থিত হয় তখন নির্দ্বৈত ও অজ্ঞানাবরণবিরহিত যে স্বরূপানন্দ অভিব্যক্ত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সুষুপ্তির আনন্দও তাহার নিকট তুচ্ছ।

সুতরাং দেখা গেল স্বস্বরূপে স্থিত থাকাই সুখ। স্বস্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটিলেই দুঃখ! দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, মানুষ যখন সুস্থ থাকে, ভাল থাকে, তখন তাহাকে, 'কেন ভাল আছ' বা 'কেন সুখে আছ'—এরূপ প্রশ্ন কেহ করে না। কিন্তু যদি কেহ বলে, 'বড় কষ্টে আছি' 'বড় কষ্টে দিন কাটিতেছে'—তখন লোকে তাহার দুঃখের কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যাহা স্বাভাবিক অবস্থা, সে বিষয়ে কাহারও শংকা হয় না। অগ্নি উষ্ণ। তাহা কেন উষ্ণ, এরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে জাগে না। জল শীতল। উহা কেন শীতল, এ প্রশ্নও কেহ করে না। কারণ উহা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বিপরীত হয় তবে লোকে প্রশ্ন করে। যদি অগ্নি শীতল ও জল উষ্ণ হয় তবে লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি করিয়া উহা সম্ভব হইল, কোন্ নিমিত্তবশতঃ উহা ঘটিল। সেইরূপ সুখে থাকাই জীবের স্বভাব। কারণ সুখ তাহার স্বরূপ। তাই সুখে থাকিলে অর্থাৎ স্বরূপে থাকিলে কোন প্রশ্ন হয় না, নিজের মনেও কোন অশান্তি জাগে না। দুঃখ অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতি ঘটিলেই প্রশ্ন হয়, অশান্তি হয়—কেন ওরূপ হইল এই শংকা মনে জাগে। অতএব স্বস্থতাই সুখ ও অস্বস্থতা অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতিই দুঃখ।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুষুপ্তি যখন বহুলাংশে স্বস্থতাবশতঃ একটি পরম আনন্দময় অবস্থা, তখন উহাই কাম্য এবং কুম্ভকর্ণের ন্যায় সকলের কেবল সুষুপ্ত হইয়া থাকিবারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে? উহাও একটি অজ্ঞানময় অবস্থাবিশেষ। জাগ্রৎ- ও স্বপ্ন-ভোগপ্রদ কর্মক্ষয়ে সুষুপ্তি-অবস্থা জীবের স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উহা জীব স্বেচ্ছায় করিতে পারে না। চেষ্টা করিলেও কেহ ইচ্ছামত সুষুপ্ত হইতে পারে না। চেষ্টা করিতে গেলে স্বপ্নই বৃদ্ধি পাইবে, সুষুপ্তি আসিবে না।

তবে দুঃখসাধন দেহ, মন, বুদ্ধি আদির সাহচর্য রহিত হইয়া পরম আনন্দময় স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার উপায় কি?—উপায় বিচার। মন, বুদ্ধি আদিই দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ আমাতে আনয়ন করতঃ বিবিধ দ্বন্দ্ব ও দুঃখের দুর্নিবার স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই মন, বুদ্ধি আদি সবই আগন্তুক, জাগ্রৎ ও স্বপ্নে থাকে কিন্তু সুষুপ্তিতে থাকে না। ইহারা আগমাপায়ী, নিয়ত-পরিবর্তনশীল ও অনিত্য বলিয়া একান্তই মিথ্যা। এখন মনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় একমাত্র বিচার। সমাধি আদির অভ্যাস মনকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র। উহার বিলোপ

করিতে পারে না। ব্যবহারকালে যে 'অহং' —'আমি', 'আমি' করে, সে 'অহং'ও তো সুষুপ্তিতে থাকে না। কিন্তু 'আমি' তখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাই কি? কখনই নহে। 'আমি' থাকি—ইহাও সকলের অনুভব-সিদ্ধ কথা। মন, বুদ্ধি, অহংকার রহিত সেই 'আমি'ই আসল 'আমি'। উহাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। উহা অনুভবমাত্রস্বরূপ। সেই 'আমি'ই জাগ্রৎ ও স্বপ্নে আগন্তুক মনবুদ্ধি-সহ জড়িত হইয়া মিথ্যা অহংকারের রূপ ধারণ করি এবং তখন সংসারে অশেষ দুঃখের স্রোতে ভাসিয়া চলি।

বেদান্তশাস্ত্র বিচারপ্রসূত জ্ঞানদ্বারা 'হৃদয়-গ্রন্থিভেদের' কথা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থিভেদ হইলেই সর্বসংশয় দূর হয়, পাপপুণ্য সর্বকর্ম ক্ষীণ হয়, সর্বদুঃখনিবৃত্তি হয় এবং পুরুষ স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া পরম আনন্দময় অবস্থালাভে কৃতকৃত্য হন। এখন এই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদের' অর্থ কি? কত লোকে ইহার কত বিভিন্ন ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন! সরল সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—হৃদয় অর্থ মন বা বুদ্ধি। উহার ভেদ অর্থ উহার নাশ অর্থাৎ উহার অসত্তাবোধ, মন, বুদ্ধি আদি বস্তুতঃ নাই, এইটি জানা। বস্তুতঃ মন, বুদ্ধি আদি কোন পদার্থই যে নাই, এগুলি প্রাতিভাসিক, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র, এবং একমাত্র আত্মাই—'আমি'ই—সর্বাবস্থায় একরূপে নির্বিকার থাকিয়া সদা বিদ্যমান—এইটি জানার নামই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদ।'

কিন্তু মন বুদ্ধি আদির বিদ্যমান দশাতে অর্থাৎ জাগ্রতে (স্বপ্নের মন ও তাহার কার্য সব কিছুই প্রাতিভাসিক ইহা সর্বলোকসম্মত, তাই কেবল জাগ্রতের কথাই ধরা হইল) যতই কেহ বিচার করুক না কেন যে মন আদি বস্তুতঃ নাই, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র,—সে জ্ঞান কখনও অপরোক্ষ হইবে না,—উহা পরোক্ষই থাকিয়া যাইবে। কারণ তৎকালে, বিচারকালে সাক্ষাৎ মন রহিয়াছে, সুতরাং কি করিয়া বোঝা যাইবে যে মন নাই? সেইজন্য তৎকালে সাধকের এমন একটা অবস্থার স্মৃতির প্রয়োজন, যখন মন থাকে না; যেমন সুষুপ্তি বা সমাধি। সমাধি তো আর সকলের হয় না? কিন্তু সুষুপ্তি অল্পবিস্তর সকলেরই হয়। সুষুপ্তিকালে মনবিহীন 'আমি' থাকি। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতিসহ যদি জাগ্রতে কেহ বিচার করে যে জাগ্রতেও মন বস্তুতঃ নাই, তাহা হইলেই জাগ্রৎকালেও মনের অভাব প্রত্যক্ষ অনুভব হইবে ও মন-রহিত এক সুখস্বরূপ 'আমি'ই অবশেষ থাকিয়া যাইব। এই বিষয়ে স্ফটিক ও জবাকুসুমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে কখনও স্বচ্ছ স্ফটিক অন্যকালে দেখে নাই, স্ফটিকের সম্মুখে জবাকুসুম যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সে কখনই এবং কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিবে না যে স্ফটিক স্বচ্ছ, লাল নহে। তাহাকে অন্যত্র স্বচ্ছ স্ফটিক দেখাইলে পর সেই স্মৃতিবলে সে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিবে যে স্ফটিক স্বচ্ছ, জবাকুসুম-সান্নিধ্যে রক্ত স্ফটিক দৃশ্যমান হইলেও স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে, স্ফটিকের রক্তিমা জবাকুসুমরূপ উপাধিনিবন্ধন মিথ্যা প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। তখনই স্ফটিকের স্বচ্ছতার অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার হইবে।

এইরূপ বিচারসহায়ে দেহাদি সর্বপদার্থের পারমার্থিক সত্যত্ববুদ্ধির নিঃশেষে বিলোপ ঘটিয়া থাকে এবং স্বস্বরূপভূত ও সুখস্বরূপ আত্মাতেই স্থিতিলাভ হয়। এই স্বরূপস্থিতিই মোক্ষ। পরমানন্দপ্রাপ্তি বা সর্বদুঃখনিবৃত্তি ইহারই নাম।

অতএব দেখা গেল যে, অর্থবুদ্ধি বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুঃখনিবৃত্তি হয়

না। দেহাদি বিষয় আছে, ইহা সত্য—এই বুদ্ধি থাকিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। বাহ্য বিষয় ও দেহাদি পদার্থ কিছুই বস্তুতঃ নাই, কেবল মিথ্যা প্রতীতিমাত্র - ইহা জানিতে পারিলে তবেই যথার্থ সুখপ্রাপ্তি, আত্মস্থিতি বা দুঃখনিবৃত্তি হয়। এ কথাই কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্বীয় অনুভববলে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

'ন জারা জায়েগা জবৃতক্
নজারা নামরূপোঁকা।
ন জব্ জায়ে নজর তবৃতক্
নিঠুর দুঃখ দুইকী॥'

—যতক্ষণ পর্যন্ত নানারূপাত্মক দ্বৈতের নজর অর্থাৎ সত্যবুদ্ধি জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠুর দ্বৈত-দুঃখ কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

অর্থবুদ্ধি না করিলে অর্থাৎ অর্থাধ্যাস ত্যাগ করিলে থাকে শুধু জগতের প্রতীতিমাত্র। প্রাতীতিক জগৎ লইয়া ব্যবহারে শুধু বিনোদই হয়। অর্থবুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের সত্যত্ববুদ্ধিই দুঃখের হেতু। অর্থবুদ্ধি না থাকিলে বিক্ষেপ, অশান্তি, দুঃখ কোথায়? দ্বৈত ছাড়িয়া মানুষ যাইবে কোথায়? যাইবার তো জায়গা নাই। **সুতরাং দ্বৈত নাই, অর্থাৎ উহার সত্যত্ব-বুদ্ধিত্যাগই দ্বৈতের ত্যাগ।** দুঃখদ দ্বৈতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় এই ত্যাগ—ইহাই সর্ব বেদান্তও একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তখন কেবল আনন্দ। প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা দ্বৈতের খেলা দর্শনে তখন আনন্দই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ হইতে পারে না। ঐন্দ্রজালিকের মিথ্যা ক্রীড়াদর্শনে সকলের বিনোদমাত্রই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ কাহারও হয় কি?

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় আমাদের প্রাকৃতিক পাঠশালা। এই পাঠ-শালায় আমাদের শিক্ষণীয়—এই বিচার। এই বিচার কোন দেশ, কাল বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ, সীমিত নহে। ইহা সার্বজনীন। স্বানুভূত এই অবস্থাত্রয়ের বিচার সহায়েই ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জগতের সকলেই স্বস্বরূপ-স্থিতিরূপ পরমলক্ষ্যে পৌছিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। ইহাই বেদান্তোক্ত অসাম্প্রদায়িক সাধন এবং ইহাই সার্বজনীন শ্রেয়োমার্গ শাশ্বত সুখলাভের উপায়।

"বাণীর অমৃত ঢালো"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঘনতমসায় সব ডুবে যায়।
অকাশ কালোয় কালো।
হে রামকৃষ্ণ! আনো দিগন্তে
নবীন উষার আলো।
হেথা যেন কেহ দুখী নাহি রয়।
সকলেই হোক্ আনন্দময়,
নিরাময়, সবে সবার মাঝারে
দেখে যেন শুধু ভালো!

তুমি বলে গেলে, 'কারে দিবে ফেলে?
সবই সেই নারায়ণ।
শুষ্ক তুলসী - ঠাকুর-সেবায়
তারও আছে প্রয়োজন!'
যত মত তত পথ—এই কথা!
নব-জীবনের শোনালে বারতা!
যুগের তৃষিত অধরে তোমার
বাণীর অমৃত ঢালো!

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আপনার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় মিল এই যে আপনিও মানেন যে, ধর্মীয় অনুভব উপলব্ধি যার কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে সে ধর্ম সম্বন্ধে অনুভবের বাইরের কোনো সাক্ষীরই প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে না। সে বলে তার দেখার কথা, শোনার কথা, অনুভবের কথা, যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" আমি জানি সেই সূর্যকল্প মহাপুরুষকে যিনি অজ্ঞান তমসার যবনিকার আড়ালে দাঁড়িয়ে। অথবা বৃহদারণ্যকের (২.৪৫): "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—"শুধু আত্মাকেই দেখা চাই, শোনা চাই, জানা চাই, চেনা চাই।" আপনি আরো লিখেছেন: "যারা অবৈজ্ঞানিক হিসেবে জানে যে, পায়ের নিচে মাটিও আছে, আর মাথার উপরে আকাশ আছে তাদের পক্ষে এইটেই সুখবর যে, বৈজ্ঞানিকরা এখন শুধু 'মাটি ছাড়া আর কিছু জানবার নেই'—এমন কথা আর জোর ক'রে বলছেন না, আকাশের দিকে চাওয়াকেও আর মূর্খতা ব'লে অবজ্ঞা করছেন না।"

এ-কথায় সায় দিয়েও আমার শুধু এইটুকু টুকবার আছে যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকদের মনে বিজ্ঞানের সর্বার্থসাধিকা শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে বলেই তাঁদের সুর ফিরেছে। রাসেল এতে বেশি দুঃখ পেয়েছেন দুটি কারণে। প্রথমটির কথা বলেছি বিজ্ঞানের ট্রাজিডির ভিতরকার রূপটা খুলে দেখাতে: যে, যুক্তিতে বিশ্বাসও মূলতঃ অন্ধ বিশ্বাস, হিউমের এ-অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ তিনি খাড়া করতে পারছেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে বেজেছে এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের যে-সন্ধানের ফলে মানুষের শক্তি বাড়ছে তার মান হু হু ক'রে বাড়লেও যে-বিজ্ঞান নিছক সত্যসন্ধানী তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আজ মুমূর্ষু।*

একে আমি নাম দিয়েছি বিজ্ঞানের ট্রাজিডি এজন্যে নয় যে, আমি রাসেলের সঙ্গে একমত যে, বিজ্ঞানে শ্রদ্ধাকে আজ মুমূর্ষু বলা চলে বিজ্ঞানের শক্তিমত্তায় শ্রদ্ধা বাড়ার জন্যে। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি—বিজ্ঞান প্রথম দিকে যে ভাবত সে সবজান্তা ও সবপার্তা হ'তে পারে, তার এ-বিশ্বাস তাকে ভুল পথে চালিয়েছিল ব'লেই সে ধর্মকে মিথ্যা দিশারি নাম দিয়ে অপদস্থ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু রাসেল প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানপূজক এ-অত্যুক্তি করলেও মানুষের মন থেকে ধর্মের মূলোচ্ছেদ করা শুধু যে সহজ নয়, তাই নয়, করতে গেলে সে এমন অথই জলে পড়ে যে তার শেষটা মনে হয়ই হয় যে, ধর্ম আত্মা ভগবান পরকাল প্রভৃতি যদি সবই মিথ্যা হয়, যদি এই কথাই সত্যি হয় যে, এ-বিশাল অচেতন

---

* J. B S. Haldane তাঁর Inequality of Man-এ "A Mathematician Looks at Science" প্রবন্ধে লিখছেন: "I feel that Russell's preoccupation with mathematical physics is largely responsible for the pessimism which attributes to scientists. He writes. 'While science as the pursuit of power becomes increasingly triumphant, science as the pursuit of truth is being killed by a scepticism which the skill of the men of science has generated'." (p. 240)

গতিশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবী নামে জীবজগতে চেতনার জন্ম হয়েছে দৈবাৎ, অথচ মরণ নিশ্চিত (থার্মডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় বিধান অনুসারে—তার পরে আমরা কেউ থাকব না শুধু কোটি কোটি নিশ্চেতন শক্তি-পারাবার নাহক ছুটোছুটি ক'রে চলবে—কত কোটি বৎসর, কে জানে ?) তাহ'লে এ-বাঁচা তো বিড়ম্বনা। কেনই বা মানুষ স্বপ্ন দেখবে শিব সত্য সুন্দর চিরন্তনের ? সে বলবেই বলবে : এ-সৃষ্টি যদি নিরর্থক, লক্ষ্যহীন দাপাদাপি মাত্র হয় তবে এসো যে যতটা পারি ভোগ ক'রে নিই—eat drink and be merry for tomorrow we die, ওরফে চার্বাকের ভাষণে : "যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

ট্রাজিডি এল বিজ্ঞানের গোড়াকার উপপত্তিটিই (premise) ভুল ছিল ব'লে : যে, এ-বস্তুবিশ্বের মূল উপাদান জড় কিনা অচেতন, এবং এহেন জড় জগতে জীবের প্রাণ মন চৈতন্য এ সবই অবাস্তর, আসল সত্য হচ্ছে এর জাড্য, ওরফে অচেতনতা। তাঁরা মহাত্মা মহাপুরুষদের এজাহার সরাসর অস্বীকার ক'রে বললেন : "ওঁদের কথা আমরা মানতে যাব কী দুঃখে যখন আমার বিশ্লেষণী বুদ্ধির সৃষ্ট বকযন্ত্রে ভাগবত চেতনার রসের ছিটে ফোঁটারও দেখা পাচ্ছি না ?" মহাপুরুষেরা বললেন : "যে-বিশ্বচৈতন্যের রসের খবর পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি, সে-ভূমাকে দেখে জেনে চেখে চিনে তুমিও ধন্য হ'তে পারো যদি চাও। কিন্তু চাইলে ছাড়তে হবে এই দাবি যে, তিনি দেখা দেবেন তোমার সর্তে তোমার বকযন্ত্রে —তোমার স্ট্যাটিষ্টিক্সকে মান দিতে। বলতে হবে তোমাকেও : আমি তোমার শরণ নিলাম তুমি আমাকে গ্রহণ ক'রে আমাকে দেখা দিয়ে কোলে তুলে আমাকে ধন্য করো। তোমার কী ইচ্ছা আমাকে জানাও আমার চেতনাকে তার প্রামাণিক জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে।" বৈজ্ঞানিক একথায় রেগে ওঠে বললেন : "অসম্ভব। আগে থাকতে মেনে নেব কেমন ক'রে ? আগে জানব তবে মানব।" মহাপুরুষ বললেন হেসে : "এ-সর্ত ক'রে তাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব। কেননা তাঁর বিধান—আমরা জেনেছি প্রত্যক্ষভাবে—আগে মানলে তবে জানতে পারবে।" এরই খৃষ্টান নাম—meekness ওরফে humility, সংস্কৃত নাম—দীনতা, শরণাগতি। মহাপুরুষ বললেন, অনু-কম্পায় গ'লে "আনন্দের সমুদ্র তোমার আশপাশে ব'য়ে চলেছে বন্ধু, কিন্তু তার সঙ্গে যোগসূত্র তোমাকে অর্জন করতে হবে যদি সে-আনন্দ-সাগরে স্নান ক'রে ধন্য হ'তে চাও। এ-যোগ-সূত্রের একটিমাত্র পথ আছে : তোমার ক্ষুদ্র অহং-এর দাবিকে নাকচ ক'রে মাথা নোয়াতে হবে অজানা সত্তার কাছে অন্তরের দিশাকে বরণ ক'রে প্রশ্নসংশয়দের দাবিদাওয়াকে দাবিয়ে রেখে।" বৈজ্ঞানিক বললেন : "অসম্ভব। যে-পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিসংখ্যানের পথে চ'লে আমি আজ জগন্নাথ হয়েছি সে-পদবী আমি ছাড়তে নারাজ।" মহাপুরুষ বললেন হেসে : "বেশ, তবে চলো এই মিথ্যে পদবীর ঘোড়সোয়ার হ'য়ে তোমার সীমাবদ্ধ যুক্তিবিচারকে লাগাম ক'রে, দেখ ঘুরেফিরে—ওপথে যা পাও তাতে মন ভরে কি না। আমার মন যে-পথে ভরেছে সেপথে আমি চলব। কেবল ব'লে রাখি—লিখে রাখো—যে, এই গোয়ালে একদিন না একদিন সবাইকেই মাথা মুড়ুতে হবে—এই শরণাগতির আবাহনের মন্ত্র জপ ক'রে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—যদি মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হ'তে চাও। তাই এখন আসি। যখন দেখবে

যে তোমার পথে চ'লে না পাবে মনে শান্তি, না আনতে পারবে তা জগতে—গণমনের আসুরিক প্রবৃত্তিরা আস্কারা পেয়ে সুরু করবে সৃষ্টি করতে মারণাস্ত্র (যার শেষ পরিণতি আণবিক বোমা), যখন দেখবে যে, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতার নানা আবিষ্কারে মানুষের বাহ্য সমৃদ্ধির চাবিকাঠি মিললেও কোনো গভীর আন্তর সার্থকতার দিশা মেলে না, প্রেম জাগে না, প্রাণের ভাষা থাকে না, বুকের মধ্যে কেবল শূন্যতার হাহা-কারই ফুলে ওঠে, তখন হয়ত আসবে তোমার চিত্তে সেই দীনতার ডাক যে অন্তরদেবতাকে বলে: "আমি চাই অমৃত হ'তে, কেবল তার পথ জানি না, তুমি পথ দেখাও—কারণ আমি জেনেছি যে, এ-ভাবের সুর আমার হৃদয়ে জেগেছে তোমারি কৃপায়। সেই কৃপাকেই আমি চাই আরো পূর্ণভাবে পেতে, যে-আলোর কণিকা দিয়েছ আমাকে তাকেই জ্বালিয়ে রেখে পথ খুঁজে পাবই পাব কেন না আমি জানতে পেরেছি যে এই-ই তোমার বিধান।"

বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞ হেসে এ-সুরকে মিডীভাল (সেকেলে) ব'লে বাতিল করলেন ব'লেই দেখতে পেলেন না যে, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই এই শ্রদ্ধার বীজ থাকলেও তাকে লালন না করলে ফসল ফলে না। কিন্তু ক্রমশঃ পরে যখন দেখলেন যে কোনো প্রশ্নেরই চরম উত্তর মানস বুদ্ধিবিচারের পথে পাওয়া যায় না, মনের কালি কাটে না, স্বভাবের বর্বর নিচুটান কাটানো সময়ে সময়ে অসম্ভব হ'য়ে অশান্তিতে মন অন্ধকার হ'য়ে আসে তখন গভীরদর্শী কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে দাবিয়ে-রাখা ধর্মে-শ্রদ্ধার চারাগাছ ফের মাথা তুলল, তাঁরা একটু একটু ক'রে এই কথাটি বুঝবার কিনারায় এলেন যে, বিজ্ঞান ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারলেও অপ্রমাণ করতেও যখন পারে না, তখন মহাপুরুষদের কথায় কান দিয়ে তাঁদের নির্দেশপথে চলতে চেষ্টা করতে যদি নাও পারি তাহলেও যাঁরা সেপথে চ'লে অনেক কিছু আনন্দময় সত্য উপলব্ধি করছেন তাঁদের এজাহারকে বাতিল করা হবে অযৌক্তিক। যে-পথে চ'লে তাঁরা অধ্যাত্ম-সত্যের দেখা পেয়েছেন সে-পথে না চ'লেই তার লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মত দেওয়া হবে গাজোয়ারি ঔদ্ধত্য। এই কথাটিই বড় চমৎকার ক'রে বলেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স জীন্‌স তাঁর অনবদ্য THE MYSTERIOUS UNIVERSE-এর শেষ অধ্যায়ে। এখানে এ-অধ্যায়টির চুম্বক দেওয়ার স্থান নেই। তবু তাঁর শেষের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

তিনি অগ্নিময় ব্রহ্মাণ্ডের বেগময় সত্তার পরিচয় দিয়ে বলছেন যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকের কাছে এ-ব্রহ্মাণ্ডকে আর মনে হয় না এক বিশাল যন্ত্র যে গাণিতিক ভঙ্গিতে চলেছে তার নির্দিষ্ট পথে, মনে হয় বরং এক বিশাল চিন্তার আধার যেখানে মন বস্তুর স্রষ্টা তথা নিয়ন্তা হ'তে চলেছে—খণ্ড মন নয় অবশ্য—সেই মহামন যার অতল গর্ভে অণুপরমাণুর নিত্য অধিষ্ঠান। বলতে সুরু করেছেন তিনি বিনয়ী ভঙ্গিতেই যে, এক সময়ে আমরা বিজ্ঞানের সত্য-আবিষ্কারের ক্ষমতা সম্বন্ধে যতই কেন না বড়াই ক'রে থাকি—"No scientist who has lived through the last thirty years is likely to be too dogmatic either as to...the direction in which reality lies." বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল লরিয়েট অ্যালেকসিস ক্যারেল তাঁর যুগপ্রবর্তক MAN THE UNKNOWN-এ এই কথাটিই বারবার বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে বিজ্ঞান এতদিন

কেবল বাহ্য বস্তুজগতেরই খবর চেয়ে এসেছে —সে-খবর পেয়ে সে যথেষ্ট লাভ করেছেও বটে, কিন্তু তবু—বলছেন তিনি জোর দিয়েই—বিজ্ঞানের লক্ষ্য শুধু মানুষের বাহ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান নয়, তাকে চাইতে হবে মানুষের আন্তর (আধ্যাত্ম) সাধনা মানুষের কাজে লাগতে। তাই "As much importance should be given to feelings as to thermodynamics It is indispensable that our thought embraces all aspects of reality."* কারণ আমাদের সন্ধানী চিন্তা মানুষকে সমগ্রভাবে নিরীক্ষা পরীক্ষা না করলে হবে যা হয়েছে (হায়রে!): "We have gained the mastery of everything which exists on the surface of the earth, excepting ourselves."† এ-যুগের আর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জে. বি. রাইন তাঁর বিখ্যাত NEW FRONTIERS OF THE MIND-এও ক্যারলের সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন যে, অবশেষে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আজ, তাই এতদিনে আমাদের চোখে পড়েছে আমাদের সমাজের সত্যি সত্যি কী টলমলে অবস্থা, আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সব অবস্থা জানতে হবে আমাদের নিজেদেরকে, নৈলে আমাদের দুরবস্থার নিরসন হবার নয়।...কারণ যথার্থ আত্মজ্ঞান না হ'লে আমরা আগেকার যুগের মতন চলব সেই সনাতন হাৎড়ে হাৎড়ে চলার পথে—আর এভাবে চলার পথে যে বিপদ সমূহ তা কি আর বলতে হবে?[১]

এ-বিপদ যে কী তা কি আজ কারুর অজানা আছে দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের নরকতাণ্ডবের পর? বিজ্ঞান ভেবেছিল যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ-কে প্রকৃতির নানা শক্তির 'পরে কর্তৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামরাজ্য আসবেই আসবে—সৌভ্রাত্রের হাটে বসবেই বসবে সমৃদ্ধির অফুরন্ত আনন্দমেলা—দেখতে দেখতে পত্তন হবেই হবে বিশ্বসাম্রাজ্যের (one world, one empire) যেখানে নানাজাতি দেবে প্রেমের রাজকর—যে-রাজ্যের কথা Norman Angel তাঁর The Great Illusion সবপ্রথম বইটিতে এঁকে ছিলেন মোহন রঙে পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-বর্বর অসুরের বাস তাকে না স্থানচ্যুত করতে পারলে কে বসাবে এই রামরাজ্য? বার্নার্ড শ মিথ্যা বলেন নি যে মানুষের নানা আসুরিক প্রবৃত্তিকে যদি বিশ্ব-প্রেমের কাছে দীক্ষা নিতে বাধ্য ক'রে সভ্যভব্য করতে না পারা যায় তাহলে যে-কোনো মহৎ কাজেই তাকে নিয়োগ করো না কেন সে সব ভেস্তে দেবে যেমন কাম ও অহঙ্কার যে-কোনো প্রেমকে ভেস্তে দেয় আবিল ক'রে।

কিন্তু এ-মহাসাধনার ভার নিতে পারে না, দিশা দিতে পারে না আমাদের বস্তুবিচারী মানস বুদ্ধি (materialistic intellect) যা বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার। হাত পাততে হবে বুদ্ধির পারে বোধির কাছে যে বলে: "জ্ঞাত্বা

---

* Chapter VIII The Remaking of man .. .. MAN THE UNKNOWN,

† Chapter I, Need of a Better Knowledge of Man ......, MAN THE UNKNOWN

১ "...... the most urgent problem of our disillusioned and floundering society is to find out more about what we are, in order to discover what we can do about the situation in which we exist today. In the conduct of our ..... outward and inward lives, we recognise more and more the need for a profounder self-knowledge than any former age had Until we know more about ourselves .. .. we are moving blindly in a world whose patterns are constantly more complex and hazardous." (Chapter 1.)

দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ"—ভগবানকে জানলে তবেই মানুষ জীবন্মুক্ত হ'তে পারে, নৈলে নয়। বিজ্ঞান আজকের দিনে চাইছে যে-ঠুনকো আত্মজ্ঞান নানা মনস্তাত্ত্বিক মনোবিকলনের বিশ্লেষণের আলোয়, সে-আলো কিছুদূর অবধি পথ দেখাতে পারে বটে কিন্তু তার সাধ অসীম হ'লেও সাধ্য সামান্যই। তাই বৈজ্ঞানিককে নত হতে হবে শেষমেশ মহাপুরুষেরই পায়, দিশা চাইতে হবে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারকল্প মহামানবের তথা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের কাছে। নৈলে সাধন হবে না নব-আবাহন গভীরতম আত্মবোধের—মিলবে না পরাবিদ্যার বর—প্রেম বিশ্বাস বিশ্বাত্মবোধ—শুধু মস্তিষ্কচালনী বুদ্ধির কাছে মিলবে না এ দিশা, কেন না :

"The limitations of reason become very strikingly, very characteristically, nakedly apparent when it is confronted with that great order or psychological truths and experiences which we have hitherto kept in the back-ground—the religious being of man and his religious life. Here is a realm at which the intellectual reason gazes with the *bewildered eyes of a foreigner who* hears a language of which the words and spirit are unintelligible to him and sees everywhere forms of life and principles of thought and action which are absolutely strange to his experience. He may try to learn this speech and understand this strange and alien life, but it is with pain and difficulty, and he cannot succeed unless he has, so to speak, unlearned himself and become one in spirit and nature with the natives of this celestial empire."

ভাবার্থ : "বুদ্ধির যে সীমা কোথায় সেটা অতি নগ্নভাবে ধরা পড়ে যখন তাকে আধ্যাত্মিক জগতের সত্য ও উপলব্ধি-সমূহের সামনাসামনি দাঁড় করানো যায়—যে-জগৎকে আমরা এতদিন ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নি। এই একটি জগতের সামনে পড়লে বুদ্ধির যুক্তি-তর্ককে বাঙ্মূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেন সে কোথাকার কোন্ পরদেশী, যে না বোঝে এখানকার ভাষা, না বোঝে তার নিগূঢ় অর্থ। এ-জগতের সংস্পর্শে সর্বত্রই জীবনের এমন সব রূপের, চিন্তার, কর্মের তত্ত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে যা তার অভিজ্ঞতায় একেবারেই চৈনিক হেঁয়ালি। অবশ্য সে এই ভাষা শিখবার, এই অচেনা অজানা জীবন বুঝবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু তাতে প্রতি পদে তার বাধা ও বেদনা বাজে। এ-চেষ্টা তার বিড়ম্বনা—যদি না সে আপন গভীর শিক্ষাদীক্ষা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে এই অমৃতলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্মে ও প্রকৃতিতে এক হ'তে শেখে।*

এ ধরনের কথা শুনলে প্রথমটায় বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের চটে ওঠা আশ্চর্য নয়, কারণ কোনো কিছু 'জানি না' কবুল করতে মানস বুদ্ধির নশ্বর অহমিকায় আঘাত লাগে, সাধুসন্তের কাছে মাথা নত করতে হবে ভাবতেও সে রেগে আগুন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি নব সত্য নব উপলব্ধিরই দাম দিতে হয় সব আগে আত্মাভিমানকে বর্জন ক'রে বলতে শিখে : "আমি জানি না, কিন্তু সত্যিই জানতে চাই, তাই চাই পথের দিশা—কোন্ পথে গেলে জানা যায় "যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যদ্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে"—যা জানলে—অর্থাৎ পরা বিদ্যা—আর কিছু না জানলেও চলে—কিন্তু তিনি যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নাগালের বাহিরে, কেন না :

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development, ১৩শ অধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

"The mind and the intellect are not the key. They can only trace out and revolve in a circle of half-truths and uncertainties. But in the mind and life, in all the action of the intellectual, the aesthetic, the ethical, the dynamic and practical, the emotional, sensational, vital, physical being, there is that which sees by identity and intuition and gives to all these things such truth and such certainty and stability as they are able to compass." "Man's road to supermanhood will be open when he declares boldly that all he has yet developed, including the intellect of which he is so rightly, and yet so vainly proud, are now no longer sufficient for him, and that to uncase, discover, set free this greater power within shall be henceforward his great preoccupation"

ভাবার্থ:—"মন ও বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ দিশারি নয়। এরা যা পারে, সে হচ্ছে একটা অর্ধ-সত্যের ও অনিশ্চয়তার বৃত্ত এঁকে তারই বর্ত্মে চক্রাকারে আবর্তন করতে। কিন্তু মানুষের মন ও প্রাণ, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যজ্ঞান, নীতিবোধ ও গতিধর্ম, ব্যবহারিক কর্ম ও ভাবপ্রবণতা, ভোগ-লোলুপতা ও শারীর চেতনা এ সবের মধ্যেই আছে সেই পরম চেতনা যার দৃষ্টি সকল সৃষ্টির স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার ফল, এবং এই চেতনাই মন প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদির প্রত্যেককে দা'ন করছে ততটা সত্য, ততটা স্থিতি, ততটা প্রতিষ্ঠা, যতটা তারা প্রত্যেকে ধারণ করতে সক্ষম।" "মানবে অতিমানব হবার পথ খুলে যাবে তখনই—যখন সে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এতদিন পর্যন্ত সে যা গ'ড়ে তুলেছে, আয়ত্ত করেছে (এমন কি বুদ্ধি পর্যন্ত—যার জন্যে সে ন্যায়তঃই, এবং কতকটা অবোধের মতনও বটে, গর্ব অনুভব করে) তা আর তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং তার নিজের মধ্যেকার বৃহত্তর শক্তিকে মুক্ত করাই হবে তার পরম ধ্যান, চরম স্বপ্ন।"*

এই-যে-সত্য, এই-যে-চেতনা মানুষকে আবহমানকাল বর্তমানের শোকাবহ বাস্তবতার পর্ব থেকে অনাগত আলোর যুগান্তরের দিকে রওনা ক'রে দিয়ে এসেছে, এ কি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা মানস যুক্তিতর্কের ধার ধারতে পারে? যুক্তিতে তো সে বিধৃত নয়, যুক্তিই যে এ-দৈব প্রেরণায় বিধৃত—তাকে প্রকাশ ক'রে তবেই না যুক্তির সার্থকতা। সে যে ধ্রুব করায়ত্তকে ছাড়ে অন্তরের দুর্নিবার প্রণোদনায়, বিচক্ষণ যুক্তির সাবধানী তাগিদে তো নয়। নীটশের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, সব অধিগত সম্পদকে সে ছাড়ে এই জন্যেই যে সে অন্তরে অন্তরে জানে যে, "Um die Erfinder von neuen werthen sich die welt"—অর্থাৎ "নূতনের (values) পূজারীকেই বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে।"

বিজ্ঞান ভালো করতে গিয়ে মন্দও করেছে কম নয়—টেনে এনেছে আমাদের সর্বধ্বংসের সামনে। তাই হয়ত আজ তার বুদ্ধি অহঙ্কার নম্রশীর্ষ হ'য়ে বিনয়ের কাছে হাত পেতেছে আলোর জন্যে। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনকে মানতে হয়েছে যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানের চর্চায়ই মানুষের মুক্তি নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কালি-ফর্ণিয়ায় তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন,

---

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development, ২২শ অধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

বিজ্ঞান কী ভাবে চলেছে আত্মঘাতের পথে। দুঃখ করেছিলেন এই ব'লে যে, "বিজ্ঞান যুদ্ধে আমাদের হাতে জুগিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে বিষ দেবার বা বিকল করবার ক্ষমতা, আর শান্তিকে আমাদের করেছে কর্মব্যস্ত অনিশ্চিত ও যন্ত্রের দাস।" (পীটার মাইকেল মোর-এর সদ্যোজাত "EINSTEIN" জীবনী থেকে উদ্ধৃত।)

এ-ট্রাজিডির কথা আরো বিশদ ক'রে লিখেছেন অলডাস হক্সলি তাঁর বহুপঠিত ENDS AND MEANS-এ। তাঁর BELIEFS অধ্যায়ে তিনি যা লিখেছেন, এখানে তার চুম্বকটুকু দিচ্ছি:

"আমরা আজ আর বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের যুগের মুগ্ধ আত্মপ্রসাদের যুগে নেই, এসে পড়েছি মোহভঙ্গের দুঃখময় প্রভাতে যখন গোলাপী নেশা কেটে গেছে দেখতে পেয়ে যে, বিজ্ঞান আমাদের উন্নততর হাতিয়ার জুগিয়েছে নিম্নতর লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে। বিজ্ঞান মানুষের আর একটা অপকার করেছে এই যে, আজকের গণমত বিজ্ঞানের গোনা-গন্তির জগৎকেই এ-ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য রূপ ব'লে ধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছে—প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতন* - যে সৃষ্টির না আছে কোনো মাথামুণ্ডু, না আছে কোনো উদ্দেশ্য। কিন্তু এহেন জগতে কেউই বাঁচতে চায় না। লক্ষ্যহীন গতির নেশায় মত্ত হয়ে থাকতে পারে মানুষ কদিন? কাজেই জীবনের 'পরে একটা উদ্দেশ্য আরোপ করতে তারা জাতীয়তা, ফ্যাশিসম্ ও কম্যুনিসম্‌কে বরণ করেছে—দার্শনিক দিক দিয়ে যাদেরকে হসনীয়ই বলব। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-সব বুলির মধ্যে দিয়ে তারা জীবনের যাহোক একটা অর্থ খুঁজে পায় তো, তাই এ নিয়ে করে দুরন্ত সিংহনাদ।

আশা করা যাক গণমনও ক্রমশ বুঝবে ঘা খেতে খেতে যে, এসব বুলিতে নেই শান্তি কি সান্ত্বনা, মানুষকে সার্থক হ'তে হলে চাইতেই হবে মানবতাকে কাটিয়ে দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠা—ভগবানের আবাহনে নব ধর্মরাজ্যের প্রবর্তনে। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর মন্ত্রঝংকৃত ভাষায়:

A deathbound littleness is not all we are:
Immortal our forgotten vastnesses
Await discovery in our summit selves

মৃত্যুঘেরা নগণ্যতা নহে তো স্বরূপ আমাদের:
বিস্মৃত বিপুল ব্যাপ্তি আছে পথ চেয়ে—কবে তারে
আমরা চিনিয়া লব আপনার সত্তার শিখরে।

আজকের বিজ্ঞান যে-পথে চলেছে সে-পথ ভুল পথ বলি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকে বরণ করতে হবেই হবে মানবাত্মার শিখর-অভিযান, অমৃত-তীর্থযাত্রা। এ-সাধনারও দিশা পাবেই পাবে অনাগত যুগের বৈজ্ঞানিক যদি সে সত্যি চায় সে-দিশা ও বরণ করে সে-সন্ধানের সর্ত ও সাধনা। সেই দিনই কেবল বিজ্ঞানের কাপালিক ট্রাজিডির অবসান হ'য়ে তার সবেজাগা সুমতির শেষফল ফলবে—জ্ঞান প্রেম ভক্তি ও সেবার মহাসমন্বয়ে।

* যদিও এযুগের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছে তাদের সুমতি হয়েছে ব'লে, তাই একথা তাঁরা আর বলেন না। আজ তাঁরা কী সুর ধরেছেন একটু আগেই তার ছবি এঁকেছি।

আলমবাজার মঠ

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আজ হইতে তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে কোন এক স্নিগ্ধ অপরাহ্নে আপনি যদি কোন বন্ধুর সহিত বা একাকীই আলমবাজার মঠে যাইতেন, আপনাকে কলিকাতার বীডন স্কোয়ারে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া চিতপুর রোড হইয়া বাগবাজার পুলের উপর দিয়া কাশীপুর রোড ধরিয়া বরাহনগর বাজারে পৌছাইতে হইত। তখনকার দিনে সামান্য কয়েকটি পয়সা খরচ করিয়া শেয়ারের গাড়ীতে বীডন স্কোয়ার হইতে বরাহনগর বাজারে আসা যাইত। কাছেই রাস্তার পূব পার্শ্বে ফাগুর প্রসিদ্ধ খাবারের দোকান। সেই দোকান হইতে মঠের সাধুদের জন্য খাস্তা কচুরি কিনিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। শুনা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ফাগুর দোকানের কচুরি ভালবাসিতেন।* যেখানে এই দোকান ছিল সেখানে এখন প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী। নিম্নতলে ডাক্তারখানা ও কয়েকটি দোকান। দ্বিতলে ব্যাঙ্ক, ত্রিতলে অনেক গৃহস্থ আশ্রয় পাইয়াছেন।

তাহার পর কিন্তু আপনাকে হাঁটিতে হইত। অবশ্য নিজের গাড়ী থাকিলে আর হাঁটিতে হইত না।...তাহার পর আলমবাজার চৌমাথায় পৌছিয়া মঠের সন্ধান করিলে যে কেহ আপনাকে মঠবাড়ী দেখাইয়া দিত। কিছুক্ষণ সাধুসংসর্গে পুণ্যসঞ্চয় করিয়া আরও মাইল দেড়েক উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলানিকেতন। রানী রাসমণির অমর কীর্তি ভবতারিণীর মন্দিরও দেখিয়া আসিতে পারিতেন। উহা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বলিয়াই বিশেষ পরিচিত।

আর যদি নৌকায় যাইবার আপনার ইচ্ছা হইত, বড়বাজার বা আহারীটোলার ঘাট হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া আলমবাজারে লোচন ঘোষের ঘাটে গিয়া পৌছিতেন। গঙ্গার নিসর্গ শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ঘাটের উপর দ্বাদশ শিবমন্দির দর্শন করিয়া পূর্ব দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই চৌমাথা। সে স্থান হইতে অল্প দূরেই মঠ।

এখন কিন্তু কলিকাতা হইতে ৩২ বা ৩৪নং বাসে, কিংবা ট্রেনে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নামিয়া একেবারে আলমবাজার চৌমাথায় পৌছিতে পারেন। কাছেই পোষ্ট অফিস। তাহার কিছু পশ্চিমে ৯৫নং দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম)—এর দ্বিতল বাড়ীতেই মঠ ছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আদি লীলা কামারপুকুরে, মধ্য লীলা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ও কলিকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে এবং অন্ত্যলীলা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট রবিবার রাত্রি ১টার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিমগ্ন হন। ৯০নং কাশীপুর রোডস্থ উদ্যানবাটীর লীজ (Lease)-ও প্রায় ফুরাইয়া আসে। তখন তাঁহার গৃহত্যাগী শিষ্যদের কোন আশ্রয় ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন সন্ধ্যাকালে ভক্তপ্রবর সুরেশচন্দ্র মিত্রকে দর্শন দিয়া তাঁহার ছেলেদের সাহায্য করিতে আদেশ করেন। সুরেশচন্দ্রও তদনুসারে স্বামীজীকে বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে বলেন, এবং তিনি মাসিক

---

* শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা—১৫৪।

যে অর্থ সাহায্য করিতেন[১] তাহাও করিতে থাকিবেন এ প্রতিশ্রুতি দেন।

বাড়ীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রায় এক মাইল উত্তরে বরাহনগরে প্রামাণিক ঘাট রোডে টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার মুন্সীদের ভগ্নপ্রায় দ্বিতল বাড়ীটি মাসিক ১০৲ টাকায় ভাডা লওয়া হয়। গৃহত্যাগী ভক্তদের একটু আশ্রয় মেলে।[২] ভক্ত ভবনাথ বাড়ীটি ভাডা করিয়া দেন।*

১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট হইতে অনেক শিক্ষিত যুবক বরাহনগর মঠের সন্ধান পাইয়া তথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী শুদ্ধানন্দ), কালীকৃষ্ণ বসু (স্বামী বিরজানন্দ), খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিমলানন্দ), গোবিন্দচন্দ্র শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বোধানন্দ) এবং সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী প্রকাশানন্দ)-ই প্রধান। কালীকৃষ্ণ বসু প্রমুখ কয়েকজন যুবক বরাহনগর মঠেই যোগ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন এই ভগ্নপ্রায় সংকীর্ণ বাড়ীতে স্থানাভাব ঘটিল। সেই কারণে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আরও মাইল-দুই উত্তরে আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হইল। গৃহত্যাগী যুবকেরা সেখানে আশ্রয় পাইলেন। বৃদ্ধা গোপালের মা ও গৌরী-মাও মাঝে মাঝে সেখানে আসিয়া এক তলায় একখানি ঘরে থাকিতে লাগিলেন।[৩]

শুনা যায় প্রামাণিক ঘাট রোডের ৺বৈদ্যনাথ দে মহাশয় কাশীপুর শ্যামাচরণ মৈত্র লেনের ৺নবীন গুড়ের (৺নবীনচন্দ্র দে মহাশয়ের) আলমবাজারের বাড়ীটি মাসিক ১০৲ টাকাতেই ভাড়া করিয়া দেন।

স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণিত আলমবাজার মঠবাড়ীর চিত্রটি এইরূপ: "মোটা-থামওয়ালা বাটী, সদর-দোর দিয়ে ঢুকে, দুটো ছোট ছোট রক্, সামনে উঠান ও তার পশ্চাতে তিনফোকর ঠাকুরদালান। উঠানের একপাশে ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দুটো বারাণ্ডা। পূর্বদিকের বারাণ্ডার পশ্চাতে একটা বড ঘরের সামনে একটা ছোট ঘর। দক্ষিণের বারাণ্ডা দিয়ে তিন খানা ঘরে যাওয়া যায়। বাঁদিকের ঘরটি ঠাকুর-ঘর। ঠাকুরঘরের পাশ দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পূর্ব কোণের ঘরটিতে ভাঁড়ার থাকতো। দক্ষিণের আর একখানি ঘরে সকলে থাকতো। এ ছাড়া বাড়ীটার পশ্চিম দিকেও তিনখানা ঘর ছিল। তার একটিতে শশী মহারাজ থাকতেন। তার পাশের ঘরটিতে কালী মহারাজ থাকতেন। আর একখানিতে তুলসী মহারাজ থাকতেন। নীচে রান্নাঘরের সুমুখে একটা গলি, তার পরে বাঁধান পুকুর। পূর্বদিকেও আর একটি পুকুর ছিল। লাটু মহারাজ মঠে আসিয়া দোতলায় পূর্বদিকের বড ঘরখানিতে থাকতেন।"[৪]

পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁহার "স্মৃতি-কথায়" লিখিয়াছেন—"মঠবাড়ী এত বড, কিন্তু

---

১ The History of Sri Ramakrishna Mission—Page. 43

২ বরাহনগর মঠের বিশদ বিবরণ ১৩৭১ সালের চৈত্র ও ১৩৭২ সালের বৈশাখ মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

* শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা। (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা—২৭৫

৩ The History of Sri Ramakrishna Misson, Page—68

৪ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা (২য় সংস্করণ)—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ২৯৭

ভাড়া মাত্র ১০৲ টাকা। ইহার কারণ দুজন লোক এ বাড়ীতে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এজন্য এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া জুটিত না।"

ভূতের বাড়ী বলিয়া সাধুদের মধ্যে বেশ ঠাট্টা তামাসা চলিত। নিজেদের মধ্যেই কয়েকজন ছাদের উপর ডাম্বেল গড়াইয়া গড়্‌গড়্‌ শব্দ করিতেন যাহাতে অন্যান্য সাধুরা ভয় পান। লাটুমহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ভূতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিতেন।[৫]

গঙ্গাধর মহারাজের 'স্মৃতিকথা'য় আরও জানিতে পারা যায় যে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন তিনি তীর্থপর্যটনের পর আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন, তখন ঐ স্থানে স্বামী প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, ও সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) প্রভৃতি মহারাজেরা বাস করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ ও ত্রিগুণাতীত মহারাজ প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন।[৬] আরও কিছুদিন পরে তাঁহারা স্থায়িভাবে সকলেই আলমবাজার মঠে বাস করিতে থাকেন।

স্থানাভাবে সাধুরা বাটী পরিবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিল না। অনেকেই প্রায় "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" হইয়া থাকিতেন। বাহিরের অপরিচিত কোন ভদ্রলোক আসিলে একখণ্ড বহির্বাস টানিয়া লইয়া পরিতেন। আহারাদির ব্যবস্থাও অনুরূপ ছিল। দিনের বেলায় কোন রকমে ভাত, ডাল ও চচ্চড়ি, এবং রাত্রে শুক্‌নো রুটি জুটিত। যে দিন অল্প একটু দুধ মিলিত, সে দিন উৎসব লাগিয়া যাইত।[৭]

এখানেও ধ্যানধারণা ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে দিন কাটিত। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই সময় মঠে আসিত। গুরুভ্রাতারা সকলেই সাগ্রহে সেই সকল পুস্তিকা পাঠ করিতেন। স্বামী অভেদানন্দ হৃষীকেশের মণ্ডলীশ্বর স্বামী ধনরাজ গিরির নিকট শারীরক-ভাষ্য পড়িয়া আসেন। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিদিন বৈকালে দুইঘণ্টাকাল বেদান্তভাষ্য পড়িতেন। আলমবাজার মঠে বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।[৮]

বরাহনগর মঠের ন্যায় আলমবাজার মঠেও শশী মহারাজ নিজস্কন্ধে সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনার ভার লইয়াছিলেন। পূজার জন্য অপরের বাগানে ফুল তুলিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইত। ভোগাদি সংগ্রহের জন্য তিনি ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন আর সুরেশচন্দ্র মিত্র ও বলরাম বসু মহাশয়দ্বয় জীবিত নাই যে মঠের অভাব অনটন দূর করিয়া দিবেন।

হরিপ্রসন্ন মহারাজ তখন এটোয়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার। ভ্রাম্যমাণ সুবোধানন্দজীর নিকট হইতে আলমবাজার মঠের আর্থিক দুর্গতির কথা শুনিয়া তিনি কিছুদিন প্রতি মাসে ষাট টাকা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিলে হরিপ্রসন্ন মহারাজ তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ ও কনিষ্ঠ-ভ্রাতার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মঠে যোগ দেন। মঠ তখন বর্তমান বেলুড় মঠের দক্ষিণে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে।

---

৫ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৬৫
৬ ঐ পৃঃ ১৩১
৭ ঐ পৃঃ ১৩৩
৮ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৩৫

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে হরিপ্রসন্ন মহারাজের নূতন নামকরণ হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

আলমবাজার মঠের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর নাগেশ্বর চাঁপা ফুল খুব ভালবাসিতেন। একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের জন্য ঐ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ ঘুঘুডাঙ্গায় (বর্তমানে—উত্তর দমদম) ডি. গুপ্তের বাগানে উক্ত ফুলের সন্ধানে যান। সেখানে গিয়া মালীদের কাছে শুনিলেন, ঘুঘুডাঙ্গা স্টেশনে (দমদম স্টেশনে) যাইবার বড় রাস্তার (বর্তমান খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সরণী) উত্তর ধারে সাতপুকুরের বাগানে এই ফুল পাওয়া যাইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে একাকীই গেলেন। কিন্তু দেখিলেন গাছ আছে বটে, তাহাতে তখনও ফুল ধরে নাই। মালীরা তাঁহাকে বলিল, সতের-আঠার দিন পরে আসিলে ফুল পাওয়া যাইবে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ সংকল্প করিয়াছিলেন ফুল না লইয়া মঠে ফিরিবেন না। তাই তিনি বারাসত অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। সেখানকার ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন লোকদিগকে দেখিয়া তাঁহার কোমল অন্তরে ব্যথা লাগিল। তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ উপায়গুলি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আঠার দিন কাটিল। তখন সাতপুকুরের বাগানে আসিয়া দেখিলেন—"সুন্দর সুবাসিত ফুলভারে নত নাগেশ্বর চাঁপার গাছটি মৃদুমন্দ ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।" গঙ্গাধর মহারাজের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মালীরাও তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত মনে কলাপাতার ঠোঙা করিয়া বিস্তর নাগেশ্বর চাঁপা ফুল তাঁহার হাতে দিল। তিনিও উহা লইয়া মহানন্দে আলমবাজার মঠে ফিরিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার পক্ষাধিককাল অজ্ঞাতবাসের কাহিনী শুনিয়া এবং রাশিকৃত নাগেশ্বর চাঁপা ফুল পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন, পরমানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ফুলগুলি নিবেদন করিলেন।[৯]

পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ শশী মহারাজকে আলমবাজার মঠেই একদিন বলিলেন—"তুই যে ঠাকুরের পূজা ফাঁদলি, কে যোগায় তোর নিত্য পান, বুট, আর মিছরির পয়সা? তোর ঘণ্টা নাড়ার বাড়াবাড়ি দেখলে আমার ভয় হয়।" শশী মহারাজ সহাস্যে উত্তর দিলেন—"তোমায় ঐ নিয়ে ভাবতে হবে না। যাঁর পূজা ফেঁদেছি, তিনিই তাঁর ভোগের পয়সা যোগাবেন।"[১০]

নিষ্ঠাবান রামকৃষ্ণানন্দের এ কথা কোন দিনই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। "তিনি যখনই ভাবতেন ঠাকুরকে কি ভোগ দেবেন, তখনই কোন না কোন ভক্তপ্রেরিত এক কুঁদা মিছরি, মালসাভরা নবীনের রসগোল্লা ও ঠাকুরসেবার অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়া পৌঁছিত।"[১১]

যে সকল যুবক আলমবাজার মঠে যোগ দেন তাঁহাদেরও কথা এখানে কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সুশীল মহারাজের বরাহনগর মঠে যাতায়াত ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি আলমবাজার মঠে যোগ দেন এবং সেই স্থানেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রকাশানন্দ নামে অভিহিত হন।

---

৯ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৫৫।

১০ উদ্বোধন—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ১৯৩।

১১ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-কৃত, পৃঃ ১০৬।

খগেন মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নূতন নামকরণ হয়—স্বামী বিমলানন্দ। সুধীর মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগ দেন এবং ঐ বৎসরই মে মাসে স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পান। তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে ভূষিত হন। শুকুল মহারাজ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ মঠে যোগ দেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মানন্দ—এই নাম প্রাপ্ত হন। হরিপদ মহারাজ এই মঠে যোগ দিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয়—স্বামী বোধানন্দ।[১২]

কানাই মহারাজ ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মঠেই স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া যথাক্রমে নির্ভয়ানন্দ ও নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। ইঁহারা দুজনেই বরাহনগর মঠে যাতায়াত করতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীও বরাহনগরে। তিনি নানাভাবে বরাহনগর মঠের সাধুদিগের সেবা করিতেন। সস্ত্রীক কাশীবাস কালে কাশীধামেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। তাঁহার আপনজন কেহ না থাকায় তিনি আলমবাজার মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার কয়েক মাস পরেই স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করেন।[১৩]

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বসু আলমবাজার মঠে যোগ দেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহারা যথাক্রমে স্বরূপানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ নামে অভিহিত হন।[১৪]

আলমবাজার মঠেও সাধু-সজ্জনের সমাগম হইত। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, অধ্যাপক বহুবল্লভ শাস্ত্রী, সিন্ধু প্রদেশের প্রসিদ্ধ "সোফিয়া" পত্রিকার সম্পাদক (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) প্রায়ই সাধুদিগের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। নাগ মহাশয়ও একদিন সস্ত্রীক আলমবাজার মঠে আসিযা প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামীজীর মার্কিন ভক্ত ডাক্তার টার্ন বুল (Dr. Turn Bull) কলিকাতায় আসিবার পর প্রায়ই এই মঠে আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদিগের পূতসঙ্গ লাভের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বরে রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে তিনি কিছুদিন বাসও করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহিমবাবু বা মহেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতার সিমলা অঞ্চল হইতে পদব্রজে আলমবাজার মঠে আসিয়া গঙ্গাধর মহারাজের ভ্রমণকাহিনী শুনিতেন। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মধ্যে মধ্যে এই মঠে আসিয়া সাধুদের সাহচর্য লাভ করিতেন। শশিপদবাবু বরাহনগরে যে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার সাহায্যকল্পে আমেরিকা হইতে স্বামীজী কয়েকবার কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলেন।[১৫]

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতের তীর্থস্থানগুলি দেখিবার মানসে রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেওঘরে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দেহাতীকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও বিশেষ দুর্দশাপন্ন দেখিয়া অনুকম্পায় মথুরবাবুকে বলেন—"তুমি তো মার দেওয়ান। এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও। আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" বহু ব্যয়ের আশঙ্কায় মথুরবাবু প্রথমে

১২ উদ্বোধন—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা।

১৩ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৩৪।

১৪ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 117

১৫ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৭৭—১৮৯।

একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া কলিকাতা হইতে উপযুক্তসংখ্যক কাপড় আনাইয়া এই কাজ সুসম্পন্ন করেন। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দেও মথুরানাথের জমিদারিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দিয়া অনুরূপ জনসেবা করান। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে ভক্তদিগের মধ্যে মথুরবাবুই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।[১৬]

বরাহনগর মঠে থাকিতে এবং পরেও গৃহত্যাগী ভক্তেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে কিছু কিছু জনসেবা করিতেন বটে, কিন্তু আলমবাজার মঠে থাকাকালেই উহা বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজী যখন বিশ্রামার্থে দার্জিলিঙ পর্বতে, তখন গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) মুর্শিদাবাদ জেলায় মহুলা গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা আরম্ভ করেন। স্বামীজী দার্জিলিঙ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামী প্রেমানন্দের নিকট এই সেবা-কার্যের কথা শুনিয়া নিজ তহবিল হইতে দেড়শত টাকা গঙ্গাধর মহারাজকে পাঠাইয়া দিলেন। স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য মহুলায় পাঠাইলেন।

এই সেবাকার্যে মঠের সকলেই গঙ্গাধর মহারাজকে উৎসাহিত করেন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠান। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) আলমবাজার মঠ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন গঙ্গাধর মহারাজকে একখানি পত্রে লেখেন—"তুমি যে মহৎ কার্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছ, তাহার আর তুলনা নাই। আমি দুর্বল, তোমাকে আর কি উৎসাহিত করিব। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, দুর্বলের বল, সকল শুভ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিদাতা তোমার উদ্যম সফল করুন, এবং তোমাকে অজর ও দীর্ঘজীবী করিয়া এইরূপ আরও শত শত জনহিতকর শুভ কাজের উদ্যোগী করুন।·· রাজা তিনদিন পূর্বে তোমাকে ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন, আজ ১০৲ টাকা পাঠাইতেছেন।"[১৭]

পূজনীয় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন গঙ্গাধর মহারাজকে আলমবাজার মঠ হইতে ৫০৲ টাকা পাঠান এবং লেখেন—"আমাদের এখান হইতে ২ জন··· যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্যের জন্য যাইবে। যদি না যাওয়া হয়, তবে তোমার ওখানেই পাঠাইব।"[১৮]

জনসেবা-পরিচালনার নির্দেশও আলমবাজার মঠ হইতে দেওয়া হইত। উক্ত পত্রের অপর অংশে দেখা যায়—"তোমরা adultদিগকে যে ½ সের করিয়া চাউল দিবে মনে করিয়াছ সে উত্তম কথা। কিন্তু উহার মধ্যে বাছিয়া দিবে। ···যতক্ষণ না আমাদের লোক যায় ততক্ষণ আন্দুলবেড়িয়া বা অন্যত্র রিলিফ খুলিও না। এ সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক পরে লিখিব।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ আলমবাজার মঠ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে আর একখানি পত্রে লেখেন—"ভাই গঙ্গাধর, আমি গত পরশু দিবস তোমাকে ইনসিয়র্যান্স করিয়া ১৫০ টাকা পাঠাইলাম।···বাছিয়া বাছিয়া যাহারা যথার্থই অকর্মণ্য, কোনরূপ খাটিয়া খাইতে অক্ষম, তাহাদিগকেই চাউলাদি দিবে। আমাদের এখান হইতে একজন বোধ

---

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ।

১৭ স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১।

১৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

হয় শীঘ্রই যশোহর খুলনার দিকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাইবে।"[১৯]

আলমবাজার মঠ হইতেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ বিশদভাবেই দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

শুধু দুর্ভিক্ষ নিবারণই নয়। এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী অনাথ বালকদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তিনি নটুবিহারী দাস নামে ৯/.০ বৎসরের একটি বালকের সন্ধান পান, এবং তাহাকে মহুলায় লইয়া গিয়া অনাথ আশ্রমের সূত্রপাত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইহাই প্রথম অনাথ আশ্রম। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসগুলিতে এবং বিভিন্ন আশ্রমে অনেক অনাথ বালক-বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে।[২০]

মঠ আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইবার পর পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি স্বামীজী কলিকাতায় পৌছান। সেই বৎসর হইতে তাঁহারই প্রবর্তিত নিয়মাবলী মঠে চালু হয়, এবং মঠের সমস্ত কাজ তদনুসারেই নির্বাহ হইতে থাকে।[২১] এমন কি জনসেবার কার্যও তাঁহার ইচ্ছামত চলিত। আলমোড়া হইতে লিখিত ২০-৬-১৮৯৭ তারিখের স্বামীজীর একখানা পত্রে দেখা যায়—"I have sent some of my boys to works in the famine districts. It has acted like a miracle." দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে আমার কয়েকটি ছেলেকে পাঠাইয়াছি। উহাতে অপূর্ব কাজ হইয়াছে।" ৯-৭-৯৭ তারিখের পত্রেও দেখা যায়—"My boys are working in the midst of famine and disease and misery—nursing by the mat-bed of Cholera-striken Pariah and feeding the starving Chandala." "আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দুর্দশার মধ্যে কাজ করিতেছে। মাদুরে শায়িত কলেরাক্রান্ত অচ্ছুতের সেবা করিতেছে, অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালকে আহার দিতেছে।"[২২]

মঠের সকল কাজে সকল সাধুরই মতামত লওয়া হইত। এই ভাবে মঠ ও মিশনের একটি সুষ্ঠু নিয়মকানুন গড়িয়া উঠিলে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মে কলিকাতার বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে সকল সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগকে ডাকিয়া এক সভায় সকলকে বুঝাইয়া বলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী প্রচার করিতে হইলে এবং তাঁহার আদর্শে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে হইলে একটি বলিষ্ঠ সঙ্ঘের প্রয়োজন। একথা তিনি প্রতীচ্য দেশ ভ্রমণ করিয়া বেশ বুঝিয়াছেন। তখন সকলেই উৎসাহ ও আনন্দের সহিত স্বামীজীর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সেই সভাতেই "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন সকলে আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন।[২৩]

ইহার এক বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজী আমেরিকা হইতে লণ্ডনে

১৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

২০ স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত পৃ ১৪২।

২১ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১।

২২ Letters of Swami Vivekananda.

২৩ The life of Swami Vivekananda.

আসিয়া তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া পাঠান। তাহার পরেই স্বামী অভেদানন্দের ডাক পড়ে। তাঁহারা দুজনেই আলমবাজার মঠ হইতে বিদেশ যাত্রা করেন।[২৪]

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শশী মহারাজকেও স্বামীজী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আলমবাজার মঠ হইতে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে যান স্বামীজীরই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দজী। মান্দ্রাজে গিয়া শশী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনা পূর্বের মতই প্রাণ দিয়া করিতে থাকেন, এবং তাঁহার জীবনাদর্শ ও অমিয়বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মান্দ্রাজ মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫]

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একদিন নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এক টুকরা কাগজে লিখিলেন—নরেন লোক শিক্ষা দিবে। নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আপত্তি করিয়া বলিলেন—না, আমি পারিব না। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিলেন—তোর ঘাড় পারিবে।[২৬] ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যেদিন স্বামীজী আমেরিকার চিকাগো সহরে উপস্থিত হন, সেই দিন হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা বিশেষভাবে ফলবতী হইতে আরম্ভ করে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনালোকে হিন্দু ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা ও বেদান্ত প্রচারে যে অত্যধিক পরিশ্রম হয়, তাহাতে স্বামীজীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশে ফিরিয়া তাঁহার শ্রমের কিছুই লাঘব হইল না। অবিরাম অভ্যর্থনার উত্তর দেওয়া, সংগঠনমূলক কার্যাবলীর জন্য চিন্তা ও নানা স্থানে বক্তৃতা চলিতেই লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুআরি আলমবাজার মঠ হইতে তিনি একখানি পত্রে লেখেন:—

"I have not a moment to die, as they say···I am almost dead. As soon as the Birthday (celebration of Sri Ramakrishna) is over I will fly off to the hills. ... I do not know whether I would live even six months more or not, unless I have some rest."[২৭]—"লোকে যেমন বলিয়া থাকে, আমার মরিবারও অবসর নাই, আমারও সেইরূপ অবস্থা। অত্যধিক পরিশ্রমে আমি মৃতপ্রায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইলেই আমি কোন পার্বত্য প্রদেশে পলাইব। বিশ্রাম না লইলে আমি আর ছয় মাসের বেশী বাঁচিব কি না সন্দেহ।"

আলমবাজার মঠ হইতেই স্বামীজী দার্জিলিঙ যাত্রা করেন, সঙ্গে যান স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী আলমবাজার মঠেই অবস্থান করেন। এই স্থানেই এবং এই সময়েই স্বামি-শিষ্যসংবাদ-প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন।[২৮]

এক বৎসর আগের ঘটনা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে আলমবাজার মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষ্যে গৃহী-ভক্তগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

---

২৪ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 95, 98.

২৫ ঐ p 118

২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

২৭ Letters of Swami Vivekananda.

২৮ স্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. ৪৪-৪৮।

প্রধান উদ্যোক্তারা দুই রকম প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন—সাধারণ লোকদিগের জন্য কলাইডালের খিচুড়ি, এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের জন্য ভুনি খিচুড়ি। মঠের সন্ন্যাসীরা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা সকলের জন্যই ভুনি খিচুড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। শেষে পর্যন্ত ভুনি খিচুড়িই হইল।

এই ব্যাপারেই দক্ষিণেশ্বরে সাধারণ মহোৎসবের দিন স্ত্রীলোকদিগকে উৎসবে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া কলিকাতার নানা স্থানে "প্লাকার্ড" টাঙ্গান হইয়াছিল, এবং স্ত্রীলোকেরা যাহাতে হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারের টিকিট না পান, তাহার জন্যও চেষ্টা করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কয়েকজন যুবকের সাহায্যে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল এই বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু বেশীই হইয়াছে।[২৯]

আমরা বরাহনগরের ৺হরিদাস বোডাল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, একথা স্বামীজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিযাছিলেন, "দু'চার জন পতিতাই যদি উদ্ধার না পাইল, তবে পতিতপাবন ঠাকুরের আবির্ভাবের কি প্রয়োজন ছিল?"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন কলিকাতায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৪ই জুনের এক পত্রে লেখেন—"গত পরশ্ব দিবস বৈকালে এখানে এক অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া আমাদিগের মঠের অনেক স্থান ভগ্ন এবং অনেক স্থানে crack হইয়া গিয়াছে। এ বাড়ী শীঘ্রই ছাড়িতে হইবে।[৩০]

জুন মাসের ১৫ তারিখে আলমবাজার মঠ হইতে লিখিত স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে দেখা যায়—"মঠের কোন স্থান যদিও একেবারে পড়িয়া যায় নাই, কিন্তু অনেক স্থানই ফাটিয়া বিশেষ জখম হইয়া একেবারে বাসের অনুপযুক্ত করিয়াছে। আমরা পরদিন হইতেই বাড়ীর সন্ধান করিতেছি, কিন্তু সুবিধামত পাওয়া যাইতেছে না।"[৩১]

স্বামীজীও এই সংবাদ পাইয়া আলমোড়া হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন এক পত্রে লিখিলেন—"A number of boys are already in training, but the recent earthquake destroyed the poor shelter we had to work in, which was only rented, any way. Never mind The work must be done without shelter and under difficulties[৩২] 'কতক গুলি ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ভাড়া করা যে সামান্য আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের কাজ চলিতেছে, এখনকার ভূমিকম্পে তাহা ভগ্নপ্রায়। যা হয় হোক, ভাববার কিছু নাই। আশ্রয়হীন হইলেও এবং নানা অসুবিধার মধ্যে পড়িলেও আমাদের কাজ চলিতে থাকিবে।"

যুগমানবের শুভ সংকল্প কখনও ব্যর্থ হয় না। অনতিকাল মধ্যেই ভাগীরথীর পূর্বকূলে কোন সুবিধাজনক স্থান না পাইয়া পশ্চিম তীরেই ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুআরি মঠ স্থানান্তরিত হইল।[৩৩]

---

২৯ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃ. ১৫৮

৩০ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

৩১ স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২।

৩২ Letters of Swami Vivekananda.

৩৩ The History of Sri Ramakrishna Mission p. 124.

আলমবাজার পোষ্ট-অফিসের কিছু পশ্চিমে ৯৫নং দেশবন্ধু রোডে পুরাতন মঠ-বাড়ী কিছু নূতন আকার ধারণ করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তবে তাহা এখন অন্য লোকের অধিকারে। বাহির হইতে সে মঠ-বাড়ী আর চিনিবার উপায় নাই। উহার সম্মুখভাগে যে জোড়া জোড়া থামওয়ালা বারান্দা ছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তৎ-পরিবর্তে সেখানে রহিয়াছে অনেকগুলি দোকানঘর। মঠের সম্মুখেই রাস্তার অপর দিকে ৺জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ী ছিল, তাহারও কোন অস্তিত্ব নাই। তবে তাঁহার বংশধরেরা সেই স্থানেই নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, এবং তাঁহাদের পুরাতন ঠাকুর-দালানটি এখনও কোনরকমে টিকিয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য যে বাড়ী হইতে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ যে স্থানে বাস করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন, সঙ্ঘের ধাত্রীস্বরূপা সেই মঠ-বাড়ীর স্মৃতিরক্ষার কি কোন উপায় হয় না?

প্রেম-রূপ

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রাজ্য-ধন স্বপ্নসম হল মূল্যহীন
হে বুদ্ধ, তোমার কাছে। বসি নিশিদিন
যোগাসনে, সিদ্ধ হয়ে নির্বাণ লভিয়া
সেথা হতে যবে তুমি আসিলে ফিরিয়া
জীবতরে অন্তহীন করুণার ধারা
ঝড়াইলে দুনয়নে, প্রেমে হলে হারা!

মা-কালীরে জ্ঞান-খড়্গে দ্বিখণ্ডিত ক'রে
লভি জ্ঞান, রামকৃষ্ণ আসিলেন ফিরে।
সে-হৃদয়ও তৃণ 'পরে পদভার হেরি
অন্তহীন বেদনায় উঠিল গুমরি।

লীন হয়ে ব্রহ্মে, নির্বিকল্প সমাধিতে
বীরেশ বিবেকানন্দ ফিরিলা জগতে,
কহিলেন, 'অনেকেরও মুক্তির কারণে
লাখ বার জন্ম নিতে ইচ্ছা জাগে প্রাণে।'

নিত্য পূর্ণ শুদ্ধ বোধ স্বরূপ যাঁহার
তিনিই অসীম নিত্য প্রেম-পারাবার।

প্রাণের পরিচয়

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে বেদান্তবিনোদ

গ্রীষ্মকালে যদি একটু বেশী গরম পড়ে, তবে আমরা অমনি বলিতে থাকি "উঃ, কি বিশ্রী গরমই পড়েছে। একেবারে প্রাণান্ত করে তুলেছে।" আবার শীতের দিনে যদি একটু কড়া শীত পড়ে, তাহা হইলেও বলি "বাপরে বাপ। কী ঠাণ্ডা। শীতে মারা গেলাম।" ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময়ে আমরা প্রাণভয়ে গৃহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি। রোগে শোকে আমাদের প্রাণ মুহ্যমান হয়, আবার আনন্দের দিনে আমাদের প্রাণ যেন উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। আমাদের আমিত্বের সাথে প্রাণের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে 'আমিটাই' প্রাণ না প্রাণটাই 'আমি', তাহা বুঝিতে পারি না। আহারান্তে আমরা মনের সুখে নিদ্রা যাই, কিন্তু প্রাণের বিশ্রামও নাই, নিদ্রাও নাই; সে বেচারী জাগ্রত থাকিয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত চলাচল করায়, ভুক্তান্ন পরিপাকের ব্যবস্থা করে, তাহা হইতে গ্রহণযোগ্য সারাংশদ্বারা রক্তমাংস অস্থিমজ্জা মস্তিষ্কাদির পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত থাকে, আর অসারাংশ বহির্নিষ্কাশনের পথে প্রেরণ করে,—এক কথায় আমাদের দেহরক্ষার্থ যাহা কিছুর প্রয়োজন সেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকে। আর জাগ্রতাবস্থায় তো তাহার অক্লান্ত সেবার কথাই নাই, তাহার সাহায্য ব্যতীত একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, চলাফেরা কাজকর্ম করা তো দূরের কথা।

প্রাণ যে কেবলমাত্র আমাদের দেহযন্ত্রটি সৃষ্টি করিয়া সেই দেহের ভিতরে থাকিয়া অহর্নিশি আমাদের সেবায় নিযুক্ত থাকে, শুধু তাহাই নহে; এই প্রাণই যে সূর্যচন্দ্র আকাশ-বাতাস অন্ন প্রভৃতি রূপে আমাদিগকে বহির্জগৎ হইতে নিরন্তর প্রাণ আহরণ করিয়া জীবিত থাকিতে সাহায্য করে, একথা আমরা আমাদের অনাদি জ্ঞানভাণ্ডার শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। শ্রুতি বলেন, "আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ" (প্রশ্নোপনিষদ্ ৩।৮), সূর্য প্রাণের বাহ্য অভিব্যক্তি। "এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ। এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ॥ (প্রশ্নঃ উপঃ ২।৫)। এই প্রাণ অগ্নি হইয়া প্রজ্বলিত হন। সূর্যরূপে তাপ দেন, ইনি মেঘ, ইনিই বায়ু, ইনি পৃথিবী, ইনিই অন্নরূপে সকলকে পুষ্ট করেন, (অধিক কি) যাহা স্থূল, মূর্ত, যাহা সূক্ষ্ম, অমূর্ত, যাহা অমৃত, এই প্রাণই সেই সমস্ত হইয়াছেন। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"॥ (কৈবল্যঃ উপঃ ১৫, মুণ্ডক ২।১।৩)। "ব্রহ্ম হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, এবং প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং বিশ্ববিধাত্রী পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।" * এইখানেই প্রাণের নিষ্কাম সেবার ইতি হয় নাই, আমাদের মৃত্যুর পরেও প্রাণের সেবার বিরাম হয় না। আয়ুষ্কাল শেষ হইলে

---

* শ্রুতির এই সকল উক্তিতে আধুনিক মনে অবিশ্বাস আসিতে পারে। সেজন্য দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমাদিগকে একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই সকল সত্য বর্তমান সময়ের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেযুগে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালীও এ যুগের প্রণালী হইতে পৃথক ছিল। বৈদিক যুগের মন যে কবিত্বপূর্ণ ছিল, একথা সর্ববাদিসম্মত। তাঁহারা সূক্ষ্মতম দার্শনিক তথ্যাদিও যে অপূর্ব কবির ভাষায় এবং

যখন আমরা পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি, তখনও প্রাণ আমাদের কর্মসংস্কার এবং কর্মফলাদির বোঝা স্ব-স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া আমাদিগকে দেহান্তর বা লোকান্তর প্রাপ্ত করাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে সাথে যাত্রা করেন। আমরা কিন্তু এমনই অকৃতজ্ঞ যে আমাদের এই জীবন-মরণের—এই জন্ম-জন্মান্তরের অকৃত্রিম বন্ধুটির পরিচয় লইবার চেষ্টা ভুলিযাও কখনো করি না এবং এই অকৃতজ্ঞতার ফলে অন্তহীন জন্মমৃত্যু-চক্রে পিষ্ট হই। শ্রুতি বলেন যে, তোমরা যদি প্রাণের ঘনিষ্ঠ পরিচয অবগত হইয়া প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণাত্মবিদ্ হইতে পার, তবে অমরত্ব লাভ করিবে (অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তোমাদের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ঘটিবে)—

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥

(প্র: উ: ৩।১২)

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব, বাহ্য এবং অধ্যাত্ম ভেদে পঞ্চবিধ অবস্থিতি জানিয়া (উপাসক) অমরত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং একবার আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্মের এই নিষ্কাম সেবকটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? অতএব যে পরম পুরুষের সহিত প্রাণের অবিনাভাব সম্বন্ধ, তাঁহার চরণে, এবং যে সকল মহর্ষিবৃন্দ অশেষ কৃপাপরায়ণ হইয়া আমাদের হিতার্থে প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে প্রাণের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার প্রয়াস পাই।

অতি প্রাচীনযুগে আশ্বলায়ন নামক জনৈক ঋষি প্রাণতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইয়া পরম ঋষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্। কুত এষ প্রাণো জায়তে?"—ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্নেতদাততম্।" (প্র: উপ: ৩।৩)—বৎস। আত্মা (বা পরমেশ্বর) হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে; ছায়া যেরূপ সর্বদা পুরুষের অনুগত থাকে, এই প্রাণও তদ্রূপ সর্বদা পরমেশ্বরকে অনুসরণ করে (প্রাণশ্ছায়াবদীশ্বরমনুগচ্ছতি—আনন্দগিরি)। এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে এই জন্মলাভ ব্যাপারটা কি

বহুস্থলে রূপকের ছদ্মবেশে লিখিয়া রাখিয়া গিযাছেন, আমাদের উপনিষদ্গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পরিভাষাও ছিল পৃথক। এই সকল কারণে তাঁহাদের উক্তির মর্ম অনুধাবন করিবার জন্য সশ্রদ্ধ চিন্তাশীলতার আবশ্যক। সামান্য কযেকটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝা যাইবে। যেমন—সূর্যের একটি নাম 'সপ্তাশ্ব', সূর্যদেব সাত ঘোড়ার রথে চড়িযা আকাশমার্গ পরিভ্রমণ করেন, কথিত আছে। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃশ্যমান আলোক-তত্ত্বে আমরা বুঝিয়াছি যে, ইহার অর্থ সূর্যকিরণে সাতটি দৃশ্যমান বর্ণ বর্তমান। আমাদের ঋষিরা বৃক্ষাদিরও প্রাণ আছে বলিয়া গিয়াছেন—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ", সেই সত্য আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিয়া গিযাছেন। শ্রুতি বলেন যে, যদি তোমার অপান বাযুর ক্রিয়া না থাকে, তবে তুমি উদান বায়ুর ক্রিয়াফলে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, আর যদি তোমার উদান বাযুর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে অপানপ্রভাবে তোমাকে নিজ শরীরের ভারে মাটিতে শুইয়া থাকিতে হইবে, দাঁড়াইতে কিংবা চলিতে পারিবে না। ইহা হইতেই কি বুঝা যায় না যে তাঁহারা 'অপানবাযু' কথাটি আধ্যাত্মিক অপানবাযুর অতিরিক্ত 'মাধ্যাকর্ষণ' শক্তি অর্থে, এবং 'উদানবায়ু'ও তদ্রূপ 'সৌর আকর্ষণ' শক্তি অর্থে ব্যবহার করিতেন? শুধু পরিভাষার তফাৎ মাত্র! বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—"জড় বলিয়া কিছু নাই, সবই শক্তি", Lord Kelvin বলিয়াছেন, "পদার্থ (matter) এবং মন (mind) একই উপাদানে সৃষ্ট, আর আমাদের শ্রুতি কোন্ আদিম যুগে বলিয়া গিয়াছেন যে প্রাণ হইতেই মন, পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। একটি পরমাণু যে শক্তির ঘনীভূত অবস্থামাত্র, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, একথা 'প্রপঞ্চসারতন্ত্রে' বিবৃত শক্তির উন্মেষ প্রসঙ্গ একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

প্রকারের; ইহার অর্থ সাধারণ প্রাণীর ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া নহে। প্রাণের এই জন্মগ্রহণ ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্বিকল্প সমাধির দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার প্রাণ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিত, শ্বাসপ্রশ্বাস বা হৃৎস্পন্দন একেবারেই থাকিত না, আবার যখন সেই সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতেন, তখন তাঁহার প্রাণের ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হইত। ঠিক সেই প্রকার প্রলয়কালে বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তি পরমেশ্বরে বিলীন অবস্থায় থাকে, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাণ যেন সেই ভগবদ্‌বিধানেই জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্পন্দিত হয়। 'জন্ম লাভ করে' এই অর্থেই বুঝিতে হইবে। তাঁহা হইতে পৃথকত্ব প্রাপ্ত হয়, এরূপ অর্থে নহে, কারণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তিন অবস্থাতেই প্রাণ পরমেশ্বরেই আশ্রিত থাকে। ভগবদধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই স্পন্দনের দ্বারা প্রাণ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের এবং তত্তৎনিবাসী দেবমনুষ্য পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদির,—এককথায় স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থেরই সৃষ্টি করে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, কোন পদার্থই 'নষ্ট' হইলে শূন্য হইয়া যায় না—তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব কারণেই পর্যবসিত হয়। জগতের যাবতীয় পদার্থ এভাবে তাহাদের মূল কারণ শক্তিতে পর্যবসিত হইতে পারে, এবং শক্তি হইতেই আবার সেগুলি অনুকূল পরিবেশ পাইলে উদ্ভূতও হয়। জড়বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার প্রাণতত্ত্ব বুঝিতে খুবই সহায়তা করে। বিশ্বজগতের সব কিছুই প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণেই উহার বিলয় হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রাণ হইতে জগৎসৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে। (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১ম অনুবাক)*

চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রাণই যে সৃষ্টির মূল, তাহা একাধিক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। নিত্যমুক্ত পুরুষ সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, "যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতম্; প্রাণঃ প্রাণেন যাতি" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।১৫।১) "রথচক্রের শলাকাসমূহ যেমন চক্রের নাভিতে (Hub) সংলগ্ন থাকে, সেই প্রকার সমস্ত প্রাণে আশ্রিত রহিয়াছে, প্রাণ স্বাধীনভাবে গমন করে।" ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাণকে মহারাজের মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায় পরমেশ্বরের সর্বার্থসম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্" (প্রশ্ন: উপ: ২।৬): "রথচক্রনাভিতে চক্রশলাকাসমূহের ন্যায় সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে।" "প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্" (প্রশ্ন: উপ: ২।১৩), "ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই প্রাণের বশীভূত।" "প্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধম্" (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৩) "প্রাণের দ্বারাই জগৎ বিধৃত আছে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন যে তাঁহার পরা-প্রকৃতি প্রাণদ্বারা এই জগৎ বিধৃত আছে (গীতা ৭।৫)। গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন, "সর্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোহংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্" (মাণ্ডুক্যকারিকা ১।৬), "প্রাণ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে এবং পুরুষ চৈতন্যাংশের কারক।

---

* ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও প্রশ্নোপনিষদে প্রাণোপাসনার উপদেশ আছে।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ"—এখানে আত্মা হইতে আকাশ অর্থ ঠিক নহে। আত্মা নির্বিকার, তাঁহার বিকার হইতেই পারে না। এই হেতু আত্মা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে আকাশ ইত্যাদি এই প্রকার শ্রুতিসম্মত অর্থই গ্রাহ্য।

"প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি" (ছান্দোগ্য, ৫।১।১৫ এবং ৭।১৫।৪); "প্রাণই নামরূপের দ্বারা পরিজ্ঞাত মূর্ত পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অমূর্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সব হইয়াছে।" আমরা একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারি যে আমাদের চিন্তা, কল্পনা, ভাব (Ideas), ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, তথা লজ্জাঘৃণারাগদ্বেষাদি যাবতীয় সদসৎ প্রবৃত্তি, সবই প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহ বা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এ জগৎ যে প্রাণস্পন্দনের দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রাণস্পন্দনের দ্বারা সঞ্জীবিত, তাহা আমরা শ্রুতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি। কঠোপনিষদে আছে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" (২।৩।২), "সমস্ত জগৎ এবং যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই প্রাণস্পন্দনের ফলে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে স্পন্দিত হইতেছে।" শক্তির স্পন্দন দ্বারা যে কিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা প্রপঞ্চসারতন্ত্র হইতে জানিতে পারি। আর প্রাণস্পন্দনের উপরে যে স্থিতি (প্রাণরক্ষা) নির্ভর করে, তাহা আর আমাদিগকে কাহারও নিকট হইতে শিখিবার প্রয়োজন হয় না; প্রাণস্পন্দন থামিয়া যাওয়ার অর্থ যে মৃত্যু, তাহা কাহারও অজানা নাই। আমরা ইহাও বেশ জানি যে আমাদের প্রাণস্পন্দন যদি অসমভাবে বা অনিয়ন্ত্রিতরূপে হইতে থাকে, তবে তাহাও মারাত্মক হয়। সুতরাং জগতের সৃষ্টি এবং স্থিতির জন্য ঠিক তালে তালে এবং নিয়মিত ভাবে (Rhythmically) প্রাণের স্পন্দন হওয়া আবশ্যক। স্থূল সূক্ষ্ম অনন্তকোটী স্তরে প্রাণের এই Rhythmical Vibration দ্বারা, একই প্রাণতত্ত্ব অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্তকোটী নামরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

প্রাণদ্বারা যেরূপ ক্রম অনুসারে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহাও আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥" (১।১।৮); অর্থাৎ "সৃষ্টি-উপযোগী প্রণিধান বা পর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্ম উপচয়প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্ম হইতে অব্যাকৃত (গুণসাম্যাবস্থাপন্ন অবিভাজ্যমান) প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে প্রাণ,† প্রাণ হইতে মন, মন হইতে পঞ্চবিধভূত তন্মাত্রা (এবং তাহা হইতে স্থূলভূত); তাহা হইতে ভূরাদি লোকসমূহ উৎপন্ন হয়; লোকাধিবাসী মনুষ্য দ্বারা কর্ম কৃত হয়, কর্ম হইতে কর্মফল (অমৃত) সমুৎপন্ন হয়; (সেই সমষ্টি-কর্মফলই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ বা কারণ হয়,—এই প্রকারে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকে)।" ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যদ্ ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং তদনেন ক্রমেণ উৎপদ্যতে, ন যুগপদ্ বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ।" ব্রহ্ম হইতে এই ক্রমানুসারেই জগৎ সৃষ্ট হয়, একমুষ্টি কুল ছড়াইয়া দিবার মত একসঙ্গে নহে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে প্রাণ হইতে অমূর্ত মন, এবং মন হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূলতর মূর্ত পদার্থাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাণ হইতেই যে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহা প্রশ্নোপনিষদেও আছে: "স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ অন্নমন্নাদ্বীর্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ॥" (৬।৪)। এইরূপে প্রাণের উন্মেষাত্মক স্পন্দনে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হয়,

† ভাষ্যকার প্রাণ অর্থে 'হিরণ্যগর্ভ' বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভ প্রাণোপহিতচৈতন্য, আমরাও প্রাণকে চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া আসিতেছি। তাছাড়া কেহ কেহ প্রাণ অর্থে Vital Force বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

প্রাণ দ্বারাই তাহা বিধৃত থাকে; পুনরায় প্রলয়কালে প্রাণের নিমেষাত্মক স্পন্দনে বিলোমক্রমে স্বস্ব বিশিষ্টতা হারাইয়া সবই প্রাণে বিলীন হয়।

এই প্রাণশক্তি ভগবানের শক্তি, শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই, এই জন্য প্রাণকেও ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম) বলা হইয়াছে, যথা—"প্রাণো হ্যেষ আত্মা" (ব্রহ্মোপনিষদ্ ১); "যঃ এষ প্রাণঃ সা এষা প্রজ্ঞা · প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" (কৌষীতকী উপঃ)। "প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে" (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৯)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রাণকেই জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা-দেবাত্মশক্তি বলা হইয়াছে। যোগিবর শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "Prakriti is the WILL and EXECUTIVE POWER of Prusha. It is not a separate entity, but one and the same with Him." "প্রকৃতি পুরুষেরই ইচ্ছাশক্তি এবং কার্যকারিণী শক্তি; ইহা পুরুষ হইতে পৃথক্ নহে, পুরুষ এবং প্রকৃতি অভিন্ন।"

এই প্রাণ এবং চৈতন্য (জ্ঞান) দ্বারা যে কিরূপ সম্মিলিত ভাবে সৃষ্টিস্থিত্যাদি কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা আমরা গভীর অভিনিবেশ লইয়া সৃষ্ট যে-কোন পদার্থের অন্তর্নিহিত তথ্য পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি। যেমন ধরা যাক আমার সম্মুখে একটি ৭৫।৮০ ফুট উচ্চ আম্রবৃক্ষ আছে। মাটির ভিতরে উহার নূতন নূতন শিকড়গুলি (যাহা অতীব সূক্ষ্ম এবং এত কোমল যে স্পর্শ করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়) তদপেক্ষা বহুগুণ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে; এই প্রক্রিয়ার অন্তরালে যে শক্তিটি নিহিত আছে, তাহা অচিন্তনীয় নহে কি? দ্বিতীয়তঃ, মাটির ভিতর হইতে শিকড়গুলি রস আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ৮০ ফুট ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিতেছে। তৃতীয়তঃ সেই একই রস হইতে পাতার উপযুক্ত রস পাতাগুলিকে, ছালের উপযোগী কষায়-রসটুকু ছালকে, Silico-calcium-প্রধান রসটুকু কাণ্ডকে ইত্যাদি যথাযথভাবে বৃক্ষের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবেশন করিতেছে, ভুলিয়াও ফলের মিষ্ট রস ছালের ভিতরে বা কাণ্ডের প্রয়োজনীয় রস পাতার ভিতরে দিতেছে না। চতুর্থতঃ মাটির ভিতর হইতে উপাদান আনিয়া উহাকে সুগন্ধ পদার্থে, মধুতে পরিণত করিয়া তাহা প্রতিটি ফুলের ভিতরে এবং শর্করাপ্রধান রস প্রতিটি ফলের ভিতরে রাখিতেছে। পঞ্চমতঃ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকারের নব নব বৃক্ষসৃষ্টির জন্য অনুরূপ শক্তি পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ অঙ্কুরটি সাবালক না হওয়া অবধি তাহার জন্য খাদ্যটুকু পর্যন্ত আঁটির ভিতরে সঞ্চিত রাখিয়া কঠিন আবরণ-দ্বারা তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। এইরূপে প্রতিটি কার্য সুনিপুণভাবে সম্পাদিত হইতেছে, অনন্ত কোটি ক্ষেত্রে ইহা ঘটিতেছে, কিন্তু কোথায়ও কোন ভুলভ্রান্তি কিংবা ইতস্ততঃ ভাব নাই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ হইতে দেবতা পর্যন্ত সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের ভিতরেই নিয়ত এবম্বিধ চৈতন্যসমন্বিত প্রাণের কার্য—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তির লীলা বিদ্যমান; চৈতন্য-টুকুই আত্মা, এবং প্রাণ তাঁহারই জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি, চৈতন্য আশ্রয়, প্রাণ আশ্রিত। এই চৈতন্য এবং প্রাণ উভয়ই বিশ্বব্যাপী, উভয়ই এক এবং অদ্বিতীয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,"—বাহ্যদৃষ্টিতে নামরূপের যতই বৈচিত্র্য, যতই বিভিন্নতা থাক না কেন, তত্ত্বহিসাবে সবই এক, অভিন্ন।

শ্রুত্যুক্ত প্রাণপ্রসঙ্গ হইতে এইরূপে আমরা জানিতে পারি যে প্রাণ জগতে মাত্র একটিই; আপনার প্রাণ হইতে আমার প্রাণ বিভিন্ন নহে, বা আমার প্রাণ হইতে পশুপক্ষীতৃণলতাদির

প্রাণও ভিন্ন নহে। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণশক্তির একমাত্র উৎস পরমপুরুষ পুরুষোত্তম; আর ধাতুপরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা অবধি আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের যন্ত্র মাত্র। প্রকাশের পার্থক্য দ্বারা শক্তির বা তদধিষ্ঠান চৈতন্যের ভিন্নত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রাণের এই ঐক্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকেই প্রাণাত্মবিদ্ বলা হইয়াছে; ব্যষ্টিপ্রাণের সহিত এই বিশ্বব্যাপী প্রাণের তাদাত্ম্য উপলব্ধি দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ব্রহ্মশক্তয়ে প্রাণায় চ ওঁ॥

সোঽহম্

শ্রীগুরুদাস দাশ

মানব জনম লভিলে যখন
হ'যোনা মায়াব ভৃত্য,
আত্মজ্ঞানেব প্রদীপ জালিয়া
আলোকিত কর চিত্ত।

নিজেরে শুধাও - কোথা হ'তে এলে,
এ ধরায় কেন জনম লভিলে,
কোন্ সে অজানা দেশে যাবে পুন
কিবা আছে চিরসত্য ?

'আমি' কোন্ জন—দেহ, না অন্য ?
স্বরূপ তাহার কি,
মৃত্যুর পারে আর কিছু আছে ?
সার সত্যটি কি ?

এ বিশ্ব মাঝে এতো শৃঙ্খলা,
চালায় তাহারে কে ?
শুধু অচেতন শক্তি, নিয়ম,
অথবা চেতন সে ?

আপন স্বরূপ, বিশ্বস্বরূপ
ফুটিবে যখন মনে
দাস আর নাহি রহিবে জড়ের,
রাজা হবে সেইক্ষণে।

মানব জনম হবে সার্থক,
লাভ হবে অমৃতত্ব—
অসীমের সনে হবে একাকার,
বিশ্ব চলিছে নির্দেশে যাঁর
দেখিবে নিজেরে তাঁরি সাথে এক—
চির অবিনাশী তত্ত্ব।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ

স্বামী ভূধরানন্দ

বর্তমানে শিক্ষাসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইতেছে। উন্নতিমূলক উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হইয়া দেশে এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। জাতির উন্নতি সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করে শিক্ষার উপর। যে জাতির শিক্ষিতের সংখ্যা যত উচ্চ সেই জাতি তত উন্নত। ইদানীং শিক্ষার মান খুব উন্নত না হইলেও উহার উন্নয়নের নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। প্রয়োজনমত যোগ্য শিক্ষকের অভাব, যথাযোগ্য পুস্তকের অভাব, সর্বোপরি যথেষ্ট অর্থের অভাব ইত্যাদিও উপযুক্ত শিক্ষার প্রবর্তনের পথে অন্তরায় রহিয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সুনির্বাচিত না হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ নাই। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশিষ্ট মতানুযায়ী পাওয়া যায় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল চরিত্রবান, আত্মবিশ্বাসী এবং সমাজ ও দেশের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযুক্ত লব্ধবিদ্য 'মানুষ' তৈয়ারী করা, কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের উপযোগী বিদ্যায় ভূষিত করা নহে। চরিত্র গঠিত না হইলে লব্ধবিদ্য, তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি দ্বারাও দেশের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এজন্য অর্থকরী বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্রগঠনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের চিন্তাই ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়, এবং সংস্কারই চরিত্রের নিয়ামক। .সেজন্য চরিত্রগঠনে প্রয়োজন সচ্চিন্তার পরিবেশন। ধর্মের মাধ্যমে ইহা সহজে করা যায়। ধর্মকে বাদ দিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণও হয় না। কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—উহাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। ধর্ম বলিতে স্বামীজী বলিয়াছেন, "অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন," "যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে।"

শিক্ষার মাধ্যমে 'মানুষ' হওয়ার অর্থ, যে চরিত্রবান ব্যক্তি দেহ মন সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিয়া বিজ্ঞানাদির জ্ঞানে ভূষিত হইয়া জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়াব যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। এইরূপ শিক্ষা বিদ্যার্থীকে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সম্পন্ন কবিয়া তাহাব মস্তিষ্ক উচ্চ চিন্তা ও আদর্শে পূর্ণ করে, দুর্বল স্বার্থপর না করিয়া দৃঢ়নিষ্ঠ বলিষ্ঠ ও সাহসী করে, সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে শিক্ষা দেয়; শিক্ষা তাহার মজ্জাগত হইযা সংস্কারে পরিণত হয়।

প্রাচীন কালের গুরুগৃহে শিক্ষার মধ্যে এই 'মানুষ' গড়িবার দিকটিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইত। অভিভাবকগণ বালকদের গুরুগৃহে পাঠাইতেন। সেখানে ব্রহ্মচর্যব্রত, সেবা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং বিশেষ করিয়া জ্বলন্ত পাবকসদৃশ আচার্যের জীবনের সংস্পর্শে যুবকগণ বহুবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিমল চরিত্রেরও অধিকারী হইয়া সমাজে ফিরিয়া আসিত। শুধু যে তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষাই দেওয়া হইত তাহা নহে, জাগতিক বিদ্যাও দান করা হইত; 'পরা' ও 'অপরা' উভয় বিদ্যাই। চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্রনির্মাণ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার তখন প্রভূত

উন্নতি হইয়াছিল। আচার্যগণই বিদ্যার্থিগণের সব ব্যয়ভার বহন করিতেন। বিবিধাকার দানের মাধ্যমে সমাজ আচার্যগণকে এ বিষয়ে সহায়তা করিত।

গুরুগৃহগুলির পরিবেশও ছিল বিদ্যার্থীদের জীবনগঠনের অনুকূল। লোকালয় হইতে দূরে মনোরম অনাড়ম্বর পরিবেশে উহা স্থাপিত হইত। মনের একাগ্রতা সাধনের জন্য এরূপ পরিবেশ অপরিহার্য।

একাগ্র মন এত শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহা দ্বারা অনায়াসে এবং স্বল্প সময়ে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়। মন একাগ্র না হইলে, সুষ্ঠুরূপে মনোযোগ দিতে না পারিলে অধ্যয়ন কোন অবস্থায় সন্তোষজনক হয় না। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্যসংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে নূতন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া আমি মোটেই মাথা ঘামাইতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম, তারপর এভাবে গঠিত নিখুঁত যন্ত্রসহায়ে খুশিমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করিবার ক্ষমতাবর্ধনের শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত।" গুরুগৃহে গুরুর পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে বিদ্যার্থীদের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই পবিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হইত। শিক্ষায় অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইত বিদ্যার্থীর অন্তরস্থ জ্ঞানের উন্মেষের পথের বাধাপসারণে, সুযোগ্য মালী যেরূপ নির্দিষ্ট চারাগাছটিকে উহার পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য বেড়া ও সার দিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, পর্যাপ্ত বারি সেচন ও বৃহৎ বৃক্ষের আচ্ছাদন হইতে রক্ষা করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করে, উপযুক্ত অভিজ্ঞ গুরুও তদ্রূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিষ্যকে তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথের প্রতিবন্ধ অপসারণের ও অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের বা দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, প্রয়োজন অনুরূপ খাদ্য-ব্যবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সম্পাদনে যত্ন এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহসেচন ও স্বাধীনতাদান করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

অভিজ্ঞ আচার্যের তত্ত্বাবধানে প্রায় দ্বাদশবর্ষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য জাগ্রত আত্মপ্রত্যয়-সহ দেবোপম চরিত্রের অধিকারী হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমনের অভিলাষ গুরুকে নিবেদন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তিনি এইরূপ আশীর্বচন উচ্চারণ করিতেন, 'উঠ বৎস, সাহস অবলম্বন কর, বীর্যবান হও, সমুদয় দায়িত্ব আপনার স্কন্ধে লও—জানিয়া রাখ তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃজনকর্তা। তুমি যাহা কিছু বল বা সহায়তা চাও তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে।'

অর্জিত জ্ঞানকে সংস্কারে পরিণত করিয়া পূর্ণ মানুষ তৈয়ার করিবার রীতি তখনকার আচার্যগণ জানিতেন। সমাজ তখন এইরূপ চরিত্রবান মানুষ দ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রাচীন কালের এই শিক্ষাব্যবস্থাই ভারতের জাতীয় শিক্ষার মূলভিত্তি। দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার নানারূপ গলদ ও শিক্ষিতগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং পূর্বোক্তরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির পুনরায় প্রচলনে দেশের সকল রকমে উন্নতি হইবে মনে করিয়া ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে দেশবাসীকে

আহ্বানপূর্বক বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস— গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া গুরুগৃহ-বাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না।"

বর্তমান কালে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সহিত প্রাচীনকালে এই গুরুকুলপ্রথার যথাসম্ভব সংমিশ্রণ সাধন করিতে হইবে—সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানাদি জাগতিক শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে চরিত্রবলেও বলীয়ান হইয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া অপর দেশের যে শিক্ষা উৎকৃষ্ট ও হিতকারী বিবেচিত হইবে তাহা নিজেদের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ধ অনুকরণ কখনো কল্যাণজনক হইবে না।

ব্রহ্মচর্যের প্রতি বিদ্যার্থিগণের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। সংযমই সকল শক্তির উৎস—এটি তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যোগীরা বলেন মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে, যাহার মস্তিষ্কে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়। ইহাই ওজো-ধাতুর শক্তি।·· কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন।" ছাত্রগণের হৃদয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি, ভারতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের চর্চা, এবং ছাত্রদের ধর্মজীবন গঠনে প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে।"· "আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি।"· "আধ্যাত্মিকতাই জীবনের অন্যান্য কার্যসমূহের ভিত্তি। আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সবলতা সম্পন্ন মানব যদি ইচ্ছা করেন অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন, আর মানুষের ভিতর আধ্যাত্মিক বল না আসিলে, তাহার শারীরিক অভাবগুলি পর্যন্ত ঠিক ঠিক পূরণ হয় না।" (শিক্ষাপ্রসঙ্গ)।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন গুরুকুলপ্রথার সহিত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয় চাহিয়া-ছিলেন। আধুনিক যুগের সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে যাহাতে চরিত্রবলে বলীয়ান—যথার্থ "মানুষ" করিয়া তোলার শিক্ষাও দেওয়া হয়, তাহা তিনি চাহিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণমিশনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বামীজীর সেই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপায়িত করিবার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সময়ে দেশে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি অল্প। তাছাড়া মনোমত প্রতিষ্ঠানগঠনে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বহুবিধ বাধাও রহিয়াছে। তথাপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যাহাতে স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া তোলা যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। ছেলেদের যথার্থ শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। শুধু অর্থকরী বিদ্যালাভই নয়, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য, দেশের ও সমাজের যথার্থ কল্যাণকারী হইবার জন্য আরো যে সব যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা সবই পরিবেশন করার আয়োজন প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

ইহার জন্য বর্তমানে কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া মনে হয় অসম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িবার সময় তাহা করা যায়, স্কুলের জন্য তো বটেই।

ইহার জন্য, বলা বাহুল্য, শিক্ষকদের নিজের জীবন ও আচরণের দিকে সর্বাগ্রে নজর দিতে হইবে। নিজের আচরণে যদি আদর্শের বিপরীত হয়, তাহা হইলে ছাত্রগণকে আদর্শনিষ্ঠ করানো সম্ভবপর নহে।

আদর্শনিষ্ঠ, সহানুভূতিশীল শিক্ষকের সংস্পর্শে ছাত্রগণ যত অধিক সময় কাটাইতে পারে ততই ভাল। সেজন্য শিক্ষায়তনগুলি আবাসিক হইলেই সবচেয়ে ভাল হয়। উহা সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃ অর্ধ-আবাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে ছাত্রগণ সকালে যাইয়া শিক্ষকগণের সহিত সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতে পারে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। সকালে ও বিকালে ক্লাস করিতে পারিলেই ভাল। দ্বিপ্রহরে ছাত্রগণের আহারের ও বিকালের জলযোগের আয়োজন শিক্ষায়তনের মধ্যেই থাকিবে। বর্তমানে প্রচলিত 'ডে-ষ্টুডেন্টস হোম'গুলির অনুকরণে ইহা করা যায়, ছাত্রগণ স্বল্পব্যয় বহন করিবে, বাকী ব্যয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বহন করিলেই ভাল। অবসর-সময়ে পাঠের সুবিধার জন্য লাইব্রেরীও সেখানে থাকিবে। খেলাধুলার মাঠ এবং ব্যায়ামাগারও থাকা চাই।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান সহরাঞ্চলে হইলে তাহা সহর হইতে ২।৩ মাইল দূরে কোন উন্মুক্ত অঞ্চলে হওয়া চাই। ফুলবাগান, সব্জিবাগান প্রভৃতির জন্য জমিও যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। ছাত্রগণ সেখানে অবসরকালে নিজেরা একটু আধটু বাগানের কাজ করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। সহজ, স্বাভাবিক ভাবে ছাত্রদের মনে আনন্দময় ভাব, সামান্য শারীরিক শ্রম, একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস, পবিত্রতা ও সর্বোপরি কিছু ধর্মভাব যাহাতে প্রবেশ করে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই আয়োজন সেখানে রাখিতে হইবে। একটি প্রার্থনাগৃহ একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের কার্যারম্ভের পূর্বে ছাত্রগণ যেখানে সমবেত হইয়া প্রার্থনা, ভজন ইত্যাদিতে কিছুক্ষণ কাটাইতে পারে। এই গৃহে ধর্মাচার্য-গণের আলেখ্য থাকিবে, প্রার্থনাদির সময় ধূপ জ্বালানো হইবে, ফুলদানিতে কিছু ফুলও থাকিবে। এমন একটি পরিবেশ হওয়া চাই, যেখানে প্রবেশ করিবামাত্র মন স্বতই শান্ত হইয়া আসে। অভ্যাস ছাড়া মনের মধ্যে কোন কিছুর ছাপ স্থায়ীভাবে দেওয়া যায় না।

এককথায়, যে গুণগুলি ছাত্রজীবনে অর্জন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, সেগুলিকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে নিয়মিতভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতক-গুলি সদভ্যাসের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। দৈনন্দিন কার্যসূচীতে সেগুলি থাকা প্রয়োজন। অথচ সর্বদা নজর রাখিতে হইবে, ছাত্রেরা যেন কখনও ভাবিবার অবসর না পায় যে তাহাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হইতেছে। সহানুভূতিশীল শিক্ষকগণের সহিত কেবল পড়াশুনার সময় নয়, খেলাধুলা, প্রার্থনা, গল্পগুজব প্রভৃতির সময়ও মেলামেশার ফলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বন্ধন দৃঢ়তর হইবে, এবং ছাত্রগণ অনুভব করিতে পারিবে যে তাহারা যাহা শিখিতেছে তাহা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। এরূপ হইলে শিক্ষা 'মানুষ' তৈয়ারীর উপযোগী হইবে।

ছাত্রগণের আবাস হইতে দুইতিন মাইলের মধ্যে শিক্ষায়তনগুলি রাখিতে পারিলে আরো একটি সুফল হইবে; ছাত্রগণ সকালে সেখানে হাঁটিয়া যাইতে ও বিকালে হাঁটিয়া ফিরিতে পারিবে। অধিকাংশ ছাত্রকে খাওয়ার পরই হাঁটিয়া অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে হয়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

লাইব্রেরীতে সর্বধর্মের মহাপুরুষদের, বড় বড় দেশনেতা, সাহিত্যিক প্রভৃতির জীবনী এবং আলেখ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

মনে হয়, আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইলে আমরা এভাবে বা উন্নততর অন্য কোন উপায়ে ছাত্রগণকে অর্থকরী বিদ্যালাভের সহিত চরিত্রবলেও বলীয়ান করিয়া তুলিয়া দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে পারিব।

পরলোকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ১৬ই এপ্রিল, ১৯৬৬, শনিবার বিকাল ৫টা ৩২ মিনিটের সময় দেশনন্দিত শিল্পসাধক, নন্দলাল বসু ৮৩ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে তাঁহার নিজস্ব ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-যজ্ঞের এই অন্যতম প্রধান ঋত্বিকের দেহাবসানে শিল্পজগতের, বিশেষতঃ ভারতীয় চিত্রকলার যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে তিনি জন্মলাভ করেন, তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু তখন সেখানে কর্মব্যপদেশে বাস করিতেন।

দ্বারভাঙ্গাতে তাঁহার ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং ২০ বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ.এ পড়িবার জন্য মেট্রোপলিটনে (বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। কিন্তু শিল্পের প্রতি আকর্ষণের আধিক্য-হেতু পাস করা সম্ভব হইল না। শিক্ষার অন্যান্য বিভাগে পড়াইবার জন্য অভিভাবক-গণের চেষ্টাও ব্যর্থ হইবার পর তিনি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্-এ ভর্তি হন। অবনীন্দ্রনাথ তখন উহার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রাবলী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে অবনীন্দ্রনাথ প্রিন্সিপ্যাল ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যে প্রীত হন। স্কুলে এবং পরে বাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথের নিকটই তিনি শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত তাঁহার বহু চিত্র প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এই সময় ভগিনী নিবেদিতা একদিন আর্টস স্কুলের এই তরুণ শিল্পীর চিত্রনৈপুণ্যে বিশেষ আকৃষ্ট হন। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বতোভাবে পুনরুজ্জীবনের জন্য ভগিনী নিবেদিতা যে বিষয়ে যাঁহাকে উন্নতির সহায়ক দেখিতেন, তাঁহাকেই যথাসাধ্য সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দান করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্নিযুগের ঋত্বিকদিগকে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি যেভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই অসীম আগ্রহ লইয়া ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনু-প্রেরণা দান ও সহায়তা করিয়াছিলেন নন্দলাল বসুকে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি লেডি হেরিংহাম অজন্তা গুহার চিত্রগুলি নকল করিতে আসিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতাই সে সময় নন্দলাল বসুকে সেখানে পাঠাইয়া দেন তাঁহার কাজে সহায়তা করিতে। নন্দলালবাবুর সহকর্মী অসিত হালদারও তাঁহার সঙ্গে যান। ভগিনী নিবেদিতার নিকট তিনি নানাভাবে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, পরজীবনে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি পুনঃপুনঃ সে কথার উল্লেখ করিতেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর কলাভবনে যোগ দিবার পর শান্তিনিকেতনের সহিত নন্দলাল বসুর আত্মীয়তা গভীর হইয়া উঠে এবং এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সেখানেই তিনি স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন,

কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। শান্তিনিকেতনের কলাভবন তাঁহারই কীর্তি বহন করিতেছে। বহু বিদেশাগত ছাত্র এখানে ভারতীয় ছাত্রদের সহিত ভারতীয় শিল্প শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে তিনি ভালবাসিতেন গভীরভাবে, স্বাধীনতা দিতেন তাহাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। কলাভবন ও শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহার স্মৃতি নিবিড় ভাবে বিজড়িত।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত চীন, জাপান, মালয় ও ব্রহ্মদেশ ঘুরিয়া আসেন, এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত যান সিংহলে।

মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লবণআইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি ভারতশিল্পের প্রদর্শনী সজ্জিত করেন।

ভারতীয় শিল্পে তাঁহার অতুলনীয় অবদানের জন্য ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন, বিশ্বভারতী তাঁহাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন কিছুকাল পরে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি. লিট.' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভগিনী নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত নিবিড় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরের মন্দিরটি তাঁহার পরিকল্পিত। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিপূত মাটির ঘরগুলিকে ঠিক সেই ভাবেই রক্ষা করিয়া, এবং সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই তিনি মন্দিরটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কামারপুকুরের কথা উঠিলেই তিনি উহাকে তাঁহার পরমতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিতেন। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বেদী এবং উহার পৃষ্ঠপট, মন্দিরগাত্রের নবগ্রহের মূর্তি প্রভৃতি বহু অঙ্গ তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিতও তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত বহু পুস্তকের প্রচ্ছদপট এবং উদ্বোধন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলির বহু চিত্রাদি তিনি আঁকিয়া দিয়াছিলেন।

অনন্যসাধারণ গুণভূষিত হইয়াও তিনি অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর আচরণের সংস্পর্শে যাঁহারা একবারও আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট তাঁহার নিরহঙ্কার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত।

তাঁহার দেহাবসানে শিল্পজগতের ও বিশ্ব-ভারতীর যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। উদ্বোধন কার্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণও অপরিমেয়।

এই মহাপ্রাণ শিল্পাচার্যের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শিল্পচর্যায় শিল্পাচার্য নন্দলাল

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী

মর্মরিত শালবীথির ছায়ায় স্তব্ধবেদনায় নিথর হয়ে আছে কলাভবন। নিদাঘদিনের প্রখর দুপুরে লালধুলোর ঘূর্ণীহাওয়া তাকে ছুঁয়ে চলেছে বারে বারে—ফেলেআসা দিনের কত স্মৃতি বাতাসের ঐ উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় মথিত করে যেন বেরিয়ে আসছে। কত দিনের নিবিড় সম্পর্ক তাঁর সাথে! এই ভবনের অন্তরালে কত গ্রীষ্ম এসেছে ঘুঘুডাকা ক্লান্ত দুপুরে শ্রান্ত পথিকের রূপ ধরে, কত বর্ষা এসেছে মল্লার-রাগে নৃত্যপরা হয়ে, বাউলের একতারায় আগমনীর সুরে কত শরৎ বিধৃত হয়েছে রূপে রঙে, তুলির স্পর্শে সজীব হয়েছে সোনার ফসলে উপচেপড়া হেমন্তলক্ষ্মী, কুহেলী আবরণে নিজেকে ঢেকে প্রকাশিত হয়েছে শীতঋতু আর বিচিত্র সাজে কতবার কতভাবে মূর্ত হয়েছে চিরহরিৎ বসন্ত। শান্তিনিকেতনের এই শান্ত-পরিবেশে দিনের পর দিন আচার্য নন্দলাল একান্তে শিল্পদৃষ্টি তুলে ধরেছেন প্রকৃতির বিবর্তনের ছন্দলয়ের দিকে—মনের গভীরে প্রেরণা পেয়ে পুলকিত চিত্তে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন শিল্পচর্যার জোয়ারজলে। প্রাণ দিয়ে যা অনুভব করেছেন আবেগ দিয়ে তা নিঃশেষে প্রকাশ করেছেন তুলি ও বর্ণের অপরূপ বিন্যাসে, রঙের জগতে রূপের জগতে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করেছেন আপন আনন্দে বিভোর হয়ে। কল্পনার ভাবলোকে আরূঢ় থেকেও তিনি বাস্তব সংসারকে দূরে না রেখে তার সঙ্গে সংযোগসূত্র বেঁধেছেন অতি নিপুণভাবে। তাঁর শিল্পীসত্তা বাস্তব জীবনকে ঘিরে অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে প্রতিফলিত করেছিল সূর্যরশ্মির বর্ণসম্ভার; তাঁর বস্তুধর্মী চিত্রও তাই এক অদৃশ্য মায়ায় মনকে বাস্তবতার উর্ধ্বে নিয়ে যায়। বিশ্বপ্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ত স্পন্দিত হয়েছে তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টায়। বনানীর শ্যামলিমার মাঝে লালমাটির পথ বেয়ে যারা দলবেঁধে গান গেয়ে চলেছে তাদের উচ্ছলতা চিত্রের রেখাবন্ধনী ছাপিয়ে উঠে মনকে জানিয়ে যায় শিল্পী নিজেকে কতটা একাত্ম করে নিয়েছেন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, কত নিবিড় ভাবে অনুভব করেছেন গ্রামীণ জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্নাকে। সাঁওতাল পল্লীর নিতান্ত সাধারণ ঘটনাও দরদী-মনের ছোঁয়া পেয়ে রূপায়িত হয়েছে অপরূপ মহিমায়। জীবনের নাট্যমঞ্চের একপাশে বসে গেছেন শিল্পী রঙতুলি হাতে করে আর একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন—সাধারণ ঘটনাও সেখানে জীবন্ত তাৎপর্য নিয়ে অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

ঘনায়মান অন্ধকার দিনে গুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসাধনার যে দীপশিখাটি উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন তারই বিচ্ছুরিত আলোয় শিষ্য নন্দলাল দেখতে পেলেন শিল্পপরিক্রমার নূতন সরণী—নূতন দিগন্তের দিকচক্ররেখা ধীরে পরিস্ফুট হ'ল অপস্রিয়মাণ তমিস্রা ভেদ করে। রূপছন্দের অনুসরণ করে সুরু হ'ল পথচলা। অনির্বাণ শিখায় জ্বলে রইল সাধনার দীপটি আর তারই আলোয় শিল্পচেতনা ছুটে চলল অর্গলমুক্ত পথে বাধাবন্ধহারা। নিত্যনূতন শিল্পসম্পদ আহরণ করে চললেন চল্‌তি পথের দুধার থেকে, সৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠল অভিনব চিত্ররূপে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাব ও রীতি এসে মিলেছিল

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতির ভিতর কিন্তু উত্তর-সাধক নন্দলাল মনে প্রাণে সাড়া দিলেন প্রাচ্য-ভূমির শাশ্বত রূপকলার আহ্বানে—ভারতের ভাবগঙ্গার পেলব পলিতে অঙ্কুরিত হ'ল চারু-শিল্পের শ্যামল সম্ভাবনা। সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের হাতছানিতে সে অচিরে বিকশিত হয়ে উঠল রূপে রসে ছন্দে। প্রতীচীর শিল্পে অপার্থিব সৌন্দর্য প্রকাশের অবকাশ নেই, বস্তুজগতের অপরূপ ব্যঞ্জনা সেখানে রূপে রঙে বিধৃত হয়ে আছে। অথচ চোখের দেখা ছাড়িয়ে মনের গভীরে একান্ত নিভৃতে শিল্পের রসাস্বাদনে বিভোর থাকা ভারতের আবহমানকালের ঐতিহ্য। প্রাচীন ভারতের শিল্প তার সকল শিল্পকর্মে অরূপের বাণী চিরদিন বয়ে এনেছে রেখার বন্ধনে, রঙের আভাসে, ভাস্কর্যের ভঙ্গীতে আর স্থাপত্যের উৎকর্ষে। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের এই ইন্দ্রিয়াতীত আবেদনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই প্রতীচ্যের প্রভাব কাটিয়ে তাঁর শিল্প যাত্রা করেছিল প্রাচ্যরীতির অভিযানে। গুরুর এই অভিযানকে নিজ শিল্পশৈলীর দিশারী-রূপে নন্দলাল বরণ করে নিয়েছিলেন—রেখার সাবলীল ছন্দকে মনোনীত করেছিলেন ভাব-প্রকাশের অন্যতম মধ্যম হিসাবে।

ভারতীয় চিত্রকলার শিল্পৈশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে প্রেরণা লাভের উৎসমুখে কল্যাণীমূর্তিতে দাঁড়িয়ে নন্দলালকে দিনের পর দিন উৎসাহ দিয়েছেন ভারতকল্যাণে নিবেদিত-প্রাণা ভগিনী নিবেদিতা। কালের যবনিকার অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা ভারতসংস্কৃতির গৌরবময় শতাব্দীগুলি দুর্নিবার আকর্ষণে নিবেদিতাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য-সৌধের সিংহদ্বারে—অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন আস্তীর্ণ স্মারকপ্রান্তে। তাঁর ক্লান্তদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'ল আগামী ভারতের নবরূপ—শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপর যার ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। ভাবী জাগৃতির আগমনপথ সুগম করতে তাই তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। শিল্পসংস্কৃতির পুনর্জাগরণে অবনীন্দ্রনাথকেও তিনি অনুপ্রাণিত করেন। নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় নন্দলালও ভারতীয় ভঙ্গীতে নিজস্বভাবে চিত্রকৃতি সুরু করেন। জননীর মমতায় ঘিরে, অকৃত্রিম স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত করে নিবেদিতা নন্দলালকে নিয়ে গেলেন ভারতীয় চিত্রকলার চিরায়ত সৌন্দর্যের বেদীমূলে—চিরসুন্দরের উপাসনার সংকল্প নিয়ে নন্দলাল নিবিষ্ট হলেন শিল্পসাধনায়। তাই অজন্তার ভিত্তিচিত্রের অনুকৃতি করতে বসে তিনি আবেগবিহ্বল চিত্তে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন, বিচিত্র চিত্ররাজি তাঁর শিল্পীসত্তায় ঝংকার তুলে আনন্দতানে মেতে উঠল; মুখর অতীত রূপরসের বরণডালা সাজিয়ে নবীন অতিথিকে অভিনন্দিত করে নিয়ে গেল নন্দনসৌধের মণিকুট্টিমে—শিল্পীমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল চিরকালের জন্য। সেই উচ্চ সৌধশিখর থেকে তিনি দেখতে পেলেন জাগ্রত শিল্পচেতনার সুদূরবিস্তৃত পরিধি। নবোদ্যমে প্রাণবন্যাধারায় প্লাবিত করলেন ঊষর শিল্পক্ষেত্র, দিকে দিকে জেগে উঠল নূতন প্রাণের স্পন্দন—পুনরুজ্জীবনের দোলায় হিল্লোলিত হ'ল ভারতীয় শিল্পকলা, সার্থক হ'ল নিবেদিতার স্বপ্ন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিবেদিতা নন্দলালকে নিয়ে গেলেন সনাতন ভারতের আত্মিকরূপের সংস্পর্শে, অন্তর্দৃষ্টির বিমল আলোয় নন্দলাল বিভোর হয়ে দেখলেন সেই বিভাসিত রূপটি।

অধ্যাত্মচিন্তার আবেষ্টনে সকল কর্মপ্রচেষ্টায়

ছন্দোবদ্ধ ভাবটি ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল শিল্পীর অন্তরে দীর্ঘমূল বিস্তার করে—উত্তরকালে তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তপ্রকরণে রূপের প্রদীপ দিয়ে আরতি করে চললেন অপরূপের মানসমূর্তি। আত্মনিবেদনের সুরটি অন্তরে ধ্বনিত হয়ে অভিব্যক্ত হ'ল ভক্তিরসনিষ্যন্দী তুলির রসধারায় বিচিত্র বর্ণপ্রলেপে রেখার সৌকর্যে আর রূপের মধুরিমায়। রূপের পূজারী ক্রমে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে রূপাতীতলোকের দ্বারদেশে উপনীত হলেন—মঙ্গলজ্যোতির উদ্ভাসিত আলোকে সুন্দরের সোপান অতিক্রম করে আশ্রয় পেলেন সত্যসুন্দরের পদপ্রান্তে। সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্ময়বপু পুরুষের সৌন্দর্যচ্ছটায় ভাস্বর হয়ে একে একে প্রকাশিত হ'ল আচার্যের পৌরাণিক চিত্রাবলী। মহাযোগী শংকরের রূপসৃষ্টির আবেদনে তাই মিলেছে অভ্রভেদী শৈলশিখরের গাম্ভীর্য আর নীলাম্বর গভীর ব্যাপ্তি, বর্ণবিন্যাসে ফুটেছে ভিখারীর রিক্তসৌন্দর্য। রূপলাবণ্য যোজনায় শিল্পী প্রতিপদক্ষেপে প্রকাশ করেছেন ভারতের চিরকালের শ্রদ্ধানত ভাবটি এবং সেইজন্যই আচার্যের তুলির স্পর্শে প্রতি দেবচরিত্র বা মহামানবচরিত্রই দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে মহিমোজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে। কল্পনার মন্দাকিনীতে অবগাহন করে পৌরাণিক চিত্র মাত্রই অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় উঠে এসেছে রসোত্তীর্ণ সৈকতভূমিতে নবোদিত সূর্যের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য অঙ্গে ধারণ করে।

অন্তহীন যাত্রাপথে মহাকালের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে অগণিত প্রাণের আবর্ত সৃষ্টি করে, তারই প্রবাহে আজ আনন্দসাগরে যাত্রা করেছে শিল্পাচার্যের মুক্ত আত্মা। বসুন্ধরার কোলে সেখানে যখনই অসীম আশা নিয়ে শিল্পীমন বিকশিত হয়ে উঠবে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে শিল্পী যখন যথার্থই নিজেকে উৎসর্গ করবে শিল্পসাধনার বেদীমূলে, ঊর্ধ্বলোক থেকে আচার্যের আশিস্‌ধারা নেমে এসে শিল্পীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে চরমপ্রাপ্তির লক্ষ্যে -শিল্পের হবে অমৃতসাগরে উত্তরণ।

শ্যামাসঙ্গীত

(সুর—রামপ্রসাদী)

শ্রীসুধীরকুমার দাস

বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ,
আমি শরণ নিলাম সেই চরণে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

যা করছি মা মর্ত্যলোকে
সব কিছুই মা দিলাম তোকে
আপনার বলতে রইলো শুধু
ওই চরণের শরণ মনে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

(আমি) বিশ্বজনে বলবো ডেকে,
তোরা দেখে যারে আমার মাকে,
মা বসে আছেন আলো করে
সবার হৃদি-সিংহাসনে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

সমালোচনা

Parliament of Religions (1963-1964) Published by Swami Sambuddhananda, Secretary, Swami Vivekananda Centenary, 163, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta 14. Pp 409+xvi. Price Rs. 18/-.

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত Parliament of Religions স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। স্বামীজীর উদাত্ত বাণীর মধ্যে মানবসমাজ সেদিন ধর্মসমন্বয়ের গভীর সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ধর্মসমন্বয়ের মহাবাণীই যে মানবজাতিকে যথার্থ ভ্রাতৃত্বের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এ তত্ত্ব মানুষ সেদিন নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল।

সেই ধর্মমহাসভার অবিস্মরণীয় কাহিনীকে মানস-নেত্রের সম্মুখে রাখিয়া স্বামীজীর জন্মশত-বার্ষিকীতে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাস পর্যন্ত একটি ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। এই ধর্মমহাসভায় যে-সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল সেগুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি Parliament of Religions নামক একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তা ও মননশীলতার জগতে এই সঙ্কলন-গ্রন্থটি একটি বহুমূল্য সম্পদ।

ধর্মসমন্বয়ের জগতে স্বামীজীর অতুলনীয় ভূমিকার উপর এই গ্রন্থে নানা দিক হইতে বিভিন্ন মনীষিগণ উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিয়াছেন। বিভিন্ন রচনাগুলির দীপ্তিতে স্বামীজীর বিরাট ও বহুমুখী প্রতিভার একটি মহৎ আলেখ্য পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ-কথায় তাই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার অভ্রান্ত-ভাবেই বলিয়াছেন—"It is needless to add that the towering personality of Swami Vivekananda emerges out of all these discourses as the great guide of the future of humanity."

গ্রন্থটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি (সম্প্রতি-লোকান্তরিত) স্বামী মাধবানন্দজীর ও শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতির ভাষণ ব্যতীত ৫৮টি রচনা স্থান পাইয়াছে। রচনাগুলি চিন্তাশীলতা ও ওজস্বিতার দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মসমন্বয় যে কেবল একটি পবিত্র সঙ্কল্পমাত্র নহে, তাহার যে একটি গভীর তাৎপর্য আছে, স্বামীজীর বাণীর আলোকে বহু মনীষী এই গ্রন্থে তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্মসমন্বয়ের প্রকৃত অর্থ, প্রত্যেক ধর্মই আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানুষের ধর্ম-জীবনকে পুষ্ট করিবে।

স্বামী মাধবানন্দজীর ভাষণে সকল ধর্মের এই প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে —"The religion of the less advanced tribes is as much religion as that of more civilized communities."

শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রশান্ত-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতায় ভাস্বর একটি মনোজ্ঞ রচনা। তাঁহার একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য। ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে শ্রীমুখোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদীপ্ত ভাষণে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন —"The emphasis on inner life has therefore to be re-established, for the

very practical reason to bring order in the outer life. The principle of the one who experiences the inner life is to become all things to all men throughout his life. ·· He promises sincerity, he commands trust, he spreads goodness and gives the impression of God and truth and spreads it everywhere. His every act is a meditation and worship."

জীবন-তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাতারূপে স্বামীজীর অসামান্য ভূমিকার বিশ্লেষণে দুইটি অসাধারণ প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধদুইটি Mrs. Maria Burgi লিখিত Western and Indian Minds' structure and Vivekananda এবং Science and Vivekananda. প্রথম প্রবন্ধে Madam Burgi দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্পর্কে দ্বৈততত্ত্বের সমস্যা কেমন করিয়া স্বামীজীর দর্শনব্যাখ্যার মধ্যে তাহার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছে। Mrs. Burgi বলেন—"It is the problem of contradictions as explained in the Maya doctrine by Vivekananda which reveals to us, Westerners, the characteristic Indian ontlook of philosophy. ···Indian metaphysics constitutes a method and in order to help us to transcend opposition and to do it 'here and now' it asks us to follow different paths adapted to the temparament of each one of us—actif, affectif, reflectif. Different paths are the Yogas which Vivekananda exposes to the West with an unsurpassable clarity for us and mind's austerity."

Science and Vivekananda প্রবন্ধে Mrs. Burgi ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিজ্ঞান তাহার সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা চরম সত্যের সম্বন্ধে যে তত্ত্বের আভাস পাইতেছে স্বামীজী বিজ্ঞানের এই পরিণতির সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁহার অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন।

Mrs. Burgi-র মতে "In the gross, mechanical materialism of our environment Swami Vivekananda, profoundly rooted in the spirit of Advaita Vedanta was able to foresee the dawn of a new Era and to point the way to a new epoch This prophet of titanic strength and superhuman courage raised his voice to give spiritual expression to the new perspectives of the West. আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে সাম্প্রতিক আবিষ্কার স্বামীজীর প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তকে কি বিস্ময়কররূপে সমর্থন করিতেছে এ প্রবন্ধটি পাঠ না করিলে তাহা অনেকের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। Mrs. Burgi তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে এই স্মরণীয় উক্তি করিয়াছেন—"Vivekananda came to the West to attest the strength and the significence of life's non-manifested power His presence among us was like a guiding beacon of power and of light, which the benevolent Providence had seen fit to send us. He showed us the way to broader reality, away *from the suffocating workshops of* the Machine."

এই গ্রন্থের আরও অনেক মূল্যবান প্রবন্ধের পরিচয় পুস্তক-সমালোচনার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব নহে। দর্শন, বিজ্ঞান, স্বামীজীর প্রচারিত জীবনবাদ এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে এ গ্রন্থে যে সকল উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার তুলনা যথার্থই বিরল। স্থানাভাববশতঃ স্বামী রঙ্গনাথানন্দের Swami Vivekananda's Synthesis of Science and Religion, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদারের Universal Religion,

Gustav Mensching রচিত The Message of Swami Vivekananda, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের The Buddha, Sri Sankaracharya and Swami Vivekananda প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলির কেবল নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

বস্তুতঃ স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সার্থক আয়োজনটি কেবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিঃশেষিত হয় নাই। গভীর চিন্তা ও নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে স্বামীজীর বাণীর পুণ্য মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রার্থিত কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

—প্রেমবল্লভ সেন

স্মৃতি-সঞ্চয়ন : স্বামী তেজসানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ১৪৯, মূল্য—সাড়ে তিন টাকা। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষসংশ্রয়—বহুজন্মদুর্লভ এই সৌভাগ্যত্রয়ের মিলিত আস্বাদে পরিপূর্ণ 'স্মৃতি-সঞ্চয়ন' সাম্প্রতিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা-জগতে অনন্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগীরথীর পুণ্যোদকস্পর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের জীবন-ধারায় প্রবাহিত হয়ে তাঁর অন্তর্জীবনে যে অমৃতসঞ্চয় রেখে গেছে, অতীত-স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তারই কিছু অংশকণা তিনি পাঠকদের উদ্দেশে প্রকাশ করেছেন। 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় প্রকাশকালে এই স্মৃতি-চিত্রগুলি পাঠকসমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেকথা আজও অনেকেরই মনে আছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সেই স্মৃতি-চিত্র-চতুষ্টয়ের সঙ্গে জীবনীচিত্রও সংযোজিত হওয়ায় দিব্যজীবনের পটভূমিতে স্মৃতির উজ্জ্বলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ—এই চারজন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রকাশে চিরায়ত সাহিত্যের সংযম, গভীরতা ও ওজোগুণ-মণ্ডিত ভাষা বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সেই সঙ্গে পাঠকের অন্তরে অধ্যাত্ম-আগ্রহের উদ্দীপনেও এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। পরম-শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর লিখিত ভূমিকায় আছে—"দেবপ্রতিম এই সব মহা-পুরুষদের সান্নিধ্যে আসিয়া যে-সকল ব্যক্তি ধন্য হইয়াছেন, নিঃসন্দেহে তাহারা সুকৃতিবান। ইঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতিতে অবশ্যই মহা-পুরুষদের পবিত্র সৌরভ ভরিয়া থাকে—আর সে সৌরভে অন্যরাও আমোদিত হয়। বর্তমান স্মৃতি-পুস্তিকাখানিরও প্রকৃত মূল্য এইখানে।" উদ্ধৃত মন্তব্যসম্বন্ধে পাঠকমাত্রেই একমত হবেন। এ বই একবার পড়ে বহুবার পড়তে ও ভাবতে ইচ্ছা জাগবে। বলা বাহুল্য, খুব কম বই সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে।

সমগ্র গ্রন্থের স্মৃতিসৌরভ যে প্রশান্ত লাবণ্যে এ গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে বিধৃত, তার জন্য প্রচ্ছদ-শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী আমাদের আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা, সৌন্দর্য ও রুচির সমন্বয় বিশেষ প্রশংসনীয়।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মুক্তধারা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [সংস্কৃতানুবাদ : অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সাহিত্যশাস্ত্রী] ১৩২।৫, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা ৩১। মূল্য—পাঁচ টাকা।

ভারত-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভাষা একহিসাবে সমার্থক। সংস্কৃতের ধ্রুপদী পটভূমি না থাকলে

এ দেশের জীবন, মনন, সাহিত্য বা সাধনা কোনটিই সম্পূর্ণতা পায় না। সংস্কৃত অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা, বর্তমান ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাব-উৎস। ভাষাশাস্ত্রের পণ্ডিতমণ্ডলী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের মূলান্বেষণে 'সংস্কৃত'-চর্চার দ্বারাই সবচেয়ে লাভবান হয়েছেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের সব সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড়ো কারণ সংস্কৃতের বিপুল ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য। স্বাভাবিকভাবেই, সংস্কৃতের এই বহুযুগব্যাপী ধারণীশক্তি লক্ষ্য করে একালের বিদ্বন্মণ্ডলীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ রাষ্ট্রভাষার বিরোধ নিরসনে সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর নানা ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে সংস্কৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখিত। বিশেষতঃ তাঁর পরিকল্পিত ও আংশিক-লিখিত India's message to the World' গ্রন্থের সূচনায় ভারতবর্ষের ভাষাগত ঐক্যসম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য আজকের দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষাসমস্যার) একমাত্র সমাধান।"

কোন বিশ্রুতকীর্তি লেখকের রচনাকে সংস্কৃতে অনুবাদের অর্থ সর্বভারতীয় ভাবলোকের সঙ্গে তার সংযোগ-সাধন। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তো সংস্কৃতানুবাদের ক্ষেত্রে সে হিসাবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেখক। আধুনিক বাংলায় সংস্কৃতের সবচেয়ে সার্থক প্রভাবের নিদর্শন রবীন্দ্ররচনাবলী। ভাষার নিজস্ব প্রতিভার সঙ্গে কবিব্যক্তিত্বের অলৌকিক ব্যঞ্জনায় মিশে রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলার কবি, তেমনি সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী এর আগেই রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অনুবাদ করে সুধীজনের প্রীতি অর্জন করেছেন। তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকের সুন্দর সাবলীল অনুবাদটিও সহৃদয় সাহিত্যানুরাগীদের প্রশংসাধন্য হবে, সন্দেহ নেই। অনুবাদ মূলানুগ, অথচ অনুবাদকের অনায়াস-নৈপুণ্যে মূলরচনার সৌরভ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ। 'মুক্তধারা' নাটকের বন্ধনমুক্তির আদর্শ সর্বভারতীয় সংস্কৃতের স্পর্শে নবীনতর সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে, বাংলা মূলরচনায় সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার দেশজ সারল্য সংস্কৃত অনুবাদে রক্ষা করা কঠিন। সেদিক থেকে সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত সংলাপ-প্রয়োগের কৌশল আরো সহায়ক হ'তে পারে।

এ যুগের বঙ্গসংস্কৃতিকে যাঁরা সংস্কৃতভাষার পুণ্যগঙ্গোদকে অভিষিক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অন্যতম পুরোধারূপে 'মুক্তধারা'র অনুবাদক অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী আন্তরিক অভিনন্দনযোগ্য। সংস্কৃতে রূপান্তরিত মুক্তধারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গ্রন্থাগারসমূহের সম্পদ বৃদ্ধি করুক—এই প্রার্থনা।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬৪তম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য:

(১) অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ১৩৬। ২,৩৫২ জন রোগীকে ভরতি করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৮৬১ জন আরোগ্য লাভ করে। ৭৮৬ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। দৈনিক গড়ে ৯৫টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। গঙ্গার ঘাট ও রাস্তা হইতে আনিয়া ৩৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

(২) বাহিরের রোগীর চিকিৎসা-বিভাগে (শিবালা-শাখাসহ) ৫৭,৭০২ জন নূতন এবং ১,৭৪,৫৯৪ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। রোগীর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৬৩৭। এই বিভাগে মোট ৪,৩৬৭টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় এবং ৩৯,৩৬৭টি ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

(৩) বৃদ্ধ ও আতুর নিবাসে—যাহাদের কোন সংস্থান নাই এইরূপ ১৩ জন পুরুষ ও ২৩ মহিলাকে রাখা হইয়াছিল।

(৪) সাহায্যদান বিভাগ হইতে ১০৫ জন অসহায় ও বৃদ্ধ মহিলাকে মাসিক আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,১৪৪'২৫ টাকা।

(৫) সাময়িক ও বিশেষ সাহায্য-বিভাগ হইতে বিপন্ন ১০৭ জন ভ্রমণকারীকে খাদ্য বা অর্থ সাহায্য করা হয়, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১,৪৩৫'৯৩ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৩০১'৩৩ টাকা মূল্যের ৭০টি কম্বল ও ধুতি বিতরণ করা হয়।

(৬) প্যাথলজি বিভাগে ৭,৯৮০টি নমুনা পরীক্ষিত হয় এবং এক্স-রে ও ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে ১,৬২৭ জন রোগীর পরীক্ষা করা হয়।

(৭) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর উদ্বৃত্ত তহবিলের আয় হইতে রচনা-প্রতিযোগিতা, শিশুদের বই ইত্যাদিতে ২৩১ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৩৯ জন দরিদ্র শিশুকে ১৬৮ খানি পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

(৮) আলোচ্য বর্ষে ২৫টি শয্যা সমন্বিত চক্ষু-বিভাগ খোলা হইয়াছে।

(৯) সেবাশ্রমের কর্মীদের সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে।

বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক সেবাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার অধিকাংশ কার্যই মিশনের ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, ভক্তবৃন্দও সেবাকার্যে অনেক সহায়তা করেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং সহৃদয় জনগণের সাহায্যে পবিত্র তীর্থ কাশীধামে এই সেবাশ্রমের মাধ্যমে নরনারায়ণসেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে।

খেতড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুগাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই প্রাসাদোপম ভবনটি ও অন্য একটি ভবন খেতড়ির রাজা বাহাদুর স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতি রক্ষাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশনকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে দান করেন। এই ভবনদ্বয়েই রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি মাতৃমন্দির (Maternity Home), একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। পাঠাগারে ৫০টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। ৩ হইতে ৭ বৎসরের শিশুদের জন্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে 'সারদা শিশুবিহার' নামে প্রাক্-প্রাথমিক নার্সারি স্কুল খোলা হইয়াছে। আশ্রমে নিয়মিতভাবে গীতা আলোচনা এবং সাময়িক উৎসব করা হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত-সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছিল :

নভেম্বর, ১৯৬৫ : আধ্যাত্মিক জীবনে খাদ্যের প্রভাব, চঞ্চল মনকে বশে আনা, সুখের সন্ধানে, জীবনে যাহা অবশ্যম্ভাবী।

ডিসেম্বর, '৬৫ : ফ্রয়েড ও বেদান্ত মতে স্বপ্নতত্ত্ব, যে জগতে আমরা বাস করি, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী, প্রকৃতিস্থ কে ?

জানুআরি, '৬৬ : মৌনাবলম্বনের শক্তি, বেদান্তের প্রয়োজন, জগতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী; ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার উপায়; যাঁহারা সবল তাঁহারাই ধন্য।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে উপনিষৎ আলোচনা হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা মার্চ বুধবার হইতে ৪ঠা মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২রা মার্চ বুধবার বৈকালে মহিলাসভায় নেতৃত্ব করেন স্থানীয় জজ সাহেবের পত্নী শ্রীযুক্তা নন্দরানী দেবী। তিনি ও বিশিষ্ট মহিলাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতি সভার অঙ্গ ছিল।

৩রা মার্চ বৈকালে স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ। তৎপর প্রবীণ উকিল শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, প্রফেসার শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সরকার, শ্রীতুষারকান্তি দেব, শ্রীনিত্যগোপাল দাস প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে।

৪ঠা মার্চ শুক্রবার মঙ্গলারতি, বেদস্তুতি, শ্রীশ্রীগীতাপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন ও রামায়ণ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। বৈকালে প্রায় ৪ হাজার লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৮ই এপ্রিল হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা-ভজনাদি দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জনসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ও তৎপত্নী শ্রীমতী শান্তি সেন "আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচার" সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

মহকুমাশাসক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, তমলুক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজদাস চৌধুরী এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী প্রভৃতিও ভাষণ দেন। পরে বেতার-শিল্পী শ্রীপূর্ণ দাস বাউল-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন ডক্টর সেনের সভাপতিত্বে আশ্রমের নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের অন্যান্য দিন শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী, শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুরশিল্পী ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে "সাবিত্রী-সত্যবান" সবাক চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাঁথি: গত ৮ই এপ্রিল হইতে দিবসত্রয়-ব্যাপী কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজাদি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, হরিনাম-সংকীর্তন, ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভার ব্যবস্থা ছিল। স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী মহানন্দ ও স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজ যুগোপযোগী ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় মহকুমাশাসক শ্রীদীপককুমার রুদ্র, সেকেণ্ড অফিসার শ্রীবিমলচন্দ্র মৈত্র, বি ডি. ও. শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার এবং অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ও ধর্মসভায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সভান্তে সুগায়ক শ্রীবেচু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিপদ কর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ২,০০০ করিয়া জনসমাগম হইত। ১০ই এপ্রিল রবিবার নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগত ১৫টি হরিসংকীর্তন সম্প্রদায়ের হরিনাম-সংকীর্তনে আশ্রমপরিবেশ আনন্দ-মুখরিত হইয়াছিল। তিন দিনে মোট প্রায় ৭,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ধুবড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

ধুবড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৩০শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, বাস্তুযাগ, সপ্তশতীহোম, শ্রীশ্রীকালীপূজা, ভজন, যাত্রাভিনয়, ধর্মগ্রন্থ-পাঠ ও ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী অনুপমানন্দ, স্বামী ইজ্যানন্দ, প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করাতে সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। সর্বসাধারণের অর্থসাহায্যে এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে এবং এজন্য প্রায় ৪২,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বগড়ীবাড়ীর শ্রীমতী সিন্ধুরানী চৌধুরাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তিটি গড়াইয়া দিয়াছেন।

উৎসবের শেষদিন প্রায় ৮,০০০ লোককে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

মিহির সেনের পকপ্রণালী অতিক্রম

কলিকাতার বিখ্যাত সাঁতারু ৩৬ বৎসর-বয়স্ক ব্যারিষ্টার শ্রীমিহির সেন গত ৬ই এপ্রিল বুধবার সকাল ৭টা ২৪ মিনিটের সময় পক প্রণালী অতিক্রম করিয়া প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

ভারত ও সিংহলের মধ্যে পকপ্রণালীর দূরত্ব ২২ মাইল। শ্রীমিহির সেনের এই পথ অতিক্রম করিতে সময় লাগে ২৫ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। তিনি ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ৫।৪০ মিনিটের সময় সিংহলের তালাইমান্নার নিকটবর্তী ওল্ড লাইটহাউসের নিকট হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের সংযোগের ফলে এখানে স্রোত খুব বেশী থাকায় মিহির সেনকে পকপ্রণালীর দূরত্ব ছাড়াও বেশী দূরত্ব অতিক্রম করিতে হয়। তিনি পকপ্রণালী অতিক্রম করিতে সমুদ্রের হাঙ্গর, বিষধর সর্প ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সম্মুখীন হন। পূর্ণিমার দিনে এই পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাকে প্রবল ঢেউয়ের সঙ্গে সারাক্ষণই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার সাফল্যের পিছনে ভারতীয় নৌবহরের কর্তৃপক্ষের ও স্থানীয় জেলেদের সহযোগিতা অনেকখানি কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কাজ করিয়াছে তাঁহার অদম্য দৃঢ়তা। যে পথ বারো ঘণ্টায় পার হইবার কথা ছিল, সে পথ পার হইতে লাগিয়াছে প্রায় ২৬ ঘণ্টা। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহাকে কি পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইতিপূর্বে শ্রীমিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বিশ্বের মধ্যে তিনিই প্রথম সাঁতারু, যাঁহার ভাগ্যে 'ডাবল্' লাভ অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল ও পকপ্রণালী অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। ইংলিশ চ্যানেল ও পক প্রণালী পার হওয়ার দ্বৈত কীর্তির অধিকারী বিখ্যাত সন্তরণবিদ্ শ্রীমিহির সেনের অসামান্য সাফল্যের জন্য ভারতবাসী মাত্রই গর্বিত।

উৎসব-সংবাদ

হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ কর্তৃক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব গত ২২শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রত্যহ পূজাপাঠাদিসহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন ২২ তারিখ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩ তারিখ অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রতুল চন্দ্র চৌধুরী, ২৪ তারিখ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। ২২ ও ২৩ তারিখ সভান্তে রামায়ণ গান করেন শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। ২৩ তারিখ সভান্তে রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম কর্তৃক 'শ্রীশ্রীমা' সবাক্ চিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৫ তারিখ 'বামাক্ষ্যাপা' নাটক অভিনীত হয়। ২৬ তারিখ শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা-মন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠান ও পারিতোষিক বিতরণের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার বিষয়ে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তা। সভান্তে ভাগবত পাঠ করেন শ্রীসীতারাম ভাগবতাচার্য। ২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার নরনারায়ণের সেবায় প্রায় বাইশ শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালে কালীকীর্তন ও সন্ধ্যায় লীলাকীর্তন হয়। ২৮শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় 'মহা উদ্বোধন' নাটক অভিনীত হয়।

খেপুত (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই ফাল্গুন (১৩৭২) মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উষা-কীর্তনসহ মঙ্গলারতি, প্রাতে প্রভাতফেরী, পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা হোম, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-

বিতরণ, রাত্রে কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পরদিন ১১ই ফাল্গুন বুধবার 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল।

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ৪ঠা মার্চ সকালে পূজা-হোম-পাঠাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিকালে এক ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সেনগুপ্ত 'কথামৃত' আলোচনা করেন। পরে চারি সহস্র ভক্তকে চিঁড়া ও ফলমূল প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রে রামায়ণগান হইয়াছিল।

৫ই মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে আলোচনা ও 'কথামৃত' পাঠ এবং রাত্রে রামায়ণ-গান হয়। ৬ই মার্চ আয়োজিত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী অন্নদানন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী। রাত্রে রামায়ণগান হয়।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ (কলিকাতা ৫০): গত ৬ই মার্চ হইতে ৯ই মার্চ এবং ১৭ই হইতে ২০শে মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব-উৎসব আশ্রম-প্রাঙ্গণে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সংঘের বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয়, রাধারমণ কীর্তনসমাজের কীর্তন, স্বামী পুণ্যানন্দজী কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, প্রাচ্যবাণী কর্তৃক সংস্কৃতনাটক, রামরতন সাংখ্যশাস্ত্রীর ভাগবত-কথকতা এবং শিকদার-বাগান সমাজের শ্রীরামকৃষ্ণ-যাত্রাভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন দিনে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী জীবানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা এবং ডঃ রমা চৌধুরী। ইহা ছাড়া বিখ্যাত রামায়ণগায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী তিন দিন রামায়ণ গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। প্রতিদিন এই আনন্দানুষ্ঠানে হাজার হাজার নরনারী যোগদান করেন। সমাপ্তিদিবসে একটি শোভাযাত্রা সিঁথি অঞ্চল পরিক্রমা করে এবং পরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সিঁথি অঞ্চল উৎসবের কয়দিন খুব আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

টালিগঞ্জ: গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ইন্দ্রাণী পার্ক, টালিগঞ্জ কর্তৃক স্থানীয় পল্লীবাসিগণের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একত্রিংশ-দধিক শততম আবিভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন পূজাদি ও প্রভাতফেরী লইয়া পল্লী-পরিক্রমার পর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ভক্তিমূলক গান ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা ৬॥টায় আরাত্রিকের পর অনুষ্ঠিত জন-সভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, প্রধান অতিথি ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এবং স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। শ্রীগণপতি পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিন সন্ধ্যারতির পর শ্রীতারক দাস মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারতত্ত্ব আলোচনা করেন। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র ও সেবাশ্রম (গান্ধী কলোনী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন।

এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের শুভেচ্ছাবাণী সহ একটি জয়ন্তীগ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বেহালা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র, পর্ণশ্রী : গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ দুইদিন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, কীর্তনসহ পল্লী-পরিক্রমা, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমতী সুমতি মুখোপাধ্যায় 'সীতার পাতালপ্রবেশ' বিষয় অবলম্বনে কীর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীসারদা সংঘের সভ্যাগণ সান্ধ্য আরাত্রিকভজন এবং বিশিষ্ট শিল্পিগণ ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উৎসবে পর্ণশ্রী অঞ্চলের শত শত নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন।

বাণীদেবীর দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নিউ-আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ও সম্পাদিকা বাণীদেবী গত সোমবার ২৫শে এপ্রিল বৈকালে উক্ত আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট ১৪ বৎসর বয়সে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। বাল্য হইতে দীর্ঘকাল (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) তিনি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রথমে তিনি ছাত্রীরূপে আসিয়াছিলেন ; শিক্ষালাভের পর সেখানেই অন্যতমা শিক্ষিকার ও পরে প্রধান শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার সহকর্মিণী ও ছাত্রী-গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ॥ শান্তিঃ॥।

সরোজকুমার কাঞ্জিলালের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, দুর্গাপুর প্রকল্পের চীফ ইঞ্জিনীয়ার সরোজকুমার কাঞ্জিলাল গত ২৫শে ফেব্রুআরি করোনারি থ্রোমোসিসে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সর্বজনপরিচিত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল কাঞ্জিলালের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভারত ও বঙ্গ সরকারের বহু প্রয়োজনীয় বিভাগে তিনি দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম টেলিফোন বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কলিকাতার স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন বিভাগ তাঁহারই কীর্তি। দুর্গাপুর প্রকল্পের জন্য আহূত হইয়া তিনি উহার বিভিন্ন বিভাগ অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন।

বাংলার যুবকদিগকে যাহাতে নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত করিয়া বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করা যায়, ইহা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল।

তাঁহার দেহত্যাগে একটি হৃদয়বান একনিষ্ঠ কর্মীর অভাব ঘটিল। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ॥ শান্তিঃ॥।

দিব্য বাণী

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষদ্—৩।১।৮

(সবার অন্তর-বাসী পরমেশ যিনি
একমাত্র শুদ্ধ-মনবুদ্ধি-গম্য তিনি।)
চক্ষু বাক্ আদি অন্য ইন্দ্রিয় সকল
তাঁহারে ধরিতে গিযা হয় যে বিফল।
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কিম্বা তপস্যায়
তাঁহাব স্বরূপ কভু জানা নাহি যায়।
অবয়বহীন সেই পরম-আত্মারে
নিরন্তর একমনে ধ্যান যেবা করে,
আত্মধ্যানে হয় যাঁর বিশুদ্ধ অন্তর—
আত্মা হন তাঁরি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর।

কথাপ্রসঙ্গে

অন্তর্মুখিতা বা আধ্যাত্মিকতা—মানবতাকে বাঁচাইবার উপায়

মানুষের মনের চাহিদার কোন শেষ নাই। পাওয়া যতই যাক না কেন, তৃষ্ণা চিরঅপরিতৃপ্তই থাকিয়া যায়, এবং আরো চাহিয়া চলে।

পথের ভিখারী, যে হয়ত পেট পুরিয়া খাইতেই পায় না, পরিবার কাপড় পায় না, দুবেলা পেট পুরিয়া খাওয়া, দুখানা নূতন কাপড় পাওয়াই তাহার নিকট তখন জীবনের পরম কাম্য। সে যদি তাহা পায়, কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার পরই মন আবার আরো বেশী কিছু চাহিবে—আহার ও পরিচ্ছদের মান সে আরো একটু উন্নত করিতে চাহিবে। তৃষ্ণার দাহ আবার সুরু হইবে। তাহাও যদি পায়, তবুও তৃষ্ণা মিটিবে না। যে পরিবেশে যখনই যে উন্নীত হইবে, সেই পরিবেশেই সে চাহিবে উহার মধ্যে সবচেয়ে ভালভাবে, আরো উন্নততর ভাবে থাকিতে। ক্রমে হয়ত বাড়ী, গাড়ী, অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা, সম্মান সবই ক্রমে ক্রমে সে প্রভুত পরিমাণে পাইল; কিন্তু তথাপি তাহার চাওয়া কোথাও থামিবে না। লালসার এই চির-অতৃপ্ত রূপ অনেকসময় অতি উৎকট ভাবে সর্বজনসমক্ষে প্রকট হইয়া পড়ে অত্যন্ত ধনী প্রতিষ্ঠাবান সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যেও, এবং মহাভারতে বর্ণিত রাজা যযাতির উক্তিই স্মরণ করাইয়া দেয়—"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তম্"—পৃথিবীতে যত প্রকারের যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তু আছে, তাহা যদি সমস্ত একত্র করা হয়, তাহা একজন মাত্র মানুষের তৃষ্ণা-নিবারণের পক্ষেও পর্যাপ্ত হয় না।

ইহাই হইল তৃষ্ণার রূপ। তাই তৃষ্ণা যতক্ষণ থাকে, মানুষ যত ভোগ্যবস্তু লাভ করুক না কেন কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না, অশান্তির আগুনে মন পুড়িতেই থাকে। শুধু তাহাই নহে, উহা ক্রমে বাড়িয়াই চলে, কারণ ভোগ যত বেশী করা যায় তৃষ্ণা ততই তীব্রতর হইতে থাকে। তৃষ্ণার পিছনে ছুটিয়া মানুষ যাহার জন্য ছোটে সেই শান্তি ও অফুরন্ত আনন্দ কখনও লাভ করিতে পারে না। তাই, কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতাকে যমরাজ যখন বিপুল ঐশ্বর্য, বিশাল সাম্রাজ্যাদি, এবং তাহা প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিবার মত অতি দীর্ঘ পরমায়ুও দিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'আমি যাহা দিলাম, তাহা ছাড়া আরো যদি কিছু ভোগ করিবার ইচ্ছা তোমার মনে জাগে তো বল, তোমাকে তাহা সবই দিব—কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি—এ সব লইয়া যতদিন খুশি—শরদো যাবদিচ্ছসি—বাঁচিয়া থাক', তখন নচিকেতা সবই প্রত্যাখ্যান করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—আমাকে কত সম্পদ আপনি দিবেন যমরাজ? যত বিপুল পরিমাণেই দিন না, মন তাহাতেও তৃপ্ত হইবে না—মানুষ কখনো বিত্তলাভে তৃপ্ত হয় না।'...আর বলিয়াছিলেন, 'জীবন যত দীর্ঘই হউক না কেন, একদিন তাহার শেষ আছে—জীবন স্বল্প, যাহার মাধ্যমে ভোগ করা যায় সেই দেহেন্দ্রিয়ও জীর্ণ, জরাগ্রস্ত হয় একদিন।'

দেহেন্দ্রিয় এক সময় জীর্ণ হয়, ভোগ করিবার শক্তি হারায়, কিন্তু ভোগতৃষ্ণা তখনো প্রবল থাকে, রাজা যযাতি দীর্ঘ সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন লইয়া মর্ত্য ও স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুসকল উৎসাহী হইয়া ভোগ করিবার পর এই সত্যটিই তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন, তৃষ্ণা 'ন জীর্যতি জীর্যতঃ'। একটি দেহ নষ্ট হইবার পর এই বিষয়-ভোগেচ্ছা, এই চির-অতৃপ্ত তৃষ্ণা, এই বাসনাই আমাদের টানিয়া লইয়া চলে জীবন হইতে জীবনান্তরে, একটি দেহ বিনষ্ট হইবার পর তাহার চাই আর একটি দেহ, যাহার মাধ্যমে আবার সে ভোগের জন্য বিষয় আহরণ করিতে পারে। স্থূলদেহ সহজে নষ্ট হয়, কিন্তু মন, যাহা সূক্ষ্মদেহের অঙ্গীভূত, এত সহজে নষ্ট হয় না, যতক্ষণ এই তৃষ্ণা থাকে ততক্ষণ উহাকে বুকে লইয়া সে দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া দীর্ঘায়িত করিয়া চলে জীবনপথ।

দেহান্তরে এই তৃষ্ণার বিকাশ ঘটে কিছুটা বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া, কিছুটা দেখিয়া, কিছুটা শুনিয়া, এবং কিছুটা পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতাবশে স্বতই। তৃষ্ণাচালিত হইয়া বিষয়লাভের জন্য উহার পিছনে ছোটার প্রবৃত্তি মনে যখন অতি-প্রবল হইয়া উঠে, তখনই উহা মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে। সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লালসার এই অসংযত প্রকাশই সর্ববিধ দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনিষ্টের মূলে রহিয়াছে। মনের এই বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন-প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার একমাত্র উপায়, যে জন্য সে তৃষ্ণাচালিত হইয়া বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাকে সেই আনন্দ অন্য উপায়ে দেওয়া। আমাদের লক্ষ্য বিষয় নয়, লক্ষ্য আনন্দলাভ; বিষয়ের মাধ্যমে আনন্দ লাভ হয় বলিয়াই বিষয় আমাদের প্রিয়। কিন্তু আনন্দ কি বিষয়ে থাকে? বিষয় মূর্ত—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, কিন্তু আনন্দ মনেরই একটি অবস্থা মাত্র—অমূর্ত, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, উহার কার্যকে পারি (যেমন পারি না মনকে বা অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকে)। যেমন আমরা বিদ্যুৎ দেখিতে পাই না, আলো, গতি প্রভৃতি উহার কার্যগুলিকে দেখি। বহিরিন্দ্রিয় মূর্ত বিষয়কে স্নায়ুস্পন্দনাকারে মস্তিষ্ককেন্দ্রে বাহিত করিলে সেখানে একটি প্রতিক্রিয়া হয়। এ পর্যন্ত স্থূল বস্তুর সহিত তাহার সংযোগ, এ পর্যন্ত ক্রিয়া স্থূল। কিন্তু তাহার পর যে অন্তরিন্দ্রিয়গুলি মস্তিষ্ককেন্দ্র হইতে সেই প্রতিক্রিয়াকে মন পর্যন্ত বাহিত করে এবং মনে তজ্জনিত যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর নহে—তাহা অমূর্ত। কারণ মন ও অন্তরিন্দ্রিয় অচেতন পদার্থবিশেষ হইলেও যেসব অচেতন বস্তু আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদের উপাদান অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত। (এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলির শাস্ত্রীয় নাম 'তন্মাত্র', এই তন্মাত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া মাটি, জল, আলোক প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের উপাদান সৃষ্টি করে)। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগজনিত যে প্রতিক্রিয়া মনে হয়, তাহাই বিষয়ানুভূতি। এগুলি সূক্ষ্ম হইলেও এগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে আমরা অনুভব করি। কিন্তু এই সব অনুভূতিজনিত যে আনন্দ, তাহা এক—রূপের অনুভূতিজনিত, শব্দের অনুভূতিজনিত, স্পর্শের অনুভূতিজনিত আনন্দের স্বরূপ একই; মাত্রায় তারতম্য অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই থাকিতে

পারে। এই আনন্দ আমাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকে, বিষয়ে নহে, ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে বিষয় বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারূপে মনে পৌছাইয়া সেখানে একটি অবস্থার সৃষ্টিমাত্র করিতে পারে যাহা আনন্দের উৎসমুখটি খুলিয়া দিবার সহায়ক হয়। বহির্বিষয়ের সহিত সংযোগ ছাড়াও মনের এই অবস্থা হইতে পারে। বহিরিন্দ্রিয় হইতে মন পর্যন্ত পথের যে কোন স্থানে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই তাহা সম্ভব। যেমন একটি ছবি দেখিতেছি ও দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি। ছবিটির সহিত চোখের সংযোগের ফলে চোখের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে দেখার কেন্দ্রে যে প্রতিক্রিয়া হয়, ছবির সহিত চোখের সংযোগ এবং তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর স্পন্দনের মাধ্যম ব্যতীতও যদি কোন কারণে মস্তিষ্ককেন্দ্রটিতে তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়, তাহা হইলেও কিন্তু আমাদের মনে ছবি দেখার এবং তজ্জনিত আনন্দের অনুভূতি জাগিবে। অতি অল্পক্ষণের জন্য হইলেও ইহা কিন্তু প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। চোখের সামনে কোন বস্তু রাখিলে চোখের রেটিনায় উহার প্রতিবিম্ব পড়ে। উহার প্রতিক্রিয়াটি মস্তিষ্ককেন্দ্রে যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, ছবিটিকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইবার পরও কিছুক্ষণের জন্য সে প্রতিক্রিয়াটি স্থায়ী হয়, সেই সময়টুকু আমরা চোখের সামনে ছবি না থাকিলেও ছবি দেখি এবং দেখিয়া আনন্দ পাই। এই সত্যটির জন্যই আমরা চলচ্চিত্রে বস্তুর সাবলীল গতি দেখিতে পাই, এই সত্যটির জন্যই ঘূর্ণমান আলোকবিন্দু মনে আলোকবৃত্তের (বস্তুতঃ কোন আলোকবৃত্ত না থাকিলেও) প্রতীতি জন্মায়। আবার বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ ছাড়া স্মৃতিজনিত প্রতিক্রিয়ায় মনে আনন্দের উৎসমুখ খোলার মত অবস্থা হইতে পারে, যেমন হয় স্বপ্নে। আবার গভীর নিদ্রায়, সুষুপ্তিতে মনের উপর বহির্বিষয়, মস্তিষ্ককেন্দ্র, অন্তরিন্দ্রিয় কোন কিছুই ক্রিয়াশীল হয় না, কোন কিছুর সহিত সংযোগও থাকে না; অথচ তখন আনন্দ অনুভব করি আমরা। এই আনন্দ সম্পূর্ণরূপে বিষয়নিরপেক্ষ। স্বপ্ন পর্যন্ত স্থূলরূপে না হইলেও সূক্ষ্মাকারে, স্মৃতির আকারে বহির্বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ কিছু থাকে—একথা হয়ত বলা চলে, কিন্তু এখানে তাহাও থাকে না। বিষয়ানুভূতিরাহিত্যই এখানে আনন্দের কারণ।

মনের একটি বিশেষ অবস্থাই যখন আনন্দের উৎসমুখ খুলিবার কারণ, এবং বিষয়ের সহিত সংযোগ ছাড়াও যখন তাহা ঘটা সম্ভব, তখন বিষয়নিরপেক্ষ ভাবে মনের এই অবস্থা আনিতে পারিলেই আর আমাদের আনন্দের জন্য উন্মত্ত হইয়া ভিখারীর মত জাগতিক বিষয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় না। কিন্তু চেষ্টা করিয়া মনের এই অবস্থা আনা কি বাস্তবিক সম্ভব? যাঁহারা বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম সব সত্তাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাঁহারা স্বয়ং এই আনন্দলাভ করিয়া 'আত্মারাম', বহির্জগতের কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়াও সদানন্দময় হইয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব। সম্ভব, শুধু এইটুকুই বলেন নাই. মন এবং মন অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর সত্তা, আনন্দময় সত্তাকে (কারণশরীর) সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়া, উহাদের ধর্ম জানিয়া তাঁহারা বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দলাভের পন্থারও নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন. বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ ব্যতিরেকেই তজ্জনিত আনন্দ অপেক্ষাও

অধিকতর আনন্দের উৎসমুখ খুলিবার পথ দেখাইয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালেই জীবনের এত বড় একটি সমস্যা সমাধানের কার্যকরী বাস্তব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা অন্তর্মুখ হইতে পারিয়াছে এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সে ভাব বজায় রাখিয়াছে। যুগে যুগে বহির্মুখিতার নূতন নূতন এবং প্রচণ্ড বেগবান দুর্যোগ আসিয়াও তাহার এই অন্তর্মুখী ভাবকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই (কোন দিন পারিবেও না)। বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দ লাভের সন্ধান পাইয়াছিল বলিয়াই ভারত ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকেই উচ্চাসন দিতে পারিয়াছে, ত্যাগ ও সেবাকেই জাতীয় আদর্শ করিতে শিখিয়াছে ।

কারণ, ত্যাগই অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে আনন্দ আহরণ করার দ্বার রুদ্ধ করাই হইল জীবনে শ্রেষ্ঠ, অবাধিত, অফুরন্ত আনন্দ লাভের পথ। আমাদের সভ্যতার নিয়ামক সত্যদ্রষ্টাগণ সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াই একথা বলিয়া গিয়াছেন, এবং সাধারণ মানুষ এপথে কিভাবে চলিলে বিষয়নিরপেক্ষভাবে এই আনন্দ লাভ করিতে পারে, তাহার সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। উপায় আর কিছুই নহে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অভ্যাসসহায়ে মনকে বহির্বিষয় হইতে গুটাইয়া আনিয়া, বহির্বিষয়ের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিয়া উহাকে অন্তর্মুখ করার এবং সেখানে একটিমাত্র নাম বা রূপের চিন্তায় তাহাকে একাগ্র করার, অথবা চিন্তাশূন্য করার চেষ্টা করা। আমরা জানি, নাম অথবা রূপ ছাড়া চিন্তার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, কোন চিন্তার বিষয় হয় কোন কথার আকারে অথবা কোন ছবির আকারে অথবা উভয়ের মিলিত আকারে মনে ভাসিয়া উঠিতেছে ; ইহা ছাড়া চিন্তা হয়ই না। সাধারণ অবস্থায় মন অতি চঞ্চল ভাবে একটি হইতে অপর একটি নাম ও রূপে ছুটিয়া বেড়ায়, অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে যুক্তিসম্মত, বা দেশকালগত কোন সামঞ্জস্যও থাকে না। সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের নজরে পড়ে না—মনকে একটি-মাত্র নাম বা রূপে একাগ্র করিবার বা চিন্তাশূন্য করিবার চেষ্টা করিলেই তাহার এই চঞ্চল রূপটি স্পষ্ট দেখা যায়। একটি বিশেষ নাম-রূপে একাগ্র করিবার সময় মন যতবার অন্যত্র চলিয়া যায়, ততবারই উহাকে ঘুরাইয়া আনিয়া পূর্ব-স্থানে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হয়—'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।' ইহারই নাম অভ্যাস, এবং একমাত্র এরূপ অভ্যাস সহায়েই মনকে স্থির করা সম্ভব। এভাবে অভ্যাস-সহায়ে মনকে অন্তর্মুখী ও একাগ্র করার চেষ্টা যত সফলতার পথে অগ্রসর হয়, অন্তর্নিহিত আনন্দের দ্বার ততই অবারিত হইতে থাকে। বাঞ্ছিত প্রিয় বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে আনন্দের এই দ্বার অবারিত করার সহায়ক যে অবস্থা মনে হয়, মনস্থির হওয়ার ফলে মনের সে অবস্থা আপনা আপনি হইতে থাকে ; অনেক বেশী করিয়াই হইতে থাকে। সত্যদ্রষ্টাগণ এদেশের সর্বসাধারণের জন্য মনস্থির করিবার সহজ সরল যে কয়েকটি উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, উহাদের মধ্যে একটি হইল ভগবদ্ভক্তি দ্বারা মনকে শান্ত করার প্রচেষ্টা। প্রতিদিন প্রভাত, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা প্রভৃতি সময়ে, বিশেষ করিয়া দৈনন্দিন কার্যারম্ভের পূর্বে প্রভাতে শ্রীভগবানের কোন নামের বা রূপের চিন্তার পুনরাবৃত্তি, বা নিজ নিজ রুচিমত প্রার্থনা ও ভজন প্রভৃতি নিয়মিত-

ভাবে করিয়া চলিলে মন ক্রমে স্থির হইয়া আসে। মনকে একাগ্র করার জন্য ভজনের শক্তি অসীম। শিশুদের মন পর্যন্ত সঙ্গীতে একাগ্র হয়। ছন্দের দোলায় মনকে পুনঃপুনঃ একই ভাবে দোলা দেওয়াই (যাহা একাগ্রতা-সাধনের একটি বিশেষ উপায়) ইহার মূল।

এভাবে চেষ্টার ফলে মন ক্রমে যত অন্তর্মুখী ও একাগ্র হয়, অন্তর্নিহিত আনন্দের দ্বার ততই অবাধিত হইতে থাকে। দেহ-মনপ্রাণে ততই উহা একটি প্রশান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। একাগ্রতা যত গভীর হইতে থাকে, এই প্রশান্তির প্রলেপও তত গাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে থাকে। আনন্দলাভেচ্ছু মন এই স্থির আনন্দের আস্বাদ যত বেশী পায়, ততই সে উহা আরো বেশী পাইবার জন্য আগ্রহী হয়—আনন্দের জন্য বাহিরে ছুটাছুটি করার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ততই তাহার কমিতে থাকে। দৈনন্দিন কর্মারম্ভের পূর্বে মনকে এভাবে স্থির করিয়া আনার আরো একটি সুফল হইল—মানসিক চঞ্চলতা কমিয়া যাওয়ায় দৈনন্দিন কাজকর্ম আরও সুষ্ঠুভাবে করা যায়। কর্মক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। সংসারে কর্মের মাধ্যমে অমৃতত্ব ও নিত্য আনন্দ লাভের উপায় রূপে গীতায় যাহা বর্ণিত আছে—মনকে নির্লিপ্ত রাখিয়া, মনের সাম্যভাব বজায় রাখিয়া অথচ উৎসাহী হইয়া কার্য করা (অন্যান্য কর্ম-ক্ষেত্রের তো কথাই নাই, যুদ্ধক্ষেত্রের মত প্রচণ্ড চিত্ত-বিক্ষেপকারী কর্মক্ষেত্রেও মনের এই সাম্য বজায় রাখিয়া কাজ করা), স্বামীজীর কথায়, প্রচণ্ড কর্ম-তৎপরতার মধ্যে চিরপ্রশান্ত থাকা—সেই লক্ষ্যের দিকেই আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর করাইয়া দেয় নিত্য নিয়মিত মন স্থির করার এই অভ্যাস। ইহার সফলতা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে মধুময় করিয়া তোলে তৃষ্ণাজনিত অতৃপ্তি ও অশান্তির দাবানলে বিষয়নিরপেক্ষ স্থির প্রতিক্রিয়াহীন আনন্দসলিল সিঞ্চনে, দৃপ্ততর তো করেই।

আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎসমুখ অবাধিত করার সহায়ক এইরূপ আরো বহুবিধ নিত্যকর্মের দ্বারা আমাদের সভ্যতা ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত। নিজের মধ্যে তলাইয়া যাইয়া নিজের স্বরূপের সন্ধানের নামই আধ্যাত্মিকতা; ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমাদের সমাজকে, আমাদের জীবনকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক বলা হয়। মানুষকে 'মানুষ' করার ইহা একটি রাজপথ। ব্যক্তিগত বা জাতি-গত আনন্দ লাভের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া হইতে, অপরের সুখসুবিধা এমনকি সর্বনাশের দিকেও দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া ধন, মান, আধিপত্য প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু আহরণে প্রবৃত্ত হওয়া হইতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষকে নিবৃত্ত করার ইহাই একমাত্র পথ—তাহার জীবনকে আধ্যাত্মিক করার, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া আনন্দের জন্য বহির্জগতের বিষয় আহরণে প্রয়োজনরহিত করার চেষ্টা করা।

আমাদের সভ্যতায় সমাজের সর্বস্তরে অবস্থিত প্রত্যেকটি লোক যাহাতে এই বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদ কিছুটা পায়, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করা রহিয়াছে, যে সভ্যতায় সর্বসাধারণের জীবনকে এভাবে অন্তর্মুখী করিয়া দ্বেষ-হিংসা-সংঘর্ষের মূল কারণ অত্যধিক এবং অসংযত বিষয়তৃষ্ণাকুল অশান্তিময় স্তর হইতে অনাবিল আনন্দময় সংযত উচ্চতর জীবনস্তরে তুলিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহার নাম আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সভ্যতা; আমাদের সভ্যতা এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের এ ভিত্তিভূমি ত্যাগ করিয়া বহির্মুখী ভাবের ভিত্তিতে দাঁড়াইবার ভয় অবশ্য ভারতের ভাগ্যবিধাতার কৃপায় বহুপূর্বে কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ বহির্মুখী সভ্যতার সর্ববিধ প্রলোভন কাটাইবার মত শক্তিমান এখনো হয় নাই; যাহার ফলে দুর্নীতি ও অন্যায় ক্রমশই আমাদের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র পথ হইল বহির্জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টার সঙ্গে সর্বসাধারণের অন্তর্জীবনের মানও উন্নত করার চেষ্টা করা এবং এদেশে তাহা করিবার সহজতম উপায় হইল ভগবানের প্রতি মন একাগ্র করিবার বা সাধারণভাবে মন চিন্তাশূন্য করিবার নিত্য অভ্যাস সহায়ে মনকে বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদলাভের দিকে অগ্রসর করাইবার ব্যবস্থাগুলির পুনঃপ্রচলন করা। যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের জীবনাদর্শে ইহা দেখানো এবং সর্বপ্রকারে ইহার সমর্থন এবং উৎসাহদানই জনগণকে এবিষয়ে আকৃষ্ট করিবার উপায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোককেই নিজনিজ পন্থাবলম্বনে এবং যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাসী নহেন তাঁহাদিগকে সাধারণভাবে একাগ্রতার সাধনে প্রয়াসী করার মত সুযোগ ও উৎসাহপ্রদান শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে অবিলম্বে করা প্রয়োজন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা তাহাতে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয় না— যদি ব্যবস্থাগ্রহণের সময় কোথাও পক্ষপাতিত্ব দেখানো না হয়। মনঃসংযমের ব্যবস্থা সকল ধর্মেই আছে, মানুষ সাধারণতঃ সেগুলিকে অভ্যাস করিতে ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়; সেগুলিকে শুধু জীবনে রূপায়িত করাই হইল কাজ। আমরা সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া এবিষয়ে উদাসীন থাকিলে জাতির উন্নতিপথের বাধাপসারণ বিলম্বিতই হইবে।

মানুষের আদর্শ হিসাবে আমরা আজ যাহা চাহিতেছি—ধর্মদ্বেষহীনতা, সাম্য, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিলোপসাধন, পারস্পরিক প্রীতি—তাহা সবই পাইবার ইহাই হইল সহজপথ। ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে অন্তর্জীবনগঠনের বাস্তব ব্যবস্থা ছাড়া কোন 'বাদ' দিয়াই তাহা সম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে তো নহেই। শুধু ভারতবর্ষ কেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্যেও নহে; বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তিভূমি হইতে সরাইয়া আনিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে পাশ্চাত্যসভ্যতারও বিনাশ আসন্ন হইবে। আজ জগতের বিষম অবস্থায় ইহার সম্ভাবনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি—আপাতদৃষ্টিতে অতি উন্নত, অতি সুসভ্য মানুষেরও আধিপত্য ও সম্পদ লাভেচ্ছু মনের অপরিমেয় অসংযত ভোগতৃষ্ণা জাতীয়তা ও মতবাদের রূপ ধরিয়া এবং উহাদের সংহতির শক্তি লইয়া হিংস্র পশুর মত মানবতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি আমরা সত্যের দিকে ফিরিয়া তাকাইব না, এই বহির্মুখী সভ্যতার দিকেই বা শূন্যপানে নিরপেক্ষ দৃষ্টি মেলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব?

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

Bagh Bazar
57 Ramkanta Bose's St.
(১৯ শে মে, ১৮৯৭)

My dear Akhandananda,

তোমার পত্র পাইযাছি। আমি কলিকাতায থাকার দরুন সময়মত জবাব দিতে পারি নাই। যাহা হউক তোমরা বেশ করিযা কার্য করিবে। টাকার পুনরায আবশ্যক হইলে ১০।১২ দিন আগে লিখিবে। তোমরা যদি গ্রাম হইতে ভিক্ষা না করিতে পার তাহা হইলে ১০ টাকা ঐ fund হইতে আপাততঃ লইয়া নিজ ব্যযের জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান হইতে টাকা গেলে সেই টাকা হইতে উক্ত fund-এ দিবে, যদ্যপি বেশী লোকের আবশ্যক না হয তাহা হইলে সকলে গুলতান করিবার আবশ্যক কি আছে? যে মত বিবেচনা হয করিবে। ইতি

Brahmananda

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব-পাদপদ্মভরসা

৫ই জুন, ১৮৯৭
আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার ২রা জুনের এক পত্র পাইলাম। আমরা বসুমতী কাগজে রিপোর্ট দিতে আরম্ভ করিযাছি—যদি তোমরাই বসুমতীতে একেবারে পাঠাও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মঠে যেন প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া তোমাদের কার্যবিবরণ-সম্বলিত পত্র আসে। মিররে আমরা ক্রমশঃ ঐ কার্য-বিবরণ প্রকাশ করিব। তোমরা ঐখানকার ভদ্রলোকদিগকে বলিয়া ইংরাজী কাগজে কার্য-বিবরণ প্রকাশ করিবে। যদি…কোন পত্রিকায় কার্য-বিবরণ প্রকাশ হয়, তবে সেই পত্রিকা মঠে পাঠাইবে। টাকা পাঠাইয়াছি ; টাকাপ্রাপ্তির সংবাদের জন্য চিন্তিত আছি, সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর করিবে। তোমরা আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস

ব্রহ্মানন্দ

ভগবৎপ্রসঙ্গ*

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬২)

ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা গাড়ীঘোড়া, ভাল বাড়ী ইত্যাদি লাভের জন্য জন্মাইনি। সাধনভজনের দ্বারা ভগবানকেই লাভ করতে হবে। ভগবান একজনই, কিন্তু বিভিন্ন তাঁর নাম ও রূপ। এই নিয়ে ঝগড়া করার কিছু নাই। দক্ষিণদেশে বিষ্ণুর ভক্ত শিবের মন্দিরে যাবে না, আবার শিবের ভক্ত বিষ্ণুর মন্দিরে যাবে না। আমাদের ক্ষুদ্র মন নিয়ে অনন্তকে কি করে বুঝব?

ভগবান অতি দুর্লভ জিনিস। অপূর্ব বস্তু। তিনি টাকাকড়ি বা পদমর্যাদা দেখেন না, শুধু প্রাণের কথা শোনেন। তাঁর কাছে ছোট ছেলের মত আবেদন নিবেদন জানাবে। তাঁর দয়াই আসল। সাধনভজন একটুও করলে তিনি এগিয়ে আসেন। নিজে যতটুকু পার চেষ্টা করে যাও। পূর্বদিকে যত এগোবে পশ্চিম ততই পিছনে পড়বে। সংসারের আসক্তি ততই ধীরে ধীরে কমে আসবে। উইপোকা দেখেছ না? দেখতে কত ছোট কিন্তু চেষ্টার ফলে কত বড় 'ঢিপি' তৈরী করে ফেলে। তাই প্রয়োজন চেষ্টা ও আন্তরিকতা। জোয়ার এলে আর দাঁড় টানতে হয় না। হাওয়া পেলে পাল তুললেই হল।

ঠাকুর দয়া করে মানুষের শরীর ধরে এসেছেন। তিনি পরমগুরু। তাঁর মধ্যেই সব ভাব রয়েছে। তাঁর স্থূলশরীর চলে গেলেও তিনি সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে এখনও রয়েছেন।

(বেলুড়মঠ, বৃহস্পতিবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬২)

ভগবানই একমাত্র সারবস্তু। বাকী সব ছায়া মাত্র। ভগবান আছেন, এইটি ষোলআনা বিশ্বাস করতে হয়। এযুগে ঠাকুর বৈজ্ঞানিকের মত নিজের অনুভূতি দিয়ে দেখে তবে বলে গেলেন।

মা তাঁকে দেবী বলেই জানতেন। তাই তাঁর শরীর গেলে মা কেঁদে উঠলেন, বললেন: মা কালী গো, কোথায় গেলে গো?

আবার ঠাকুরও তাঁকে দেবী বলে জানতেন। একদিন মা তাঁর পদসেবা করতে করতে জিজ্ঞেস করছেন: তুমি আমাকে কি মনে কর?

অমনি ঠাকুর বলে উঠলেন: যে মা মন্দিরে ভবতারিণীরূপে পূজো পাচ্ছেন, সেই মা-ই এখন নহবতে রয়েছেন (তাঁর গর্ভধারিণী মা) আবার তিনিই এখন আমার পায়ে হাতবুলিয়ে দিচ্ছেন।

কাজেই তিনই এক। ঠাকুর পুরুষশরীর নিয়ে এলেও তাঁর মাতৃভাব।

খুব চেষ্টা করে যাও। প্রথমে চোখ বুজলেই তো অন্ধকার। তা হোক্‌গে যাক। এইভাবে চেষ্টা করতে করতেই হবে।

(বেলুড় মঠ, বুধবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬২)

ঠাকুর জীবরূপ ধারণ করে কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয় দেখিয়ে গেলেন। যে নামেই ডাক, জানবে ভগবান এক। প্রাণ ভরে ডাকতে ডাকতেই মনের মলিনতা সব চলে যাবে।

ছোটছেলে যখন যন্ত্রণা পেয়ে চিৎকার করে ডাকে মা তখন ছুটে আসেন। এক

---

* প্রসঙ্গের অনুলিখন।

মিনিটও দেরী করেন না। কাজেই ধৈর্য হারিও না। সময় হলে তিনি আসবেনই আসবেন। অসময়ে এলে কদর হবে না। এমন প্রতিজ্ঞা থাকা চাই যে, তাঁরই দয়ায় আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, কিছুতেই ছাড়ব না। তিনি ভেতরেই আছেন। সর্বত্র আছেন।

ভক্তি তোমাদের ভেতরেই আছে। তা নইলে তোমরা এখানে আসবে কেন? সময় পেলেই তাঁর নাম করে যাবে। দেখবে সংসার মধুময় হয়ে উঠবে। সংসার কর ক্ষতি নাই কিন্তু সাংসারিকতা ত্যাগ করতে হবে। জলে নৌকো থাকে কিন্তু নৌকোর ভেতরে জল ঢুকলেই বিপদ। সকলের আশ্রমে বা কনভেন্ট-এ যোগ দেবার প্রযোজন নাই। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গার মত ভক্তিকে আশ্রয় করে সংসার করতে হয়। তাঁকে পেতেই হবে নইলে শান্তি নাই। টাকাকড়ি ইত্যাদি পেলে সাংসারিক সুখ হয় কিন্তু তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত আসল শান্তি হবে না।

(বেলুড় মঠ, বৃহস্পতিবার, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬২)

শ্রীচৈতন্য নামের মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। নামরূপ বীজ বটগাছের বীজের মত। দীক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য সব হযে যাবে না। তবে হবেই। মন্ত্র শুধু repeat করলেই (আওড়ালেই) হবে না। চাই অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা।

তিনি সর্বত্র আছেন, যেন লুকিয়ে। আড়াল থেকে সব দেখছেন। তিনি এক শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। ঠাকুর বলেছেন, আন্তরিক হলে একদিন হবেই। কত কত জন্ম নিতে হয়েছে। কত কত বাসনা ছিল। সে সব কিছুটা পূর্ণ না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। কত সংখ্যা জপ করলাম, কত প্রার্থনা স্তবস্তুতি করলাম—এতে মন দেবার প্রয়োজন নাই। মন প্রাণ ঢেলে খুব ডেকে যাও।

সেই কাঠুরিয়ার গল্প পড়েছ ত? ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও।

প্রশ্ন: মহারাজ, সেবার ভাবে কাজ করা কেমন?

উত্তর: সেবাবুদ্ধিতে সকল কাজ করা। স্বামীজী বলেছেন, Work is worship. প্রতিটি কাজকে পূজা হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি বলেছেন। কোন কাজই ছোট নয়। সর্বভূতে তিনি রয়েছেন এইটি ভেবে তাঁরই সেবা করছি মনে করতে হবে। যেমন মন্দিরে ঠাকুরসেবা। সব সময়ে একটা ভাব নিযে চলতে হবে—যেন ঠাকুরই বিভিন্ন মূর্তিতে আমাদের সেবা নেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' —এর নামই Practical Advaita.

তুমি তো সাধু হবার জন্য এসেছ। শুধু 'কথামৃত' পড়লে হবে না। …স্বামীজীর বইগুলি ভাল করে পড়বে। Through স্বামীজী ঠাকুরকে বোঝার চেষ্টা করবে।

আর একটি কথা মনে রাখবে। সঙ্ঘের সেবাই ঠাকুরের সেবা। কাজেই সব সময়ে বিচার করবে, আমি সঙ্ঘের সেবা করতে এসেছি, না সঙ্ঘের সেবা নিতে এসেছি।

(বেলুড় মঠ, সোমবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬২)

আজ Christmas Eve. বিশেষ শুভদিন। মন্ত্রে বিশ্বাস করে সাধন করলে অবিদ্যানাশ হয়। আনন্দলাভ হয়। ভগবানকে প্রসন্ন করতে হলে নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিক ভাবে ডেকে যেতে হবে।

নিজেকে দীন হীন কখনো ভাববে না। যা হয়েছে, হয়ে গেছে। সেজন্য ভেব না। ঠাকুরের কাছে তোমরা আবদার করবে। জোর করবে ছোট ছেলের মত, বলবে কেন দেখা দেবে না? তিনি যে আমাদের অত্যন্ত আপনার জন। পরম আত্মীয়।

একশর মধ্যে নিরানব্বইটা কেউ ভাল করলে সাধারণ মানুষ ভুলে যায় কিন্তু একটা মন্দ করলে মনে রাখে। আর ভগবান? তিনি নিরানব্বইটা দোষের কথা ভুলে যান কিন্তু একটি মাত্র ভালর কথা মনে রাখেন। এই হল মানুষের সঙ্গে ভগবানের তফাৎ। বুঝলে ত? ঠাকুর বলতেন, আমরা যখন যতটুকু ডেকেছি তিনি শুনে রেখেছেন। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনিটিও শুনতে পান।

ঠাকুরকে স্মরণ করা, চিন্তা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সাক্ষাৎ ভগবান মানুষের রূপ ধরে এসেছেন। মানুষ যা নিয়ে মেতে আছে, তিনি সেই দিক দিয়েই গেলেন না। ...তাঁর মুখ দিয়ে মা কালীই কথা বলেছেন। তাই তাঁর কথা পড়লে মনে খুব জোর পাবে। মনে হবে আমাকে কেউ ডোবাতে পারবে না। তিনি সকলের জন্য কত কেঁদেছিলেন।

আমাদের দেরী যদি হয়—তাতে ভগবানের দোষ নয়, তাঁর নামের দোষ নয়। আমাদের মনে অনেক কামনা-বাসনা আছে বলেই ঠিক ঠিক হয় না। তাই দেরী হয়। তিনি লুকিয়ে রয়েছেন ভেতরে বাইরে সর্বত্র।

(বেলুড় মঠ, শুক্রবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬২)

তাঁর ওপরে ভক্তি হলে ব্যাকুলতা আসে। জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন জলে ডোবা লোক একটু বাতাসের জন্য হাঁপিয়ে ওঠে, সাধকের তখন তেমনি অবস্থা হয়। তখন ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়।

ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। নূতন অবতার হয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি সূক্ষ্ম দেহে থাকবেন, স্বামীজী বলেছেন।

ভাব নিয়ে করতে পারলে সব কাজই তাঁর পূজা হয়। সব কাজের মধ্যে তাঁর স্মরণ মনন রাখবে। পদ্মপত্র জলে থাকে কিন্তু জলে ভিজে না। তেমনি সংসারে অনাসক্ত ভাবে কি করে থাকা যায় ঠাকুর ও মা তাঁদের জীবনে, কাজে-কর্মে আমাদের তা দেখিয়ে গেলেন। অজ্ঞান আমাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে—তাই এই দুরবস্থা!

ভগবান আমাদের সব চেয়ে আপনার জন। তিনি প্রেমময়। কিন্তু তাহলে সংসারে এত দুঃখকষ্ট কেন? তার নানা কারণ। আমাদের আগের আগের বাসনা ও কর্ম অনুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ হয়। তাঁর দয়া হলে জ্ঞান ভক্তি সবই লাভ হয়। কিন্তু Secret (রহস্য) হ'ল ব্যাকুলতা। তাঁর দিকে মন গেলে তিনি প্রসন্ন হন।

স্বামীজী বলেছেন, গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, দেয়ালে চুরি করে না, কিন্তু গরু গরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই থাকে। মানুষ অন্যায় করে কিন্তু আবার ভক্তিবিশ্বাসের বলে জ্ঞান লাভ করে। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) বলতেন, কেমন জান? কাপড়ে সাবান লাগানোর মত। প্রথমে বোঝা যায় না অত ময়লা কেমন করে যাবে। কিন্তু কাচতে কাচতে সব ময়লা আলাদা হয়ে যায়। তখন কেমন পরিষ্কার দেখায়। তখন আবার উল্টো। বোঝাই যায় না যে কাপড়ে কোন কালে ময়লা ছিল।

(বেলুড় মঠ, শনিবার, ১২ই জানুআরি, ১৯৬৩)

বর্তমান যুগে শারীরিক কঠোরতার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আর বাইরের কঠোরতা করলেই তাঁকে পাওয়া যায় না। শেকল ধরে জলের নিচে যাওয়ার মত তাঁর পবিত্র নাম জপ করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানের সব শক্তি ঐ নামেই রয়েছে। চাই নামে বিশ্বাস আর একাগ্রতা। বিভীষণ একজনের কাপড়ের খুঁটে রামনাম লিখে বলে দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাও, ডুবে যাবার ভয় নাই।

কিন্তু পেলেনা বলে হতাশ হয়ে যাবে না। মনের বাসনা দূর না হলে কিন্তু তাঁর দর্শন বা কৃপা সহজে পাওয়া যায় না। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) বলতেন, ভগবান তো আর সাপ নন, মন্ত্র পড়লেই চলে আসবেন। তিনি অতি আপনজন। দয়াঘন মূর্তি। ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। ভালবাসা দিয়েই তাঁকে বাঁধতে হবে।

তিনি ভেতরে বাইরে সর্বত্র রয়েছেন। নেবুর রসের মধ্যে যেমন নেবু ফেলে দেয়—তেমনি। কাজেই তাঁর চিন্তা দ্বারা নূতন ভাবে এবার জীবন গঠন করার চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, শ, ষ, স। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। সহ্য করা সংসারজীবনেও একান্ত প্রয়োজন।

সৎকাজ, সৎচিন্তা ও প্রার্থনা- এর দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয়। আগুন প্রথমে জ্বালান খুবই শক্ত। বৈদিক যুগে কাঠে কাঠে ঘসে আগুন বের করা হয়েছিল। এই ভক্তি-বিশ্বাসের আগুনকে নিভতে দেওয়া চলবে না। ঠাকুরতো কত ভরসা দিয়ে গেলেন। মানুষ কত দুর্বল, কত অন্যায় করে কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও ভগবানের কৃপায় সে ভগবান লাভ করতে পারে।

"তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।"

"অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে 'তত্ত্বমসি'। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।"

"দর্শন করলে একরকম, শাস্ত্র পড়লে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায

ভারতকে অবনতির এক চরম অবস্থা থেকে টেনে তুলে আনার জন্যে, মহা জড়তার আবরণ সরিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মার শক্তিকে, দেবত্বকে প্রকট করে দেবার জন্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। শুধু ভারতের নয়, সারা জগতের মানুষের জন্যেই তাঁরা এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা যথাযথ রূপে গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ যে কাজ সমাধা করে গেছেন—জাতির ধমনীতে ধমনীতে আত্ম-বিশ্বাসের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে, তার জড়তার ভিত নাড়িয়ে দিয়ে তাকে আত্ম-বিকাশের পথ ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন, ফলে জাতি সর্ববিষয়ে আত্মার এই মহিমাকে প্রকাশ করে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্য, রাজনীতি দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে জাতির নিজস্ব বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশের সহায়করূপে এসেছেন বহু মহামানব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে ভারতের যে চিরন্তন বাণী জাতির অন্তস্তল আলোড়িত করে তুলেছিল, মানুষের সেই দেহাতীত অমিতবীর্য অমর আত্মার মহিমাকেই প্রকট করেছেন তাঁরা। নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সমকালেই ভারতে পরপর জন্মগ্রহণ করেছেন কয়েকজন মহামানব।

নরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি, কলিকাতায়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এর দু'বছর আগে এবং গান্ধীজীর জন্ম এর ছ'বছর পরে ১৮৬৯-এ। এঁদের পিছু পিছু শ্রীঅরবিন্দ এলেন ১৮৭২-এ। কালে-ভদ্রে এক-আধজন মহামানব সর্বত্রই জন্মে থাকেন। কিন্তু তৎকালীন নির্জীব সমাজকে প্রাণচঞ্চল করবার জন্যে দরকার ছিল এতগুলি প্রতিভা-সম্পন্ন লোকের একের পর এক আসা। পৃথিবীর ইতিহাসে একই দেশে এতগুলি মহারথীর এইভাবে উপর্যুপরি আবির্ভাব কদাচিৎ ঘটে। যখন ঘটে তখন বুঝতে হবে সেই দেশের ভবিষ্যৎ বিশাল সম্ভাব্যতায় সমুজ্জ্বল। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই একদিন ধর্মে এবং কর্মে মহান হয়ে উঠবে।

বিবেকানন্দের চেহারায় এবং চালচলনে একটা রাজকীয় মহিমা বিচ্ছুরিত হোতো। তিনি ছিলেন যেন মূর্তিমান মহাবীর্য। কণ্ঠে জ্ঞান ও কর্মের জয়ধ্বনি নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন তিনি। যেমন পারতেন সাঁতার কাটতে, নৌকা বাইতে, ঘোড়ায় চড়তে তেমনি পারতেন সুকণ্ঠের সঙ্গীতে সবাইকে মুগ্ধ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন সেরা ছাত্র। সংস্কৃতে ও ইংরেজীতে তাঁর দস্তুরমতো দখল ছিল। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রনাথ খুব যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা আছে তাও তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এটা তাঁর মনে হয়েছিল, ঋষিগণ প্রকৃতই সত্যান্বেষী ছিলেন এবং সত্যকে জানবার জন্যে কোন ত্যাগেই তাঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন একজন সত্যদ্রষ্টা পুরুষকে দেখবার জন্যে নরেন্দ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বহু-বাঞ্ছিত মনের মানুষটিকে খুঁজে পেলেন। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে-বর্ণনা তিনি পেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণে সেই উপনিষদ্‌কে জীবন্ত দেখে তিনি বিস্ময়ে

শ্রদ্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এখানে একটা কথার উল্লেখ থাকা ভালো। শ্রীরামকৃষ্ণে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে নরেন্দ্রনাথের দীর্ঘদিন লেগেছিল। এ-সম্পর্কে স্বামীজী তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন, "I fought my master six long years, with the result that I know every inch of the way, every inch of the way." বুদ্ধির অহংকার নিয়ে যে-যুবক একদা সংশয়াকুল চিত্তে গুরুদেবের কাছে যাতায়াত করতেন, সেই নরেন্দ্রনাথই উত্তরকালে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত-চিকীর্ষা, উদারতায় জমাট, কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য! তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড। তস্য দাসদাসোঽহং, তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবতী হোক, তিনি কি নামের দাস?"

পূর্ণ আত্মসমর্পণ আর পরিপূর্ণ ভাবে জানা একই কথা। জ্ঞান ও প্রেম এক বৃন্তেরই দুটি ফল।

বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-জীবনের নাম, নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণই বিবেকানন্দ করে তৈরী করেছিলেন। তৈরী করেছিলেন একটা বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই উদ্দেশ্যটি ছিল সকল ধর্মই মূলতঃ সত্য—এই সমন্বয়ের বাণীকে বিশ্বময় ঘোষণা করা! বস্তুতঃ সকল ধর্মের রাস্তাতেই ভগবানলাভ হয়—এই উদার বাণীর পতাকাতলে সবাইকে মেলানোর জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীতে এসেছিলেন। যত মত তত পথ—এই সত্য ঘোষণা করবার অসীম শক্তি এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিচিত্র সাধনার পথে একই পরম উপলব্ধির শিখরে পৌঁছেছিলেন বলে।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে যে-সত্য তিনি লাভ করলেন তাকে বিশ্বময় প্রচার করবার কতই না প্রয়োজন ছিল! বিজ্ঞানের কল্যাণে দূরত্ব আজ নিশ্চিহ্ন-প্রায়, physical annihilation of space আর কল্পনা নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষগুলি আজ একে অন্যের কতই না কাছাকাছি এসে পড়েছে! মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আজ যদি মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, আমরা যদি একে অন্যকে সহানুভূতির সঙ্গে জানবার চেষ্টা না করি তবে তো আমাদের এই নৈকট্য একটা মহা অনর্থের সৃষ্টি করবে। কিন্তু মানুষে মানুষে মৈত্রী কি শুধু স্বাধীনতার ভিত্তিতেই সম্ভব নয়? একজন মানুষকে যখন তার নিজস্ব রুচি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতা আমরা দিই তখনই শুধু তার মন পেতে পারি। প্রত্যেকটি ধর্মবিশ্বাসেরই সমান অধিকার আছে সগৌরবে বেঁচে থাকবার এবং প্রতিবেশী যাতে শ্রদ্ধাবান তাকে শ্রদ্ধা করা প্রতিবেশীর অবশ্য-কর্তব্য—এই সত্যকে যুগের মর্মে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই কি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব নয়?

তাঁর যুগবাণীর জয়ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে নরেন্দ্রনাথকে বেছে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্রও ভুল করেননি। শিষ্যের কণ্ঠে তো গুরুরই বাণীর প্রতিধ্বনি। সেই

স্বাধীনতার স্তব-গান। বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে বারম্বার ধ্বনিত হয়েছে: 'Freedom, oh Freedom !' is the cry of life. 'Freedom, oh Freedom !' is the song of the Soul. গুরুও তো জীবদ্দশায় বারম্বার বলেছিলেন: কারও ভাব নষ্ট করতে নেই, কেননা যে কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়, যে যার ভাব ধ'রে তাঁকে ডেকে যা। হিন্দুশাস্ত্রে, বিশেষতঃ গীতায়, স্বভাবের উপরে, স্বধর্মের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা অনুপম শুচিতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। আমরা যখন এই স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে অন্যকে অনুকরণ করতে যাই তখন সেটা আত্মহত্যারই সামিল হয়। স্বভাব এবং স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে আমরা যখন নিজেদের মতো করে অন্যদের বানাতে যাই তখনও আমরা তাদের বিষম ক্ষতি করি। তাই ঠাকুর বারম্বার বললেন: আর কারও ভাবের নিন্দা করিস নি বা অপরের ভাবটা নিজের ব'লে ধরতে বা নিতে যাসনি। পৃথিবীতে যিনি এসেছিলেন মৈত্রীর পতাকাতলে বিচিত্র-প্রকৃতির, বিচিত্র-রুচির, বিচিত্র-বিশ্বাসের নর-নারীকে মেলানোর জন্যে তিনি নিঃসংশয়ে স্বাধীনতাতেই সেই মৈত্রীর দৃঢ়তম ভিত্তি দেখেছিলেন। একথা নিমেষের জন্যেও যেন না ভুলি, বিবেকানন্দের বাণীতে শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দের নিজস্ব ভাষায়: "All that has been weak has been mine, and all that has been life-giving, strength-giving, pure, and holy has been his inspiration, his words, and he himself." "আমি যদি কোন দুর্বলতা পরিবেশন করে থাকি, সে আমারই। আর আমি যা দিয়েছি তার মধ্যে যা-কিছু বলপ্রদ, প্রাণপ্রদ, শুভ্র এবং শুচি সে-সমস্তের মূলে তাঁরই প্রেরণা, সে সমস্ত তাঁরই কথা, সে সমস্ত তিনিই স্বয়ং।"

এই বিজ্ঞানের যুগে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষগুলিকে একত্রে মেলানোর জন্যে 'যত মত তত পথ' এই বাণীর যেমন একান্ত প্রয়োজন ছিল তেমনি প্রয়োজন ছিল অনুন্নত, অবহেলিত, পদ-দলিত দুর্ভাগা জনসাধারণকে ওঠানোর। বিবেকানন্দের জীবনীতে রোমা রলাঁ লিখেছেন, "Every human epoch has been set its own particular work. Our task is, or ought to be, to raise the masses, so long shamefully betrayed, exploited, and degraded by the very men who should have been their guides and sustainers." "মানবের প্রতিটি যুগেরই করণীয় নিজস্ব একটি বিশেষ কাজ আছে। আমাদের কাজ হচ্ছে বা হওয়া উচিত, যাদের আমরা এত কাল নির্লজ্জভাবে শোষণ করেছি, যাদের নীচুতে আমরা নামিয়ে এনেছি, যাদের সঙ্গে আচরণে আমরা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছি, সেই জনসাধারণকে উপরে ওঠানো, আমাদের কর্তব্য ছিল তাদের পথপ্রদর্শক হওয়া, তাদের রক্ষা করা।"

বিবেকানন্দ যুগের এই কাজে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ যখন আর্যাবর্ত ভ্রমণ করে দাক্ষিণাত্যের ওপর দিয়ে চলছিলেন তখন ভারতবর্ষের কঙ্কালসার মূর্তির নগ্নতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে বেদনায় অভিভূত করে দিলো। ক্ষুধাতুর অর্ধ-উলঙ্গ লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর ম্লান মুখচ্ছবি তাঁর স্বপ্নের মধ্যেও আনাগোনা করতে লাগলো। মনের মধ্যে দিবারাত্রি উঠছে কেবল তাদেরই চিন্তার তরঙ্গ! অবশেষে

যখন কুমারিকা অন্তরীপে স্বামীজী পৌছালেন তখন জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দেবার পথ খুঁজে পেলেন যারা সকলের নীচে, সকলের পিছে সেই সর্বহারাদের ধূলিধূসরিত নগ্নপদপ্রান্তে।

এরপর স্বামীজীর আমেরিকা গমন। চিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর কম্বুকণ্ঠের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে হিন্দুধর্মের মর্মবাণী ধ্বনিত হলো। সেই বাণী পাশ্চাত্য কান পেতে শুনলো শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক। আমেরিকায় স্বামীজী সেই অভিযানের চরম সাফল্যের মুহূর্তেও তার স্বদেশের বুভুক্ষু দরিদ্রনারায়ণদের কথা ভুলতে পারেননি। ধনকুবেরদের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বিলাসের সহস্র উপকরণের মধ্যে তিনি ঘুমাতে পারছেন না তাঁর স্বদেশের ক্ষুধার্ত জনসাধারণের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। আমেরিকা থেকে ঐ সময়ে লেখা স্বামীজীর চিঠির পর চিঠিতে জনসাধারণের জন্যে তাঁর অসীম সহানুভূতির প্রকাশ রয়েছে।

উপনিষদে আমরা পড়েছি—পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব।

যুগের কর্ণে স্বামীজী নূতন বাণী শোনালেন, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' "For the next fifty years this alone shall be our keynote —this, our great Mother India. Let all other vain gods disappear for that time from our minds. This is the only god that is awake, our own race—'everywhere his hands, everywhere his feet everywhere his ears, he covers every thing'. All other gods are sleeping."

কিন্তু অজ্ঞানের ঘন-মেঘে আচ্ছন্ন জড়প্রায় জীবন্মৃত জনসাধারণকে মনুষ্যত্বের প্রদীপ্ত মহিমার মধ্যে কেমন করে প্রাণচঞ্চল করে তুলবেন তিনি? ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং থেকে লেখা চিঠিতে এই প্রশ্নের তিনি জবাব দিয়েছেন। ঐ চিঠিতে আছে: "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। ... কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম।"

ভারতবর্ষের আশাহত জড়পিণ্ডবৎ জনসাধারণকে আত্মবিশ্বাসে ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে শক্তিমান করে তুলবার জন্যে স্বামীজী তাই বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা আপনার গুরুদেব সম্পর্কে লিখেছেন, "strength, strength, strength was the one quality he called for in woman and in man." "শক্তি, শক্তি, শক্তি। নর-নারীর মধ্যে এই শক্তিকেই তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।" স্বামীজীর কণ্ঠে শক্তিরই আবাহনগীতি। সমস্ত উপনিষদে তো এই শক্তিরই জয়ধ্বনি। স্বামীজী, তাই, নিবেদিতাকে একদা বলেছিলেন, So I preach only the Upanishads If you look you will find that I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads it is only that one idea—strength.

স্বামীজীর Vedanta and Indian Life বক্তৃতায় আছে: People get disgusted many times at my preaching Advaitism. I do not mean to preach Advaitism or Dvaitism or any ism in the world. The only ism that we require now is the wonderful idea of the Soul—Its eternal might, Its eternal strength, Its eternal purity and its eternal perfection."

"আমার মুখে অদ্বৈতবাদ শুনে লোকে অনেক সময় বিরক্ত হয়। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ বা পৃথিবীর অন্য কোন বাদ আমি প্রচার করতে চাই না; একমাত্র যে 'বাদ'-এ আমাদের এখন প্রয়োজন আছে, সেটি হচ্ছে আত্মাসম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা—আত্মার অনন্ত শক্তি, আত্মার অন্তহীন নির্মলতা, আত্মার নিত্য পূর্ণতা।"

স্বামীজী আবার বলছেন, "Let me tell you, strength is what we want. And the first step in getting strength is to uphold the Upanishads, and believe—I am the Soul". "আমি তোমাদের বলছি, আমাদের এখন প্রয়োজন শক্তি, আর এই শক্তি অর্জনের প্রথম সোপান হচ্ছে উপনিষদকে ধারণা করা এবং বিশ্বাস করা যে 'আমি হচ্ছি আসলে আত্মা'।" সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অপরাজেয় সেই আত্মা, যাকে তরবারি ছেদন করতে পারে না, আগুন পোড়াতে পারে না, বাতাস শুকাতে পারে না।

আসলে বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তি মন্ত্রেরই উপাসক। তিনি বিশ্বাস করতেন দুর্বলতাই সকল পাপের, সকল অমঙ্গলের মূল কারণ। কম্বুকণ্ঠের ওজস্বিনী ভাষায় কতবার তিনি জলদমন্দ্রে ঘোষণা করেছেন, "Know that all sins and all evils can be summed up in that one word, weakness". আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর—এই প্রার্থনাই নিরন্তর তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হোতো। নিবেদিতা নিজের গুরুদেব সম্পর্কে The Master as I saw Him গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন: How often did the habit of the monk seem to slip away from him and the armour of the warrior stand revealed. 'কতবার দেখেছি তাঁর অঙ্গ থেকে সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন খসে পড়েছে এবং ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যোদ্ধার বর্ম।'

নিবেদিতার এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য! বিবেকানন্দ নিঃসংশয়ে তৈরী হয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের কঠিন ধাতুতে। জীবন তাঁর কাছে ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পদে পদে বাধা। বাধার শেষ নেই, সংগ্রামেরও শেষ নেই। পরাজয়েরও কি শেষ আছে? যেখানে একটা সংগ্রাম শেষ করে তরবারি কোষবদ্ধ করতে উদ্যত হচ্ছি সেখানে কোথা থেকে আহ্বান আসছে নূতনতর, কঠিনতর এবং বৃহত্তর সংগ্রাম সুরু করবার। আরামের লোভে, দুঃখের ভয়ে যদি সংগ্রামকে এড়িয়ে চলি বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় কুড়াতে হবে সকলের ঘৃণা, পড়ে থাকতে হবে সকলের পশ্চাতে, সকলের পদতলে।

তাইতো তরুণ ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ যে-ডাক দিয়েছেন সেই ডাকের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে অতন্দ্র প্রহরীর তূর্যনাদ। এই বর্ম-পরা ক্ষাত্রবীর্যে দুর্জয় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে আজ আমরা জানাবো, তাঁর আগ্নেয়-বাণীর বিপুল তাৎপর্যকে আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করবো। কারণ আজ আমাদের

সব চেয়ে প্রয়োজন শক্তিসাধনার। শরীরে, মনে, আত্মায় আমাদিগকে সর্বাগ্রে বলিষ্ঠ হতে হবে।

স্বামীজী বললেন, জাতি হিসাবে আমরা বাক্‌সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। কেননা শরীরে মনে আমরা দুর্বল। সর্বাগ্রে দেহে মনে আমাদের যুবকদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তখন শক্তির পিছু পিছু ধর্ম আসবে। First of all, our young men must be strong. Religion will come afterwards. নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—এই বাণী স্বামীজীর কণ্ঠে কতবার উৎসারিত হয়েছে !

কিন্তু গোড়াতেই যদি গলদ থেকে যায় অর্থাৎ নিজের উপরে যদি বিশ্বাসের বিন্দু-বিসর্গ না থাকে অর্থাৎ আমি কোন কর্মেরই নই—এই ধারণা যদি কারও মনের মধ্যে শিকড় গাড়ে তবে তো তাকে দিয়ে পৃথিবীতে কিছুই করানো যাবে না। আত্ম-অবিশ্বাসে তার বাহু নিশ্চল নির্বীর্য হয়ে থাকবে। তাই স্বামীজী বারম্বার বললেন: Believe, therefore, in yourselves. The secret of Advaita is—Beleive in yourselves first, and then believe in anything else. আগে নিজেদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করো, তার পর অপর কিছুতে বিশ্বাস কোরো।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা মূল্য আছে। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি পৃথিবীকে এমন-কিছু দেবার জন্যে যা আর কেউ দিতে পারে না। এই রকমের একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তবেই না মানুষ নিজেকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করতে পারে! তাই যে-মানুষ নিজেকে অপরিমেয় মূল্য দিয়ে থাকে আর যে-মানুষ নিজেকে কোন মূল্যই দেয় না—এ দুয়ের অপরাধ পাশাপাশি রাখলে হীনম্মন্যের অপরাধের কাছে দুর্বিনীতের অহঙ্কারের অপরাধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিক চেষ্টারটন (G. K. Chesterton) কবি ব্রাউনিং-এর কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: The crimes of the devil who thinks himself of immeasurable value are as nothing to the crimes of the devil who thinks himself of no value.

উপরে স্বামীজীর যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তাদের মুকুরে একটি বিপুল সত্যকে আমরা প্রতিবিম্বিত দেখতে পাই। এই সত্যটি হলো অধঃপাতিত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান শক্তি-অর্জনের মধ্য দিয়ে। উপনিষদের আশ্রয়-গ্রহণ একটা হীনবীর্য, নির্জীব জাতিকে প্রাণ-চাঞ্চল্যে জীবন্ত করবার জন্যে। উপনিষদ বলেছে, দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করার মূঢ়তাই সমস্ত দুর্বলতার মূলে। আসল মানুষটাতো আত্মা। সেই কথাই ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়:

যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়,
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ড-পল-গুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

'মুক্তধারা' নাটকে শিবতরাইয়ের রাজদ্রোহী ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজশক্তির দম্ভকে ভাঙবার জন্যে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। মারের ভয় থেকে তাদের মনকে মুক্ত করবার জন্যে ধনঞ্জয় তাদের হাতে তুলে দিয়েছে আত্মিক শক্তির অনুপম অস্ত্র। উত্তরকালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের নিরস্ত্র জনসাধারণ আত্মার দুঃখ-বরণের সীমাহীন শক্তিকে আশ্রয় করেই বৃটিশের মারের সাগর পাড়ি দিয়েছিল। পুলিশের লাঠির ঘায়ে সত্যাগ্রহীদের মাথার খুলি চৌচির হয়ে ভেঙে যাচ্ছে—এইতো রাজদ্রোহের অনিবার্য পরিণাম

এবং সেই প্রচণ্ড মারের মুখে লাগছে না বলা কত শক্ত! যাতে শিবতরাই-এর বিদ্রোহী প্রজারা মাথা তুলে বলতে পারে লাগছে না তার জন্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী গণেশ সর্দারকে বলেছে, "আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।"

অন্যায়ের কাছে বশ্যতা স্বীকারই অন্যায়ের স্পর্ধাকে অটুট রেখেছে। বশ্যতা-স্বীকারের মূলে ভীরুতা। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে সে শক্তি রাখে বিদ্রোহীকে মেরে ফেলবার। 'রক্তকরবী'র রাজা এই মারের ভয় দেখিয়েই বিদ্রোহিণী নন্দিনীকে বলেছে, "আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারি।" প্রাণ হারাতে আমরা স্বভাবতই ভয় করি। আঘাতের যন্ত্রণাকে আমরা ভয়ে এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু ভয়ের মূলে তো দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা। আসল মানুষটা যে আলোর শিখা এবং দেহটা যে আমার একটা বাহন মাত্র, এই সত্য সম্পর্কে জনসাধারণ অচেতন হয়ে আছে। যে-মুহূর্তে তারা আপনাদিগকে জানবে অনন্ত শক্তির আধার ব'লে তাদের মধ্যে জাগবে সত্যের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে যে-কোন দুঃখের অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বার মহাবীর্য।

সমস্ত দুর্বলতা, ভীরুতা, ক্লীবতা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্যে বিবেকানন্দ দিগন্তপ্রসারী জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন দেশ-জোড়া মূঢ়তার তমসার বিরুদ্ধে। বেদান্তকে করেছিলেন তার হাতিয়ার। বেদান্ত মানুষের সম্মুখে তার সত্যপরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছে। আসল মানুষটি অনন্ত শক্তির আধার আত্মা—এই পরম ঘোষণা বেদান্তের কণ্ঠে!

কিন্তু বেদান্তের আত্মতত্ত্ব তো গুহায় নিহিত রয়েছে! উপনিষদ্ তো সন্ন্যাসীদের মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে আছে। বনের বেদান্তের বাণীকে যদি সর্বসাধারণের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, আত্মা যদি আপামর-জনসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগবে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের জাগরণের ফলে তারা একটা মহৎ আদর্শের জন্যে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতেও কুণ্ঠিত হবে না। বিবেকানন্দ তাই বললেন, আত্মবিশ্বাসে ভারতবর্ষকে বলীয়ান করবার জন্যে বেদান্তকে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নামিয়ে আনো হিমালয়ের অরণ্যের ছায়া থেকে। "It must come down to the daily, everyday life of the people; it shall be worked out in the palace of kings, in the cave of the recluse, it shall be worked out in the cottage of the poor, by the beggar in the street, every where any where it can be worked out." উপনিষদের আত্মতত্ত্ব নিয়ে কুটীর থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র আলোচনা চলেছে, অদ্বৈততত্ত্বের বহুল প্রচারের ফলে আত্মকেন্দ্রিকতার মৃত্যু-জাল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসছে এবং সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুঞ্জয় এক একটি পুরুষ-সিংহ হয়ে উঠেছে—এ মহান স্বপ্ন বিবেকানন্দের সমস্ত অন্তরকে জুড়ে ছিল। বিবেকানন্দ যাঁকে মার্কিন সন্ন্যাসী বলতেন সেই কবি ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যানেরও বর্ণনায় সেরা সহরের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, where speculations on the soul are encouraged.

রবীন্দ্রনাথ জাতিকে পান করিয়েছেন উপনিষদেরই এই সঞ্জীবনী রস তাকে

সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত করবার জন্যে। নৈবেদ্যের কবিতাগুলি মূলতঃ উপনিষদের প্রেরণায় রচিত এবং তাদের অনেকগুলিতে মাভৈঃ মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। একটা কবিতা এখানে উদ্ধৃত করলাম যার মধ্যে উপনিষদে বিঘোষিত বীর্যের আদর্শের জয়ধ্বনি।

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে।

আর গান্ধীজী তো পরিষ্কার করেই বলেছেন: "power resides in the people এবং আমি গত একুশ বৎসর ধ'রে চেষ্টা করে আসছি এই সহজ সত্যটুকু জনসাধারণকে বুঝাবার জন্যে যে তারাই শক্তির আধার, পার্লামেণ্ট নয়। গান্ধীজীর আহ্বানে যখন জনসাধারণ Civil Disobedience আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরম দুঃখকে বরণ করে নিলো এবং হাজার হাজার মানুষের সেই দুঃখ-বরণের ফলে বৃটিশ-শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তখন আত্মা সত্য—এই তত্ত্বই কি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো না? বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন, আত্মার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাসী ভারতের জনসাধারণ আপনাদিগকে দুর্বল ও অধম মনে করার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে বাধার পর বাধাকে জয় করতে করতে সাফল্য থেকে সাফল্যের শিখরে চলেছে। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের হাতে বিশ্ববিজয়ের পতাকা। আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি কলকাতায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে আছে: India must conquer the world, and nothing less than that is my ideal.

কিন্তু একমাত্র স্বাধীন বলিষ্ঠ ভারতবর্ষের কথাই পৃথিবী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে। আর আত্মার শক্তির অদ্ভুত প্রকাশই তো শ্রীরামকৃষ্ণের শুচি-শুভ্র জীবনে। তাঁর জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, it is the most marvellous manifestation of soul-power that you can read of, much less to expect. বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে উপনিষদের আত্মার শক্তিরই জয়ধ্বনি। রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই ধ্বনিই শুনতে পাই। গান্ধীজীর অহিংস গণবিপ্লবের মধ্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো, সকলের মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান এবং আত্মার অদ্ভুত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতি সাধারণ মানুষও দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

কিন্তু অপূর্ণ থেকে যাবে এই আলোচনা যদি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক উদ্বোধিত নব্য ভারতের শক্তিসাধনা প্রসঙ্গে এই সঙ্গে স্মরণ না করি স্বদেশের সেই প্রাতঃস্মরণীয় রণগুরু, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমন্বয় মূর্তি সুভাষচন্দ্রকে যিনি শক্তির জয়ধ্বনি করলেন, নতুন ভারতের মর্মে প্রতিষ্ঠিত করলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে যাঁর কণ্ঠে—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(২) শব্দ

প্রকৃতির যে বিশেষ ঘটনা আমাদের কানে অনুভূতি আনে তাই শব্দ। একটু বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায় যে শব্দের সঙ্গে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে জড়িত; একটি হ'ল শব্দের উৎস, দ্বিতীয়টি হ'ল শব্দের প্রসারণ, তৃতীয়টি হ'ল আমাদের কান—যা দিয়ে শব্দকে অনুভব করা হয়। একভাবে দেখতে গেলে আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কান হ'ল সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। শত শব্দের মধ্যে কান একটি বিশেষ শব্দকে বেছে নিতে পারে। অসংখ্য যন্ত্রের ঝনঝনার মধ্যে প্রত্যেকটি যন্ত্রের সুর আমাদের কানে আলাদাভাবে ধরা পড়ে। শব্দের উৎসের বৈশিষ্ট্য এবং দূরত্ব সম্পর্কে ধারণাও কান সহজেই আমাদের এনে দেয়। শব্দের এই গুণগুলি আমাদের কাছে এমনিতে সহজ ও সাধারণ বলেই মনে হয়, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের অশেষ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও শব্দকে ধরার জন্য কানের মত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কানের এই গুণাগুণ বুঝতে হ'লে আমাদের শরীরতত্ত্ব এবং বিভিন্ন অনুভূতির গোড়ার কথা জানা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত তা আমাদের পুরোপুরি জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শব্দের উৎস এবং প্রসারণ সংক্রান্ত সব কথাই জানা গেছে।

দেখা গেছে শব্দ উৎস থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সবসময়ে একটি মাধ্যম ব্যবহার করে। সাধারণ অবস্থায় বায়ুই এই মাধ্যমের কাজ করে। খুব সহজ একটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, যদি শব্দের উৎস ও গ্রাহকের মধ্যবর্তী জায়গায় কোন বস্তু না থাকে তাহলে শব্দ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পারে না। একটি কাঁচের জারের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা রেখে যদি বাজানো যায় তাহলে জারের বাইরে ঘণ্টাটির শব্দ শোনা যায়, কিন্তু জারটিকে পাম্প ব্যবহার করে বায়ুশূন্য করা হ'লে আর বাইরে শব্দ শোনা যায় না। কাজেই ঘণ্টাটি যে শব্দ তৈরী করে তা জারের বায়ুকে আশ্রয় করেই দূরবর্তী জায়গায় পৌঁছায়। পদার্থ যে কোন অবস্থায়ই শব্দকে প্রসারিত করতে পারে। বায়বীয়, তরল বা কঠিন যে কোন পদার্থই শব্দের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে শব্দকে প্রসারিত করার কাজে বিভিন্ন পদার্থের ক্ষমতায় তারতম্য আছে। কঠিন পদার্থই শব্দকে খুব সহজে প্রসারিত করতে পারে। তরল পদার্থে প্রসারণের সময় শব্দের জোর খুব কমে যায়। আর বায়বীয় পদার্থে প্রসারণের ক্ষমতা নির্ভর করে তার ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও চাপের উপরে।

শব্দ উৎস থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে কিছু সময় নেয়। বিদ্যুৎ চমকাবার সময়ে এটা খুব সহজেই ধরা পড়ে। বিদ্যুৎ চমকালে আলো ও শব্দ একই সময়ে তৈরী হয় কিন্তু আমরা আলো দেখবার অনেক পরে শব্দ শুনতে পাই। কত সময়ের পরে শব্দ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাবে তা শব্দের উৎসের দূরত্ব ও মাধ্যমের উপরে নির্ভর করে। শব্দ কোন একটি বিশেষ গতি নিয়ে প্রসারিত হয়; এই গতিবেগ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের এবং তা নির্ভর করে মাধ্যমের তাপমাত্রা, চাপ এবং আরোও কয়েকটি গুণের উপরে। এথেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, যখন শব্দসৃষ্টি হয় তখন শব্দের উৎস মাধ্যমে

কোন বিশেষ ধরনের পরিবর্তনের সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তন নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কানে বায়ুর এই পরিবর্তিত অবস্থাই শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয় তা নিয়ে অনুসন্ধান করলে মাধ্যমে শব্দ-প্রসারণের সময়ে যে পরিবর্তন হয় তা বোঝা যেতে পারে। আমরা কথা বললে, কোন বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করলে, কোন ধাতব পদার্থকে হঠাৎ মাটিতে ফেললে, হাততালি দিলে, জোরে বায়ু বইলে, দুটি জিনিসে ঘর্ষণ করলে—এমনি অসংখ্য রকমের ঘটনায় শব্দ উৎপন্ন হয়। এই অসংখ্য ঘটনাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখন শব্দের উৎসটি কাঁপতে থাকে তখনই শব্দ সৃষ্ট হয়। এটা সকলেরই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, যখন ধাতব পাত্রে হঠাৎ আঘাত লেগে শব্দ সৃষ্ট হয় তখন পাত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে রাখলে শব্দ বন্ধ হ'য়ে যায়। তারের বাদ্যযন্ত্রে যখন শব্দ তৈরী হয় তখন তারটির কম্পন তো চোখেই ধরা পড়ে বা তারটিতে হাত দিয়েও অনুভব করা যায়। কোন জিনিস যদি খুব তাড়াতাড়ি কাঁপতে থাকে তাহলেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ধরনের শব্দের যে অনুভূতি আমাদের হয়, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সেগুলি শব্দের উৎসের কম্পনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। এই বিশেষত্বকে তিনটি গুণ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। একটি কম্পনের অঙ্ক, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে উৎসটি কতবার কাঁপে। দ্বিতীয়টি হ'ল কম্পনের বিস্তার, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা থেকে উৎসটি কাঁপনের সময়ে দুদিকে কতটা এগিয়ে যায়—তৃতীয়টি হ'ল কম্পনরূপ বা ঠিক কি ভাবে কাঁপছে। কম্পনাঙ্কের তারতম্য আমাদের মোটা বা সরু গলার অনুভূতি আনে। যদি কোন শব্দের কম্পনাঙ্ক খুব বেশী হয় তাহলে সেই শব্দ আমাদের কাছে সরু বলে মনে হয়; আবার কম্পনাঙ্ক যদি কম হয় তাহলে মোটা বলে মনে হয়। কম্পনের বিস্তারের উপরে নির্ভর করে শব্দটি জোরালো কি আস্তে হচ্ছে সেই অনুভূতি। বিস্তার যদি বেশী হয় তাহলে শব্দটি জোরালো মনে হয় এবং যদি কম হয় তাহলে মনে হয় শব্দটি আস্তে হচ্ছে। কম্পনরূপের উপর নির্ভর করে কোন শব্দের নিজস্বতা। একই কম্পনাঙ্কের এবং একই বিস্তারের যদি দুটি শব্দের কম্পনরূপ আলাদা হয় তাহলে শব্দ দুটি বিভিন্ন বলে মনে হয়। এই কারণেই বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের একই রকম জোরাল একই সুর আলাদা বলে মনে হয়। যখন "সা" সেতারে এবং বেহালায় বাজানো হয় তখন কম্পনাঙ্ক একই থাকে কিন্তু সেতারের সা ঠিক বেহালার সা-র মত শোনায় না।

শব্দের উৎসের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উৎসের বিভিন্ন ধরনের কম্পন থেকেই শব্দের বিচিত্রতা আসে। আমরা যখন শব্দ শুনি তখন বায়ুই এই কম্পন আমাদের কানে পৌঁছে দেয়। উৎসটিকে ঘিরে থাকে বায়ু এবং কম্পনের সময়ে বায়ুর অণুগুলিতে ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কার ফলে বায়ুর অণুগুলিও কাঁপতে আরম্ভ করে এবং বায়ুর ঘনত্ব পরিবর্তিত হয়। ঘনত্বের পরিবর্তন বায়ুতে তরঙ্গের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেমন কোন পুকুরে ঢিল ছুড়লে পুকুরের জলের সব অণুগুলি ওঠা-নামা আরম্ভ করে এবং তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। জলের তরঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জল যেন তরঙ্গের কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আসলে এটা আমাদের দৃষ্টিভ্রম। জল ছড়িয়ে পড়ে না, শুধুমাত্র অণুগুলির ওঠানামাই ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ছোটবেলার ঢিল ছুড়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে ভাসান নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকেই এই উক্তির

সত্যতা বোঝা যায়। জলের তরঙ্গের মতই শব্দের উৎস যখন বায়ুতে শব্দতরঙ্গ তৈরী করে তখন বায়ুর অণুগুলিতে উৎস থেকে কাঁপন সঞ্চারিত হয় এবং অণু থেকে অণুতে এই কাঁপন ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের কানে অণুগুলির কাঁপনের ধাক্কাই শব্দানুভূতির সৃষ্টি করে।

দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর কম্পমান অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিই হ'ল শব্দ। যদি কোন বস্তু গতিশীল হয় তাহলে বস্তুটির গতিজনিত শক্তি থাকে। অন্যান্য সব শক্তির মতই এই গতিজনিত শক্তি থেকে আমরা কাজ পেতে পারি। বায়ুচালিত যন্ত্রে গতিশীল বায়ু ব্যবহার করে যন্ত্র চালানো হয়। যন্ত্রের চাকা বায়ুর ধাক্কায় ঘুরতে আরম্ভ করে এবং এই ঘূর্ণমান চাকাটি বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গতিশীল জল-ধারার শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এ দুটি ক্ষেত্রে বায়ু বা জলধারার গতিবেগ সবসময়ে একই দিকে থাকে। কিন্তু গতির দিক যদি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, যেমন হয় কম্পমান জিনিসের গতিতে, তাহলেও বস্তুটির এমনি শক্তি থাকে। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে কম্পমান বস্তুর শক্তি প্রমাণ করা যায় না—কিন্তু যদি ভাবা যায় যে কোন বস্তুকে কম্পমান করতে হ'লে শক্তি ব্যয় করতে হয় এবং মনে রাখা যায় যে শক্তির মোট পরিমাণ ধ্রুব, তাহলেই বোঝা যায় কম্পমান অবস্থায় বস্তুটিতে শক্তি থাকবে। অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায় যে বস্তুর গতিজনিত শক্তি গতিবেগের বর্গের সমানুপাতিক। কাজেই গতিবেগের দিক পরিবর্তন করলে শক্তি একই থাকে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কম্পমান বস্তুর শক্তি সাধারণভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে কেননা কম্পমান বস্তুর গতিবেগের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় কিন্তু কম্পমান বস্তুর গড়ে একটি শক্তি থাকবে। একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'র‍্যালে ডিস্ক', ব্যবহার করে অধ্যাপক র‍্যালে কম্পমান বস্তুর শক্তিও অন্যান্য শক্তির মতই বিশেষভাবে প্রমাণ করেন। র‍্যালে ডিস্কের উপরে যখন শব্দ করা হয় তখন ডিস্কটি ঘুরতে থাকে যেমন বায়ুচালিত যন্ত্রের চাকা হাওয়ায় ঘোরে। বর্তমানে আরো অনেক নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলিতে কম্পমান বস্তু বা বায়ুতে শব্দের শক্তিকে সোজাসুজি বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিশব্দ (Ultrasonic) ব্যবহারকারী যন্ত্রগুলি। যদিও বায়ুতে কম্পন হ'লেই শব্দ উৎপন্ন হয় কিন্তু আমাদের কানের ক্ষমতা সীমিত হওয়ার ফলে শুধুমাত্র কম্পনাঙ্ক প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ১৫,০০০ হাজারের মধ্যে হ'লেই আমাদের শব্দের অনুভূতি আসে। কম্পনাঙ্ক এর কম বা বেশী হ'লে আমরা সে কম্পনকে অনুভব করতে পারি না। যদি বায়ুর কম্পন এমনি হয় যে কম্পনাঙ্ক পনের হাজারের বেশী তাহলে এই কম্পনকে অতিশব্দ বলা হয় কেননা এই কম্পন আমাদের শুনতে পাওয়া শব্দের মতই, কিন্তু কম্পনাঙ্ক সে শব্দের চেয়ে বেশী। এমনি অতিশব্দ ব্যবহার করে আজকাল কাচ বা অন্যান্য ভঙ্গুর জিনিস কাটা হচ্ছে ঠিক যেমন বিভিন্ন ধাতুর জিনিস ধারালো যন্ত্র দিয়ে কাটা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শব্দ হ'ল শক্তির এক ধরনের প্রকাশ। এই শক্তি বস্তুকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়। একভাবে বলা যেতে পারে কম্পমান বস্তুর শক্তিই হ'ল শব্দ এবং এই শক্তি আমাদের কানে এসে পৌছালে আমরা শব্দকে অনুভব করি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা ও নাসিকা সোজাসুজি বস্তুকে অনুভব করে। আর কান অনুভব করে এক ধরনের বস্তুআশ্রয়ী শক্তিকে। অপর দুটি ইন্দ্রিয় অনুভব করে বস্তুনিরপেক্ষ শক্তি আলো ও তাপকে।

রাজস্থানের মেলা উৎসব ও ব্রত পার্বণ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

আনুষ্ঠানিক বার ব্রত পার্বণ সব দেশেই সব জাতেই চিরদিন আছে; পুরানো ধারাটি থাকে আবার বদল হয়। নতুন ধারা আসে, পুরোনোকে বদলায়, নতুন রূপ দেয়, তবু একটি ধারা থেকেই যায়।

সব দেশের মত রাজস্থানেও নানা ধারার নানা শাখাপ্রশাখায় মানুষের উৎসব পার্বণ ছিল। এখনো আছে যদিও রাজতন্ত্র উঠে যাবার পর মেলায় জৌলুষ উৎসব আর তেমন নেই।

এই সব মেলা পার্বণ উৎসবের কিছুটা বার ব্রত পার্বণ পর্যায়ে; কিছু শুধু ব্রত, কিছু শুধু পার্বণ উৎসব, কিছু তার শুধু পূজা পার্বণের অঙ্গ মন্দির-দেবালয়ে; আবার তার কতকগুলি মেলা পার্বণ ব্রত একেবারে সর্বভারতীয়। যেমন বছরের প্রথম থেকেই ধরি জন্মাষ্টমী। এটি একেবারে সর্বভারতীয় পূজা পার্বণ ব্রত পালন ব্যাপারের অঙ্গ। এতে মেলা সেই, উৎসবও সেই, জনসাধারণের একেবারে মন্দির-দেবালয়ের ব্রত পার্বণ অনুষ্ঠান। পূজা উপবাস হল প্রধান অঙ্গ। এমনি হল পরবর্তী একটি সমস্ত ভারতের পার্বণ উৎসব—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিম সভ্য নগরবাসী গ্রামীণ আদিবাসী সকলের উৎসব —এ হল দেওয়ালী।

দীপাবলী। দীপান্বিতা কার্তিকী অমাবস্যা। এটি একেবারে উৎসব পার্বণ মেলা কালীপূজা লক্ষ্মীপূজা ব্রত—সব মিশানো পার্বণ।

এই দেওয়ালীতে সাধারণ ঘরে ঘরে দীপমালা দান ছাড়াও লক্ষ্মীপূজা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গজলক্ষ্মীপূজা, পরিজনদের মিষ্টান্ন খাওয়ানো পাঠানো, বিজয়াদশমীর মত আমাদের, নতুন কাপড় দেওয়া তত্ত্ব করা আপনজনদের; বাড়ী পরিষ্কার করা, রং করা, চুনকাম করাও হল দেওয়ালীর একটা বিশেষ কাজ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছর দেওয়ালীর আগের ত্রয়োদশীতে ধনতেরস্ (ধনত্রয়োদশী) বাসনপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে কেনা হয়; রাজস্থানে বম্বে-গুজরাটে বিশেষ করে কিছু না হলে একটি চামচও কেনা চাই। ধনতেরমের পরদিন হয় ভূতচতুর্দশী সেদিন হল আমাদের দেশের 'চোদ্দ প্রদীপ'-দান, 'চোদ্দ শাক'-ভক্ষণ, উত্তরপশ্চিম ভারতে হল ছোট 'দেওয়ালী'; তার পরদিন ওদেশে এদেশে মহালক্ষ্মী মহাকালী পূজার অমাবস্যা। সেদিন আমাদের হল কালীপূজা তো বটেই, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে অলক্ষ্মী-বিদায়। তারপর দিনটি হল রাজস্থানের 'দ্যূত' প্রতিপদ (জুয়াখেলা অবাধে) এবং গোবর্ধনের মেলা উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণ মেলার উৎসব আবার সঙ্গে রাজ্যের যত গোধন বলীবর্দ আছে সকলের অর্চনা—শিং রাঙিয়ে দেওয়া লাল নীল রঙে, ক্ষুর ধুইয়ে দেওয়া, খাবার দেওয়া বিশেষ করে।

এর পরবর্তী সর্বভারতীয় উৎসব ও মেলা হল হোলী। আমাদের দেশে দোলবিহার, ফাগুয়া বা হোলী পাঞ্জাবে উত্তরপ্রদেশে রাজস্থানে মাদ্রাজে, গুজরাট বম্বে মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা—প্রায় সব দেশেই হোলী বা দোল একই রকমের রঙের আনন্দের উৎসব;

আবার মন্দিরেও দেবতারও হোলী বা ফাল্গুনী পূর্ণিমার বসন্তোৎসব অভ্র-আবীরে রঙীন।

বছরের শেষ উৎসব ও পার্বণ ব্রত—এও সারা ভারতের ব্রত ও পার্বণ, মেলা ঠিক নয়—এ হল শ্রীশ্রীরামনবমী।

এইবার পাঁচটি বড পার্বণ ও উৎসব আমাদের হিন্দু সকলেরই প্রায় এক এবং একই রকমের। পূজা পাঠ, ব্রত উপবাস, খাওয়ানো, তত্ত্ব করা, তত্ত্ব পাঠানো, আর হোলীতে উন্মত্ত রং খেলা এসব সব প্রদেশেই সকলে করেন। মেয়েরা করেন স্নান দান উপবাস ব্রতপালন, পূজা-অর্চনা। পুরুষরাও ব্রত করেন, কম অবশ্য। আর সকলে করে উৎসবের হৈ হৈ আনন্দ প্রমোদ, যেমন হোলীর দিন, দেওয়ালীর দিন। মোটামুটি শাস্ত্র-আচার মেনে বা না মেনে এই কয়েকটি পূজাপার্বণে আমরা সমস্ত ভারতবাসী একেবারে এক জাতি ও এক ভাবময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চার বর্ণেরই উৎসব এক। মনে হয় 'চার আশ্রমী' বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধরাও এ উৎসবে মিশে যান, নিতান্ত সন্ন্যাসী দণ্ডী না হলে।

এখন বলি রাজস্থানের ছোটখাটো এবং বড় বড উৎসব-পার্বণের কিছু কথা, যা সেকালে—মানে ৬০।৭০ বছর আগের কালে ছিল, এখনো কিছু আছে, কিন্তু প্রায় নেই, রাজা-মহারাজের রাজত্ব উচ্ছেদের পর থেকে প্রায় উঠে গেছে।

'কাল'কে এই একপুরুষের নিমেষের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। 'কাল' 'মহাকালে'র গতিপথ কারুর জানা নেই। তবু যেন কোন খানে মানুষের মনে 'পুরোনো'র উপর হারানোর উপর একটু মোহময় মমতা থেকে যায়। তাই থেকে জন্ম নেয় ইতিহাস ও সেকালের কথা এবং পুরোনো কথা। হস্তিনাপুর বা দিল্লীর পুরোনো ধ্বংসাবশেষ, কোণারকের মন্দির-দেউল, কিংবা অজন্তা-ইলোরার মূর্তি-চিত্রাবলীর মত এই সব প্রথায় ও ঐতিহ্যে এক মোহ ও মহিমময় রূপ আছে।

রাজস্থানের সব প্রদেশের মধ্যে জয়পুর ও উদয়পুর বা মেবার দেশের উৎসবগুলোই বেশী প্রচলিত। যোধপুর মাড়োয়ার জশলমীর বিকানীর এগুলি প্রসিদ্ধ জায়গা হলেও সেসব জায়গায়ও বড উৎসবে প্রায় ভেদ নেই, ছোটোখাটো আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধ থাকলেও।

জয়পুরে বছরের প্রথম উৎসব মেলা হল বৈশাখ মাসে নৃসিংহ-চতুর্দশীতে 'নরসিংহের মেলা'।

নৃসিংহ মেলাটাই হল হিরণ্যকশিপুবধ নৃসিংহ অবতারের। প্রতি মেলারই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে, সওযারী বেরুলো মানে শোভাযাত্রা করে রাজকীয় চতুরঙ্গবাহিনী হাতী ঘোড়া (উট) রথ পদাতিক সৈন্য সমারোহে সাজিয়ে (কখনো কুচকাওয়াজ করতে করতে) বেরুলো। বিশেষ বিশেষ মেলায় তার বিশেষ অঙ্গ হল কোনোটিতে দেবীদর্শন, রাজদর্শন ও যুদ্ধযাত্রায় অভিনয় নানারকম।

নৃসিংহ মেলায় কিন্তু ঐ শোভাযাত্রাটা হত না। এটি যেন একটা 'যাত্রা'র মত। সহরের মাঝখানে এক চওড়া পথের ওপর একপাশে একটি প্রকাণ্ড বাঁধানো জায়গায় একটি মঞ্চ করে আসর হত। সাদা চাদর পাতা বিরাট আসর। তার একপাশে একটি কাগজের তৈরী মোটা মোটা স্তম্ভ বা থাম। তার কাছাকাছি ঝকমকে একটি চেয়ার পাতা। সেটি হল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনের প্রতীক আসন। সেই সিংহাসনে রাজপুত রাজাদের মত চৌগোপ্পা গালপাট্টা বাঁধা

জরীদার জাঁকজমকালো পোষাক ও গহনা পরা মাথায় পাগড়ী মুকুট শোভিত মহারাজা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু সমাসীন থাকতেন।

তাঁর পাশে প্রহ্লাদরূপী একটি ক্ষুদ্র রোগা টিঙ্‌টিঙে বালক দাঁড়িয়ে। তার কাছাকাছি তার গুরুমশাইরা—প্রসিদ্ধ ষণ্ড ও অমর্ক বসে। কিছু সেপাইসান্ত্রী ও চোপদার 'নকীব' রাজসভায় উপযোগী ভাবে দাঁড়াত।

আর রাস্তার এদিকে ওদিকে সর্বত্র আলো ফুল বাঁশী পুতুল খেলনার বাজার রঙে উজ্জ্বল ঝলমল, শব্দে মুখর হয়ে থাকত।

চারদিকের বাড়ীর ছাত প্রাঙ্গণ পথের ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য এবং সে-দেশীয় প্রথায় মেয়েদের মাঙ্গলিক গানে মুখর।

সেই মঞ্চ ও মণ্ডপ দর্শকে ভরা। তার মাঝে আমরা, বহু ছোট বড বালকবালিকা সমবেত হতাম।

সভাটি জমজমাট দর্শক ও অভিনেতাদের নিয়ে। আর চতুর্দিকের ছাতে সিঁড়িপথে রকে বাজারে তিলধারণের জায়গা নেই বল্লেই ঠিক হয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকও এসে সহরের মেলায় জড হয়েছে। ঘাগরা লুগড়ী (ওড়না) ভারি ভারি গহনা পরা ঘোর ফিকে লাল সবুজ নীল রঙের বসনে সজ্জিত মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে তারস্বরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীত গানে মেলা মুখর করে রাখত।

হেনকালে সন্ধ্যার ঘোর ঘোর সময়ে নকীবের ভেঁপু বা বাঁশী বেজে উঠত ভোঁ ভোঁ করে যাত্রা বা মেলার আরম্ভ হওয়ার নির্দেশ। আর হিরণ্যকশিপুর ক্ষুদ্র নকল রাজসভাটি তৎপর হয়ে উঠত।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানা প্রশ্নোত্তরের পর ক্রন্দনরত ভীত বালক প্রহ্লাদকে স-গর্জনে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোথায় তোর হরি? কোথায় সেই কৃষ্ণ? দেখাতে পারিস? কোথায় থাকে সে?' (তাঁর ভাইয়ের বধকারী শত্রু!)

প্রহ্লাদ জবাব দিচ্ছেন, 'তিনি সর্বত্র আছেন।' যদিও গলার স্বর শোনা যায় না—বালক অভিনেতার। কিন্তু প্রতি বছর দেখা এবং আবাল্য শোনা গল্প ছোট বড কারুরই বুঝতে বাধা হয় না।

হিরণ্যকশিপু আবার গর্জন করেন, 'এখানে আছে সে? এই থামের মধ্যে?'

প্রহ্লাদ বলেন, 'আছেন।

এবারে নাটকীয় ভাবে হিরণ্যকশিপু তাঁর তরোয়াল কোশমুক্ত করে থামের ওপর আঘাত করলেন।

কাগজের থাম ছিঁড়ে পড়ল।

আর দর্শক-এর শিশুসংঘ সভয়ে আচম্বিতে দেখল থামের ভিতর থেকে সোনালী ও রূপালী কেশরওয়ালা একটি সিংহ গর্জন করতে করতে বেরিয়ে দুই বাহু আস্ফালন করতে করতে হুঙ্কার দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে ধরে নিয়ে কোলের ওপর ফেলে তাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিল তাঁরই সিংহাসনে বসে। যদিও এদিকে সিংহের কেশরের জামার নিচের দিকটাতে চুড়ীদার পাজামা-পরা দুটি মানুষের পা দেখা যাচ্ছিল। তবু একে সন্ধ্যা, তাতে সিংহের ভয়াবহ গর্জন ও আকার হুঙ্কার দেখে শুনে সমবেত আমরা ছোটরা তখন ত্রস্ত। তারপর সুরু হত প্রহ্লাদের স্তব-স্তুতি। এবং জনতার জয় জয় রব হৈ হৈতে মেলাভঙ্গ।

এই হল বছরের প্রথম মেলা। এতে 'লওয়াজমা' 'সওয়ারী' (শোভাযাত্রা) রাজদর্শন ব্যাপারটা থাকত না। মেলার পথ তখন অন্ধকার, বিদ্যুৎহীন সেকালে। মিটমিটে আলোয় লোকে পুতুল, খাবার ও অন্যজিনিস কিনছে। পথে অবশ্য গ্যাসের আলো জ্বলত।

বৈশাখ মাসে এর পরে মেলার উৎসব না থাকলেও দেবালয়ে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী মদনমোহনের ছোট বড সব দেবালয়ে সারামাস-ব্যাপী উৎসব ফুল-সাজের।

গোবিন্দজীর 'ফুল বাংলা', অর্থাৎ 'পুষ্প-গৃহ' বা 'কুঞ্জালয়' রচনা, সারাটি মন্দির ফুলেফুলে সাজানো সেদিন। ফুলশিঙার হল (ফুল-শৃঙ্গার) শুধু বিগ্রহকে ফুলসাজে সাজানো। রত্নবেদী থেকে দেওয়ালের গা, সিংহাসনের সমস্ত অপূর্ব সুন্দর ফুলের কারুকাজ করা হয়, প্রায় সাদা ফুলে ডাকের চকচকে রঙীন কাগজ দিয়ে লাল নীল সবুজ সাদার ফুলকাজ। কখনো কখনো কোনো শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠ শেঠ ধনীরাও এই 'ফুলশিঙার' ফুল বাংলা উৎসব করেন দেবতার। মন্দিরকর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে সাধারণতঃ একদিনই হয়। মহারাজার তরফ থেকেও একদিন হয়। সেদিন সমস্ত মন্দিরের বাইরেও ফুলসাজ হত। একবার কোন শেঠ শুধু গোলাপফুলের 'শৃঙ্গার-বেশ' দেন দেবতার, সে এক অপূর্ব শোভা দেখেছিলাম। কবে বাল্যকালে, তবু মনে আঁকা আছে।

বৈশাখমাস ভোর দেবতাদের 'ঝারা' 'শীতল' বৈশাখী উৎসবও থাকে। তার সঙ্গে আর একটি উৎসব থাকে অক্ষয় তৃতীয়ায়। রাজস্থানে বলে 'আখাতীজ'। অক্ষয় দান পুণ্যের ব্রত নিয়ম এটি, জলদান, ব্রাহ্মণদের অন্নদান, ধনদান—নানাব্রতময় এটি। এইদিনে রাজকীয় কোষাগারের কিছু 'মোহর'কে রূপান্তরিত করা হত আরো চাপ দিয়ে চেপ্টে পাতলা করে। সেই মোহর দিয়ে সেদিন রাজারানীদের 'নজর' করার প্রথাও ছিল। ঐ তিথিতে বিশেষ একটি পুণ্যতিথির দরবার বসত।

এরপর জ্যৈষ্ঠ মাস। এ মাসে মেলা নেই, পার্বণ উৎসব কিন্তু মন্দিরে দেবালয়ে আছে—'জলযাত্রা'। অর্থাৎ স্নানযাত্রারই মত দেবতার স্নানাঙ্গ উৎসব। কিন্তু এদেশে বা জগন্নাথধামে ও অন্যত্র স্নানযাত্রা একদিন মাত্র হয়, আর অন্য রকমের অঙ্গরাগময় স্নানের উৎসব।

এ হয় বৈশাখ সংক্রান্তি থেকে একাদশী, দুটি পূর্ণিমা নিয়ে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি অবধি। একটু অন্য ধরনের এ স্নান—শীতল উৎসব। গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন সকলেরই মন্দিরের মাঝখানে ছোট ছোট ফোয়ারার মুখ আছে। মেঝের নীচে জলাধার, সেই আটদশটি ফোয়ারার মুখ খুলে দেওয়া হয়। বেলা বারোটা-একটা থেকে তিন-চারটে অবধি সেই ফোয়ারার জলে বিগ্রহ সিক্ত ও শীতল হন। সামনের দর্শকদের সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, সামনের প্রাঙ্গণ জলে থৈ থৈ করে। পুরোহিত-পূজারীরাও সিক্ত বস্ত্রে মালা চন্দন তুলসী বিতরণ করেন। তারপর ফোয়ারার মুখ বন্ধ করে দেবতার সিক্তবাস বদলে আরতি—গোধুলি-আরতি হয়। প্রায় সারাদিনের 'জলযাত্রা' ঐ পাঁচ দিন হয়। কখনো রাজকীয় বিশেষ বিশেষ দিনে আবার বাইরের প্রাঙ্গণের বাগানের ফোয়ারাগুলিও খোলা হয়। উত্তর-ভারতের দুর্ধর্ষ গরমের দিন। মানুষ জীবজন্তু ময়ুর পায়রা পাখীদেরও যেন জলে ভেজায় আনন্দের পর্ব পার্বণ হয় সেদিন। দেবতার ফোয়ারায় জলে ভিতরে ভিজে বসে থাকে। বাইরেও তেমনি লোক জড হয়।

আষাঢ় মাসের রথযাত্রা উৎসব কিন্তু গোবিন্দজীর দেশে নেই। গোবিন্দজী গোপী-নাথজী বাংলাদেশে জগন্নাথের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তাই রথযাত্রা এদিকে বাংলার সর্বত্র আছে। যদিও মন্দিরের গোবিন্দজী মন্দিরেই থাকেন নানানামে, কিন্তু জগন্নাথরূপে মূর্তিতে

তাঁকে রথযাত্রা করতেই হয় এদেশে। এই রথযাত্রাটি কিন্তু মনে হয় দক্ষিণের ও উৎকলের থেকে নেওয়া।

শ্রাবণে এসে পড়ে ঝুলন উৎসব। কোনো মন্দিরে পাঁচ দিন, কোথাও দশ দিন, কোথাও পনের দিন ধরে শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর ঝুলন উৎসব। দোলনা করে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহের দোলায় ঝুলনের উৎসব হয়। অবশ্য বিশ্বম্ভর-তনু 'বিগ্রহ' সিংহাসনপীঠেই সমাসীন থাকেন শ্রীরাধা-সহ। চারদিকের বেদীটি একটি রূপার ঝুলন আকারের ঘেরা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। উপরে থাকে দোলনার ডাণ্ডীটি। চার দিকে চারটি রূপার দণ্ড। সেইটিই নেড়ে দেন পুরোহিত-পূজারীরা—ঠিক মনে হয় বিগ্রহ ঝুলনে বসে দুলছেন। নড়ে শুধু বেষ্টনীটি।

এ তো গেল মন্দিরের উৎসবপ্রথা। দেশে কিন্তু শ্রাবণ-ভাদ্র সারামাস ঘরে ঘরে বনে বাগানে ছাতে দোলনা টাঙানো—আর তাতে দোলার ধুম পড়ে যায়। গাছে গাছে পথের ধারে দোলনা টাঙানো—'পাটকড়ি' নিয়ে আবাল-বৃদ্ধবনিতার দল জমে। বুড়া-বুড়ীদেরও দোলার শখ কম নয় সেদেশে। যত গান চলে—ঝুলনসঙ্গীত, কাজরীসঙ্গীত, মেঘের আহ্বান, তত সারাদিন 'দোলা' চলে। 'দোলনা' আর খালি থাকে না। যেখানে শক্ত গাছে ডাল সেখানেই ঝুলা।

এ ছাড়া এই শ্রাবণী ঝুলন পূর্ণিমার আর একটি নাম আছে রাখী পূর্ণিমা।

এই রাখী পূর্ণিমারও খুব মহৎ ও গভীর একটি ঐতিহ্য আছে। সমস্ত রাজস্থানে 'রাখী' যেন একটি বন্ধুত্বের প্রীতির শরণাগতির নির্ভরতার প্রতীকোৎসব-পূর্ণিমা, রাজোয়াড়ার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে। এই রাখীবন্ধন পূর্ণিমার একটি নিজস্ব মহিমময় গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতময় ভাব আছে। রক্ষাবন্ধন থেকে 'রাখী'বন্ধন কথাটি হয়েছে। রাজস্থানে গল্প আছে দুর্বাসা মুনির সময়ে এর প্রচলন হয়। তাতে জাতিধর্ম নরনারী নির্বিশেষে বন্ধুত্বের বন্ধন, ধর্মবন্ধন, কল্যাণ-বন্ধন, শরণাগতির বন্ধনের সুগভীর সুবিস্তৃত নিষ্ঠাময় আশ্চর্য পবিত্র মহিমময় ক্ষেত্র থাকে। অজানা অন্তঃপুরিকা অচেনা নরনারী একনিমেষে একটি সুতোর রাঙা রাখী পাঠিয়ে চিরকালের ভাইবোনের সম্পর্কের বন্ধন গ্রহণ ও বরণ করে নিতে পারেন। হয়ত চিরকালই দেখা চেনা পরিচয় হল না। ঐ পাতানো ভাইবোন সম্পর্কের দুটি মানুষে কিন্তু একটি সুগভীর স্নেহ, শ্রদ্ধাময় সম্পর্ক ও বিশ্বস্ত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

এ রাখীবন্ধন বহুকালের প্রথা। একই ভাবে আছে, কিন্তু এ বন্ধন যে কত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বন্ধন, সব সম্প্রদায় ধর্ম জাতি নির্বিশেষে, তারও ইতিহাস ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

চিতোরের মহারানা সঙ্গ—সংগ্রামসিংহের বিধবা মহারানী রাজমাতা কর্ণাবতী (করুণাবতী) এক সময়ে মাণ্ডু আর গুর্জর প্রদেশের সুলতান বাহাদুর দ্বারা চিতোর আক্রান্ত হলে হুমায়ুন বাদশাকে মণিমুক্তাখচিত একটি রাখী পাঠান —'রাখী-ভাই'রূপে বরণ করে। হুমায়ুন তখন বাঙলাদেশে বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।

এই রাজপুত রাখীবন্ধনের এমনি মহিমান্বিত খ্যাতি ও প্রভাব ছিল, মুসলমান সম্রাটের কাছেও, যে তিনি তখনি বাংলার দিক থেকে ফিরে এলেন, আর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করে বললেন ব্রাহ্মণ দূত ও অন্য সাঙ্গোপাঙ্গোদের, 'এই রাজপুত-ভগিনীর রক্ষার জন্য আমার সব ঐশ্বর্য রথম্ভর দুর্গ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি।'

ফিরে তিনি এলেনও বটে, গুর্জর সুলতান বাহাদুরশাকে পরাজিতও করলেন, কিন্তু মহারানী রাজমাতা কর্ণাবতী তখন আর বেঁচে ছিলেন না। তেরো হাজার অন্তঃপুরবাসিনী পরিজন সপত্নী সখী সহচারিণীদের নিয়ে 'জহরব্রত' করে অগ্নি প্রবেশ করেছিলেন। বিজয়ী শত্রুর কবলে পড়ে লাঞ্ছনা অপমান মর্যাদাহানির আতঙ্কে সেকালের রাজপুত ঘরানার প্রথামত মৃত্যুই কাম্য মনে করেছিলেন।

সম্রাট হুমায়ুন না-দেখা 'শরণাগত রাখী-ভগিনী' রানা-মহিষীর সপরিজনে জহরব্রত পালনে মৃত্যুবরণে খুবই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। কিন্তু রানা সঙ্গের পুত্র মহারানা বিক্রমজিৎকে রাজ্য উদ্ধারে পূর্ণ সহায়তা করেন এবং রাজ্য-উদ্ধারও হয়। আর গুর্জর সুলতান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

'রাখী'বন্ধনের রাখীসম্পর্কের মহিমার এ একটি আশ্চর্য দিক। পুরুষের পৌরুষকে বাড়ায়, চরিত্রের দৃঢ়তা বাড়ায়, ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে, নরনারী নির্বিশেষে। অনেক সময়ে বিপন্ন নারী অথবা কোনো বিবাহে স্বয়ম্বরা হতে ইচ্ছুক মেয়েও এই 'রাখী' পাঠাতেন প্রিয়জনের উদ্দেশে ব্রাহ্মণের হাতে।

আবার এ বন্ধুত্বের নিদর্শন ও প্রীতি যেমন সমান সমান ও অসমান সম্পর্কে, বর্ণবিভেদেও, তেমনি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদেরও বিশেষ চিহ্ন এটি।

এই রাখীবন্ধনকে এখনো আমাদের ৺বিজয়ার প্রণাম আশীর্বাদ আলিঙ্গনের মত একটি জাতীয় উৎসবের আনন্দময় সম্পর্ক বলে ধরা হয়।

রাখীর গল্প অনেক আছে ছোট বড় সব ঘরেই।

তার মাঝে বলবার মত গল্প—"রাজস্থান"-লেখক তখনকার 'এজেন্ট'-প্রধান রাজপুতানার 'রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস'লেখক শ্রদ্ধেয় টড্ সাহেবের লেখায় পাই।

টড্ বলেন, অনেক রাজপুত মহিলার সঙ্গে তাঁর 'রাখী ভাই' সম্পর্ক হয়েছিল। রাজপুত প্রথামত তিনি সেই ভগিনীদের মণিমুক্তা-গাঁথা রাখীগুলি আনন্দিত হয়ে গ্রহণও করতেন। আর ওদেশের প্রথামত তিনটি কিংবা পাঁচটি 'মোহর' বোনদের উপহার পাঠাতেন। রানা ভীমসিংহের এক বোন তাঁর 'রাখী'বোন ছিলেন। যতদিন বেঁচেছিলেন প্রতি বছরই তিনি রাখীপূর্ণিমাতে সাহেবকে রাখী পাঠাতেন। এমন তিনচারটি বহুমূল্য রাখী সাহেবের কাছে ছিল। সেগুলি বিলাতে নিয়ে যান। আপনার জন করে নেওয়া সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে এই সম্পর্ক পাতানোর সম্মান ও ঐতিহ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

টড্ বলেন, এই বোনদের চোখে দেখার সুযোগ তাঁর জীবনে হয়নি (হুমায়ুন কর্ণাবতীর মতই), যদিও কখনো কখনো ঐ ভগিনীরা আলাপ আলোচনা করতে বেরুতে, সাক্ষাৎ করতেও চেয়েছেন।

কিন্তু টড্ রাজস্থানের নিয়ম-প্রথাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। নিয়ম অতিক্রম করাটা ঠিক মনে করতেন না। তাই চিরদিনই না-চেনা না-দেখা ভাইবোনের সম্পর্কের মাধুর্যটুকুই বিদেশী-রচিত ইতিহাসেও লেখা রইল। আরেক জায়গায় বলেন, বুঁদীর রানী তখন নাবালক রাজার জননী, বুঁদীরাজ মৃত্যুকালে সন্তান আর রাজ্যের ভার টড্কে দিয়ে যান। এই রাজমাতাও কুলপুরোহিতের হাতে তাঁকে 'রাখী' পাঠান; সেই অবধি তাঁদের মধ্যে রাজকার্যে অন্য পরামর্শে পর্দার আড়াল থেকে নানানকম আলাপ কথাবার্তা

হত। কত সময় রানীমাতা চিঠিপত্রও দিতেন প্রয়োজনমত। কিন্তু চাক্ষুষ অপরিচিতই থেকে যান। (টড্ বলেন, তাঁদের কথাবার্তা চিঠিপত্র বেশ শিক্ষিত সমাজের মতই তাঁর মনে হয়েছে। অবান্তর হলেও এটি উল্লেখযোগ্য)। এই রাখীবন্ধন-সম্পর্ককে মোগল সম্রাট আকবর থেকে সকলেই সম্মান করতেন। এমন কি ঔরঙ্গজেবের উদয়পুরের মহারানা রাজসিংহের রানীকে এই সম্পর্কে লেখা চিঠি পাওয়া যায় রাজস্থানের ইতিহাসে। (ক্রমশঃ)

অশেষ করুণা

শ্রীশান্তশীল দাশ

অশেষ করুণা তোমার ঠাকুর,
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে ;
যতবার আমি প'ড়ে প'ড়ে যাই,
ততবার তুমি তোল যে ধ'রে।
যখনি ঘনায় গভীর আঁধার,
পথ ভুলে যাই, করি হাহাকার ,
পথের নিশানা তুলে ধরো তুমি,
সব কালো মেঘ যায় যে সরে ;
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে।
কেউ আছে আর কেউ-বা না থাক,
তুমি আছ যেন একথা কভু
ভুলে নাহি যাই, যত ব্যথা পাই,
যতই আঘাত আসুক প্রভু।
তোমার পরশে সকল বেদনা
ধুয়ে মুছে হবে অমলিন সোনা,
তোমার মুরতি চির সুন্দর
আমায় হৃদয় থাকুক ভ'রে ;
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে।

বন্যানিয়ন্ত্রণ

অধ্যাপক শ্রীচিরঞ্জীব সরকার

ইতিহাস পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে নগর, জনপদ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি নদীতীরবর্তী স্থানেই প্রথম গড়ে ওঠে। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ জল মনুষ্যজীবনে এক অপরিহার্য বস্তু এবং নদীতীরবর্তী স্থানে জল সুলভ। দ্বিতীয়তঃ, চলাচলের ও যানবাহনের পক্ষে নদী একটি প্রকৃষ্ট পথ। নদী উহার জলপ্রবাহের সাথে যে পলি বহন করে আনে নদীর নিম্নভাগে (downstream) নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বন্যার সময় তা জমা প'ড়ে ঐ অঞ্চলসমূহকে উর্বর করে তোলে। কিন্তু বন্যা প্রবল আকার ধারণ করলে নগর, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। বহু মনুষ্য এবং গৃহপালিত গবাদি পশুর প্রাণ বিনষ্ট হয়। ব্যাপক বন্যার ফলে বহু কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। অবশ্য কোন অর্থমূল্যেই মনুষ্যজীবনের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বন্যার প্রকোপ হতে আত্মরক্ষার জন্য মানবসমাজ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করেছে। এই প্রসঙ্গে সেই বিভিন্ন উপায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

বন্যা ও তার কারণঃ বন্যার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন ফেনায়িত জলধারা নদীর ভিতর দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে দুই কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী নগর, জনপদ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি প্লাবিত করে তখন তাকে বন্যা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, কোন প্রবল বর্ষণের পরে নদীতে যে জলধারা প্রবাহিত হয় তাকে বন্যার জলধারা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, কতখানি জল প্রবাহিত হলে বন্যা বলা চলে তার সঠিক সীমা কিছু নেই।

বন্যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি এবং সংবাদপত্রে পাঠ করেছি। অনেকের আবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে বন্যায় প্রায় প্রতিবৎসরই বহুলোকের এবং গৃহপালিত গবাদি পশুর প্রাণ বিনষ্ট হোত। এ ছাড়া বহু কোটি টাকা মূল্যের শস্য এবং ধনসম্পত্তি নষ্ট হোত। নদীযোজনাসমূহের তৈয়ারির পরে বন্যা এবং তার ধ্বংসলীলা অনেকাংশে কমে গেছে, যদিও এখনও মাঝে মাঝে বন্যার খবর পাওয়া যায়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং অন্যান্য দেশেও বন্যার প্রবল ধ্বংসলীলার খবর পাওয়া যেত। অথচ মজার কথা এই যে, কোন নদীর বন্যার দ্বারা ধ্বংসলীলা যতক্ষণ না সাধিত হয়েছে, ততক্ষণ সেই নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণের কথা কেউ ভাবেনি।

এখন দেখা যাক বন্যার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কি কি কারণে বন্যার প্রবলতা কম ও বৃদ্ধি হয়। এখানে শুধু বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে। এছাড়া বন্যা আরও অনেক কারণে হতে পারে। যথা, প্রবল সাইক্লোন অথবা ভূমিকম্পের জন্য সমুদ্রে প্রবল জলস্ফীতি এবং তৎকারণে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এবং নদীতে বন্যা, ইত্যাদি। বৃষ্টি থেকে যে বন্যার উৎপত্তি তার আলোচনাকালে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দের আলোচনা প্রয়োজন। সেগুলি নিম্নলিখিত আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হোল।

বৃষ্টিধারা যখন আকাশ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে নেমে আসে তখন তা নিম্নলিখিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৃষ্টিধারাব অবতরণকালে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হবার পরেও একটা অংশ বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়। একে বলে 'ইভাপোরেশন্' (evaporation)। আব একটা অংশ উদ্ভিজ্জাদিতে আটকে যায় এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করতে পারে না। এই অংশটিকে বলা হয় 'ইণ্টারসেপ্‌শন্' (interception)। একটি অংশ হ্রদ ও অন্যান্য আবদ্ধ জলাশয়কে পূর্ণ করে। একে বলা হয় 'ডিপ্রেশন্ স্টোরেজ' (depression storage)। এই অংশগুলি বাদে বৃষ্টিধারার যে জল মৃত্তিকাপৃষ্ঠ স্পর্শ করে তার একটি প্রধান অংশ মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে। এই অংশটিকে বলা হয় 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্' (infiltration)। প্রত্যেক মৃত্তিকার ভিতরে কিছু না কিছু জলকণা (moisture) থাকে। এবং প্রত্যেক মৃত্তিকারই মাধ্যাকর্ষণশক্তির বিরুদ্ধে সর্ব উচ্চ কিছুটা পরিমাণ জলকণা দীর্ঘকাল ধরে রাখবার ক্ষমতা থাকে। এই জলকণার পরিমাণকে ঐ মৃত্তিকার 'ফিল্ড ক্যাপাসিটি' (field capacity) বলে। মৃত্তিকার মধ্যে কোন এক অবস্থায় যে পরিমাণ জলকণা থাকে তা ঐ মৃত্তিকার 'ফিল্ড ক্যাপাসিটি' অপেক্ষা যতখানি কম তাকে ঐ মৃত্তিকার ঐ অবস্থার 'ফিল্ড্ ময়শ্চার ডেফিসিয়েন্সি' (field moisture defficiency) বলা হয়। আবার, মৃত্তিকার ভিতর খনন করে কিছুদূর গেলে দেখা যাবে যে একটা সীমার নীচে মৃত্তিকাকণিকার ভিতরকার ফাঁকগুলি জলকণা দ্বারা পূর্ণ থাকে (saturated)। ঐ জলকণাপূর্ণ মৃত্তিকার সর্ব উচ্চ সীমা বা পৃষ্ঠকে (level) 'ওয়াটার টেবিল্' (water-table) বলে। মৃত্তিকার ভিতরের এই সঞ্চিত জলরাশি থেকেই কূপ, নলকূপ প্রভৃতিতে জল পাওয়া যায়। আবার মৃত্তিকা-ভ্যন্তরস্থ এই সঞ্চিত জলরাশি হতেই জল নদীতেও প্রবাহিত হয় এবং সেই জলপ্রবাহকে নদীর 'বেস্ ফ্লো' (base-flow) বলে। বহু নদীতে (বিশেষ করে যে সব নদীতে সম্বৎসর প্রবাহ থাকে) এই মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জলপ্রবাহই গ্রীষ্মকালে এবং অন্য শুষ্ক আবহাওয়ার সময় জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে।

বৃষ্টির জলেব যে অংশ মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে তা প্রথমে মৃত্তিকার 'ফিল্ড্ ময়শ্চার ডেফিসিয়েন্সি' পূর্ণ করে এবং তৎপরে তা 'গ্রাউণ্ড ওয়াটার টেবিলে' গিয়ে মিলিত হয়, এবং মৃত্তিকার ভিতরের সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সর্বোচ্চ যে হারে বৃষ্টির জল মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে তাকে ঐ জমির 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' (infiltration capacity) বলে। বৃষ্টিধারার হার যখন জমির 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' অপেক্ষা বেশী হয়, তখন বৃষ্টিধারার বাকী পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে সঞ্চিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত জলধারার নাম 'ওভারল্যাণ্ড্ ফ্লো' (overland flow)। 'ওভারল্যাণ্ড্ ফ্লো' যখন নদীর ভিতরে এসে পড়ে প্রবাহিত হয় তখন তাকে নদীর প্রবাহ বা 'ডিস্‌চার্জ' (discharge) বলে। এই প্রবাহ-এর পরিমাণ মাপবার একক (unit) হোল 'কিউসেক্' (cusec), অর্থাৎ নদীর কোন এক জায়গায় (cross-section) ভিতর দিয়ে যত ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত হয় (cubic foot per second)। যন্ত্রদ্বারা এই জলপ্রবাহের পরিমাপ বিভিন্ন উপায়ে করা হয়।

বৃষ্টিপাতের পরে নদীতে যে জলপ্রবাহ আসে তার পরিমাণ নিম্নলিখিত পরিমাপগুলির

উপর নির্ভর করে, যথা, বৃষ্টিপাতের হার, উচ্চ অববাহিকার (catchment-basin) ক্ষেত্রফল, মৃত্তিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' ইত্যাদি। এর মধ্যে উচ্চ অববাহিকার মৃত্তিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি'র উপর নদীর জলপ্রবাহ বহুলাংশে নির্ভর করে। যেমন, একই উচ্চ অববাহিকার উপরে একই পরিমাণ বৃষ্টিপাতের হার বিভিন্ন পরিমাণ জলপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। বৃষ্টিপাতের পূর্বে কিছুদিন যদি কোন বৃষ্টি না হয়ে থাকে তবে মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক থাকে এবং উহার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' খুব বেশী হয়। অতএব, জলপ্রবাহের পরিমাণ অনেক কমে যায়। 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' জমির উপরিভাগের ঢাল (slope), উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ, উচ্চ অববাহিকার 'ওরিয়েন্টেশন্' (orientation), বৃষ্টিপাতের সময় জমির শুষ্কতা বা আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। পূর্বেকার বারিপাতের জন্য মৃত্তিকা যদি জলকণাপূর্ণ থাকে (saturated) এবং উচ্চ অববাহিকার জমির ঢাল বেশী ও উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ কম হয়, তবে উহার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' খুবই কম হবে। ঐ সময় খুব উচ্চ হারে বারিপাত হলে নদীর জলপ্রবাহ প্রবল আকার ধারণ করে এবং ঐ জলপ্রবাহকে বন্যা আখ্যা দেওয়া হয়।

বন্যানিয়ন্ত্রণ: (১) বাঁধনির্মাণ ও নদীগর্ভ-খনন সহায়ে:

বন্যানিয়ন্ত্রণের উপায় বা পদ্ধতিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:

(১) নদীর দুই তীরে সমান্তরাল বাঁধ নির্মাণ, যাতে নদীর জলরাশি দুই কূল প্লাবিত করতে না পারে। এতে নদীর ভিতর প্রবাহিত জলরাশির পরিমাণ কমান হয় না।

(২) নদীর অভ্যন্তরস্থ জলরাশির প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস না করে জলপৃষ্ঠের উচ্চতা (level of water-surface) হ্রাস করান, যাতে জলরাশি দুই কূলের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে।

(৩) সেই সকল প্রক্রিয়া যাহা দ্বারা নদী-অভ্যন্তরস্থ জলরাশির পরিমাণ অথবা জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। এই প্রক্রিয়াগুলি মোটামুটি দুই প্রকারের। যথা, নদীর উপরে আড়াআড়িভাবে (across the river) বাঁধনির্মাণ, এবং নদীর উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তন।

উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির ভিতর প্রথমটি অর্থাৎ নদীর দুই তীরে সমান্তরাল বাঁধনির্মাণ বহুকাল পূর্ব হতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে নদীতীরস্থ জনপদ, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতিকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বহুকাল পরে একটি বিশেষ ত্রুটি দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে সমতলভূমিতে। উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে,নদীর দুই তীরে বাঁধ যখন ছিল না, তখন নদীর জল যে সমস্ত পলি বহন করত তার অধিকাংশই বন্যার জলের সাথে গিয়ে নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহের উপর পড়ে সেই সকল জমিকে উর্বর করে তুলত। এবং বন্যার জল সরে যাবার কালে (during receeding flood) নদীপার্শ্বস্থ জমির উপরিভাগের পলিমুক্ত জল নদীর ভিতর প্রবেশ করে নদীর গর্ভপৃষ্ঠের (river-bed) উপরে বন্যার সময়ে সঞ্চিত পলিরাশি ধুয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু নদীতীরে বাঁধ দেবার ফলে বন্যার জলরাশি নদীতীরস্থ অঞ্চলের উপর প্রসারিত হতে না পারায় জলরাশি দ্বারা বাহিত প্রায় সমস্ত পলিই নদীর গর্ভপৃষ্ঠের উপরে পতিত হয়ে গর্ভপৃষ্ঠকে উঁচু করে তোলে। ফলে, পর পর বৎসরের বন্যায় জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায় এবং

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে উচ্চতর বাঁধের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঁধের উচ্চতা বাড়াবার একটা সীমা আছে। তাছাড়া তীরবর্তী জমিপৃষ্ঠের উচ্চতা পূর্বে যেমন ছিল তাই থেকে গেছে। অতএব এখন কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যে বন্যা হবে তা আগের থেকে অনেকগুণ বেশী ক্ষতিকর হবে। বিশেষ করে বাঁধনির্মাণের পরে ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের মনে একটা নির্ভাবনার ভাব এসে যায় এবং তারা তখন আর বন্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত নয়। এবং এখন বন্যার জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবার ফলে জীবনহানির এবং ক্ষতির পরিমাণ বেশী হবার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় সমস্ত পলি নদীর গর্ভপৃষ্ঠে পতিত হবার দরুন গর্ভপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে এমন হতে পারে যে উহা পার্শ্ববর্তী (নদীতীরবর্তী) জমিপৃষ্ঠ হতে উঁচু। তখন ঐ সমস্ত জমি থেকে বর্ষার জল নিষ্কাশন খুব কষ্টসাধ্য এবং একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। একবার এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে এ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নদীর গর্ভপৃষ্ঠ খনন করে গভীর করলে নদীতে জলপৃষ্ঠের উচ্চতা হ্রাস করা যেতে পারে, যাতে বন্যার জলরাশি দুই কূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য এই প্রক্রিয়াদ্বারা নদীতীরবর্তী অল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট স্থানে বন্যানিয়ন্ত্রণই সম্ভব, কারণ নদীর পুরো দৈর্ঘ্যকে এইভাবে খনন করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ এবং একরূপ অসম্ভবই বলা চলে। আবার অনেক সময়, নদী যদি বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়, এবং সেই বাঁকা পথ যদি অশ্বক্ষুরের (horse-shoe bend) আকার ধারণ করে, তবে জলের প্রবাহ পথে ঘর্ষণজনিত বাধা (frictional resistance) বেশী হওয়ায় জলপ্রবাহের গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায়। বন্যার সময় জলপৃষ্ঠের উচ্চতা নদীতীরের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী হলে বন্যা হয়। এমতাবস্থায় খানিকটা স্থান খনন করে নদীর গতিপথ সোজা করে দিলে বেশীর ভাগ জল এই সোজা পথে প্রবাহিত হবে এবং বক্রপথের তীরবর্তী জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আবার, অনেক সময় নদীতীরবর্তী কোন স্থানকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে হলে ঐ স্থানের নদীর প্রবাহপথের উচ্চভাগ (upstream) থেকে একটি পৃথক কৃত্রিম খাল (diversion-channel) খনন করে নিম্নভাগের (downstream) প্রবাহপথে কোথাও যোগ করা যেতে পারে, যাতে নদীর জলপ্রবাহ দুইভাগে বিভক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানের পার্শ্ববর্তী নদীপথে জলপ্রবাহের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আগেই বলা হয়েছে যে উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলি বন্যার জলরাশির বা জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ হ্রাস না করে নদীতীরবর্তী কোন এক স্বল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং বিশেষ অঞ্চলকেই মাত্র বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু এইসকল প্রক্রিয়া দ্বারা নদীর নিম্নভাগের সমস্ত উপত্যকাতে ব্যাপকভাবে বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

এখন তৃতীয় বিভাগের দুইটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি হোল নদীর উচ্চভাগের কোন এক স্থানে নদীর উপর আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যানিয়ন্ত্রণের পক্ষে কার্যকরী একটি কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত করা। এই কৃত্রিম জলাধারের আয়তন এবং গভীরতা এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে বন্যার জলের একটি প্রধান অংশকে

এই জলাধারে আটকে ফেলা যায়। প্রথমে দেখা যাক এই কৃত্রিম জলাধার কিভাবে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। যে বাঁধ এই জলাধার প্রস্তুত করে সেই বাঁধের খানিকটা অংশ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে ঐ অংশের উপর এবং ভিতর দিয়ে জলপ্রবাহের পথ থাকে। বাঁধের এই অংশকে 'স্পিল্‌ওয়ে' (spillway) বলে। প্রথমেই হিসাব করে দেখা হয় জলপ্রবাহের হার কি পরিমাণ হলে বাঁধের নিম্নভাগের (downstream) নদীপ্রবাহ-পথে জলরাশি নদীখালের ভিতরে দুই তীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ, বন্যা না ঘটায়। বন্যার সময় 'স্পিল্‌ওয়ের' ভিতর দিয়ে সর্বোচ্চ এই পরিমাণ জলই প্রবাহিত হতে দেওয়া হয়; আর জলাধারের জলসংরক্ষণের ক্ষমতা এমন হওয়া আবশ্যক যাতে বন্যার বাকী পরিমাণ জল জলাধারের ভিতর আটকে ফেলা যায়, অন্তত: সাময়িকভাবে। এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে জলাধার, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করতে হয় ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে বন্যার জলপ্রবাহের হার কি পরিমাণ হতে পারে তা নির্দিষ্ট করে। কতদূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্যার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হবে তা নির্ভর করে নদীপ্রকল্পের আর্থিক সঙ্গতির উপর এবং বন্যা নিরোধ করে যে পরিমাণ সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করা হবে তার মূল্যের উপর। এই ভবিষ্যৎ ১০০ বৎসর, ২০০ বৎসর অথবা হাজার বৎসরও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে একশত, দুইশত বা সহস্র বৎসরে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ বন্যার জলপ্রবাহের হার হবে তা দেখা হয়। ইহাকে বলা হয় শত বা সহস্র বৎসরে একবার বন্যা (once in hundred or thousand year flood)। এই সংজ্ঞা থেকে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে, এই বৎসর যদি এইরূপ বন্যা একবার হয় তবে আর একবার ঐ পরিমাণ বন্যা একমাত্র একশত বৎসর পরেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক ধারণা এই যে প্রতি বৎসরই ঐ পরিমাণ বন্যা একশততে একবার হবার সম্ভাবনা (one percent chance every year)। এইজন্য এইরূপ বন্যাকে একশততে একবার সম্ভাব্য বন্যা (one percent chance flood) আখ্যা দেওয়া হয়। সেইরূপ এক হাজার বৎসরের সর্বোচ্চ পরিমাণ বন্যাকে এক হাজারে একবার সম্ভাব্য বন্যা (point one percent chance flood) বলা হয়। পূর্বে পূর্বে নদীর উচ্চ অববাহিকায় কি কি সময়ে কিরূপ এবং কি কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং ঐ সকল বৃষ্টিপাত হতে নদীতে কি পরিমাণ জলপ্রবাহের হার উৎপন্ন হয়েছে, এই সকল তথ্য হতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ বন্যা হইতে পারে তাহা স্থির করা হয়। নদী-প্রকল্পের জলাধার, বাঁধ ইত্যাদির আয়তন (size) কোন এক বিশেষ বন্যার উপরে ভিত্তি করেই স্থির করা হয়। যদি ভবিষ্যতে কখনও ইহা অপেক্ষা বেশী বন্যা আসে, তবে সেই বন্যার জলপ্রবাহের সর্বোচ্চ হার জলাধারের ভিতর প্রবেশ করবার পূর্বেই জলাধার পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সেই জলাধার বন্যানিয়ন্ত্রণের দিক থেকে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে। তখন, যাতে জলাধারের জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বাঁধের পক্ষে বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম না করে সেজন্য, বাঁধ থেকে জলনিষ্কাশনের হার ঐ বন্যার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের হারের সমান হবে, এবং জলাধার তৈয়ারী না করা হলে ঐ বন্যাতে নদীর নিম্নভাগে যে ক্ষতি সাধিত হত, জলাধার সত্ত্বেও একই পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে।

অতএব ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, কোন বন্যানিয়ন্ত্রক নদীপ্রকল্প কোন এক বিশেষ বন্যার (design flood, যথা, one percent বা point one percent chance flood) জন্যই তৈয়ারী করা সম্ভব। এই বন্যানিয়ন্ত্রক প্রকল্প তৈয়ারী হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিশেষ বন্যা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ বন্যার জলপ্রবাহের হার নদীতে আসা সম্ভব এবং তখন বন্যানিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ঐ প্রকল্প সম্পূর্ণ অকেজো। এখানে এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে জনসাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, কোন বন্যা-নিয়ন্ত্রক নদীপ্রকল্প তৈয়ারী হবার পরে ঐ নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে ভবিষ্যতে আর বন্যার ভয় নেই। এবং এই ধারণার উপর ভিত্তি করে লোকে ধীরে ধীরে নদীর নিম্নভাগের পূর্বেকার বন্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনপদ, শিল্পাঞ্চল প্রভৃতি গড়ে তোলে এবং নির্ভাবনায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু দেখা গেল যে এই ধারণা ভ্রমাত্মক এবং ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। নদীর নিম্নভাগের উপত্যকার বন্যাঅধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকে ইংরেজীতে flood plain encroachment বলে। এইরূপ বসবাসের পূর্বে বন্যানিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়ের মতামত-গ্রহণ প্রয়োজন।

আবার অনেকসময়ে জলাধারনিয়ন্ত্রণ কালেও নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে বন্যার উদ্ভব সম্ভব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক নদীর উচ্চ অববাহিকায় এবং নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে প্রবল বারিপাত হচ্ছে। এই বারিপাতের ফলে জলাধারে প্রবল এক বন্যা আসবার সম্ভাবনা দেখে জলাধারের জল খুব দ্রুত নিষ্কাশন করা হোল, যাতে বন্যার একটি প্রধান অংশ জলাধারের খালি-করা জায়গায় আটকে ফেলা যায়। কিন্তু জলাধারের জল খুব দ্রুত নিষ্কাশনের ফলে নদীর নিম্নভাগে জলপ্রবাহের হার বারিপাতজনিত জলপ্রবাহের হারের সহিত মিলিত হয়ে প্রবল বন্যা ঘটাতে পারে। এইজন্য জলাধারনিয়ন্ত্রণ (reservoir-operation) সুচিন্তিত উপায়ে করা প্রয়োজন।

বন্যানিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জলাধারা প্রস্তুত হলে তা দিয়ে আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, যেমন, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচের জন্য জলসরবরাহ, মৎস্য-চাষ ইত্যাদি। এই সকল নদীপ্রকল্পকে বহুউদ্দেশ্যসাধক নদীপ্রকল্প (multipurpose river-valley project) বলা হয়। অবশ্য বন্যানিয়ন্ত্রণের সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে জলাধার, বাঁধ ইত্যাদির আয়তন (size) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং তাতে বেশী অর্থের প্রয়োজন।

অনেকসময় উচ্চ অববাহিকায় নদীর এবং উহার শাখা-প্রশাখার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ দ্বারা জলাধার নির্মাণ (soil conservation dams and reservoirs) করে বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং নদীর নিম্নভাগের জলপ্রবাহকে পলিমুক্ত করা হয়। কিন্তু এই ধরনের প্রকল্পের সমালোচকেরা বলেন যে, কয়েক বৎসর পরে জলাধারগুলিতে পলি জমা পড়ে উহাদের আয়তন অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তখন ঐগুলি উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনের দিক থেকে অকেজো হয়ে পড়ে। তাছাড়া এতে একটি বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। বিভিন্ন জলাধার থেকে জলনিষ্কাশন সুপরি-কল্পিত উপায়ে না করা হলে ঐ সকল নিষ্কাশিত জল নদীর নিম্নভাগে (*downstream*) কোথাও একত্র মিলিত হয়ে প্রবল বন্যার আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য এ সকল প্রকল্পে জলাধার থেকে জলনিষ্কাশন খুবই সুচিন্তিত এবং সুপরি-কল্পিত উপায়ে করা উচিত, এবং বিভিন্ন জলা-

ধারের ও বাঁধের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

(২) উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তন সহায়ে :

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটির কম-বেশীর উপর বন্যার জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের (জমিপৃষ্ঠের) প্রকৃতির পরিবর্তন করে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান কার্য সাধিত হয়, যথা : (১) জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা, (২) বৃষ্টিপাতজনিত জমিপৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত জলধারার (overland flow) গতিবেগে বাধা সৃষ্টি করে এই জলপ্রবাহের নদীপথে প্রবেশের সময় বৃদ্ধি করা, যাতে নদীপথে প্রবাহিত জলপ্রবাহের হারের (discharge) পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং (৩) উচ্চঅববাহিকার জমিপৃষ্ঠ থেকে বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত্তিকা ধুয়ে যাওয়া (soil-erosion) রোধ করা। এই কার্যগুলি সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে সাধিত হয়। যথা, (১) জমির 'কন্‌টুর লাইন' (contour line) বরাবর স্বল্প উচ্চ এবং স্বল্পআয়তনযুক্ত (about 6 to 9″ in height and 5 to 6 ft. in base width) বাঁধ নির্মাণ, (২) 'কন্‌টুর লাইন' বরাবর জমি চাষ করা (contour farming), এবং (৩) উচ্চ অববাহিকায় উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা (aforestation)। কোন জমির উপরিভাগে সমউচ্চতাবিশিষ্ট জায়গার উপর দিয়ে যদি কাল্পনিক রেখা টানা হয় তবে সেই রেখাকে 'কন্‌টুর লাইন' বলা হয়। অতএব 'কন্‌টুর লাইন' বরাবর সকল ভূমিপৃষ্ঠের উচ্চতা সমান। এখন দেখা যাক এই তিনটি উপায়ে উপরি-উক্ত কার্যাবলী কিভাবে সাধিত হয়। প্রথমে দেখা যাক কন্‌টুর বাঁধ কিভাবে কাজ করে। পূর্বে বলা হয়েছে যে বৃষ্টিপাতের হার যখন জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি অপেক্ষা বেশী হয় তখন অতিরিক্ত বৃষ্টির জল জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে পড়ে জলপ্রবাহের সৃষ্টি করে। কন্‌টুর বাঁধ নির্মাণের ফলে স্বল্পগভীর ছোট ছোট বহু জলাশয় নদীর উচ্চ অববাহিকার উপরে সৃষ্ট হয় বৃষ্টিপাতের সময়। এই জলাশয়গুলি বৃষ্টির জল অনেকসময় ধরে উচ্চ অববাহিকার জমির উপর ধরে রাখে, এবং তার ফলে উচ্চ অববাহিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি' বৃদ্ধি হয়, 'ইভাপোরেশন্‌' বেড়ে যায় এবং ফলে 'ওভারল্যাণ্ড ফ্লো' অনেক কমে যায়। এছাড়াও জলাশয়গুলিতে জল অনেকসময় ধরে আটকে থাকায় 'ওভারল্যাণ্ড ফ্লো'র হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাতে নদীর জলপ্রবাহের হার বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌' বৃদ্ধি পাবার দরুন ভূগর্ভে সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং 'ওয়াটার টেবিল'এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে একদিকে যেমন বন্যার জলপ্রবাহের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে প্রবল বন্যার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নদীতে গ্রীষ্মকালে এবং অন্যান্য শুষ্ক আবহাওয়ার সময় জলপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। 'কন্‌টুর বাঁধ' দ্বারা আরও একটি প্রধান উপকার সাধিত হয়। বৃষ্টিপাতের সময় উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের মৃত্তিকা ধুয়ে যাবার ফলে বর্ষাকালে নদীতে জলের সহিত প্রচুর পরিমাণে পলি প্রবাহিত হয়। বৃষ্টির কণিকাগুলি যখন জমির উপরিভাগের মৃত্তিকার উপর বেগে পতিত হয় তখন মৃত্তিকাকণিকাগুলি পরস্পর আলগা হয়ে যায় এবং পরে ওভারল্যাণ্ড ফ্লোর সহিত প্রবাহিত

হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। এইভাবে প্রতিবৎসর নদীর উচ্চ অববাহিকা থেকে লক্ষ লক্ষ টন উর্বর মৃত্তিকা ধুয়ে যায় এবং সমুদ্রে বা নদীর মোহানায় গিয়ে জমায়েত হয়। অবশ্য অনেক সময় বন্যার সাথে নদীর নিম্নভাগের নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহেও পলি জমা পড়ে সেই অঞ্চলসমূহকে উর্বর করে তোলে। কিন্তু নদীর জলপ্রবাহের সহিত বাহিত এই পলিই নানাবিধ নদীসমস্যার একটি প্রধান কারণ। আবার এই পলি বন্যা-নিয়ন্ত্রক জলাধারে জমা পড়ে উহার আয়তন এবং গভীরতা কমিয়ে দেয় এবং জলাধারগুলির কার্যকারিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নদীর উচ্চ অববাহিকায় কন্টুর বাঁধ দিয়ে স্বল্পগভীর জলাশয়গুলি সৃষ্টির ফলে বৃষ্টিকণিকাগুলি আর মৃত্তিকা স্পর্শ করতে না পারায় মৃত্তিকাকণিকাগুলি আলগা হয় না। এবং এই জলাশয়গুলির উপবিভাগ থেকে ওভারল্যাণ্ড ফ্লো হবার ফলে উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগ থেকে মৃত্তিকার ক্ষয় বন্ধ হয়।

কন্টুর ফারমিং (contour farming)-এর অর্থ হোল কন্টুর রেখা বরাবর জমি চাষ করা। ইহার জন্য কৃষকদিগের ভিতরে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন যাতে তারা জমির ঢালের দিকে চাষ না করে কন্টুর রেখা বরাবর চাষ করে। জমির ঢাল বরাবর চাষ করলে ঢাল বরাবর ছোট ছোট অসংখ্য নালার সৃষ্টি হয়। এতে ওভারল্যাণ্ড ফ্লো অত্যন্ত বেশী হয় এবং জমির উপরিভাগের মৃত্তিকাও ঐ জলের সহিত বহুল পরিমাণে বাহিত হয়। পক্ষান্তরে কন্টুর রেখা বরাবর চাষ করলে 'কন্টুর্ বাঁধ' এর অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

তৃতীয় উপায় হোল নদীর উচ্চ অববাহিকার জমিতে উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ইহাতেও পূর্বোক্তরূপ ফল পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জের শিকড়গুলি মৃত্তিকার ভিতরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এই সকল শিকড় থেকে আবার অতি সূক্ষ্ম শিকড়সকল চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই শিকড়গুলি উহাদের চারিদিকে জলকণা ধরে রাখে। ইহাতে জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও উদ্ভিজ্জাদি ওভাল্যাণ্ডফ্লো-কে বাধা প্রদান করে উহার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ বৃদ্ধি এবং নদীর জলপ্রবাহের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার শিকড়গুলি মৃত্তিকা-কণিকাগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকায় উচ্চ অববাহিকার জমির উপবিভাগের মৃত্তিকা-ক্ষয় বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের যে কয়টি পদ্ধতি বিবৃত হোল তার সব কয়টিই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতির প্রয়োগে সব দিক দিয়ে সুফল পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে সেই সমস্যার প্রকৃতির উপর। সেইজন্য কোন বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি গ্রহণের পূর্বে সমস্যার প্রকৃতির বিশদ পর্যালোচনা একান্তই প্রয়োজন। অবশ্য এই পর্যালোচনা প্রকল্পের আর্থিক সঙ্গতির উপর লক্ষ্য রেখেই করতে হবে। কিন্তু সর্বশেষে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি, অর্থাৎ উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন সর্বক্ষেত্রেই সুফল দেবে এবং সকল নদীর উচ্চ অববাহিকাতেই, অর্থাৎ দেশের সর্বত্র এই সকল প্রকল্প সুপরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা বিধেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১৮৬৩—১৮৯৬)

শ্রীঅজিত সেন

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে তখনই ভগবান অবতীর্ণ হন। উনবিংশ শতাব্দীতে এমনি এক প্রয়োজনে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। পুতঃসলিলা গঙ্গার পূর্বতীরস্থ দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীর কুঠীর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তিনি ব্যাকুল হয়ে ডাকতেন নবযুগপ্রবর্তনে যাঁরা তাঁকে সহায়তা করবেন, তাঁর সেই লীলাসহচরদের, আত্মজ-প্রতিম যুবকবৃন্দকে—'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে!' যুবকভক্তদের আসা সুরু হল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ হতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগীন' প্রভৃতি এসে পড়লেন।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহী শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত। প্রায়-বিলুপ্ত ইতিবৃত্তের সূত্র অনুসরণে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভবনাথ-স্মৃতিসঞ্চয়নে এই সংকলন নিছক অনুলিখন মাত্র।

বরাহনগরে অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। গায়ের রং অতি উজ্জ্বল অর্থাৎ গৌরবর্ণ। মুখ গোল ও ঈষৎ চাপা এবং মুখে কালো (কুঞ্চিত) দাড়ি। এক কথায় সুপুরুষ চেহারা ছিল। এই প্রিয়দর্শন যুবক অতীব ভক্তিমান ছিলেন। অতি অমায়িক প্রকৃতির ও ভক্তভাবের এই যুবকের ঈশ্বরের নামে চোখ জলে ভরে যেত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন।

ভবনাথের পিতার নাম রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। এঁদের দুটিমাত্র সন্তান হয়েছিল। একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা। পুত্র ভবনাথ বড় এবং কন্যা ক্ষীরোদবালা ছোট।

ভবনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন সমাজের সর্বস্তরে তখন পরিবর্তনের প্রচণ্ড জোয়ার চলেছে। ইয়ং বেঙ্গলদের অনুকরণে ও স্বেচ্ছাচারিতার নগ্নপ্রভাবে বরাহনগরের নৈতিক কাঠামো (অন্যান্য বহু স্থানের মতই) ভেঙ্গে পড়তে সুরু করেছে। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর শ্রীযুক্ত শশিপদবাবুর নেতৃত্বে দক্ষিণ বরাহনগরের যুবকেরা বিভিন্ন দেশহিতকর সৎকার্যে এগিয়ে এলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বরাহনগরে ২৭শে অক্টোবর তারিখে "স্টুডেন্টস্ ক্লাব" স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান মূলতঃ জনশিক্ষা ও আত্মোন্নতি বিধানের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, নৈতিক সুশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ভবনাথ ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়,

কালীকৃষ্ণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিনারায়ণ দাঁ, প্রভাতচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র দে, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, দাশরথি সান্যাল প্রভৃতি দক্ষিণ বরাহনগরবাসী যুবকগণ এই সকল সমাজসেবা-মূলক কর্মে পুরোধার আসন গ্রহণ করেন।

ভবনাথ নরেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। ভবনাথও নরেন্দ্রনাথের মত যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং নিরাকারের ধ্যান করতে ভালবাসতেন। তবে নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভবনাথের ছিল অকৃত্রিম আনুগত্য। ভবনাথ নরেন্দ্রনাথকে এত গভীর ভালোবাসতেন যে সুবিধা পেলেই নরেন্দ্রনাথকে বরাহনগরে অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন-এ নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে খাওয়াতেন। তখন কলকাতা থেকে সোজা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল না; ফলে কলকাতা থেকে বরাহনগর পর্যন্ত গাড়িতে এসে তারপর হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যেতে হত। অন্যথায় খরচ অনেক বেশী পড়তো। যাই হোক বরাহনগরে নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব যথা সাতকড়ি লাহিড়ী, দাশরথি সান্যাল, (এঁরা উভয়েই নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন) ভুবন মোহন দাস, হরিদাস বড়াল, বিপিন সাহা, মহেন্দ্রনাথ পাল, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে।

"জুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর।
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীরে ঘর॥
নবীন বয়স তেঁহ ব্রাহ্মণের ছেলে।
উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ হয় এই কালে॥
আত্মবন্ধু প্রতিবেশী করে উপহাস।
শুনিয়া প্রভুর পদে তাঁহার বিশ্বাস॥"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি]

তবে—

"প্রভুভক্ত ভবনাথ সদ্‌বুদ্ধি গুণে।
পরের ব্যঙ্গোক্তি কানে আদতে না শুনে।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পর ভবনাথ প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন ও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে রাত কাটাতেন। তাঁর বাবা মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাঁকে নানা ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। বরঞ্চ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। এই সময়ে ভবনাথ আমিষআহার এবং তাম্বুলাদি বর্জন করেন। একথা জানতে পেরে রামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁকে বলেছিলেন—"সে কিরে! পান-মাছে কি হয়েছে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই হ'ল আসল ত্যাগ।"

ভবনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বহুবার 'নরেন্দ্র, রাখাল' প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁর নামোল্লেখ করতেন, এঁদের সকলকেই নিত্যসিদ্ধ বলতেন। বলরামকে বলেছিলেন: এদের খাইও তাহলে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে। এরা (নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, পূর্ণ প্রভৃতি) সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভালো হবে।

ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ) দুজনে ভারি মিল। হরিহর আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রনাথের কাছে বাসা করতে বললেন। ওঁরা দুজনেই অরূপের ঘর। ভবনাথের প্রকৃতিভাব আর নরেন্দ্রনাথের পুরুষভাব।

ভবনাথ ছিলেন জন্মসাধক। যুগাবতার নিজেই বলেছেন—"নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ

এরা সব নিত্যসিদ্ধ, এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।" রামকৃষ্ণদেবের এই গৃহী-শিষ্যের অন্তর্বাসনা ছিল সন্ন্যাস। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কে কবে নিরিখ করতে পেরেছে? ভবনাথকে তাই সংসার করতে হ'ল।

তাঁর বিবাহপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের কাছে বলেছেন (৯ই মার্চ, ১৮৮৫)—

"ভবনাথ বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা লয়ে দুজনে থাকে। তারপর আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করবি, তখন ভবনাথ রেগে রোক করে বললে—কি! আমরাও আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?"

বরাহনগর কুটীঘাট রোডের ওপরে কালী-কৃষ্ণের বাড়ী থেকে কিছু দূরে জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেনের কাছ বরাবর অবিনাশ দাঁ মহাশয়ের বাড়ী। ইনি ভবনাথের অত্যন্ত পরিচিত জন ছিলেন। তখন কলকাতায় সবে ক্যামেরার চল স্থুরু হয়েছে। অবিনাশের একটি ক্যামেরা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজের ছবি কাকেও তুলতে দিতেন না। ভবনাথ অবিনাশকে ডেকে এনেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তোলার জন্যে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে রাধাকান্ত-মন্দিরের সম্মুখস্থ রোয়াকে এই ছবি তোলা হয়। (১৮৮৩—'৮৪ খৃষ্টাব্দ) এই ছবিটিই ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছে।

একদিন দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের ফটো দেখে নিয়ে যেতে চান, ঠাকুর তাঁকে সেই ফটোটি না দিয়ে বলেন যে, অবিনাশ সেদিন ফটো তুলে নিয়েছে, তার কাছে পাওয়া যাবে; ভবনাথকে বললে সে অবিনাশকে তাগাদা দিয়ে আনিয়ে দেবে।

প্রায় কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মল্লিকপুরের অভয়চরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা কিরণশশী দেবীর সঙ্গে ভবনাথের বিবাহ হয়। অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে তিনি বরাহনগরের একটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তবে তাঁর এই চাকরি খুব বেশী দিন থাকেনি। এর কিছুদিন পরেই ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়, ফলে প্রকৃতপক্ষে ভবনাথকে সংসারের ঝামেলায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়। তবে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ভবনাথের স্ত্রী কিরণশশী দেবী এযাত্রায় আরোগ্য লাভ করেন। বিবাহিত হলেও ভবনাথের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। কিন্তু এই সময় থেকেই চাকরি ইত্যাদি চেষ্টার জন্য ভবনাথের পক্ষে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে নিয়মিত যাতায়াত ব্যাহত হতে থাকে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ভবনাথ, হাজরা, শ্রীম প্রভৃতি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পাণিহাটী মহোৎসবে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে, আরও একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভবনাথপ্রমুখ বরাহ-নগরবাসী যুবকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"র, (১৮৭৬) পাঠাগার ও "দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী" (১৮৮২) সম্ভবতঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একত্র হয়ে "বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী" নামে পরিচালিত হতে স্থুরু করে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে এই পাঠাগারের নিজস্বগৃহের উদ্বোধন হয়েছে। ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ এই "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"র (বর্তমান "বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী" নামে পরিচিত) একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

পরমহংসদেবের গলরোগের বৃদ্ধি হলে ভক্তগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা উপযুক্ত চিকিৎসাদির জন্য অবশেষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর (২৭শে অগ্রহায়ণ) পরমহংসদেবকে শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নিয়ে এলেন। এই উদ্যানবাটীতে (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬) কথাপ্রসঙ্গে ভবনাথ মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন: বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নতুন স্কুল হবে শুনলাম, আমারও তো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে—চেষ্টা করলে হয় না? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভবনাথের অনিয়মিত আসাযাওয়া নিয়ে বহুবার ভক্তদের কাছে অনুযোগও করেছেন। আবার সস্নেহ অন্তরে ভবনাথের জন্য গভীরভাবে চিন্তিতও হয়েছিলেন, কেননা ভবনাথ সংসারে পড়েছেন। [শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) "একে খুব সাহস দে।"]

ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিব লগ্ন এসে পড়ল। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট পরমহংসদেব মহাসমাধিতে লীন হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ যুবকভক্তগণকে একত্র করে একটি মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন। ইহার জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন—একটি স্থান অন্ততঃ চাই। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় সুরেশচন্দ্র মিত্র (পরমহংসদেব ইঁহাকে সুরেন্দ্র বলতেন) মাসিক কিছু টাকা দিতে রাজি হলেন। ভবনাথকে একটি বাড়ী যোগাড় করতে বলা হলে তিনি মুন্সীদের ভূতের বাড়ীখানা মাসিক ১১৲ টাকা হিসাবে ভাড়া করে দিলেন। ভবনাথ ও হুটকো গোপাল দুজনে মিলে বাড়ীখানা পরিষ্কার করে ফেললেন। দু-চার মাসের মধ্যেই সব হ'ল। এভাবে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির কিছুকাল পরে ভবনাথ বরাহনগর অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জী লেনের বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে ভবানীপুরে গিরিশ ডাক্তার রোডে বাড়ী কিনেছিলেন। এই সময়ে ভবনাথের একমাত্র কন্যা প্রতিভাদেবীর জন্ম হয়। তারপর তিনি সরকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের পদ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই বরাহনগর মঠে ভবনাথের যাতায়াত কমে গিয়েছিল।

বরাহনগর মঠ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বৎসর কাল চলেছিল। এর পরে বরাহনগরের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ আলমবাজারে একটি দোতলা বাড়ীতে মঠ স্থানান্তরিত করলেন।

আলমবাজার থেকে লোচন ঘোষের ঘাটে যাবার রাস্তার দক্ষিণ পাশে এই বাড়ী অবস্থিত। রাস্তার উত্তরে চট্টোপাধ্যায়দের মোটা থামওয়ালা বাড়ী। সদর দরজা পূর্বদিকের গলির ভিতর। আলমবাজার মঠে ভবনাথ সুযোগ পেলেই মধ্যে মধ্যে আসতেন ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের সঙ্গে আনন্দ ও উৎসবাদি করতেন। স্বামীজী ভবনাথকে যে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত (১৮৯৪) স্বামীজীর (১৪১ নং) পত্রে—"ভবনাথ তোমাদের ভাল-বাসে কিনা? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা দিও।" ভবনাথের সংগঠন-ক্ষমতা স্বামীজীর অজ্ঞাত ছিল না—(পত্র নং ১০২)..."হরমোহন, ভবনাথ, কালী-কৃষ্ণবাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর..." ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণা-

নন্দকে লিখিত (পত্র নং ২৪১), "ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত (পত্র নং ১৪৯) পত্রেও স্বামীজীর বন্ধুপ্রীতির আন্তরিক উত্তাপ মেলে—"কালীকৃষ্ণ, ভবনাথ, দাশু, সাতু, হরি চাটুজ্যে সকলকে তোমরা ভালোবাসো কিনা —সব লিখবে।"

ভবনাথ সুগায়ক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে তিনি একাধিক গানও গেয়েছিলেন। সেই সব গানের কয়েকটির প্রথম পদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হ'ল।

(ক) ধন্য ধন্য আজি দীন, আনন্দময়ী। (১১.৩. ১৮৮৩.)

(খ) দয়াময় তোমা হেন কে হিতকারী— (বলরামবাটীতে ৭.৪.১৮৮৩.)

(গ) গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না (২৯.৯.১৮৮৪.)

কিছু সাহিত্যসেবাও তিনি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত "নীতি-কুসুম" ও "আদর্শ নরনারী" গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলিকাতা ত্যাগের পর নকীপুর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি নানা জায়গা ঘুরে রোগাক্রান্ত দেহে (কালাজ্বর) ভবনাথ কলকাতায় ফিরে বাদুড়বাগানে রামকৃষ্ণ দাস লেনে ভাড়া বাড়ীতে এসে উঠলেন। এই সময়ে কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয়। ভবনাথকে জোর করে মধুপুর পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে ফিরে এসে মাত্র একমাস রামকৃষ্ণ দাস লেনে অবস্থান করার পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই একনিষ্ঠ কর্মযোগীর অকাল তিরোভাব ঘটে।

এই মহাসাধকের শেষকৃত্য কাশীপুর শ্মশানে (অধুনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান) বহু সাধক-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়।*

জাগো!

শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের পৃথিবী কার অভিশাপে
হোলো আজি মরুময়,
আকাশে বাতাসে শুধু হাহাকার-
ভরা নিশ্বাস বয়।
মানুষের মাঝে 'মানুষ' সুপ্ত
স্বার্থ-তিমিরে চেতনা লুপ্ত
মানবের প্রাণ দেয় যে বিশ্বে
দানবের পরিচয়।

সকল হৃদয়ে আসীন হে দেব,
লুকায়ে থেকো না আর,
পূর্ণ বিভায় ওঠো, জেগে ওঠো
অন্তরে সবাকার।
মিথ্যা ও ছলে আবিল কর্মে
লোভ-দ্বেষ-ভরা জীবনমর্মে
ধ্বংস করিয়া ফোটাও সেথায়
সত্য স্বরূপ তার।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়), শ্রীরামকৃষ্ণ (সুবোধচন্দ্র দে) প্রভৃতি পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ঈশ্বর

শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

ভগবান পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে ঈশ্বর কথাটি বুঝাতে তিনটি সূত্র লিখেছেন :—

(১) 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ'।

(২) 'তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্'। আর,

(৩) 'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনান-বচ্ছেদাৎ'।

(১) ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় যাঁকে **স্পর্শ** করতে পারে না, সেই পুরুষ-বিশেষকে ঈশ্বর বলে। **ক্লেশ** কি? পতঞ্জলি বলেন—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ রকম মনোধর্মই **পঞ্চ ক্লেশ** এগুলো সবই মিথ্যাজ্ঞান। যেটা যা নয়, সেটাকে তাই ব'লে বুঝা অর্থাৎ অনিত্য, অশুচি, দুঃখ, ও অনাত্মপদার্থের উপর নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা জ্ঞানের নাম **অবিদ্যা**। **অস্মিতা** হচ্ছে দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তিকে, জীববুদ্ধি ও স্বরূপচৈতন্যকে একই ব'লে বোধ। অর্থাৎ মনবুদ্ধি প্রভৃতিতে 'আমি' প্রতীতিই **অস্মিতা**। যে সুখ একবার ভোগ করা গেছে, তার কথা মনে হ'লেই আবার সেটা ভোগ করার যে কামনা বা ইচ্ছা তারই নাম **রাগ**, আর যে দুঃখ একবার ভোগ করা গেছে, তার উপর যে বিরাগ বা অপ্রবৃত্তি তারই নাম **দ্বেষ**। জীব-মাত্রেরই দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্গে একটা 'আমি' সম্পর্ক পাতানো আছে। জীব এই পাতানো সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না। তেমনি ধনাদি বিষয়ের সঙ্গেও একটা 'আমার' সম্পর্ক পাতানো আছে—এ থেকেও বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না, তাই জীবের মৃত্যুভীতি। পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত এই মৃত্যুভয়রূপ সংস্কারই **অভিনিবেশ**।

তারপর কর্ম। কর্ম দ্বিবিধ—কুশল ও অকুশল।

এই দ্বিবিধ কর্মের যে ফল তাকে **বিপাক** বলে।

আশয় কি? না, কর্মানুরূপ যে বাসনা (অনুকূল বা প্রতিকূল সংস্কার) তাকে **আশয়** বলে। এগুলি সবই চিত্তধর্ম, কিন্তু পুরুষ ফলভোক্তা ব'লে তারই ধর্ম ব'লে অভিহিত হয়।

যিনি উল্লিখিত ক্লেশাদি সব কিছুতেই নির্লিপ্ত,—এর কোনটাই যাঁকে ছুঁতে পারে না, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। পুরুষ-বিশেষ বলেছেন এই জন্য যে, কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত অনেক পুরুষ আছেন যাঁরা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহরূপ ত্রিবিধ বন্ধন ছেদন ক'রে কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বর সেরূপ নন। তাঁর বন্ধন কখনো ছিল না—কখনো হবে না। তিনি নিত্যমুক্ত, নিত্য স্বপ্রতিষ্ঠ ঈশ্বর-স্বরূপ। সেজন্য তাঁকে ক্লেশাদি থেকে মুক্তপুরুষ না ব'লে পুরুষ-বিশেষ বলা হয়েছে। তিনি সদাই ঈশ্বর—সদাই মুক্ত। তাঁর ঐশ্বর্যের সম বা অধিক ঐশ্বর্য আর কারু নাই। ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা তাঁতে আছে ব'লে তিনি ঈশ্বর।

(২) তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি জীবাত্মার মত চিত্তের সঙ্গে মিলে মিশে বাসনা-নামক সংস্কারের বশীভূত হন না। তিনি এক অসাধারণ অচিন্ত্য শক্তি-যুক্ত ও দেহাদি-রহিত আত্মা বা পরমপুরুষ। নিরতিশয় জ্ঞান (জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা) আছে

ব'লে তিনি ঈশ্বর। তিনি বিশেষত্বপূর্ণ ব'লে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ নন—কেবল শাস্ত্র থেকেই তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হ'তে পারে। নিজের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন না থাকলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা রূপ প্রয়োজন তাঁর আছে। সকলকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করবো,—প্রাণিগণের প্রতি এরূপ অনুগ্রহই সে প্রয়োজন।

[তাই তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (গীতা ৪।৮)।]

(৩) ঈশ্বর সর্বপ্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেষ্টা; কারণ তিনিই সকলের আদি। কালশক্তি তাঁতে অস্তমিত। পূর্ব পূর্ব গুরুগণ সকলেই কালাধীন—উৎপত্তি-বিনাশশীল, পরিমিতায়ুঃ। ঈশ্বর কপিলাদি গুরুসকলেরও গুরু, তাঁর সম্বন্ধে কাল অনুমাপক হয় না। তিনি সকল কালেই আছেন। যেমন বর্তমান সৃষ্টির আদিতে স্বীয় নিত্যমুক্ত স্বভাব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়, অপরাপর সর্গেও সেরূপ জানা যায়।

*

মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। তিনি মায়াধীশ; মায়াকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াদি কার্য করেন। যখন মায়া তাঁতে লীন অবস্থায় থাকে তখন তিনি ব্রহ্ম। ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে থেকে জীবকে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত করছেন (গীতা ১৮।৬১)।

*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন :

ঈশ্বরই কর্তা—জীবের 'আমি কর্তা' বোধ অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। হাঁড়ির নীচে আগুন আছে। তাই হাঁড়ির ভিতরে জলের মধ্যে আলু বেগুন চাল ডাল লাফাতে থাকে। জলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। পুতুলনাচের পুতুল বাজিকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলেই চুপ। ঈশ্বরদর্শন না হওয়া পর্যন্ত আমিই সদসৎ সব কাজ করছি এ ভুল থাকে। এ তাঁরই মায়া—সংসার এই মায়ার খেলা। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে—সৎপথ ধরলে, তাঁকে লাভ করা যায়। তখন বোঝা যায়, তিনিই কর্তা, আর আমি অকর্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; তিনি করান, তাই করি। চাঁদামামা সকলেরি মামা।

ঈশ্বর ও কর্মফল—তিনিই সব করাচ্ছেন, তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রস্বরূপ,—নিমিত্তমাত্র। আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে। তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে!

যে ঈশ্বর দর্শন করেছে সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। যার সাধা গলা তার সুরেতে সা, রে, গা, মা-ই এসে পড়ে। সিদ্ধ লোকের বেতালে পা পড়ে না।

কিন্তু পাপের শাস্তি দেবেন কি না দেবেন সে হিসেবে তোমার দরকার কি? সে তিনি বুঝবেন। বাগানে কত গাছ, কত পাতা, সে হিসেবে তোমার দরকার কি? তুমি আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।

এ সংসারে ঈশ্বরসাধন জন্য তুমি মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয় তাই চেষ্টা করো। বিচার ক'রে তোমার কি হবে? আধ পো মদে তুমি মাতাল হ'তে পারো, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তা জেনে তোমার কি হবে?

ঈশ্বরই গুরু—গুরু এক সচ্চিদানন্দ (ঈশ্বর)। তিনিই গুরুরূপে এসে শিক্ষা দেন। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া,

তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ-গুরু বই আর গতি নাই।

সদ্‌গুরু লাভ হ'লে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তারাই কাঁচা গুরু। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেন সেখো, হাত ধরে নিয়ে যান। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেহ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে হবে না, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়—তবে তো বিশ্বাস হবে। বিশ্বাস হ'লেই সব হ'য়ে গেল। একলব্য মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণ-শিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে পূজা করতো—তাতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হ'লো।

ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু—

সংসারের সব কিছুই অনিত্য। শরীর এই আছে, এই নাই। তাই তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। নিষ্কাম হ'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়। নিষ্কাম হ'লে ভাল —তবে নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন। তা ব'লে দয়ার কাজ কি কিছু করবে না? তা নয়, সামনে দুঃখকষ্ট দেখলে সামর্থ্য থাকলে নিশ্চয় দেওয়া উচিত! অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান, আরও বড়।

তবে নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরলাভের একটা উপায়। কিন্তু ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কামভাবে করছি কিন্তু হয়ত যশের ইচ্ছা গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা এসে গেছে। আবার বেশী কর্ম জড়ালে কর্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না। বেশী কর্মের ভিতর যদি সে পড়ে ব্যাকুল হয়ে সে প্রার্থনা করে—হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম কমিয়ে দাও, আমার মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু'—এ বোধ না থাকলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না।

তাঁকে লাভ হ'লে বোধ হয় তিনিই কর্তা, আমি অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজে জড়িয়ে মরি? কর্ম আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করতে করতে এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।

ঈশ্বর ও শুদ্ধ আত্মা—

(হাজরার প্রতি) তুমি শুদ্ধ আত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধ আত্মা নিষ্ক্রিয়, 'তিন অবস্থা'র সাক্ষী স্বরূপ। যখন ভাবি তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে 'ঈশ্বর' বলি।

ষোড়শীপূজা

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

সারদা ও রামকৃষ্ণ মিলে গঙ্গাতটে
গৈরিকের মুক্তরাগ লাগে লীলা-নাটে।
রাতে রামকৃষ্ণ সদা ভাবমগ্ন হন
ভাবের জগতে মন থাকে অনুক্ষণ।
সমাধিতে রামকৃষ্ণ লীন হন সদা
দেখি বড় ভয় পান জননী সারদা।
এই মহাভাব ভাঙা হয় অতি ভার
কিছুতেই নাহি খুলে সমাধির দ্বার।
অনভ্যস্তা মাতা ডাকে কাঁদিয়া হৃদয়ে—
কি করিলে সংজ্ঞা হয় দাও তাহা কয়ে।
ঠাকুর সে কথা পরে জানিলা যখন
ধীরে ধীরে তাঁরে তিনি নিজমুখে কন
কোন্ ভাবে কোন্ নাম শুনাইলে তবে
দেহে তাঁর পুনরায় বাহ্যজ্ঞান হবে।
ভাবে সমাধিতে আর ঈশ্বরকথায়
ঈশ্বর-আবেশে প্রতি রাত কেটে যায়।
এইভাবে একসাথে করি রাত্রিবাস
অপূর্ব সে দিব্যলীলা চলে আটমাস।
এরই মাঝে এল ফলহারিণী-শ্যামার
পূজারাতি, অমানিশা নিবিড় আঁধার।

ঠাকুর সেদিন ডাকি হৃদয়েরে কন—
মোর ঘরে কর শ্যামাপূজা-আয়োজন।
দীনু পূজারীরে সাথে লইয়া হৃদয়
যথাসাধ্য পূজা-আয়োজনে রত হয়।
যথাকালে আসি রামকৃষ্ণের আহ্বানে
জননী সারদা বসে দেবীর আসনে।
পূজক-আসনে বসে জগতের গুরু,
বিধিমতে দেবীপূজা হয়ে যায় সুরু।
দেবীপদে রামকৃষ্ণ যা করে অর্পণ
ভাবমগ্না সারদা তা করেন গ্রহণ।
পূজার মাঝারে হয়ে সমাধিতে লয়
পূজ্য ও পূজক মিশে এক আত্মা হয়।
পূজা-শেষে প্রভু মা-র চরণকমলে
সাধনার সব ফল দিলা অর্ঘ্য-ছলে।
দ্বাদশ বৎসর ধরি কত না সাধন,
কত ত্যাগ, কি তপস্যা, কত আরাধন।
তাহার সকল ফল জপমালা সনে
সঁপি মূর্তিমতী মহাশক্তির চরণে
দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী সাধন-যজ্ঞেতে
পূর্ণাহুতি দান করিলেন এই মতে।

সমালোচনা

বিবেকচূড়ামণিঃ—অনুবাদক : স্বামী বেদান্তানন্দ, প্রকাশক : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩৮০ ; মূল্য ৪৲।

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে শঙ্করাচার্যকৃত 'বিবেক-চূড়ামণিঃ' গ্রন্থখানি চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। সাধক ও মুমুক্ষুগণের কণ্ঠহারস্বরূপ 'বিবেকচূড়া-মণিঃ' গ্রন্থের সার্থকতা শুধু নামে নয়, জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করাইবার ক্ষমতা ইহার অসীম। নামরূপাত্মক সংসারের মিথ্যাত্ব, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সত্তার অনস্তিত্ব এবং জীবের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদন অতি দুরূহ। কিন্তু শব্দের মনোহারিত্ব, ভাষার প্রাঞ্জলতা, যুক্তির সুগমতা ও উপস্থাপনের কৌশলে দুরূহ বিষয়ও প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট দুর্বোধ্য থাকে না। এই প্রকরণ-গ্রন্থে আচার্য শঙ্করের লেখনী-মুখে নির্ঝরের মতো অমৃতধারা নিঃসৃত হইয়াছে। যুগাচার্য স্বামীজী 'বিবেকচূড়ামণিঃ' গ্রন্থটিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। স্বামীজীর বাণী ও রচনায় অনেকস্থলে ইহার উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মূল সংস্কৃত শ্লোক, তাহার নীচে অন্বয় ও বাংলা শব্দার্থ, তৎপরে সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এই ব্যাখ্যা বিষয়-বস্তু অনুপ্রবেশে বিশেষ সাহায্য করিবে। বাংলা ভাষায় বিবেকচূড়ামণির এইরূপ একটি সংস্করণের বিশেষ অভাব ছিল, আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় সে অভাব দূর হইল সন্দেহ নাই। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত এই 'বিবেক-চূড়ামণিঃ' বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া বিবেকের আলোক প্রজ্বালিত করুক—এই প্রার্থনা।

কঠোপনিষদ্—অনুবাদক ও সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য। প্রকাশক : বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, পোঃ বজবজ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৬৪ ; মূল্য ৭৲।

উপনিষদের বাণী মহা জাগরণের বাণী। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'উপ-নিষদের বাণী দ্বারা সারা জগৎকে সজীব, সবল ও প্রাণবন্ত করা যায়।' স্বামীজী কঠোপনিষদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিত্ব-পূর্ণ ভাষা, উচ্চভাব, নচিকেতার মতো দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী ইত্যাদির সমাবেশবশতঃ এই উপনিষদ্খানি উপনিষৎসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। জ্ঞানলাভের পথে শ্রদ্ধা অপরিহার্য, কঠোপনিষদের অনুধ্যানে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা জাগরিত হয় বলিয়া ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক।

আলোচ্য গ্রন্থে মূল উপনিষদ্, মন্ত্রের অন্বয়, বাংলা অর্থ, ও শঙ্করভাষ্য সানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভাষ্যবিবৃতি'তে মূল উপনিষদ্ ও শঙ্করভাষ্যের যে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট। নিঃসন্দেহে বলা যায় কঠোপনিষদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে এই 'ভাষ্যবিবৃতি' বিশেষ সহায়ক।

আশ্রম (১৩৭২)—প্রকাশক : স্বামী পুণ্যানন্দ, কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা ; পৃষ্ঠা ৭৬।

এবারের রহড়া বালকাশ্রমের সচিত্র বার্ষিক পত্রিকাখানি নানা দিক হইতে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সংখ্যাটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'শৈশবে মাধবানন্দ' ছবিখানি এবং 'হে মহাজীবন' রচনাটি—প্রবন্ধটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি সার্থকভাবে পরিবেশিত। শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রতিটি লেখাই সুলিখিত। 'আশ্রম-সংবাদে' বিভিন্ন বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একতারা (১৩৭২)—সম্পাদক শ্রীপ্রতুল দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, মুকুন্দপল্লী, বীরভূম। পৃষ্ঠা ৬২।

'একতারা' পত্রিকাটি শিক্ষাপীঠের নব পর্যায়ে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণের রচনাবলীতে পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। 'আমাদের মাষ্টার মশাই' প্রবন্ধটি শিক্ষাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা আজীবন শিক্ষাব্রতী মুকুন্দবিহারী সাহার জীবনপরিক্রমা ও সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'একদিনের স্বাধীনতা' একটি মনোজ্ঞ রচনা। চিত্রগুলি শিক্ষাপীঠের কর্মধারার পরিচিতি-জ্ঞাপক। প্রচ্ছদপটটি পত্রিকার নামটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

কল্যাণ (হিন্দী): ৪০তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—ধর্মাঙ্ক। সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০, মূল্য ৭'৫০ টাকা।

বহুল-প্রচারিত ও হিন্দী ভাষার বিখ্যাত ধর্মপত্রিকা 'কল্যাণ'-পত্রিকার সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া সুন্দর ও মূল্যবান সচিত্র বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন; এই বৎসর 'ধর্মাঙ্ক' নামে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই বিশেষাঙ্কখানি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মহীনতার ভাব প্রকট, সেইজন্য প্রকৃত ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সন্দিহানতা জনসাধারণকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, এই অবস্থায় 'ধর্মাঙ্ক'-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য।

আলোচ্য 'বিশেষাঙ্ক'টিতে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ধর্মপ্রবক্তাগণের লেখনীমুখে বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধের মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ, মহিমা, অনুশাসন, আদর্শ প্রভৃতি যুগোপযোগী করিয়া পরিবেশিত। বহুচিত্রসমন্বিত পত্রিকাটি সংরক্ষণযোগ্য।

স্মরণিকা (১৯৬৬)—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদ, কার্যালয়: ১, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৪৩।

সুচিন্তিত রচনাসমৃদ্ধ স্মরণিকাটি স্বামীজী-নেতাজী সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'শিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ', স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', 'বিবেক-মনীষা', 'জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ', 'মহাসূর্য' (কবিতা), 'গুরুবাদ ও পুরোহিততন্ত্র', সুভাষচন্দ্রের 'রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ', 'নেতাজী সুভাষ' (কবিতা)।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদের কর্মিবৃন্দ যে উদ্দেশ্যে 'স্মরণিকা' প্রকাশ করিয়াছেন, পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচন দেখিয়া মনে হয় সে প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে পত্রিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ছোট ছোট ঢেউ—সঞ্চয়। প্রকাশক: শ্রীঅমিয়কান্ত দেবসিংহ, সম্বোধি প্রকাশ, টেম্পল ষ্ট্রীট, জলপাইগুড়ি। পৃষ্ঠা ৯৭; মূল্য ২৲।

ছোটদের জন্য লেখা বইটিতে প্রাকৃতিক বর্ণনার সঙ্গে কিশোরচরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইটি শিশুসাহিত্যে আদরণীয় হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান : এপ্রিল, ১৯৬৪ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ পর্যন্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৩৩তম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম ছিল 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহাকে একটি সাধারণ হাসপাতালে পরিণত করা হয়। বর্তমানে ৩৫০ জন রোগী থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী রোগীকে বিনা-খরচে রাখা হয়।

এই হাসপাতালে সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে। বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তত্ত্বাবধান করেন।

নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সেবাপ্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শিক্ষার্থিনী পরিষেবিকার সংখ্যা ছিল ১৩৩।

বাহিরের সকল রোগী এবং হাসপাতালের শতকরা ৫০ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮৮,৫৮৯ (নূতন ৩১,৯৯৩), তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা ১১,৫২৯টি। অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,২৩৪, অস্ত্রচিকিৎসা ৬৯৯টি।

আলোচ্য বর্ষে চর্মচিকিৎসার জন্য নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। ক্যান্সার-চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা হইতেছে।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুট' খোলা হইয়াছে, ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত।

পেরিয়নায়কেনপালয়ম (কোয়েম্বাতুর) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী (১৯৬৪-'৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাটি দাক্ষিণাত্যে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। কোয়েম্বাতুর হইতে ১১ মাইল দূরে উতাকামণ্ড রোডের পার্শ্বে ৪০০ একর ভূমির উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে :

বহুমুখী বিদ্যালয়, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, স্বামী শিবানন্দ স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল বি টি কলেজ, শরীর শিক্ষা কলেজ, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ, সমাজ-শিক্ষা সংগঠক শিক্ষণ কেন্দ্র, গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ, কৃষি শিক্ষা বিদ্যালয়, কলানিলয়ম্, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, শিল্প বিদ্যালয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ২৭,০০০, ১১০ খানি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়।

ডিসপেনসারীতে ১৬,৭৫১ জন রোগী পরীক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯,৯৫৮ জন পুরুষ, ২,১২৭ জন স্ত্রীলোক এবং ৪,৬৫৬টি শিশু।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক উৎসবগুলি যথাযথ মর্যাদাসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে ১০,০০০ নারায়ণের সেবা করা হয়, উৎসবে ৩০,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া

স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর, ১৯৬৫: সৎসঙ্গ; চরম আত্মোন্নতি, বিশ্বশান্তি, 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধিকা শ্রীসারদাদেবী; আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি, পারমার্থিক সত্যের প্রতিবন্ধক—শব্দ, মানুষের পথপ্রদর্শক সেই জীবন (খৃষ্টমাস উপলক্ষে)।

জানুআরি, ১৯৬৬: যোগ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের তুলাদণ্ড, যুদ্ধ না শান্তি? নৈতিক মূল্যমানের প্রয়োজনীয়তা; স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বের প্রতি তাঁহার বাণী, ঈশ্বরই আমার শক্তি ও সঙ্গীত, কাল, মন ও নিত্যতা, সর্বজনীন ধর্মের অর্থ কি? ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে দর্শন কর।

মার্চ, '৬৬: অন্ধকার নয়, জীবনের আলো; মৃত্যুর পূর্বেই যাহা আমাদের করণীয়, ঈশ্বরানুভূতির পরাকাষ্ঠা লাভের উপায়, শরীর ও মনকে কিরূপে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করা যায়? চিন্তার সীমার পারে, অতীন্দ্রিয় জীবন, স্ফোটবাদ-রহস্য, উন্নত মনের জাগরণ, আমেরিকাকে স্বামী বিবেকানন্দ কি ধর্ম দিয়াছিলেন?

স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র: অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

বিভিন্ন সময়ে আলোচ্য বিষয়:

জানুআরি, ১৯৬৬: পুরাতনের বিদায় ও নূতনের অভিনন্দন; অন্তরের শান্তি বৃদ্ধি করিবার উপায়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী, বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক, মনের দুঃসহ যাতনা।

ফেব্রুআরি: নীতিপরায়ণতার তাৎপর্য কি? যোগ—মন স্থির করিবার বিজ্ঞান; ঈশ্বর আমার শক্তি ও সঙ্গীত; শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

মার্চ: জাগতিক ঐশ্বর্য ও ঐশ্বরিক সম্পদ, যোগ—ইহার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ, পৃথিবীতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানোন্মেষ, ঈশ্বরদর্শনের জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা।

এতদ্ব্যতীত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কঠোপনিষদের ক্লাস লইয়াছিলেন।

উৎসব-সংবাদ

রহড়া: ৪ঠা এপ্রিল সোমবার প্রাতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ঊষাকীর্তন প্রভৃতি দ্বারা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সপ্তাহব্যাপী কার্যসূচী আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে শিক্ষা ও কুটীরশিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। অধ্যাপক বসু তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে শিশুদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় পরিচয় এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানাচার্যকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দ বলেন যে, আশ্রমের ছেলেদের এই প্রদর্শনীটি শিশুর সৃজনশীল মনের পরিচয় বহন করিতেছে।

শিক্ষা ও কুটীরশিল্প প্রদর্শনীতে বালকাশ্রমের সতরটি সংস্থা যোগদান করিয়াছিল। তাছাড়া নরেন্দ্রপুর আশ্রম, ভারত সরকারের পুনর্বাসন শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিভাগ ইউ. এস. আই. এস., ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আশুতোষ মিউজিয়মের সহযোগিতায় একটি চমৎকার শিক্ষামূলক গ্যালারি পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশাখার বিদ্যার্থীরা তাহাদের কক্ষগুলিতে নানাবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ও

যন্ত্রপাতি সহ বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিল।

প্রাক্‌-বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিশুদের হাতের কাজ, নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলির বিভাগ পরিকল্পনা ও পরিচালনা, নিম্ন ও স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বিবিধ শিক্ষামূলক মডেল, হস্তশিল্প, কুটীরশিল্প ও কারুশিল্প এবং জেলা গ্রন্থাগারের রহড়া শাখা কর্তৃক পরিকল্পিত আদর্শ গ্রন্থাগারের পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রদর্শনীটি সমগ্রভাবে খুবই আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

উৎসবে কীর্তন, ভজন, নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন বিভাগের তরজা এবং শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ ও সম্প্রদায়ের ব্যায়াম প্রদর্শন দর্শকগণের মনে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে। বিভিন্ন দিনে যাঁহাদের বক্তৃতা ও ভাষণ সুধীজনকে নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দুই লক্ষাধিক দর্শক উৎসব ও প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। ১০ই এপ্রিল রবিবার সকালে রহড়া পল্লীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর সপ্তাহব্যাপী উৎসব শেষ হয়।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৯শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত তিন দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎসবের প্রথম দিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা আশ্রমপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি এবং আশ্রমের ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্থী-হোম এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়। বিকালে জনসভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীরাধেশ্যাম সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা-কালে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত উদার মত ও পথ অবলম্বন করিলে বর্তমান বিশ্বের শান্তির প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করা যাইবে।

দ্বিতীয় দিন কোল মাইনস্ ওয়েলফেয়ার কমিশনার শ্রী এস. কে. সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশাল জনসভা হয়। সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন-কাহিনী পরিবেশন প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীশ্রীমা নারীজীবনের এক মহিমময় দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার অপার করুণা ও মাতৃস্নেহে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই ধন্য হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী তাঁহার ভাষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষের নব-জাগৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবময় ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, তাঁহার দেহাবসানের তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহারই প্রদত্ত 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত বাংলা তথা ভারতবর্ষের নচিকেতারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে এবং দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

১লা মে রবিবার তৃতীয় দিনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভায় পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে—স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়িয়া তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন আশ্রমের

কর্মসচিব স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ। সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণের পর শ্রীদত্ত বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভার শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাফল্যের সহিত 'নচিকেতা' নাটক মঞ্চস্থ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

বাগেরহাট ঃ গত ২৯শে এপ্রিল বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্ম মহোৎসব মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ এবং বিশেষ পুজাহোমাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুপুরে প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। বিকালে শ্রীযুত বিনোদবিহারী সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় আট-নয়শত বিশিষ্ট শ্রোতার উপস্থিতিতে ডাঃ অরুণচন্দ্র নাগ, মোঃ ইউসুপ আলি সেখ, নিত্যানন্দ বিশ্বাস, শ্রীপরমানন্দ রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের সম্পাদক মোবারক আলি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

সভাপতি তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করেন। সভার পর সন্ধ্যায় প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী লঙ্কাকাণ্ড পালা কীর্তন করেন।

অবৈতনিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

দেওঘর ঃ গত ৭ই এপ্রিল বিহারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এক-পার্শ্বে স্থানীয় শ্রমিক-সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বিবেকানন্দ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই সব শিশু স্থানীয় পাশী (অনুন্নত) সম্প্রদায়-ভুক্ত, অত্যন্ত দরিদ্র। এতদিন ইহাদের পড়াশুনার কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রত্যহ বিনামূল্যে দুপুরের আহার দেওয়া হয়, পোষাক, পুস্তক প্রভৃতিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইয়াছে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মন্ত্রীমহোদয় বলেন যে সমগ্র বিহারে এই ধরনের স্কুল (যেখানে বিনামূল্যে দুপুরের আহার এবং পুস্তকাদি দেওয়া হয়) ইহাই প্রথম। মিশনের এই শুভ প্রচেষ্টাকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এইদিন মন্ত্রীমহোদয় বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি ও বায়োলজি লেবরেটরী গৃহেরও দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রচারকার্য

গত ১. ৭. ৬৫ হইতে ২৯. ১২. ৬৫ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন :

বিষয়	স্থান
সনাতন ধর্ম	খার, বোম্বাই
ধর্মসমন্বয়	,, ,,
আচার্য শঙ্কর, ভগবান বুদ্ধ	বিবেকানন্দ হল
শিক্ষা, স্বামী বিবানন্দের স্মৃতি	বোম্বাই
সনাতন ধর্ম	বরিষা-বেহালা, কলিকাতা
ধর্মজীবন	কলিকাতা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	ভট্টাচার্যপাড়া, হাওড়া
শিক্ষার উদ্দেশ্য	খালতল লাইব্রেরী
ভারতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাণী	বলরাম মন্দির, কলিকাতা
মহাপুরুষ-স্মৃতি	বালিগঞ্জ ,,
ভক্ত নাগমহাশয়	বকুলবাগান ,,
ধর্ম কি ?	সুরক্লিজ ভবন ,,
নারীজাতির আদর্শ	রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ,,
কর্মযোগ	ইছাপুর
অতীত ও বর্তমানের উপর বেদান্তের প্রভাব	দুর্গাপুর লায়নস্ ক্লাব
স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও সমাজসেবা	দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
সনাতন ধর্ম	খার আশ্রম, বোম্বাই
সনাতন ধর্ম ও দুর্গাপূজা	,, ,,
বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম	,, ,,
ভগবদ্গীতার বাণী	শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ,,
সনাতন ধর্মের দান	অনঙ্গমোহন হরিসভা
শ্রীরামকৃষ্ণ	পাঠচক্র, টালিগঞ্জ

বিষয়	স্থান
বিভিন্নধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের দান	রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিষ্কাম কর্ম	মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা
শক্তিপূজা	বরিষা-বেহালা কলিকাতা
ভারতের মহান সন্ন্যাসী	আঁটপুর হুগলি
স্বামী প্রেমানন্দ	"
ক্ষুধা	বউমহল কলিকাতা
স্বামী প্রেমানন্দ	ব্রহ্মমন্দির বেলুড়
শ্রীশ্রীমা	শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দিল্লী
শ্রীশ্রীমা	" সারদা সমিতি
স্বামী প্রেমানন্দ	আঁটপুর, হুগলি
স্বামী বিবেকানন্দ	ভিজাগাপত্তন
স্বামীজীর আহ্বান	রেলওয়ে ইনস্টিটিউট

স্বামী অম্বরাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি যে, গত ২রা মে, বেলা ৫টার সময় কলিকাতা সেবা-প্রতিষ্ঠানে স্বামী অম্বরাত্মানন্দ (রুক্মন্ মহারাজ) ৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ডায়াবিটিস ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ৩১শে মার্চ তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রমের ও পরে ত্রিচুর আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কালাডি আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

তাঁহার মধুর স্বভাব ও সহাস্য মুখমণ্ডল তাঁহার চিত্তপ্রসাদের পরিচয় প্রদান করিত। সকলেরই তিনি বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ও শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব সংবাদ

আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২রা ও ৩রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পূজা ও শাস্ত্রপাঠাদির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে প্রথম দিন সন্ধ্যায় কাসুন্দিয়া 'মায়ের মন্দিরের' সভ্যগণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে কলিকাতার 'রামকৃষ্ণ কথামৃত সঙ্ঘ'—'সুরে কথামৃত' পরিবেশন করেন। বৈকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহারাজ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুললিত ভাষণ দেন।

পরে শিবপুর কল্পনা মজলিস কর্তৃক 'হৈমবতী উমা' ও 'বীর অভিমন্যু' যাত্রাগান হয়। উৎসবের দুইদিন অন্ততঃ দশহাজার ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। প্রসাদ হাতে হাতে বিতরিত হয়।

নূতনপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব অনাড়ম্বর গ্রাম্য পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যালোচনা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছিল।

বাঁখাটি শ্রীরামকৃষ্ণ জুনিয়ার হাইস্কুলে গত ২০শে চৈত্র রবিবার যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সহ প্রভাতফেরী, পূজার্চনা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং দুপুরে প্রসাদবিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক বিবিধ বিষয়ের আলোচনা জনচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

স্বামী গদাধরানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে, এবং স্বামী চিদ্‌রসানন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। পরদিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-সংকীর্তন জনগণকে মুগ্ধ করে।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব পূজাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইযাছে। দুপুরে প্রায় দুই-হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি স্বামী সুশান্তানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীরথীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে গত ৩রা বৈশাখ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব, কল্যাচক বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূজার্চনা, ভোগরাগ, শোভাযাত্রা, খেলাধুলা, বক্তৃতা ও প্রসাদবিতরণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐদিন সন্ধ্যায় গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বদেবানন্দজীর পৌরোহিত্যে ও হেঁড্যাচক্রের অবর পরিদর্শক শ্রীযুত বাণীকণ্ঠ মিশ্র মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। সভান্তে স্বামী নিগমাত্মানন্দ সেবসমিতির কর্মীদের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচালিত সেবাসমিতির দুগ্ধবিতরণ ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৪ঠা বৈশাখ, সকালে ঠাকুরনগর নন্দা মহিলা বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিকট স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা ও মাতৃ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র-স্মৃতি বিদ্যানিকেতনে গত ১লা মে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পূজা, শাস্ত্রপাঠ ও ভজনের মাধ্যমে সমস্তদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে খিচুড়ি ও ফলমূল প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ও জেলা শারীব শিক্ষণ ও যুবকল্যাণ পরিদর্শক শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-দর্শনের গূঢ়-মর্মটি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেন।

সন্ধ্যায় ভারত সরকারের ফিল্‌ড পাবলিসিটি ডিভিশন কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচিত্র এবং অন্যান্য তথ্যমূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অভিনব মোটর

স্টুটগার্টের এক মোটরগাড়ির কারখানা নূতন ধরনের একটি বাস নির্মাণ করিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'রোটেল'। এই বাসে আছে ২৭ জন ট্যুরিস্টের শোবার ঘর, স্নানাগার, রান্নাঘর এবং বৈঠকখানা। ট্যুরিস্টরা কোন হোটেলে না উঠিয়া এই বাসে

বাস করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করিতে পারিবে, খরচও কম পড়িবে। বর্তমানে এই বাসটি জেরুজালেম অভিমুখে ভ্রমণরত।

বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান

সম্প্রতি-প্রকাশিত ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্র-পুঞ্জের পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জীতে বাহির হইয়াছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াইযাছে ৩২০ কোটিরও বেশী এবং এই সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ষপঞ্জীতে দেখানো হইয়াছে যে, ১৯৬০ হইতে ১৯৬৪—এই চার বৎসরে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১·৮ ভাগ।

চীনের জনসংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬৯ কোটি। ইহার পরবর্তী স্থান ভারতের—জনসংখ্যা ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ। ইহার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন (২২ কোটি ৮০ লক্ষ) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (.৯ কোটি ২০ লক্ষ) স্থান।

এশিযার জনসংখ্যা ১৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ, ইওরোপের ৪৪ কোটি ১০ লক্ষ, আফ্রিকার ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ, লাটিন আমেরিকার ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ, উত্তর আমেরিকার ২১ কোটি ১০ লক্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ। —রয়টার

পরলোকে ক্ষীরোদবালা রায়

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিতা ক্ষীরোদবালা রায় গত ৭ই মে সকাল ৫॥ টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বৎসর। গত একবৎসরকাল তিনি কলিকাতায় ৬-এফ্, আনন্দ পালিত রোডে ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ সরকারের ভবনে বাস করিতেছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান সিলেটে। ১০ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের দুর্লভ সঙ্গ ও অসীম কৃপা লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে "কমলানেবুর দেশের বৌমা" বলিতেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পুস্তকে (দ্বিতীয় খণ্ড) তাঁহার লেখা স্মৃতিকথা রহিয়াছে।

তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ॥ শান্তিঃ॥।